র্কস সংখ্যা ১৯৮৪

পরিচয়

ডুয়ার্স! ডুয়ার্স!

পরিশিষ্ট

... হি নো দিবসাঃ

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ঘটনাবলীর, বিশেষ করে শিক্ষাজগতের, সত্যনিষ্ঠ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এই বর্ষীয়ান সুখ্যাত অধ্যাপক তথ্যসহ সমালোচনা করেছেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির আচরণও আলোচিত হয়েছে। [৪০'০০]

অন্যান্য বই

ঠাকুরবাড়ীর কথা

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সংশোধিত পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঠাকুরবাড়ীর দু'শ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে পুনঃ-প্রকাশিত [২৫'০০]

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

ডঃ শঙ্কর ঘোষ [২০'০০]

ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত চার হাজার পদের আকরগ্রন্থ [৭৫ ০০]

ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। সাহিত্য একাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত। [৩০'০০]

রামায়ণ

কৃত্তিবাস বিরচিত

ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ। সচিত্র। [৩০'০০]

উপনিষদের দর্শন

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় [২০'০০]

উপনিষদের কথা
তন্ত্রের কথা

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

[প্রতি বই ১০'০০]

সা হি ত্য সং স দ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা ৭০০০০৯

রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা, সংগীত ও নৃত্য সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের চিত্তাকর্ষক বিবরণ ও সরস স্মৃতিকথাপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি বিধৃত এই গ্রন্থগুলি রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসুদের অবশ্যপাঠ্য। সুন্দর প্রচ্ছদে, চিত্রে ও রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিচিত্রে অলংকৃত।

অজিতকুমার চক্রবর্তী **কাব্য পরিক্রমা** : সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত ১০.০০।
অবনীন্দ্রনাথ ও রাণী চন্দ **ঘরোয়া** ১৫.০০।
অমিতাভ চৌধুরী **জমিদার রবীন্দ্রনাথ** ৭.০০।
অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় **মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ** ৩.৫০।
উইলিয়াম পিয়ারসন **শান্তিনিকেতন-স্মৃতি** ৮.০০।
প্রতিমা দেবী **নির্বাণ** ৬.০০, **নৃত্য** ৩.০০।
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী **রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন** ১৫.০০।
শ্রীরাণী চন্দ **আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ** ১৬.০০, **গুরুদেব** ১৬.০০।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত **শান্তিনিকেতনের একযুগ** ২৪.০০।
শ্রীশঙ্খ ঘোষ **নির্মাণ আর সৃষ্টি** ২৮.০০।
শ্রীশান্তিদেব ঘোষ **রবীন্দ্রসংগীত** ২০.০০।
শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী **রবীন্দ্রনাথ ও চার অধ্যায়** ১৫.০০।
Krishna Kripalani : **Rabindranath Tagore : A Biography** 65.00.

L. K. Elmhirst **Poet and plowman 25.00, 32.00.**
Rabindranath Tagore **On the Edges of Time 30.00.**
Sunitikumar Chatterji **World Literature and Tagore : 25.00.**
Santiniketan 1901-1951 : 8.50, 11.00

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ

কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা-১৭
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার। ২১০ বিধান সরণী

সোভিয়েত পত্র পত্রিকা ও বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েত সাহিত্যিকদের গল্প, উপন্যাস, কাব্য—আর তার সাথে ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি-সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার বইয়ের জন্য যোগাযোগ করুন।

মার্কস সংখ্যা, ১৯৮৪

ফেব্রুয়ারি—এপ্রিল ১৯৮৪ মাঘ-চৈত্র [illegible] ৫৩ বর্ষ ৭-৯ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

কালানুক্রমিক রচনাপঞ্জি

মার্কসের নতুন লেখা। সিদ্ধার্থ রায়

কবিতাগুচ্ছ

মণীন্দ্র রায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শুভ বসু

কর্মের প্রবৃত্তি

পূর্ণতার সাধনা : ভিয়েতনাম অজেয়া সরকার

বিপ্লবের নিরন্তর উৎস : অ্যাঙ্গোলা, এল সালভাদোর, নিকারাগুয়া
গৌতম চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদচিত্র

যামিনী রায়

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দেবেশ রায়

পরিচয়-এর পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক গুপ্ত প্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৭ থেকে মুদ্রিত ও 'পরিচয়'-কার্যালয় ,৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৭০০০০৭ থেকে প্রকাশিত

গত বছর থেকে ভেবে এসে, এ বছর, এখন, বুঝছি, 'পরিচয়'-এর পক্ষে মার্কস সংখ্যা প্রকাশ প্রায় দুঃসাধ্যতম কাজ।

আমরা, 'পরিচয়'-এর লেখককর্মীরা, গত পাঁচ দশক ধরেই মার্কসবাদের মহাদেশের নাগরিক। সৃষ্টিশীলতায়, মননে, সংগঠনে, রাজনীতিবোধে, ইতিহাসচেতনায় মার্কসবাদের কাছ থেকেই আমরা আমাদের সামর্থ সংগ্রহ করে আসছি, করে থাকি। সেই সংগ্রহ এক নিত্য অভিযান—উৎসের সঙ্গে নিয়তপ্রসারমাণ এক সেতুনির্মাণের অভিযান। 'পরিচয়' গত অর্ধশতকের ওপর সেই সেতু রচনা করার কাজে লেগে আছে।

এত দীর্ঘ দিনে কখনো শ্লথতা দেখা গেছে, কখনো পার্টি-সাপেক্ষ রাজনীতির কর্মসূচি সাহিত্যশিল্পচিন্তা বা সৃষ্টিকে ব্যাহত করেছে, কখনো তত্ত্বের সরলীকরণ ঘটেছে, কঠিনকে সহজ করে নেয়া হয়েছে, বিমূর্ততার চিন্তাকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছে—তবু, সব সত্ত্বেও, মার্কসবাদ দিয়েই আমরা দুনিয়াকে বুঝতে চেয়েছি, নিজেদের বুঝতে চেয়েছি। বুঝতে চেয়েছি ও বদলাতে চেয়েছি—নিজেদের বদলাতে চেয়েছি, দুনিয়াটাকেও বদলাতে চেয়েছি।

কথাটা তত্ত্বচিন্তার প্রমাণ দিয়ে বোঝানো সহজ। সে তত্ত্বচিন্তা 'পরিচয়'-এ গত পঞ্চাশ বছর নেহাত কম হয় নি। কথাটা গল্প, কবিতা, উপন্যাস দিয়ে বোঝানো কঠিন। সে চেষ্টাও গত পঞ্চাশ বছরে 'পরিচয়'-এ কম হয় নি। মার্কসবাদ 'পরিচয়'-এর কবি-লেখকদের দেখবার চোখ ও ভাববার মন তৈরি করেছে। সেই চোখ ও মনেই গত পঞ্চাশ বছর ধরে 'পরিচয়'-এর লেখকরা বিশিষ্ট হয়ে আছেন।

'পরিচয়'-এর মার্কস সংখ্যার পরিকল্পনা তৈরি করা তাই আমাদের পক্ষে দুরূহ। কোন বিশেষ বিষয়ের ওপর জোর দেয়া হবে, কোন নতুন তথ্য আমরা সন্নিবেশিত করতে পারব, আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক হয়েও মার্কসবাদের ব্যাপ্তিকে সঙ্কীর্ণ করবে না কোন বিষয়, মার্কসবাদের আধুনিকতার চর্চার সঙ্কেত পাওয়া যাবে কোন প্রসঙ্গে—এ-নিয়ে মনস্থির করে ওঠা শেষ পর্যন্তও সম্ভব

হয় নি। সেই অস্থিরতার পরিচয় হয়ত আমাদের এই সংখ্যার সর্বত্রই পাওয়া যাবে।

কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা স্থির ছিলাম। আমরা মার্কসবাদকে কোনো একটি, এবং একটিই মাত্র দিকে থেকে উপস্থিত করতে চাই না। ব্যক্তির আত্মসচেতনতার অবলম্বন আবার ব্যক্তি নিরপেক্ষ ইতিহাসচেতনার আধার, গাণিতিক বিমূর্তনের নিয়ামক অথচ বাস্তব প্রত্যক্ষ সংগঠনেরও নিয়ন্ত্রা—যে দর্শন, শুধু একটি দিক থেকে বিচার করলে তাকে সামগ্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, অথচ সেই সামগ্রিকতাই মার্কসবাদকে অন্য দর্শন থেকে আলাদা করেছে।

মার্কসবাদ নিয়ে আধুনিককালে চর্চা যেমন ব্যাপক হয়েছে, তেমনি তার সমগ্রতাকেও অনেকটা খণ্ডিত করে ফেলা হয়েছে। পশ্চিম ইয়োরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্কসবাদ চর্চার একটা বড় অংশ গত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে তৈরি হয়েছে রাষ্ট্রতত্ত্বকে কেন্দ্র করে। মার্কসবাদে রাষ্ট্রের সংজ্ঞার সেই আধুনিক তাৎপর্য আমাদের একটি রচনার বিষয়। আধুনিক টেকনোলজি ও সাইবারনেটিকস্ যে-স্তরে গেছে সেখানে মার্কসবাদের উৎপাদনতত্ত্ব ও উৎপাদনসম্পর্কের ব্যাখ্যা আর খাটে কি না এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে আজকাল প্রায়ই লেনিনের রুশবিপ্লবের তত্ত্ব সমালোচিত হচ্ছে, যেন, লেনিন রুশ বিপ্লবটা মার্কসবাদ মেনে করেন নি। লেনিনকে মেনে, স্তালিনের সূত্র ধরে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে নাকচ করারও আরো একটা ধরন আছে। কোনো কোনো মার্কসবাদী এই কথাও বিনীতভাবে বলেছেন যে পৃথিবীতে সঞ্চিত মারণাস্ত্রের পরিমাণ মানবসভ্যতা সম্পর্কেই যে অনিশ্চয়তা তৈরি করে ফেলেছে তাতে ইতিহাসের বদল ঘটানোর উপাদান সম্পর্কে মার্কসবাদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আর সক্রিয় থাকছে না।

মার্কসকে যথার্থভাবে পড়া আমাদের শুরুই হয়েছে বছর ত্রিশ-চল্লিশ। জীবৎকালে মার্কস-এর প্রকাশিত রচনার সংখ্যা তাঁর সমগ্র রচনাবলির সামান্য ভগ্নাংশও নয়। তাঁর মৃত্যুর পরে এঙ্গেলস্-এর যত্নে ও চেষ্টায় আমাদের জন্যে মার্কসবাদের সম্পদশালা তৈরি হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু তখনও সেগুলোর পাঠক খুব বেশি ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মার্কসবাদের চর্চা একটি প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন পেল। এখন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় মার্কস-এর রচনাসংগ্রহে তাঁর এখনও অনূদিত নয়, গ্রন্থ অন্তর্গত নয়, এমন রচনার সংখ্যা দেখলে মার্কস-এর রচনার সমগ্রতা সম্পর্কে একটা ধারণা আসে। মার্কস-এর রচনাবলির প্রকাশক্রমের তালিকা

থেকেও বোঝা যায় মার্কস কতটা 'অনাবিষ্কৃত' থেকে গেছেন এতদিন। মার্কসের রচনাবলি সম্পর্কিত আলোচনা দিয়েই আমরা তাই শুরু করছি।

মার্কসের মৃত্যুর পরের প্রথম এই একশ বছরকে বলা যায়—মার্কসের রচনার সঙ্গে বিশ্বের পরিচয়ের পর্ব। কখনো পাণ্ডুলিপি থেকে, কখনো পুরনো কাগজপত্র থেকে মার্কসের এক একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে, আর তাঁকে পড়ার, বোঝার ধরন নতুন মোড় নিয়েছে। ১৯৩০-এর কাছাকাছি 'প্যারিস পাণ্ডুলিপি' বেরবার পর থেকে 'মানববাদী' মার্কস সম্পর্কে এক ধারণা তৈরি হয়েছে। ১৯৫০-এর মাঝামাঝি 'গুণ্ডরিস' বেরবার পর 'ক্যাপিটাল'-এর পুনর্গঠন পশ্চিমি দুনিয়ার মার্কসবাদ চর্চার প্রায় প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। মার্কসকে এই নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশাতেই পশ্চিমি দুনিয়ায় 'আননোন কার্ল মার্কস' নামে বইও বেরতে পেরেছে।

মার্কসের জীবৎকালেই তাঁর তত্ত্ব ইয়োরোপীয় সমাজবিদ্যায় বারবার বিতর্কিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর ইয়োরোপে সমাজ সম্পর্কিত কোনো নতুন তত্ত্বে মার্কসবাদের হিশেব-নিকেশ না করে এগোবার উপায় ছিল না। মার্কসীয় পদ্ধতি ও ইতিহাসবিচারে মার্কসের নিজের স্টাইল নিয়ে আমরা একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি—তাতে মার্কসকে দেখা হয়েছে আধুনিক বিতর্কেরই পরিস্থিতিতে।

কিন্তু তবু, সভ্যতার ইতিহাসে মার্কসবাদী দর্শন যে গুরুত্ব গত একশ বছরে অর্জন করেছে তা নিছক তত্ত্ব হিশেবে নয়। মার্কসবাদই প্রথম সেই তত্ত্ব যা কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক সাংগঠনিক আধার পেয়েছে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিতর বারবার পরীক্ষিত ও ব্যবহৃত হতে পেরেছে, দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করে বদলিয়েছে, বদলানোটাই হয়ে উঠেছে ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যাটাই ঘটিয়ে ফেলেছে এক পরিবর্তন। বিশ শতক জুড়ে সারা পৃথিবীতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসারের ফলেই মার্কসবাদ হয়ে উঠেছে আন্দোলন ও সংগঠনের অবিচ্ছেদ্য।

মার্কসবাদের আধুনিক চর্চায় আজকাল মার্কসবাদে বিশ্বাসী অনেক পণ্ডিত গবেষকও কখনো-কখনো এমন মন্তব্য করে থাকেন যে—মার্কসবাদই সত্য-সন্ধানের একমাত্র চাবি নয়, এবং সত্যের প্রকৃত সন্ধিৎসুকে আরো অনেক চাবিই ব্যবহার করতে হতে পারে।

এমনি শুনলে এ-কথায় কোনো আপত্তি না উঠতেও পারে—শুদ্ধ বিজ্ঞানের মার্কসবাদ-নিরপেক্ষ পদ্ধতি তো তর্কাতীত ভাবেই মান্য।

কিন্তু একটু পরে বোঝা যায়, যাঁরা ঐ আপত্তি তোলেন তাঁরা গোপনে, তত্ত্ব হিশেবে মার্কসবাদের অনন্যতাকেই অস্বীকার করতে চান, একটু ঘুরিয়ে!

মার্কসবাদ যদি তত্ত্বই হত নিছক, তার আরো কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী বা সহযোগীকেও মেনে নেয়া যেত। কিন্তু আন্দোলন ও সংগঠন, কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কমিউনিস্ট সংগঠনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যতাই মার্কসবাদকে তত্ত্ব হিশেবে অনন্যতা দিয়েছে। মার্কসবাদ ছাড়া অন্য অনেক পদ্ধতিতেই সত্য জানা যেতে পারে, কিন্তু মার্কসবাদ ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতেই সেই জ্ঞাত সত্য দিয়ে দুনিয়াকে বদলানো যায় না।

কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠনের এই প্রসার এই শতাব্দীতে ঘটেছে সোভিয়েত বিপ্লবের ফলে ও ষাট বছরের ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈজয়ন্ত অস্তিত্বের জোরে। সোভিয়েত ইউনিয়নই এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর প্রধান সেই দেশ—যে দেশের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি প্রতিশ্রুতি, এমন-কি প্রতিটি নীরবতাও, সারা পৃথিবীতে মার্কসবাদ দ্বারা নিয়ত পরীক্ষিত হয়। মার্কসবাদ কীভাবে দুনিয়াকে বদলায় তা বুঝতে এখনও পর্যন্ত আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকেই তাকাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের যে-নতুন পর্ব শুরু হয়েছে তার প্রধান উৎস সোভিয়েতভূমি। বিশ্ব-শক্তিসাম্যে সোভিয়েতের প্রাধান্য, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশ্বব্যবস্থায় বিকাশ ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম—দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ইতিহাসের প্রধানতম উপাদান। ইতিহাসের এই চলমান বিকাশের বিশ্বরূপকে প্রত্যক্ষ না করলে মার্কসবাদের চর্চা হয়ে পড়ে তত্ত্ববিলাস বা কূটকচাল। আমরা তাই মার্কসবাদের আলোচনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিশাবেই ভিয়েতনামের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ও আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার প্রসারমাণ মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে দুটি রচনা এই সংখ্যায় প্রকাশ করছি।

তা ছাড়া আছে, মার্কসের রচনা নিয়ে নতুন আলোচনা, তাঁর তত্ত্বের বিষয়ে উত্থাপিত প্রশ্ন ও প্রস্তাবিত বিবেচনা, আর শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টিশীল অনুপ্রেরণা হিশেবে মার্কসবাদের অমোঘ প্রভাব সম্পর্কে আমাদের অনুভব।

এই সংখ্যার পরিকল্পনায় ও রচনাসংগ্রহে, সমস্ত সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমরা মার্কসকে দেখতে চেয়েছি জ্ঞানের নির্মাণ, কর্মের প্রযুক্তি ও সৌন্দর্যের স্বারূপ্যের সমগ্রতায়। সমগ্রতার সেই নির্দেশেই মানুষ তার প্রাক্-ইতিহাস ছেড়ে ইতিহাসে প্রবেশ করছে।

লাল স্ট্রবেরি

কার্ল মার্কস স্মরণে

মণীন্দ্র রায়

রক্ত তো কতোই ঝরেছে—
ক্রুসেডের বর্শায়,
জলদস্যুর তলোয়ারে,
নারী আর পুরুষের কেনাবেচার হাটে
হাঘরে শিশুরা ঘুরেছে
টিনের বাটি হাতে।

রুখেও উঠেছে মানুষ—
পিরামিডের পাথর টানা দাস,
রোমক সাম্রাজ্যের চাবুক-ভাঙা স্পার্টাকাস,
তিন হাজার বিদ্রোহী
বুকে তীর বিঁধে লুটিয়ে পড়েছে পথে ;
প্যারিসের ক্ষণস্থায়ী বিপ্লব,
যেন মেঘছেঁড়া আলো,
অন্ধকার নেমেছে দিগ্বিজয়ের কালো নিশান উড়িয়ে।

আর তখন
তখনি বেজে উঠল তোমার কণ্ঠ,
যেন মিনারের দীর্ঘ চূড়ায়
ট্রাম্পেটের ঈগল ঃ
জাগো, সর্বহারা জাগো,
শতাব্দীর বাগানজোড়া ঐ
লাল স্ট্রবেরি,
সারা পৃথিবী তোমার !

শিশু, জায়মান প্রশ্নে

সিদ্ধেশ্বর সেন

'……কেবল তখনই মানব-প্রগতিকে সেই বিকটাকৃতি আদিম দেবমূর্তির মতো দেখাবে না যে নিহতের মাথার খুলিতে ছাড়া সুধাপান করতে চায় না…'
মার্কস : ভারত প্রসঙ্গে

ধ্বংস ও উজ্জীবনের
সমস্ত মুখগুলি খোলা

এখন চালিকা
তাই দ্বন্দ্বের নিয়মে
করে খেলা

ফেরে, কম্বুরেখা
আগে-পিছে,
যতিতে-গতিতে
রেখে পা

যেমন শৈশব থেকে, প্রতি পদে
জীবনের
কুশীলবের থামা, চলা

* * *

বিষয়টি ভেঙেচুরে দেয়, তবু
সন্তুষ্টির বোধ, নিরাপত্তা

মনে কর সেই সব শৈশব
অগ্নিও করে নি যাকে দগ্ধ

মনে কর, উদ্দালক
বুক দিয়ে বেঁধেছিলে আল

মনে কর তারা,

আরণ্যক,
বয়েছিল অরণির কাষ্ঠ

মেনেছ অভয়
যমের দুয়ারে তুমি, কবে, নচিকেতা

বিষয়টি তবু আজ ভেঙে ফেলে
সন্তুষ্টির বোধ, নিরাপত্তা

শিশুটিই মেলে ধরে প্রশ্ন
নরকের পাল্লা ভেঙে কোনো

মনে কর শৈশব, মনে কর
হারায়নি কণ্ঠায়
ফাঁসির রজ্জুর মতো কবচকুণ্ডল, সহজাত, পরে যারা

চিনে যদি নেয় কেউ—
ফের নেবে চিনে !
দশমাস পূর্ণ হ'লে মায়েরও সোদর।

জেনেছিল বিস্ফোরণ, বহ্নির-শুদ্ধির দান,
দীর্ঘ দীর্ঘ আমরণে, জয়
ক'রে প্রতিস্পর্ধী প্রাণ

শিশুটিই মেলে ধরে প্রশ্ন, তবে
নরকের পাল্লা ভেঙে ফেলে— ?

মনে কর কৈশোরেরও সাজ, কেন আজ
শৈশবের আততায়ী

শিখেছিল ..
ক্যারাটে বা গুপ্তি,

রাজনীতি, শিখেছিল, মানবনীতিকে
পায়ে দ'লে

শিশুটি নিহত নাকি উজ্জ্বলশৈশব
হানে সম্বিৎ, ঠেলে
অপাঙক্তেয়ের, মিথ্যের দাম

বাদামের খোসাটি যেমন, ভাঙে,
আঙুলের চাপে
বের হ'য়ে শুদ্ধ বাদাম

শিশুটি কি সত্তাহীন,
যদি জীবনই মেগে যায় শুধু ?
শিশুটিই প্রশ্নে জায়মান

* * *

এখনও ভীষণ্‌দেব, ক্রূর ও ভয়াল, তুলে
ওষ্ঠে পানপাত্র, নরকরোটিতে,
সুধাপান ?

শর্যনা পর্বতে, বৃত্রহা, দেহ থেকে
ভিন্ন করে মূর্ধা—

অথবা মোলক, ফিনিসীয়
ঘোর গৃধ্নু, বিশ্বের বিকার,
নতশির, দৈনিকের
বলি চাইবে কী ও !

এই দেনা এই বলি—
মানবিক ইতিহাস ভাঙে সে বিবাদ

দ্বান্দ্বিক গোধূলি
যেন, ন্যায়ে মার্কসীয়, ঘটায় বিস্ফার

কালের প্রজ্ঞাই বুঝি, ঠিকরে দেয়
মুক্তধারাগুলি

করযুগে যোগায় আয়ুধ,
ভৈরবের ডম্বরু

ফুঁ দিয়ে বাজিয়ে রেখে,
জাগরণে—
সত্তার বিষাণ ॥

আভেনিদা এল সালভাদোর
মার্কস-এর মৃত্যু-শতবর্ষে

অমিতাভ দাশগুপ্ত

লক্‌হীডে সব ছুটি বাতিল।
শিরার শিকড়-জড়ানো হাত
কাজ শুধু কাজ জিরো আওয়ার
মারণ খেলায় কী তৎপর—
তবুও শান্ত, শঙ্কাজিৎ
আভেনিদা এল সালভাদোর।

চাবি আছে। কোনো দরজা নেই।
রিপু্‌ তাড়নায় ক্ষিপ্ত হাত
ছাখো, সাইমন বলিভারের
গলা ও মুখের মাঝখানে
টানে সাবলীল ছুরির ছড়;
কেপ কেনেডির বালি চোখের
আভেনিদা এল সালভাদোর।

ভূগোলচিত্রে ছোট্ট তিল,
তবু্‌ তাকে নিয়ে ভারী নাকাল
ক্রুপস ইসপাত কারখানার
যত সব হুঁদে টেকনোক্র্যাট,
কার্নেগি হল-ও খোলে নখর—
আমেলিয়া নেমি আর্টেগা-র
আত্মদানের পুণ্যে লাল
আভেনিদা এল সালভাদোর।

টেলেক্‌স ছুটেছে ভরা মাতাল,
ছুটি কাটা সব কোম্পানির,
কাক-পক্ষীরা পায় না টের
কবি এডগার ভ্যালেঞ্জো আজ

মূর্দা কুঠিতে কেন নিথর,
সাংবাদিকের এক্সক্লুসিভ
এড়িয়ে তবুও দেশে-দেশে
তোলপাড় তোলে সেই খবর,
কবি ভ্যালেজোর মৃত্যু নেই—
আভেনিদা এল সালভাদোর।

তুমিও বলেছো ঃ মৃত্যু নেই,
নিকারাগুয়ায় ওঠে ইকো,
ভোরের চেয়েও জরুরি সেই
শ্লোগানে শ্লোগানে ভালোবাসায়
জ্বলে ওঠে আলো চম্পকের ;
টেলেক্স-এ তোলে পাগল ঝড়
আভেনিদা এল সালভাদোর।

সে ছবি এখন বেশ দূরে

শুভ বসু

এই বহুদূরে চলে আসা হলো কোনো অনিবার্যতায় ?
রাক্ষসীলগ্নের ছায়া পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছে শহর।
দৈনন্দিনতার নখ অদ্ভুত কৌতুকে, শোধ তোলার নেশায়
খুঁটে খুঁটে তুলে নেয় যূথবদ্ধতার স্মৃতি,
সোনালি রৌদ্রের দিকে পাখিদের ডানার সংকেত।

এখন তোমার সেই কথাগুলো কিছু ফ্রিকে লাগে,
যে সব কথার বজ্রে বাঁধ ভেঙে নদী একদিন
কুমারী মাটির ঘুম দেশে দেশে ভেঙে দিয়েছিল !

জমায়েত টুটে গেছে কবে, হাত থেকে ছিঁড়ে গেছে হাত।

যে সব প্রতিজ্ঞা খুব দীপ্তি নিয়ে সমস্ত রাঙাত,
বিশতলা বাইশতলা ঢ্যাঙাদের পায়ের সমীপে
আজ তারা মস্করায় নাচে। যে সমস্ত গান
দিনের বাণীর ছোঁয়া দিতে চেয়ে ডেকে যেত অমর পৌরুষে,
তাদের স্মৃতির রেশ ক্যাসেটে অলস পড়ে থাকে।

এখন তোমার সেই কথাগুলো ফিকে। ফ্রেমের ভেতরে
তীব্র ও ভ্রূ চোখ থেকে ক্ষোভ ও বেদনা ঝরে পড়ে।

বাঁচার সমস্ত সাধ একে একে শুষে নেয় যখন অশ্লেষা,
তখনো স্বপ্নের দায় কেন এত নাছোড়, চরম ?
তখনো সংরাগ কেন মাঝে মাঝে শেকড়ের তৃষ্ণা ও স্পন্দন
চিনে নিতে চেয়ে এত লড়ে যায় বন্ধ্যা মাটিতেও ?
ধোঁয়া কুয়াসায় ডুবে প্রাণপণে সবিতার দিকনির্ণয়ের
প্রয়াস চালিয়ে যায় অবুঝের মত ?

এখানে যদিও আজ অব্যবহিতকে গ্রাস করে ফেলে কংকালীতলার
প্রেতপুরাণের থেকে উঠে আসা কবন্ধের ভিড়, তবু জানি
সময়স্রোতের কেন্দ্রে এখনো যে দীপ্তি, জয়, সম্ভাবনা আছে
সেখানে অমোঘ সেই তত্ত্বের সূর্যের

তাপ লাগে।

কালানুক্রমিক জীবন ও রচনাপঞ্জি

মার্কস-এর যে-সব রচনা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো মোটা হরফে।

	সমকালীন ইতিহাস	রচনা	ব্যক্তিগত জীবন
১৮১৮	—	—	জন্ম
১৮২৪	—	—	ব্যাপটিজম
১৮৩০	গ্রেট রিফর্ম বিল	—	গ্রামার স্কুলে ভর্তি
১৮৩৫ -১৮৩৬	জার্মানিতে জোলেভারিন	—	বন ও বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু
১৮৩৭	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব শুরু	**বাবার কাছে চিঠি**	
১৮৩৮	চার্টিস্ট আন্দোলন শুরু	**ডক্টরেটের জন্যে থিসিস**	তাঁর বাবা হিয়েনরিখ মার্কস-এর মৃত্যু
১৮৩৯	—	**ডক্টরেটের জন্যে থিসিস**	
১৮৪০	ফ্রেডারিক চতুর্থ উইলিয়ামের সিংহাসনারোহণ	**ডক্টরেটের জন্যে থিসিস**	
১৮৪১		**কবিতাবলি**	ডক্টরেট পেলেন। বনে গেলেন।
১৮৪২	—	'রাইনিশ জেইতুং'-কাগজে প্রকাশিত রচনাবলি	ব্যারন ভন ওয়েস্টফ্যালেন-এর মৃত্যু ; 'রাইনিশ

			জেইতুং'-এর সম্পাদক হিশেবে কোলনে এলেন।
১৮৪৩	—	১ **ক্রিটিক অব হেগেলস ফিলজফি অফ রাইট** ২ অন দি জুইশ কোশ্চেন	বিবাহ। প্যারিসযাত্রা (অক্টোবরে)।
১৮৪৪	—	১. ক্রিটিক অব হেগেলস ফিলজফি অব রাইট : ভূমিকা ; ২. **ইকনমিক অ্যাণ্ড ফিলজফিক্যাল ম্যানাসক্রিপ্টস** ৩. ক্রিটিক্যাল নোটস অন 'দি কিং অব প্রুশিয়া এ্যাণ্ড সোস্যাল রিফর্ম ; ৪. দি হোলি ফ্যামিলি	কন্যা জেনির জন্ম (মে) ; এঙ্গেলস-এর সঙ্গে আলাপ (সেপ্টে:)
১৮৪৫	—	**থিসিস অন ফয়েরবাখ**	ব্রাসেলসে গেলেন (ফেব্রুয়ারি) ; ইংল্যাণ্ডে (জুলাই) ; কন্যা লরার জন্ম
১৮৪৬	রিপিল অব কর্ন ল'জ	১. **দি জার্মান ইডিওলজি** ২. ক্রিগের বিরুদ্ধে বিবৃতি ৩. **এনেনকভকে চিঠি**	করেসপনডেন্স কমিটি প্রতিষ্ঠা (জানুয়ারি) ; উইয়েটলিঙের সঙ্গে কলহ (মার্চ) ; ছেলে এডগারের জন্ম (ডিসেম্বর) ;
১৮৪৭	—	দি পভার্টি অব ফিলজফি	কমিউনিস্ট লিগে যোগ দিলেন (জানুয়ারি)

১৮৪৮	বিপ্লবের বছর ; ক্যালিফর্নিয়ায় গোল্ডরাশ	১. ফ্রি ট্রেডের ওপর বক্তৃতা ২. কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো ৩. জার্মানিতে কমিউনিস্ট দাবি ৪. 'নিউ রাইনিশ জেইতুঙ'এর জন্যে ৮০টি লেখা	
১৮৪৯	—	১. ওয়েজ, লেবার অ্যাণ্ড ক্যাপিটাল ২. 'নিউ রাইনিশ জেইতুঙ'-এর জন্যে ২০টি প্রবন্ধ	প্যারিস যাত্রা (মে), লণ্ডনে (আগস্ট), ছেলে গুইদোর জন্ম (নভেম্বর)
১৮৫০	টেন আওয়ার্স অ্যাক্ট	১. কমিউনিস্ট লিগের সেনট্রাল কমিটির বিবৃতি ২. 'নিউ রাইনিশ জেইতুং-রিভিউ'-এর লেখা, ৩. দি ক্লাস স্ট্রাগলস ইন ফ্রান্স	গুইদোর মৃত্যু (সেপ্টেম্বর) ডিন স্ট্রিটে (ডিসেম্বর)
১৮৫১	গ্রেট একজিবিশন	—	ফ্রানৎসিসকার জন্ম(মার্চ) ;
১৮৫২	ফ্রান্সে সেকেণ্ড এম্পায়ার [১৮৫২/৬২]	১. [নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন-এর লেখা] ২. দি এইটিনথ ব্রুমেয়ার অব লুই বোনাপার্ট ৩. দি গ্রেট মেন অব একজাইল	ফ্রানৎসিসকার মৃত্যু (এপ্রিল) ; কমিউনিষ্ট লিগ (নভেম্বর)
১৮৫৩		১. দি কোলোন কমিউনিষ্ট ট্রায়াল ২. পামারস্টোন ৩. দি নাইট অব দি নোব্‌ল কনসায়েন্স	—
১৮৫৪	ক্রিমিয়ার যুদ্ধ	পামারস্টোন অ্যাণ্ড রাশিয়া	—
১৮৫৫	—	'নিউ ওডার জেইতুং'-এর	এলিনোরের জন্ম

		জন্যে প্রায় ১০০টি লেখা	(জানুয়ারি) ; এডগারের মৃত্যু (এপ্রিল)
১৮৫৬	—	১. রিভিলেশনস অ্যাবাউট দি ডিপ্লোমেটিক হিস্ট্রি অব দি এইট্টিনথ সেনচুরি ২. 'পিপলস পেপার' ও 'ফ্রি প্রেস'-এর জন্যে লেখা	ব্যারনেস ভন ওয়েস্ট-ফালেনের মৃত্যু (জুলাই) ; গ্রাফটন টেরাসে বাড়ি
১৮৫৭	প্রথম ভারতীয় বিদ্রোহ	**জেনারেল ইনট্রোডাকশন**	
১৮৫৭/৮		**আউটলাইনস অব এ ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি (গুণ্ডরিজ)**	
১৮৫৮		নিউ আমেরিকা এনসাইক্লোপিডিয়ার জন্যে প্রবন্ধ	
১৮৫৯	ডারউইনের 'ওরিজিন অব স্পেসিজ', মিল-এর 'অন লিবার্টি'	১. প্রিফেস টু এ ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি ২. ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি ৩. 'দাস ভোল্ক'-এর জন্যে লেখা	
১৮৬০	ইতালি রাজ্য প্রতিষ্ঠা	১. হের ভোগট	
১৮৬১	আমেরিকার গৃহযুদ্ধ	'ডাই প্রিয়েস'-এ ১৫টি প্রবন্ধ	লাসালের সঙ্গে দেখা করতে হল্যাণ্ড ও জার্মানিতে (এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি)
১৮৬২	রাশিয়ায় দাসমুক্তি, জার্মানিতে বিসমার্ক		লাসাল লণ্ডনে (জুলাই)
১৮৬২/৩	—	১. **থিয়োরিজ অব সারপ্লাস ভ্যালু**	

		২. 'দাই প্রিয়েস'-এর জন্যে ৩০টি প্রবন্ধ ৩. **'পোলিশ কোশ্চেন'-এর ওপর লেখা**	
১৮৬৩	লাসালিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা	**ক্যাপিটাল (২য় খণ্ড)** (১৮৭৭ পর্যন্ত)	মেরি বার্নস-এর মৃত্যু (জানুয়ারি) ও মার্ক্স-এর মায়ের মৃত্যু (নভেম্বর); মার্ক্স ট্রায়ারে গেলেন (ডিসেম্বর)
১৮৬৪	ফার্স্ট ইন্টারন্যাশন্যাল	১. ফার্স্ট ইন্টারন্যাশন্যালে উদ্বোধনী ভাষণ ২. **ক্যাপিটাল (৩য় খণ্ড)**	মডেনা ভিলাস-এ বাড়ি (মার্চ); উলফের মৃত্যু (মে); লাসালের মৃত্যু (আগস্ট)
১৮৬৫	—	১. **ভ্যালু, প্রাইস এ্যাণ্ড প্রফিট** ২. অন প্রুদোঁ	
১৮৬৬	অস্ট্রো প্রাশিয়ান যুদ্ধ	প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসের কর্মসূচি	—
১৮৬৭	—	ক্যাপিটাল (প্রথম খণ্ড)	ক্যাপিটালের জন্যে হামবুর্গে, (এপ্রিল-মে)
১৮৬৮	প্রথম গ্ল্যাডস্টোন মন্ত্রীসভা	—	লরায় বিয়ে

১৮৬৯	জার্মানিতে সোশ্যাল ডেমক্রেটিক পার্টি প্রতিষ্ঠা	—	এঙ্গেলস-এর অবসর গ্রহণ; কুগেলমানের সঙ্গে মার্ক্স দেখা করেন (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)
১৮৭০	ফ্রাঙ্কো, প্রাশিয়ান যুদ্ধ	ফ্রাঙ্কো প্রাশিয়ান যুদ্ধের সম্পর্কে দুটি বক্তৃতা	এঙ্গেলস লণ্ডনে (সেপ্টেম্বর)
১৮৭১	প্যারিস কমিউন; জার্মান এম্পায়ার	দি সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স	
১৮৭২	আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেস	১. অ্যালেজড স্প্লিটস ইন ইণ্টারন্যাশন্যাল; ২. কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ৩. আমস্টারডাম ভাষণ	জেনির বিয়ে
১৮৭৩	—	ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের ভূমিকা	—
১৮৭৪	—	**রিমার্কস অন বাকুনিনস্ স্টেটিজম অ্যাণ্ড অ্যানার্কি**	মার্ক্স কার্লসবাদে (আগস্ট-অক্টোবর)
১৮৭৫	গোথা কংগ্রেস	১. ক্রিটিক অব দি গোথা প্রোগ্রাম ২. ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ডের ফরাসি সংস্করণ	মার্ক্স কার্লসবাদে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর); মেইটল্যাণ্ড পার্ক রোডে;
১৮৭৬	—	—	বাকুনিনের মৃত্যু; মার্ক্স কার্লসবাদে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর)

১৮৭৭	রুশো-তুর্কি যুদ্ধ	১. এ্যান্টি ডুরিং প্রসঙ্গে ২. মিগাইলবস্কিকে চিঠি	মার্ক্স ন্যুয়েনহারে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর)
১৮৭৮	জার্মানিতে সমাজতন্ত্রী বিরোধী আইন	—	—
১৮৭৯	—	১. **সার্কুলার লেটার** ২. প্রশ্নাবলি ৩. ফরাসি শ্রমিকদের কর্মসূচির ভূমিকা ৪. **হেবগনার সম্পর্কে মন্তব্য**	
১৮৮১	—	১. **ভেরা সাসুলিচকে লেখা চিঠি** ২. **মরগানের প্রিমিটিভ সোসাইটি সম্পর্কে নোট**	মার্ক্স আর্জেনতুল-এ (অগস্ট-সেপ্টেম্বর) ; জেনি মার্ক্স-এর মৃত্যু (ডিসেম্বর)
১৮৮২	—	কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর দ্বিতীয় রুশ সংস্করণের ভূমিকা	মার্ক্স অ্যালজিরার্সে মন্টিকার্লোতে (ফেব্রুয়ারি-জুন)
১৮৮৩	নিৎসের দাস স্পোক জরাথুস্ট্র	—	জেনি লোগেঁর মৃত্যু (জানুয়ারি), মার্ক্স-এর মৃত্যু (মার্চ)

মার্কস-এর 'নতুন' লেখা

সিদ্ধার্থ রায়

'Arm in arm with you I throw this challenge to the age'

মার্কসের উদ্ধৃতিতে শিলার

১৮৪২ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে কোলোনে প্রকাশিত দৈনিক, 'রাইনিশে জাইতুং ফুর পলিটিক, হ্যাণ্ডেল, অ্যাণ্ড গেওয়ার্বে'-এর তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'ডিবেটস অন ফ্রিডম অব দি প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশন অব দি প্রসিডিংস অব দি অ্যাসেম্বলি অব দি এস্টেট'-এ মার্কস লিখছেন, 'প্রথম কথা, কে কাকে অধিকার দেবে? কাণ্ট, ফিকটের অধিকার মানবেন না, টলেমি মানবেন না যে জ্যোতির্বিদ হিসেবে কোপারনিকাসের কোনো অধিকার আছে বা ধর্মতাত্ত্বিক হিসেবে লুথারের অধিকার বার্নার্ড মানবেন না। বিদ্বানরা প্রত্যেকেই তাঁদের সমালোচকদের অনধিকারী ভাবেন।'

মার্কসের অনেক রচনার মতোই এই প্রবন্ধগুলো আমাদের এতদিন অপঠিত ছিল। সম্প্রতি ইংরেজি ভাষায় প্রথম অনূদিত এই লেখাটিতে মার্কস যেমন শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন অসহিষ্ণু মানবস্বভাবের, অনধিকারচর্চার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া যেমন উঠে আসে একই বিষয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার বহুমুখী গবেষণা থেকেই, একটু আলাদা করে দেখলে, মার্কসবাদ চর্চার ক্ষেত্রে বহু মতই সমস্যা এখন। কোন বই তুলে নেব আমরা হাতে—কোলাকাওস্কিও মার্কসবাদের তত্ত্ব ও ইতিহাস লেখেন, আবার হবসবমের চার খণ্ডে প্রকাশিতব্য মার্কসবাদের বৃত্তান্তও ইতিহাসই। আন্দ্রে গোরজের ক্রমবিলীন সর্বহারার তত্ত্ব ও মার্কসবাদ, নাকি ফেদোসিয়েভের তীব্রতর শ্রেণীসংগ্রামের আধুনিক ব্যাখ্যা ও মার্কসবাদ; 'পশ্চিমী মার্কসবাদ' নামে নব্যধারার শ্রেণী-

লংগ্রামহীন মার্কসবাদ অথবা নয়া-মার্কসবাদের ভিন্নতর ব্যাখ্যায় শূন্যতার বোধ ; দায়বদ্ধ সৃষ্টিশীলতা নিয়ে ফ্র্যাকফুর্ট স্কুলের মত, নাকি ফ্রয়েডীয় বামপন্থার বিচারে মানবপ্রবৃত্তির অনুসন্ধান ?

হয়তো মার্কসবাদ-সংক্রান্ত এই বিচিত্রদৃক্, মার্কসের বহুতল মনীষারই প্রমাণ। কিন্তু 'মার্কস ইন হিজ ওন ওয়র্ডস'-এর মতো বই থেকে বা নির্বাচিত রচনাবলিতেও হয় প্রকৃত মানুটিকে আড়াল করে দাঁড়ায় নির্বাচকের পছন্দ-অপছন্দের মাপকাঠি, নয়তো, একটি মানুষের এক দিক জানাই হয় না। আমাদের এই বিহ্বলতা কাটাতেই তাই যাওয়া প্রয়োজন সমগ্র মার্কসের কাছে। এবং ভাবলে অবাক লাগে মার্কসের মৃত্যু একশো বছর পেরিয়ে গেলেও এতদিন জার্মান বা রুশ না-জানা পাঠকের পক্ষে সমগ্র মার্কসকে জানবার কোনো সরাসরি উপায় ছিল না, নির্বাচিত রচনাবলি বা মার্কস-বিষয়ক লেখাতে মূল জার্মানের অনূদিত অংশ ছাড়া। ১৯৭৫ সাল থেকে আমাদের সে সুযোগ প্রথম আসে। মস্কোর প্রগ্রেস পাবলিশার্স, লণ্ডনের লরেন্স উইশার্ট ও নিউ ইয়র্কের ইনটারন্যাশনাল পাবলিশার্সের সহযোগিতায়, মার্কস-এঙ্গেলস-এর সমগ্র রচনাবলির প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে বলা হচ্ছে, 'এই সংস্করণ এই প্রথম ইংরেজি-জানা পাঠকদের কাছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রায় সম্পূর্ণ, সম্পাদিত, প্রামাণিক সংস্করণ উপস্থিত করছে।' (পৃ ভূমিকা ১৯)। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৫ সালে। পঞ্চাশ খণ্ডকে তিন ভাগে ছড়ানো হবে—ক) দার্শনিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য রচনা—১ থেকে ২৮ খণ্ড; খ) মার্কসের ক্যাপিটাল ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রচনা—২৯ থেকে ৩৭ খণ্ড ; ও গ) ১৮৪৪ সাল থেকে লেখা চিঠি—৩৮ থেকে ৫০ খণ্ড।

এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত ১৯ খণ্ডে যে-মার্কস উঠে আসেন আমাদের সামনে, এতদিন অবধি জানা-মার্কসের চাইতে তা বড় মাপের তো বটেই, বিচিত্র, নতুন। অথচ গত ৯ বছর ধরে এই খণ্ডগুলো পাওয়া গেলেও কিন্তু দেশবিদেশের ও এদেশের মার্কসবাদচর্চায় মার্কসের নতুন প্রকাশিত, আগে অপঠিত, লেখাগুলোর কোনো আলোচনা হয় নি। এমন কি এই অসামান্য খণ্ডগুলো 'পুস্তক সমালোচনা' কলমেও কোথাও আলোচিত নয়। সম্পাদনার কাজ কোন দক্ষ পূর্ণাঙ্গতায় পৌছুতে পারে, এই খণ্ডগুলোর প্রতিটি পাতায় তার দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। গ্রেট ব্রিটেনের জ্যাক কোহেন, মরিস কর্নফোর্থ, মরিস ডব, ই. জে. হবস্‌বম, জেমস ক্লাগম্যান, মারগারেট মিন্যাট,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেমস এস. এ্যালেন, ফিলিস এস. ফনার, প্রয়াত হাওয়ার্ড সেলস্যাম, ডার্ক জে. স্ট্রইক, উইলিয়ম ডব্লু. ওয়েইনস্টোন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের এন. পি. কারামানোভা, ভি. এন. পাভলভ, এম. কে. কে. শেগলোভা, টি. ওয়াই. সোলোভোয়া, পি. এন. ফেদোসিয়েভ, এল. আই. গোলম্যান, এ. আই. ম্যালিশ, এ. জি. ইয়েগোরোভ ও ভি. ওয়াই. জেভিনের চোখে বাদ যায় নি মার্কসের যে-কোনো ব্যক্তি সম্পর্কিত, সাহিত্যিক উদ্ধৃতি বা অন্য কোনো প্রসঙ্গের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। এমন কি, অনবধানতাবশত মার্কস যে ভুল করেছেন, উদ্ধৃতিতে বা চিঠি লিখবার সময় উল্লেখ করা সাল বা মাসে—সেগুলো পর্যন্ত আলাদা করে দেখানো। এ কাজ কত দুঃসাধ্য তা একটিমাত্র তথ্য জানলেই বোঝা যায়—মার্কস বড় ও ছোট হাতের 'এ' অক্ষরটিই লিখতেন বারো-তেরো রকমভাবে ও অধিকাংশ সময়ে কোনো বড় শব্দের এক সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করতেন।

যে বিচিত্র ও নতুন মার্কসকে পাচ্ছি আমরা এই উদ্যোগের ফলে, তার উৎস পাঁচরকম—ক) মার্কসের সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত লেখার প্রথম প্রকাশ, খ) ইংরেজি ভাষায় প্রথম প্রকাশিত লেখা, গ) নানা পত্রিকায় ইংরাজিতে লেখা নানা প্রবন্ধ যা দ্বিতীয়বার কোথাও প্রকাশিত হয় নি, ঘ) মার্কস বিষয়ক নানা দলিলের (মার্কসের জন্ম সার্টিফিকেট, বিয়ের সার্টিফিকেট, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, শিক্ষাগত মানপত্র ইত্যাদি) প্রথম প্রকাশ ও ঙ) এতদিন পর্যন্ত অপ্রকাশিত চিঠিপত্র।

কোনোদিনই কোথাও প্রকাশিত হয় নি, এমন নতুন রচনার সংখ্যা—সাত। আর ইংরেজি ভাষায় প্রথম অনুবাদ হল এমন লেখা ও মার্কস বিষয়ক নতুন দলিলপত্র ও চিঠি মিলিয়ে আমদের কাছে অপঠিত মার্কসের লেখার মোট সংখ্যা—৭৮৬! পঞ্চাশতম-খণ্ড বেরুলে এই সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা শক্ত। আমরা বলতে পারি, বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে, সত্তর ও আশির দশক জুড়ে, এক নতুন ও পূর্ণাঙ্গ মার্কসকে চিনে নেব এই লেখাগুলো থেকে।

অজানা ছিল এতদিন প্রেমিকা জেনিকে মনে করে মার্কস যখন ১৮৩৬ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৩৯-এর এপ্রিল পর্যন্ত নানা কবিতা ও কাব্যনাট্য লিখছেন, তার কয়েক বছর পরে ১৮৩৯-এর শেষে, মার্কসের কাছে নতুন বই পড়বার ব্যাপারে সাহায্য চেয়ে সেই জেনিই লেখেন, 'নিশ্চয়ই নতুন বইয়ের খবর তোমার জানা আছে, কিন্তু আমি চাই সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বই, রূপকথা নয়,

কাব্যি নয়। আমার আর ও-সব সহ্য হচ্ছে না' (১ খণ্ড, পৃ ৬৯৮)। মার্কসের সাহিত্যচর্চার সম্পূর্ণ অনুবাদ—কবিতা, কাব্যনাট্য ও আংশিক উপন্যাসসহ—যেমন অনূদিত হলো ইংরেজিতে, তেমনি জেনির এই চিঠিটি আগে কোনো ভাষাতেই প্রকাশিত হয় নি।

বা ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরিয়াসের দর্শনের পার্থক্য বোঝাতে তাঁর গবেষণা গ্রন্থের নতুন ভূমিকাতে ১৮৪১ সালের শেষে ও ১৮৪২-এর শুরুতেই মার্কস লিখলেন, অনেক বাদ দিয়ে যোগ দিয়ে, ছোট মন্তব্য : 'এপিকিউরিয়ান, স্টয়িক ও স্কেপটিকদের দর্শন বুঝবার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। তাঁরা 'আত্ম-সচেতনতা'র দার্শনিক। এই লেখাগুলো থেকে বোঝা যাবে তাঁদের সম্পর্কে এতদিন কত কম আলোচনা হয়েছে।'

১৮৪১ সালের শেষ দিকে মার্কস নতুন করে গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হন, তাঁর মূল গবেষণার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। ছিল অন্য কোনো ব্যক্তির করা কপি মার্কসের নোট সহ। ১৯৪৬ সালে কুর্ট কার্ল মেরজ, মেলবোরনে প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করলেও এই ভূমিকাটির কথা জানা ছিল না বহুদিন। এই সময়েই শেলিং-এর বিরুদ্ধে নোটটি মার্কস লেখেন। নতুন এই ভূমিকাটি ছোট হলেও মার্কস অনেক অংশ বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বোধ হয় 'আত্মসচেতন' শব্দটি। এর আগে শব্দটি ১২ বার ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন লেখায়। কিন্তু এত স্পষ্ট করে নয়। ১৮৪২ সালের ৫ মে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর প্রথম প্রবন্ধের পঞ্চম অনুচ্ছেদেই মার্কস ব্যবহার করলেন এই শব্দটি, 'আধা-সরকারি এক সংবাদপত্র-শিশুর আত্মসচেতনতায় জাগরণ আমরা এই প্রথম লক্ষ করছি।'

চল্লিশের দশকে মার্কসের সাংবাদিক হিসেবে লেখাগুলোর অধিকাংশই এতদিন প্রকাশিত ছিল না ইংরেজি ভাষায়। 'রেইনিশ জেইতুং' কাগজে মার্কসের সাংবাদিক হিসেবে আত্মপ্রকাশকে লেনিন বলেছিলেন, 'ভাববাদ থেকে জড়বাদে, বিপ্লবী গণতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে মার্কসের উত্তরণ।' মার্কস নিজেকেও সমৃদ্ধ করেছেন—রাজনৈতিক অর্থনীতিতে মার্কস দক্ষ ছিলেন না, সেই দুর্বলতার দিকে তিনি নজর দিলেন এবার, ১৮৪২-৪৩-এ। জার্মানির তৎকালীন সামাজিক সমস্যার তীব্র সমালোচনা থাকায় বহু লেখাই এতদিন অমুদ্রিত ছিল। সমগ্র ইউরোপীয় সংবাদপত্র ও সামাজিক চিন্তার আন্দোলনে তাই এই অনবদ্য লেখাগুলো ১৮৪৮ সালের জার্মানিতে বৈপ্লবিক জমি তৈরির প্রথম প্রকাশ পদক্ষেপ। রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি যদিও তখন

ছাড়তে পারেন নি। প্রুসিয়াকে তিনি আদর্শ রাষ্ট্র-প্রকৃতির থেকে বিপথগামী বলেই মনে করতেন, তবুও বাস্তবতার প্রতি যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রয়োগে মার্কস যখন কাঠ চুরি নিয়ে বা 'মোসেলের সংবাদদাতার যুক্তি' নামে প্রবন্ধ লেখেন, তখন, ১৮৯৫ সালের ১৫ এপ্রিল ফিশারকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠির ভাষায় বলতে হয়, মার্কস কাঠ চুরি আর মোসেল কৃষকদের বিষয়ে লিখতে গিয়েই শুদ্ধ রাজনীতি থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিচারের জটিলতায় প্রথম সচেতন হলেন, ক্রমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে সমাজতন্ত্রের বিচারে। ঐ প্রবন্ধেই মার্কস প্রথম লিখলেন, 'রাজনীতিগত ভাবে ও সামাজিক ভাবে সম্পত্তিহীন দরিদ্রের সমাবেশের'-র কথা। 'রেইনিশ জেইতুং' প্রকাশ থেকে নিষিদ্ধ হওয়া অবধি সমস্ত দলিল, এমন কি, শেয়ারহোল্ডারদের মিটিঙের 'মিনিটস' পর্যন্ত পড়তে পাই আমরা এখন।

এতদিন জানা ছিল, (মার্কসের আগের নির্বাচিত রচনাবলিতে অন্তর্ভুক্তও বটে) 'লুথার এ্যাজ আরবিটার বিটুইন স্ট্রস এ্যাণ্ড ফয়েরবাখ' প্রবন্ধটি মার্কসের লেখা—এখন গবেষণায় তা মার্কসের লেখা নয় বলে প্রমাণিত।

মার্কস-এঙ্গেলসের চিঠিপত্র আদানপ্রদান নিয়ে লেনিন লিখেছিলেন, 'এই সমস্ত চিঠিপত্রের মূল চিন্তা, ফোকাস কোথায়, তা যদি এক কথায় বলতে হয়, তা হলে বলা যায়, 'ডায়ালেকটিকস'। অর্থনীতির ভিত্তি থেকে তার সমস্ত বিকাশকে, ইতিহাসকে, প্রকৃতি বিজ্ঞানকে, দর্শনকে ও শ্রমিক শ্রেণীর দর্শন, নীতি ও কৌশলকে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেছে এই জড়বাদী দ্বান্দ্বিকতার তত্ত্ব।...মার্কস ও এঙ্গেলসের এটাই সবচেয়ে বড় দান ও বিপ্লবী মননে এখানেই তাঁদের নেতৃত্ব' (লেনিন, রচনাসংগ্রহ, ১৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৪)।

১৮৪৪-৫৫ অবধি মার্কসের লেখা, এবং ইংরেজিতে প্রথম অনূদিত, অসংখ্য চিঠির মধ্যে থেকে তিনটি বিশিষ্ট দিক বেরিয়ে আসে—দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, রাজনৈতিক অর্থনীতি ও বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব। ব্যক্তিগত জীবনের অভাব, পারিবারিক মৃত্যু, পুলিশের ধাওয়া, দেশ থেকে বহিষ্কারের হুমকি ছাড়াও এই অজস্র চিঠিগুলোতে ছড়ানো বহু পরিকল্পনা, কোনো বড় কাজের প্রাথমিক খশড়া ও আভাস, যার অনেকগুলোই পরিকল্পনা থেকে গেছে অবস্থার চাপে। এই অসামান্য পত্রলেখকের মৃত্যুর পর একজন জার্মান বুর্জোয়া সাংবাদিক মার্কসকে 'বেচারা' বলায় ১৮৮৩-র জুনে ক্রুদ্ধ এঙ্গেলস লিখলেন, 'এই ছাগলরা যদি আমার সঙ্গে মুর-এর চিঠিপত্রগুলো পড়ে তা হলে হাঁ হয়ে যাবে। তার বলিষ্ঠ প্রাণবান গদ্যের কাছে হাইনের কবিতাকেও মনে

হয় বালভাষিত। মুর প্রচণ্ড হতে পারতেন, কিন্তু বেচারা হতে পারতেন না—কখনোই না'।

যেমন 'হোলি ফ্যামিলি', 'দ্য কনডিশন অব দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যাণ্ড', 'জার্মান আইডিওলজি', 'ম্যানিফেস্টো অব দ্য কমিউনিস্ট পার্টি', 'দ্য এইটিনথ ব্রুমেয়ার অব লুই বোনাপার্ট' ও অন্যান্য আরও বহু লেখার প্রথম পরিকল্পনা ও খশড়া এই চিঠিপত্রেই প্রথম করা হয়েছিল। হয়তো এই তথ্য অনেকের জানা—কিন্তু মূল চিঠির অনূদিত পূর্ণাঙ্গ বয়ান তো এই প্রথম বের হল। মার্কসের ইচ্ছে ছিল দুই খণ্ডে 'ক্রিটিক অব পলিটিকস অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল ইকনমি' লেখা, জার্মান বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ফ্রিডরিশ লিস্টের মতামতের সমালোচনা লিখবার ইচ্ছে ছিল মার্কস-এঙ্গেলসের, 'লাইব্রেরি অব দ্য বেস্ট ফরেন সোশালিস্ট রাইটার্স' গড়বার পরিকল্পনা করেছিলেন দুজনে। কোনো ইচ্ছেই শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। এই চিঠি থেকে 'জার্মান ইডিওলজি' সম্পর্কে আমরা জানতে পারি, মার্কস-এঙ্গেলসের ইচ্ছে ছিল লেখাগুলো ছোট-ছোট নিবন্ধের আকারে প্রকাশ করা। এর জন্য ত্রৈমাসিক একটি পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়েছিল। পত্রিকাটি বেরয় নি। ১৮৪৬ সালের ১৪-১৬ মে, মার্কসের অনুগামী ও 'খাঁটি সোস্যালিষ্ট' জোসেফ হেবেইডেমেয়ারকে মার্কস লিখলেন, 'শিগগিরই বইটি তৈরি হয়ে যাবে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রায় তৈরি। প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি পৌছনো মাত্র ছাপার কাজ শুরু হয় যেন।' (৩৮ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১)। ইংলিশ লেবার মুভমেণ্টের প্রথম সারির নেতা ও চারটিস্ট বামপন্থীদের অন্যতম সংগঠক জর্জ জুলিয়ান হার্নে-ও এক চিঠিতে (মার্চ ৩০, ১৮৪৬) জানাচ্ছেন, 'আপনার কোয়াটারলি কাগজটি বের করার কথা শুনে খুশি হলাম। আপনার আশা অনুযায়ী সব হচ্ছে তো? আমি আমার স্ত্রীকে বলছিলাম আপনি রাত ৩টে-৪টে পর্যন্ত কী রকম দর্শনচর্চা করে থাকেন। শুনে তিনি বললেন, এমন দর্শন তাঁর পোশাবে না। বিপ্লবের উৎপাদনে আমার স্ত্রীর কোনো আপত্তি নেই কিন্তু ব্যাপারটা যদি সময় মেনে করা হয়' (৩৮ খণ্ড, পৃ ৫৩৩)।

'এইটিনথ ব্রুমেয়ার' লেখার আগেই ১৮৫২ সালের প্রথমে হেবেইডেমেয়ারকে পাঠানো এক চিঠিতে মার্কস সর্বহারার ঐতিহাসিক ভূমিকা, শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম নিয়ে তাঁর সারাংশ ব্যাখ্যা করেন, 'আমার পক্ষ থেকে এটুকুই বলতে পারি, আমি আধুনিক সমাজে শ্রেণীব্যবস্থার ও শ্রেণীসংগ্রামের আবিষ্কারক বলে কখনো দাবি তুলি নি। আমার বহু আগে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরাই শ্রেণী-সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশ নিয়ে অনেক লিখেছেন।...আমার কাজ

হচ্ছে ১. উৎপাদনের ব্যবস্থার বিকাশের কতকগুলি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে এই শ্রেণীগুলির অবস্থান বাঁধা; ২. শ্রেণীসংগ্রাম থেকে অনিবার্য ভাবে প্রলেতারিয়েতের ডিকটেটরশিপ তৈরি হয়; ৩. এই ডিকটেটরশিপ শ্রেণীলোপ ও শ্রেণীহীন সমাজপ্রতিষ্ঠার পথে একটা অস্থায়ী স্তর মাত্র' (৩৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২-৬৫)। এই অজস্র ব্যক্তিগত চিঠিতে আক্ষরিকভাবে ছড়িয়ে আছে মার্কস-এঙ্গেলসের প্রতিদিনকার যুদ্ধ ও সংগ্রামের কথা।

জার্মান অর্থনীতিবিদ ও সংরক্ষণনীতির প্রধান প্রবক্তা ফ্রিডরিশ লিস্টের লেখার মার্কসকৃত সমালোচনা এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। জার্মান বুর্জোয়াসি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রতিযোগিতা থেকে নিজেদের বাঁচাতে সংরক্ষণনীতির আশ্রয় নিয়েছিল এবং এই সংরক্ষণনীতির প্রধান সমর্থক লিস্টের বক্তব্যে মার্কস দেখেছিলেন জাতীয়তাবাদের নামে শোষনের এক যুক্তিবাদী অছিলা। কিন্তু লিস্টের অর্থনৈতিক মতামতকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কস 'শ্রম', 'শ্রমিক' 'বিনিময় মূল্য', 'উৎপাদক শক্তি' ও অন্যান্য মূল অর্থনৈতিক ও সামাজিক ধারণা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বলেন। মার্কসের কাছ থেকে শোনা গেল, ১৮৪৫-এর মার্চে ফ্যাক্টরি ও প্ল্যাণ্ট উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তৈরি 'মানুষের সারমেয়গৃহ' জন্ম দেয় 'প্রলেতারিয়েতের। আর প্রলেতারিয়েতের আধারে এক নতুন বিশ্বব্যবস্থার' এবং তার ধনতান্ত্রিক 'নোংরা খোলস', যে-আবরণ এই নতুন উৎপাদক শক্তি ভেঙে দেবে নিজেদের মুক্ত করবার জন্য। মার্কসের বড় মেয়ে, জেনির নাতিদের কাছে আরও নানা পাণ্ডুলিপির সঙ্গে এই লেখাটির খশড়া ছিল। কিছুদিন আগে তার সন্ধান মিলেছে। কাটাকুটি, মোছা, ফিরে লেখা, শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপে ভর্তি এই প্রবন্ধটির পাঠোদ্ধার দুঃসাহসিক সম্পাদকীয় অভিযান নিঃসন্দেহে।

বুর্জোয়া সমাজের মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয় ও সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক পরস্পরবিরোধিতা বোঝাতে মার্কস, প্যারিসের পুলিশ মহাফেজখানার অধ্যক্ষের বিবরণ থেকে তৎকালীন আত্মহত্যা ও নানাবিধ মৃত্যুর বিবরণ তুলে দেখালেন সামাজিক ব্যবস্থা ও পারিবারিক সম্পর্ক কী ভাবে ধ্বংস করছে ব্যক্তির স্বরূপকে। ১৮৪৫-এর দ্বিতীয় ভাগে লেখা এই প্রবন্ধটিতে Peuchet-এর লেখা থেকে উদ্ধৃতিই বেশি, মার্কস মাঝে-মাঝে সিদ্ধান্ত টেনেছেন, ১৮৪৮ ও ১৮৪৯-এর বিপ্লবের সময় মার্কসের সম্পাদনায় প্রকাশিত কোলোনের জার্মান দৈনিক 'নিউ রাইনিশ জাইতুং'-এ মার্কসের ও এঙ্গেলসের সহযোগিতায় লেখা প্রায় অধিকাংশ প্রবন্ধই ইংরেজিতে অপ্রকাশিত ছিল। ১৮৪৮ ও ১৮৪৯ সালের

বিপ্লবে বৈজ্ঞানিক সামাজিক প্রক্রিয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে মার্কসবাদের প্রথম পরীক্ষা, তাই মার্কস ও এঙ্গেলস নিজেদের সমস্ত শক্তি দিয়ে সংগঠন ও কাগজের কাজ চালিয়ে গেলেন, সঙ্গে কোর্ট কেস, কর্তৃপক্ষের জুলুম, দেশান্তর, শাস্তি, নির্বাসন, কী নেই। মার্কস বিষয়ক দলিলে আছে বিপ্লবের সময়কার বিভিন্ন মিটিঙের সিদ্ধান্ত, দাবি ও পুলিশের গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বয়ান পর্যন্ত, সমস্ত পাঠভেদসহ।

১৮৫৩-র নভেম্বরে লেখা 'দ্য নাইট অব দ্য নোবল কনশাসনেস' প্রবন্ধে, 'গ্রেট মেন অব দ্য একসাইল' বা 'রেভেলেসন্স কনসারনিং দ্য কমিউনিস্ট ট্রায়াল ইন কোলোন' নিবন্ধের মতোই, মার্কস পাতিবুর্জোয়া, বুলিকপচানো বিপ্লবের চক্রান্তকারী নেতাদের মুখোশ খুলে দিলেন প্রকাশ্যে। কমিউনিস্ট লিগের সদস্য অগাস্ট উইলিকের চেষ্টা ছিল বাইরের তথাকথিত গণতান্ত্রিক সংবাদমাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবীদের আক্রমণ করা। ভুল ও বিকৃত তথ্য ব্যবহার করে মার্কসকে অপদস্থ করবার চালাকি মার্কস উইলিকের পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য উদ্ধৃত করেই প্রমাণ করলেন, 'একটা ঠিক কাজের পিছনে একটা চৈতন্য-বিভ্রাট আবিষ্কার করার মধ্যেই হের উইলিকের মহত্ত্ব নিহিত আছে। 'মার্কস জানেন'। কী করে উইলিক জানলেন, মার্কস কী জানেন' (১২ খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৮২)। মার্কসের বিরুদ্ধে প্রবন্ধে উইলিক যে অভিযোগ আনেন, মার্কসের জবাব জার্মান ভাষাতেই প্রকাশ পেয়েছিল এ্যাডলফ ক্লুস আর জোসেফ হেবইডেমেয়ারের উদ্যোগে নিউ ইয়র্কে। উইলিকের লেখা বেরুবার পরই অবশ্য হেবইডেমেয়ার, ক্লুস আর এব্রাহাম জ্যাকোবি ১৮৫৩-র ২৪ নভেম্বরে সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় প্রতিবাদ পাঠান। মার্কস তবুও নিজেই জবাব দেবার সিদ্ধান্ত নেন।

১৮৬০-এর ২৯ ফেব্রুয়ারি কবি ও বিপ্লবী বন্ধু ফার্ডিনাণ্ড ফ্রেইলিগ্রাথকে মার্কস লিখলেন, যে নানা দেশের বুর্জোয়া চক্রের প্ররোচনায় সমস্ত সরকারি জগৎটাই মার্কস ও তাঁর সহযোগীদের আক্রমণ করছে, 'আমাদের মারার জন্যে পেনালকোডের বারটা বাজাচ্ছে, শুধু তাই নয়, দৈর্ঘে প্রস্থে তাকে টানাটানি করছে।' মার্কসের ভাষায় এই 'official world'-এর প্রধান উদ্যোক্তা হলেন জার্মান বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদ কার্ল ভোগট। প্রথমে পাতি বুর্জোয়া ডিমোক্র্যাটদের সঙ্গে খাতির ছিল তাঁর। ১৮৫৯-এ তিনি মার্কস ও তাঁর অনুগামীদের অকথ্য গালাগাল দিয়ে এক প্রবন্ধ লেখেন, তার আগে 'অ্যালজেমেইন জেইতুং' পত্রিকায় 'জুর ওয়ারনাং' প্রবন্ধে ভোগটের

বোনাপার্টিস্ট চরিত্র প্রকাশ পাবার পর ভোগট্ ঐ সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা করার আবেদন করলে তা খারিজ হয়। এবং ১৮৫৯ সালের ডিসেম্বরে ভোগট্ তাঁর উক্ত প্রবন্ধটি লেখেন। বুর্জোয়া প্রেস ভোগট্-এর এই লেখাকে ব্যাপক প্রচার দেয়। ১৮৬০-এর ৩১ জানুয়ারি মার্কস এঙ্গেলসকে চিঠিতে জানালেন, 'বুর্জোয়া সংবাদপত্রের বাধাহীন আনন্দ', ফেব্রুয়ারির ৩ তারিখে ফের লিখলেন, 'আমার উপর তার [ভোগট্-এর] আক্রমণ আসলে পুরো পার্টির বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের কুদেতা। তাই কুদেতা দিয়েই তার জবাব দিতে হবে। আমাদের কোন আত্মরক্ষার প্রয়োজন নেই।' বার্লিনের 'National Zeitung' দুটি প্রধান রচনায় তাদের জানুয়ারি ২২ ও ২৫, ১৮৬০, সংখ্যায় ভোগট্-এর লেখার সারাংশ ছাপে। ইউরোপের বহু পত্রিকা, বিশেষ করে হামবুর্গের ফ্রেইৎসওস, (এপ্রিল ১৮৬০) ব্রেসলর জেইতুং' ও লণ্ডনের 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' (ফেব্রুয়ারি ৫, ১৮৫০) এই নিবন্ধের ঢালাও সমর্থন করে। প্যারিসের 'রেভেউ কনতেম্পরো' (ফেব্রুয়ারি ১৫, ১৮৬০) পত্রিকার ভূমিকাও একই।

ফ্রেইলিগ্রাথকে মার্কস লিখলেন (ফেব্রুয়ারি ২৩, ১৮৬০) যে ভোগট্-এর মুখোশ খোলা 'জার্মানিতে পার্টির ভবিষ্যতের জন্যে ও পার্টির ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রমাণের জন্যে সবচেয়ে জরুরি। ভোগট্কে লিখিত উত্তর দেবার প্রস্তুতির জন্যে মার্কসের 'ক্যাপিটাল' লেখার কাজ এক বছর পিছিয়ে যায়। কমিউনিস্ট লিগ সম্পর্কে ভোগট্-এর কুৎসার জবাবে ভোগট্কে বিপ্লব-বিরোধী, সর্বহারা-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল তৃতীয় নেপোলিয়নের অর্থলালিত দালাল বলে প্রমাণ করে দিলেন মার্কস। ভোগট্ কেবল একজন ব্যক্তি নন, মার্কসের ভাষায় ভোগট্ 'একটি প্রবণতার প্রতিনিধি।' মার্কসীয় ইতিহাস চর্চায় প্রথম বড় কাজ এই প্রবন্ধটিতে মার্কস লিখলেন, ভোগট্ শুধু জার্মান বস্তুবাদের গাদ নন, তিনি নেপোলিয়নের অর্থপুষ্ট 'অন্যতম মুখপাত্র যাঁর গলা দিয়ে তুলিয়েরের ভেন্ট্রিলোক্যুইস্ট বিদেশী ভাষায় কথা বলেন' (১৭ খণ্ড পৃষ্ঠা ১৫৯)'। ভোগট্কে প্রতিক্রিয়াশীল প্রমাণ করতে মার্কস তৎকালীন বুর্জোয়া প্রেসের প্রকৃত চরিত্র উদ্ঘাটন করলেন তাঁর অসামান্য আক্রমণাত্মক ভাষায়। 'বোনাপার্টিস্ট প্রেসের সদস্যদের প্রত্যেকে এক ও একমাত্র মহাজনের কাছ থেকেই তাঁদের অনুপ্রেরণা উপার্জন করেন। তাই আমরা দেখি ডা.ডা ভোগট একা একা লড়ছেন এমন এক পাগলা জগাই নন। তাঁকে টাকায় মদত দেয়া হয়, তাঁকে বুলি শেখানো হয়, তাঁর নাম মহাজনের খাতায় তোলা হয়।' (১৭ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১১)। জার্মানি ও ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়া সংবাদপত্রের চরিত্র

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কস লিখলেন, 'লুকোনো পাইপের সাহায্যে লণ্ডনের সব পায়খানার ময়লা টেমসে এসে পড়ে। একই পদ্ধতিতে বিশ্বধনতন্ত্র তাদের সামাজিক মলমূত্র একগাদা পোষা কলমচির কলম দিয়ে ত্যাগ করে এবং সেই সব মলমূত্র একটা কেন্দ্রীয় সংবাদপত্রে এসে জমা হয়ঃ'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ।' মানুষের মলমূত্রে টেমসের জল কী ভাবে পচে যায় আর ব্রিটেনের মাটির সার কী করে নষ্ট হয় সে বিষয়ে প্রায়ই যথাযথ বিলাপ করা হয়ে থাকে। এই কেন্দ্রীয় সংবাদপত্রের মালিক লেভি শুধু রসায়নের বিশেষজ্ঞ নয়, এলকেমিরও বিশেষজ্ঞ। লণ্ডনের সামাজিক মলমূত্রকে সংবাদপত্রের রচনায় পরিবর্তিত করে সে সেই রচনাগুলোকে তামার পয়সায় ও তামার পয়সাকে সোনার টাকায় বদলে নেয়। সেই সংবাদপত্রের সিংহদ্বারে লেখা আছে, 'এখানে দুর্গন্ধ তৈরি করার অনুমতি আছে'। অথবা, বায়রন এর যে পদ্য অনুবাদ করেছিলেন, 'পথিক, এখানে মুতিয়া যাও' (১৭ খণ্ড, পৃ ২৪২)।

১৮৬০ সালের জানুয়ারি থেকে ভোগট্ এর ওপর প্রবন্ধ লেখার মালমশলা মার্কস সংগ্রহ শুরু করেন, লেখা শেষ হয় সেপ্টেম্বরে। তথ্য সংগ্রহের জন্য মার্কস চিঠি লেখেন সহকর্মীদের। বেকার, লোমেল, বোরখেইম, ডানা, কোলেট, জটর‍্যান্ড, লেলেহ্বেল, সোমেয়ার, পারসজেল, সাজোনোভ চিঠি লিখলেন মার্কসকে। ১৮৬০-এর ১৩ নভেম্বর এঙ্গেলসকে লেখা চিঠিতে জানা যাচ্ছে, নিবন্ধের নবম পরিচ্ছেদ লেখার মূল উৎস ছিল জি লোমেলের চিঠি। মার্কস 'National Zeitung'-এর সম্পাদক ফ্রিডরিশ জাবেলের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন করলেও তা প্রুসিয়ার বিচারকরা ১৮৬০-এর এপ্রিল অক্টোবর পর্বে নাকচ করে দেন। ফলে প্রবন্ধের শেষ অধ্যায় হয় 'এ ল স্যুট'।

নাম নিয়ে মত পার্থক্য হয়েছিল মার্কস ও এঙ্গেলস-এর। মার্কস চাইছিলেন, 'প্রাক্তন-সম্রাট ভোগট্' বা 'ডা-ডা ভোগট্' নাম দিতে। এঙ্গেলস দুটোই নামঞ্জুর করে 'হের ভোগট্' নাম পাঠালেন।

বই লেখা হলেও প্রকাশ করা আরও দুরূহ। টাকাকড়ির সমস্যা ও প্রকাশকদের অসহযোগিতা। ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বরে লণ্ডনের প্রকাশকের কাছে তা পাঠানো হয়, হেরসফেল্ড নামে মুদ্রকের সাহায্যে বই প্রকাশ পায় ১লা ডিসেম্বর, ১৮৬০। ভুলে ভর্তি। বহুল প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা হয়েছিল। জার্মানি, সুইটজারল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মোট ৪০টি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলেও কেবল ৬টি কাগজ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে।

বাকি সবাই সচেতনভাবে উদাসীন। ১৮৬১-র জানুয়ারি মার্কস এঙ্গেলকে লিখলেন, 'শয়তানরা বইটিকে চেপে দিতে চায়।'

বইটি প্রকাশিত হবার পর এঙ্গেলস লিখলেন। 'দারুণ হয়েছে' তর্কাতর্কির লেখা এতদিন যা লিখেছ তার সব চাইতে ভালো লেখা'। (ডিসেম্বর, ৩, ৫, ১৯, ১৮৬০)। ভুল্‌ উলফএর মত, 'প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মাস্টার পিস'। তাছাড়া ইমানদ, লাসালে, বুশার, অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন।

প্রতিপক্ষও নীরব ছিল না। বোনাপার্টিস্ট এজেন্ট এডুয়ার্ড মেইয়েন, এইচ বেটা ছদ্মনামে বেটজিয়েখ, ও অন্যান্যরা বেশ কটি প্রবন্ধ লেখেন মার্কসকে আক্রমণ করে।

মার্কসের জীবদ্দশায় তো নয়ই, পরেও 'হের ভোগট্' দ্বিতীয়বার বেরয় নি। ইংরেজিতে এই প্রথম অনুবাদ হল। এখন কেবল মুগ্ধ বিস্ময়ে এ অনবদ্য রচনা থেকে মার্কসের চিরপরিচিত অপরিচিত মুখ আরো একবার দেখা যায়।

কর্মের প্রযুক্তি

সমগ্রতার সাধনা : ভিয়েতনাম

অজেয়া সরকার

'একটা ভাল ফিল্ম-স্টুডিয়ো তৈরি করা এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু একটা ভাল ফিল্ম তৈরি করা খুবই কঠিন। বিষয় আর নির্মিতির অভাব ভাল স্টুডিয়ো আর ভাল যন্ত্রপাতি দিয়ে মেটানো যায় না। শিল্পের মানে শিল্পই। কোনো কিছুই শিল্পের বিকল্প নয়। রাজনীতি দিয়ে শিল্পের কাজ হয় না। নতুন যন্ত্রপাতি দিয়েও হয় না। রাজনীতি দিয়ে শিল্পের কাজ সারতে গেলে শুধু শ্লোগান-বানানো হয়। যন্ত্রপাতি দিয়ে শিল্পের কাজ সারতে গেলেও ভাল কিছু হয় না। মানবজমিনই হচ্ছে আসল কথা।'

'(শিল্প) প্রতিভার বিকাশ অত সহজ কাজ নয়, দু-এক বছরে এ কাজ হয় না, এর জন্যে ধৈর্য দরকার।…শিল্পীদের বেশি খাটানো কখনোই উচিত নয়। শিল্পীদের পক্ষে রাতদিন খাটা সম্ভব নয়। তাদের বিশ্রামের ও পড়াশোনার সময় দরকার।'

'অনেকেই বিদেশী শব্দ ব্যবহার করতে ভালবাসেন—যদিও তার বদলে খুব ভাল দেশী শব্দ ব্যবহার করা যায়।…কেউ সব কথাই অতি-সংক্ষেপে সারতে চান।—কেউ একই কথা বহুবার ব্যবহার করেন।…আমাদের নতুন শব্দ চাই—নতুন নতুন শব্দ আমাদের অত্যন্ত দরকার। বিশেষত বিজ্ঞানে, কারিগরিতে। আমাদের ভাষায় নতুন শব্দ আনতে হবে।…আমাদের ভাষার একটা ভাল ব্যাকরণ তৈরি করতে হলে সবচেয়ে আগে দরকার ভাষা সম্পর্কে ধারণা ও প্রক্রিয়া ঠিক করে নেয়া।…আমাদের ভাষার নবীকরণ দরকার।'

এই কথাগুলি বলেছিলেন ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম ভন দং। আজ নয়। ১৯৬৪ সালে ও তার পর।

১৯৬৪-র গ্রীষ্ম থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামের ওপর বোমা ফেলতে শুরু করে। সেই যুদ্ধ ইতিহাসে ধ্বংস ও বর্বরতার নিদর্শন হিসেবেই অবিস্মরণীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের নাৎসি-নিধনের পরও ভিয়েতনাম-নিধনের কর্মসূচি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারি ভাবে নিয়েছিল বলেও 'অবিস্মরণীয়।' সমস্ত পৃথিবীর গণতান্ত্রিক মানুষ হিটলারকে হারিয়েছিল আর পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রতম দেশ পৃথিবীর একটি বৃহত্তম দেশকে হারিয়ে দিল—এই কারণেও অবিস্মরণীয়।

ভিয়েতনাম মানুষের সৃষ্টিশীল স্পর্ধা ও সাহসের নতুনতম নৈতিক প্রমাণও—সে-কারণেও এই যুদ্ধ অবিস্মরণীয়।

সেই যুদ্ধের মধ্যে ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী শিল্পী-লেখক-বুদ্ধিজীবীদের নানা মিটিঙে বক্তৃতা করতেন। কখনো তাঁর আলোচ্য—ছোট ফিল্ম তোলা ভাল, নাকি, বড় ফিল্ম তোলা ভাল। কখনো তাঁর বিষয়—শিল্পীদের ঠিকমতো বিশ্রাম জুটছে কিনা। কখনো তিনি বলেন—ভিয়েতনামী ভাষায় একটা অভিধান তৈরির সমস্যা। কখনো জিজ্ঞাসা করেন—দক্ষিণ ভিয়েতনামে অনেক ভাল গল্প-কবিতা লেখা হচ্ছে, উত্তরে হচ্ছে না কেন।

আর বারবার লোকগীতির ধুয়োর মতো, বলেন, সব কিছু করতে হবে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে।

বারবার, বিঠোভেনের সিম্ফনির মতো এক মহাসঙ্গীতের প্রধান স্বরের পুনরাবৃত্তির মতো, বলেন, সব কিছু করতে হবে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে।

দু-এক সময় লেনিনের নাম করেন, দু-এক সময় হো-চি মিনের কথা বলেন, দু-এক সময় মার্কস-এঙ্গেলসের কথা বলেন।

কিন্তু নামটুকুই। উদ্ধৃতি নেই, দার্শনিক তত্ত্বের কূটকচাল নেই। তাত্ত্বিক বিতর্ক নেই।

কারণ, তখন 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' উদ্ধৃত হচ্ছিল উত্তর ভিয়েতনামের আকাশে মার্কিনি বোমার রাতকে দিন বানানো বিকট আলোতে—'কমিউনিজমের প্রেত সারা দুনিয়াকে ভয় দেখাচ্ছে'। তখন লেনিনের 'সাম্রাজ্যবাদ—ধনতন্ত্রের পরিণতি' উদ্ধৃত হচ্ছিল দক্ষিণপূর্ব এশিয়াকে দখলে রাখার জন্যে ভিয়েতনাম যুদ্ধ চালানোর খরচ অনুমোদন করে মার্কিনি কংগ্রেসের একের পর এক নতুন প্রস্তাবে। তখন, হ্যাঁ তখনই, 'জার্মান ইডিওলজি'র তরুণ

মার্কস উদ্ধৃত হচ্ছিলেন হো চি মিনের গলায়—আমরা আমাদের জন্মভূমিকে শতগুণ সুন্দর করে গড়ে তুলব—এই নদী, পাহাড়, বন তো বদলাবে না, এই মানুষও তো বদলাবে না। তখন মার্কিন বিমান বহরকে মাটিতে টেনে নামানোর কাজে ঐ টুকু দেশের প্রতিটি মানুষ যখন পথে, তখন প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করেন—একটা কবিতার কথা বা একটা গানের কোনো লাইন।

কারণ, ভিয়েতনাম জানত, যেমন জানত ১৯১৭-র রাশিয়া, ১৯৪৮-এর চীন, ১৯৫৯-এর কিউবা, মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম একটি দর্শন দুনিয়াকে বদলে দিচ্ছে—সে দর্শন মানুষের পূর্ণতম বিকাশের দর্শন।

মার্কসবাদের আগে আর-কোনো 'দর্শন', দর্শনের কর্মসূচিকে এমন বদলে দেয় নি।

মার্কসবাদের আগে আর কোনো দর্শন কি 'দুনিয়া' বলতে সত্যি করেই এই গ্রহটিকে বুঝিয়েছে, না-কি, বেশির ভাগ দর্শনই এটা ধরে নিত যে দর্শনের জন্যে, বা তত্ত্বালোচনার জন্যে, পৃথিবী বলতে ইয়োরোপ ধরে নিলেই চলে। তাই ইয়োরোপের চাইতে প্রাচীন ভূখণ্ড, প্রাচীন জনসমষ্টি, প্রাচীন ভাষা সত্ত্বেও, আফ্রিকা-ভারত-চীন-আমেরিকা 'আবিষ্কার' হয় না কলম্বাস, ভাস্কো দা গামার আগে।

'রিনাসান্স-মানবতা' আবশ্যিক ভাবেই শ্বেতাঙ্গ। 'রিনাসান্স-সম্পূর্ণতা'ও আবশ্যিক ভাবেই এক পাশ্চাত্য-সম্পূর্ণতা। 'রিনাসান্স-ম্যান' বলে যে-উপকথা প্রচলিত তার পরবর্তী বংশধরদের মানবিক সমগ্রতার মেদ জুটিয়েছে আফ্রিকার ক্রীতদাস আর এশিয়ার কাঁচা বাজার।

মার্কসবাদেই প্রথম অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের মানুষ তার মানবিক অভিজ্ঞান খুঁজে পেল। সেই মানবিক-অভিজ্ঞানের কাছে রিনাসান্সের দুজন-একজন প্রতিভাধরের কীর্তি ম্লান হয়ে যায়। সেই অভিজ্ঞানের জোরেই ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী তার এক মুঠো দেশকে আধুনিক এক বর্বর যুদ্ধের সামনে কবিতার চরণ শোনাতে পারেন, রসিকতাও করতে পারেন পুরোন কবিতা আর নতুন কবিতার ভিতরকার পার্থক্য নিয়ে। আর সেই অভিজ্ঞান থেকে অধঃপতিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তৃতায় এমন খিস্তি করেন যে তা প্রকাশের আগে কেটে দিতে হয়।

দুই

মার্কসবাদ কেবল শোষিত মানুষের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা রাষ্ট্র-

ক্ষমতা তুলে দেয় না। তার সঙ্গে আরো যে-সব সুযোগ ও সম্ভাবনা ব্যবহারের ক্ষমতা দেয়, তা হলো বিপ্লবের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ কোনো দেশের শোষিত মানুষের হাতে নতুন সমাজ, নতুন মূল্যবোধ, নতুন মানুষ সৃষ্টির ক্ষমতা। সভ্যতার ইতিহাসে বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে নতুন সমাজের গঠনপর্বে শিল্প, সাহিত্য তথা ভাষার ভূমিকা অপরিসীম। আজকের তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির ক্ষেত্রে এই চিন্তার এক বিশেষ তাৎপর্য আছে।

ভিয়েতনামে দেশ ও জাতি গঠনের কাজ চলছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রায় আটাশ বছর ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্যে। বলা যায় এই দীর্ঘ যুদ্ধে জড়িত প্রায় তিন প্রজন্মের মানুষ যেমন লড়েছে, মরেছে, তেমনই নতুন সমাজ ও দেশ গঠনের কাজে একই সঙ্গে নিজেদের উৎসর্গ করেছে। শেষের সেই কাজ সম্পূর্ণ করায় শিল্প, সাহিত্য ও ভাষা গ্রহণ করেছে এক অভাবনীয় ভূমিকা!

মার্কস বলেছিলেন যে বৈপ্লবিক মতাদর্শ যখন জনমানসের গভীরে প্রবেশ করে তখনি সেটি এমন এক অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়, যা কেবল পুরোন সমাজকে চূর্ণ করেই শান্ত হয় না, এক নতুন সমাজের গঠন পর্ব পুরো দমে শুরু করতে পারে। ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করার কঠিন আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে তার জনগণ মার্কসের এই তত্ত্বের তাৎপর্য বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিল।

ঠিক এই কথাই নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছিলেন গণতান্ত্রিক ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফ্যাম ভন দঙ, ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংস্কৃতি কর্মীদের এক সম্মেলনে।

মতাদর্শ ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবে যে কোনো দেশের পক্ষে অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো সাংস্কৃতিক সক্রিয়তার ভূমিকা ও কর্মসূচি সম্পর্কে সঠিক ধারণা। সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম, তা সে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কিংবা গৃহযুদ্ধ যাই হোক না কেন, সেগুলি সম্পাদন করার পাশাপাশি, প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকারের মধ্যেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ ত্বরান্বিত করতে হয়। কেবল তা হলেই পুরনো ব্যবস্থার বিলুপ্তি আর নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চলতে পারে। ভিয়েতনামে সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর তার শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে পার্টির নেতৃত্বে সেই কাজই সম্পন্ন করেছিল।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রসঙ্গে ভিয়েতনামের পার্টি সিদ্ধান্ত করেন যে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেই সেই বিপ্লব চালাতে হবে। একটি অনুন্নত দেশকে যদি পুঁজিবাদী বিকাশের অভিজ্ঞতা ছাড়াই, তাকে পাশ কাটিয়ে সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মে

আত্মনিয়োগ করতে হয়, তাহলে বহুতর সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান জরুরি হয়ে পড়ে। অথচ সংস্কৃতির সমস্যা কেবল বহুবিস্তৃত তাই নয়, সেটা জটিলও বটে। আর অনুন্নত দেশে এখানেই দুর্বলতা প্রচুর।

সাধারণ জ্ঞান থেকে সুস্বাস্থ্য, শরীরচর্চা, সামাজিক রীতিনীতি আচরণ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কগুলি সবই এই সংস্কৃতির অঙ্গ। এদের মধ্যে কোন ধারণা গ্রহণীয় আর কোনটাই-বা বর্জনীয় সেটাই আগে ঠিক করা দরকার। এই সাংস্কৃতিক সক্রিয়তাকে একটি মৌল সর্ব ব্যাপক, দীর্ঘ মেয়াদি পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার না করলে, বিভ্রান্তির সম্ভাবনা প্রচুর। তাই সাংস্কৃতিক বিপ্লব সমাধা করার কাজ কেবল সংস্কৃতি কর্মীদের ওপর নির্ভর করে না, সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে তাতে সামিল হতে হয়। লেনিন একদা বলেছিলেন যে, সব দেশের বর্তমানকে অতীত প্রভাবিত করে, তার বিকাশে বাধা দেয় এবং নানা সমস্যা ঘটায়। একটি অনুন্নত সমাজে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা যে মানসিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলে তার রেশ সমাজের নানা স্তরে থেকে যায়।

উদাহরণ হিসেবে ফ্যাম ভন দঙ্‌ এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলেছেন ভিয়েতনামি জনগণের সাধারণভাবে নারী সম্পর্কে মনোভাবের কথা। যে ভিয়েতনাম একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে রত, যার এক অত্যন্ত উন্নত ও সুসভ্য মতাদর্শ সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে ও রাষ্ট্রব্যবস্থা চালায়, সেখানেও নারী সম্পর্কে মনোভাবে ছিল কেবল পুরনো ধারণার গতানুগতিকতা তাই নয়, অনেক অনুন্নত ও সামন্ত ব্যবস্থাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি। স্বয়ং হো চি মিন অভিযোগ করেছেন নারী সম্পর্কে, স্ত্রীদের সম্পর্কে ভিয়েতনামি পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে। এটা মোটেই কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, বরং বলা যায় সমাজে ব্যাপকভাবে এই মনোভাব বর্তমান ছিল।

সুস্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষার ধারণার অভাবও, ভিয়েতনামী জনগণের মনে ব্যাপক ছিল। নিঃসন্দেহে এগুলি ছিল ঔপনিবেশিক অভ্যাসের রেশ। ভিয়েতনামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, বিশেষত পাহাড়ি এলাকায় জাতীয় সম্পদ সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণার অভাব, অনুন্নত সাংস্কৃতিক মানের আরেকটি নিদর্শন। এই জায়গার মানুষ বনসম্পদ কী, কেন তার সংরক্ষণ প্রয়োজন, সে কথার তাৎপর্য বোঝে নি। এগুলিকে বলা যায় মানুষের যাযাবর মনোভাবের প্রকাশ। বলা বাহুল্য এই অভিজ্ঞতা কেবল ভিয়েতনামের নয়। ভারত সহ অন্য অনুন্নত দেশের দিকে চোখ ফেরালেও দেখা যাবে এই সব সমাজে নারীর মূল্য ও মর্যাদা স্বীকারে সমাজ কুণ্ঠিত, অগণিত মানুষের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোনো বোধ

নেই এবং জাতীয় সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার তথা অপব্যবহার সেখানে নৈমিত্তিক ঘটনা।

তিন

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের রূপায়ণে ভিয়েতনাম একদা এক আন্দোলন গড়েছিল 'নতুন-সংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবার গঠনের' আন্দোলন। সমাজ পরিবর্তনে অবশ্যই তার বিরাট অবদান আছে। পৃথিবীর মানুষ আবালবৃদ্ধবনিতা যে ভিয়েতনামি জনগণের সংগ্রামে মুগ্ধ হয়েছে, তার মধ্যে পেয়েছে প্রভূত সৌন্দর্যের সন্ধান, প্রেরণার উৎস ও জনগণের মহত্ত্ব, সেইসব উপাদানগুলিকে আরো বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ করে ভিয়েতনামের সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করতে হবে। ফ্যাম ভর্ন দঙ্, জোর দিয়ে বলেছিলেন এই কাজ সম্পন্ন করার ওপর নির্ভর করছে ভিয়েতনামের সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় ও জাতীয় মুক্তি। তিনি বলেন, 'Without such a spiritual and cultural life, we can not defeat the U. S. aggressors.'

এই সাংস্কৃতিক অভিযান মানুষের আত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বৈচিত্র্যময়তার গুরুত্ববৃদ্ধিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অসীম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছিল। মানুষের অস্তিত্ব, জীবনের এই বৈচিত্র্যময়তা ও সৌন্দর্যের সন্ধানের ওপর নির্ভর করে। সমাজতন্ত্র গঠনে যদিও ভাল খাবার, ভাল পোশাক, এবং ভাল বাসস্থানের খুবই গুরুত্ব আছে, কিন্তু সমুন্নত জীবন বলতে কেবল এইসব ভাল জিনিসের যোগান বোঝায় না। জীবনের বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি খুবই দরকার, তার জন্যই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু '...human life, values and virtues, and the best human qualities do not only lie in material things but also in the spirit, ideas, feelings and soul,' যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই ভিয়েতনামের মানুষকে ভাবতে হয়েছে কী করে জনগণের আত্মিক, মতাদর্শ ও আবেগগত জীবনধারাকে আরো সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় করে তোলা যায়। সে কাজ করতে হবে দায়িত্ব সচেতন হয়ে, সংগঠন গড়ে তুলে, পরিকল্পনার ভিত্তিতে ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে। তারই জন্যে প্রয়োজন হল নতুন সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক মূল্যবোধের সৃজন।

ভিয়েতনামে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব পর্ব চলেছিল এমন একটা সময় যখন

মার্কিন হানাদারদের বিরুদ্ধে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণকে মতাদর্শের শক্তিতে বলীয়ান করে তোলা, উত্তরাঞ্চলে আক্রমণ প্রতিহত করা, দক্ষিণাঞ্চলে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই সম্পূর্ণ করা এবং তাকে প্রতিহত করে জাতীয় ঐক্য স্থাপন ও সমাজতন্ত্র সারা দেশে প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পূর্ণ করা প্রভৃতি দায়িত্বগুলি মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। এক কথায় এই সমগ্র কর্মসূচি ছিল ভিয়েতনামের বিকাশমান মুক্তি বিপ্লবের অঙ্গ। ফরাসি ঔপনিবেশিকবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম থেকে যে বিপ্লবের সূচনা, দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে মার্কিন হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে তার স্তরগুলি একে একে বিকশিত হয়ে ওঠে। ও তার মধ্যেই প্রকাশ পায় ভিয়েতনামি জনগণের এই বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার অপরিসীম নিষ্ঠা।

কিন্তু তখনই প্রশ্ন ওঠে শত্রুমুক্ত উত্তরাঞ্চলে কৃষি ও শিল্পের গঠনে, সমাজ-তান্ত্রিক গঠন কর্মের সর্বস্তরে এই বিপ্লবী শক্তির সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ ঘটেছে কী? ভিয়েতনামের পার্টি অবস্থার পর্যালোচনা করে অনুভব করেন যে, এই বিপ্লবী দায়িত্ব পালনের জন্য পার্টির বহু পরীক্ষিত নীতি সমূহকে আরো বিকশিত করতে হবে। সেই নীতিগুলি হল স্বেচ্ছাব্রতী মনোভাব, যৌথ সক্রিয়তা ও গণতান্ত্রিকতা, যেমন দেশের সমবায় ক্ষেত্রগুলিকে রূপান্তরিত করতে হবে খাঁটি, বিবেকবান, পরিশ্রম ও বুদ্ধিমান মানুষদের যৌথ সক্রিয়তার কর্মকেন্দ্রে। মতাদর্শ ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব হবে সেই কর্মকাণ্ডের পথিকৃৎ। তখনই প্রশ্ন ওঠে এই সব সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক সক্রিয়তাকে কী ভাবে জনজীবনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট করানো যায়? প্রধানমন্ত্রী ফ্যাম বলেছেন, তার জন্য দরকার ছিল জনগণকে সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক সক্রিয়তা সম্পর্কে সচেতন করা। তাহলে নিজের উপলব্ধি থেকে জনগণ সেই সব সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতা বুঝবে এবং নিজেদের সৃজনশীল সক্রিয়তা দিয়ে তা সমাধান করবে। ফলে জনগণের অভিজ্ঞতা থেকে এমন অনেক নতুন চিত্তাকর্ষক ও নতুন ধরণের আর্ট ফর্ম গড়ে উঠতে পারে' যা নিছক তাত্ত্বিক চিন্তায় ভাবা যায় না। সন্দেহ নেই রাষ্ট্রীয় বা অন্যান্য সংগঠিত উৎস থেকে সাহায্য পেলে এ কাজ দ্রুততর হতে পারত। কিন্তু যুদ্ধরত ভিয়েতনামের জনগণকে নিজের শক্তির জোরেই, আত্মনির্ভর হয়ে সে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। ভিয়েতনামের নেতৃত্ব বিশ্বাস করেছিলেন জনমানস উদ্বেলিত হলে, সমস্যা সমাধানের পথ তারা নিজেরাই খুঁজে নিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে ফ্যাম ভিয়েতনামের এই সরগ্রামী জনগণ বলতে কাদের বোঝাত, তারও এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেই জনগণ হলো খেতে খামারে,

কলেকারখানায়, সমবায়ে, শ্রমিক সংগঠনে, যুব ও মহিলা সংস্থায় এবং সৈন্য বাহিনীতে সংগঠিত দেশের মানুষ। ভিয়েনামের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছিল যে, বৈপ্লবিক মতাদর্শ জনগণের চিত্তকে প্রভাবিত করলে এক বিপুল গণ-জাগরণ ঘটে যায়, যা তার সামনে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রগতির পথে সমস্ত বাধাকে অপসারিত করতে পারে। তাই মতাদর্শগত, সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক সক্রিয়তার ভূমিকা আছে মানুষেরই স্বার্থে। সমাজের সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি এই চেতনার উদ্বোধনে মৌল দায়িত্ব পালন করে। তাই এই সব সংস্থাকে যত নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করা যাবে, যত সুশিক্ষিত ও পদ্ধতিতে উন্নত করা যাবে, ততই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের বৈপ্লবিক ভূমিকা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

ফ্যাম বলেছিলেন যে, ১৯৬৭ সালেও সে কাজ যথাযথ করা যায় নি। তার জন্যই নতুন ধরনের চিন্তাধারা ও কর্মসূচির প্রয়োজন ছিল। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান যে, সংবাদপত্র, মুদ্রণ শিল্পী, চলচ্চিত্র শিল্পী প্রভৃতি ক্ষেত্রে একাজ সম্পন্ন করার গুরুত্ব কত বেশি। মুদ্রণ ব্যবস্থার সঙ্গে সাংস্কৃতিক কাজের প্রত্যক্ষ যোগ থাকে। তেমনই সম্পর্ক হলো চলচ্চিত্রের সঙ্গে। লেনিন চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, এটা হলো এমন এক অসীম তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পকর্ম যা মানুষকে তার মননের সবচেয়ে সংবেদনশীল স্তরে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সাংস্কৃতিক রূপান্তরে তাই এদেরও রয়েছে বিশিষ্ট ভূমিকা।

চার

এই সাংস্কৃতিক রূপান্তরের পথে হাল ধরবে কারা সেটাই জরুরি প্রশ্ন। সাংস্কৃতিক রূপান্তরের উপযুক্ত জমি তৈরি হলেও তাকে বাস্তবায়িত করতে চাই দক্ষ সংস্কৃতি কর্মীদল, সৃজনশীল এবং যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ যারা সচেতনভাবেই এই ইতিবাচক পরিবর্তন পদ্ধতির নিয়ামক। দেশের মাটির যা কিছু মহান ঐতিহ্য নতুন সংস্কৃতির মধ্যে থাকা চাই তার প্রতিফলন। সচেতন সংস্কৃতি কর্মীদলের মধ্যে দিয়েই ঘটবে সেই সেতুবন্ধন।

নতুন ভিয়েতনাম গড়ার কাজে ফ্যাম ভন দঙ্, তাই বারেবারে সচেতন করেছিলেন সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরকে এই দায়িত্বের বিষয়ে। সংস্কৃতি কর্মীদলকে তাই প্রশিক্ষিত করতে হবে যাতে তারা গড়ে ওঠে এই নতুন সংস্কৃতি আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে। সংস্কৃতির বস্তুগত ভিত্তি তৈরির মতোই এই

প্রশিক্ষণ সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশিক্ষিত সচেতন কর্মীদলই নতুন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের চালিকা শক্তি।

এই সংস্কৃতি কর্মী তৈরির কাজ একটা ধারাবাহিক দায়িত্ব। ধৈর্যের সাথে ধারাবাহিকতার মিশ্রণ। এই বিপুল কর্মকাণ্ডে প্রয়োজন বহু বিচিত্র ধারার ও বিচিত্র স্তরের সংস্কৃতি কর্মী—ম্যানেজার, সৃজনশীল শিল্পী, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী, গবেষক, শিক্ষক আরো কত। এরই সাথে সৃজনশীল মনকে দেওয়া চাই উৎসাহ।

সম্ভাবনার অঙ্কুরগুলিকে প্রশিক্ষিত করার এই কাজ যেমন সহজসাধ্য নয়, তেমনি এর ফললাভও হয় না তাৎক্ষণিক। অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে চালিত করে করেই জন্ম নেয় নতুন সংস্কৃতি চেতনা। সেদিনের ভিয়েতনামে সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের কর্মীদেরও সংগঠিত করার এই দায়িত্ব ছিল ফ্যাম ভন দঙ-এর সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের। যদি এখানে সচেতনতার কোন ঘাটতি থেকে যায় তবে তার দায়িত্ব নেতৃত্বেরই।

সৃজনশীল শক্তিকেও সংগঠিত করতে হয়। সঠিক নীতি এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে থাকে। আদর্শগত প্রশ্নে সব সময়ই চূড়ান্ত মতৈক্য না হলেও, বাস্তব পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন সব সময়ই আবশ্যিক। অনেকক্ষেত্রে জাতীয় পরিস্থিতিকে নিয়ে যেতে হয় আন্তর্জাতিক স্তরে।

ঠিক সেই সময়ই ফ্যাম লক্ষ্য করেছিলেন দক্ষিণাঞ্চলে খুব মূল্যবান সাহিত্য ও শিল্পকর্ম সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল এর কারণ কী? উত্তর ভিয়েতনামের সাহিত্য ও শিল্পকর্মীদের সেই কারণ অনুসন্ধান করতে হবে এবং তার থেকে নিজেদের সৃজনশীল সক্রিয়তা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেটা এমন এক যুগ ছিল, যখন সময় নষ্ট করার মতো বেশি সময় ছিল না। সংগ্রামের যে অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের সৃজনশীল শক্তির জন্ম তখনকার সংগ্রামের উত্তুঙ্গ পর্বে সেই সৃষ্টিশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো খুবই জরুরি মনে হয়েছিল। তাই ফ্যাম হুঁশিয়ারি দেন, 'A nation can have many vestiges, but its artistic heritage is all important. Such a heritage can live for ever, whence its value.'

ফ্যাম ভন দঙ্ তাই বলেছিলেন, দুটি দিকের উপর জোর দিতে হবে। তার একটি হল তাৎক্ষণিক, সমকালীনতার দিক, অপরটি শিল্পকর্মের চিরায়ত মূল্যের দিক। তিনি বলেছিলেন বড় মাপের শিল্পকর্ম

করার জন্য যে পরিমাণ শৈল্পিক পুঁজির প্রয়োজন, সংগ্রামী ভিয়েতনামীদের কাজে লাগাবার মতো ততটা মালমশলা ছিল না। তাই জরুরি ছিল তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য ছোট মাপের, স্বল্প পরিসরের শিল্পকর্ম। দেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে ঠিক তেমনি সাহিত্য ও শিল্পকর্মের নজির তখন উত্তরে এসে পৌঁছেছিল। সেগুলি ছিল বাস্তবঘটনার, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির দলিলচিত্র। সেগুলি অত্যন্ত জীবন্ত, মানবিক এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিল্পীরা নানা ফর্মের মাধ্যমে সেগুলি তুলে ধরেছিলেন, জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ছিনিয়ে আনা কতগুলি পাতার মতো।

চলচ্চিত্র সম্পর্কেও ঠিক একই কথা বলেছেন ফ্যাম। স্বল্প দৈর্ঘের ছবি মোটেই কম গুরুত্বের নয়। কারণ তার আবেদন ছবির দৈর্ঘের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার মর্মবস্তুর গভীরতার ওপর। ভিয়েতনামিদের তখন প্রয়োজন ছিল বড় মাপের জটিল চিত্রনাট্যের চেয়ে সংগ্রামের, সৃজনের, কর্ম-শক্তি প্রকাশের ছোট মাপের দলিল চিত্র। শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এইসব দলিল চিত্র যদি প্রকৃত শিল্পগুণান্বিত হয়, তাহলেই মার্কিন হানাদারদের বিরুদ্ধে তা চিরকাল দুনিয়ার মানুষকে হুঁশিয়ারি দিয়ে যাবে। অবশ্যই এর পাশাপাশি চলবে বড় মাপের, গভীর জীবনবোধের চিত্ররূপ।

পাঁচ

ফ্যামের মতে সংস্কৃতি ফ্রন্টে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অন্যতম হাতিয়ার ছিল ভিয়েতনামের ভাষা। সেই ভাষার সাবলীলতা, বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কেবল এক নৈতিক দায় ছিল না, ধৈর্যের সঙ্গে উৎসাহের সঙ্গে সেই দায় পালন করা ছিল এক চিরকালীন গুরুত্বের অঙ্গ। দেশের সংস্কৃতি দেশের ভাষার সঙ্গে নাড়ীর যোগ বজায় রাখে। তাই ভাষার প্রকৃতি, তার মৌলিকতা, তার মর্মবস্তু, মূল্যবোধ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা, এক কথায়, ভাষার সম্পদ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকা, এই কাজের পক্ষে একান্ত জরুরি ছিল।

ভিয়েতনামের ভাষা প্রকৃতই সম্পদশালী, কারণ তার জনগণের বহুমুখী জীবনধারা, আবেগ ও আত্মিক আর্তির প্রকাশ, দীর্ঘস্থায়ী শ্রেণী ও সামাজিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামময় জীবন, এক কথায়, বিগত চার হাজার বছরের ইতিহাস এই ভাষার মধ্যে লালিত হয়েছে।

ভিয়েতনামের ভাষা সৌন্দর্যের উৎস, যে সৌন্দর্য কথায় প্রকাশিত নয়.

বিশ্লেষণের উর্ধ্বে কেবল অনুভব করতে হয়। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই এই সৌন্দর্য উৎসারিত। জনগণের আবেগ অনুভূতি, চিত্রকল্প, রূপরস যে স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে, খুশির মেজাজে অথচ অর্থবহ হয়ে স্বপ্রকাশ হয়, এই ভাষা তার থেকেই তার প্রাণসম্পদ ও সৌন্দর্য পেয়েছে। ভিয়েতনামি সাহিত্যের দিকপাল নগুয়েন ত্রাই, নুগুয়েন হু প্রমুখ মহৎ শিল্পী থেকে সমকালের কবি সাহিত্যিকরা পর্যন্ত, দেশের উত্তরে অথবা দক্ষিণে যেখানেই তাঁরা থাকুন না কেন, সবাই অবদান রেখেছেন এই ভাষার বিশুদ্ধতা সাবলীলতা ও সৌন্দর্যের অপরিসীম পরিপুষ্টিতে।

এই প্রসঙ্গে ভাষার সম্পদের দিকটাই বেশি বিবেচ্য। ভিয়েতনামি শব্দের অর্থভেদ প্রচুর, কিংবা বলা যায় একই কথাকে নানা শব্দে প্রকাশ করা যায়। ভাবের সূক্ষ্ম তারতম্য এই শব্দের প্রয়োগে অর্থবহ হয়ে ওঠে। তাই মতাদর্শ ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবে এই ভাষার প্রয়োগ, শব্দায়ন থেকে তার নিপুণ ব্যবহার, সবটাই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ভিয়েতনামিদের সংগ্রামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা থেকে জাতীয় মুক্তি অর্জন করা পর্যন্ত, সর্বস্তরে সবসময় এই ভাষাকে জীবন প্রতিফলিত করার কাজে, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে বাঙ্ময় করে তুলতে, সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক-শৈল্পিক-বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত অভিজ্ঞতা ও সাফল্যকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে হবে। এ কাজ করার জন্য দরকার হল সাধুভাষার বদলে চলতি ভাষায় কথা বলা। কিছু মানুষের প্রবণতা আছে সাধুভাষা ব্যবহারের দিকে কিংবা যেমন তেমন করে, অগোছালো ভাবে কথা বলার দিকে। তারা মানুষের বা সমাজের কারো প্রয়োজন মেটায় না, বরং হেঁয়ালি সৃষ্টি করে, দুর্বোধ্যতা বাড়ায়। তেমনি আরেকটা প্রবণতা হল, 'ক্লিশে' বা আপ্তবাক্য কিংবা ছকে ফেলা কথা বলার দিকে। সংগ্রামের পক্ষে সাধুভাষা ব্যবহারের মতো এর ব্যবহার সমান ক্ষতিকর।

আরেকটা প্রবণতা হলো ভিয়েতনামি শব্দ থাকতেও বিদেশী শব্দ ব্যবহার, পুরো কথা না বলে আধখানা শব্দের প্রয়োগ, কিংবা একই শব্দের পৌনঃপুনিকতা। কোনো কোনো লেখক অযথা এবং যথেচ্ছ শব্দ সংক্ষেপ করে থাকেন। জনগণের বোধের পক্ষে তা সমান ক্ষতিকর। সন্দেহ নেই, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে ভাষার শব্দ সম্পদ বাড়াতে হবে। বিপ্লব সম্পূর্ণ করার স্বার্থেই তা করা দরকার। ফ্যাম বলেছিলেন, সে কাজের প্রস্তুতি নিতে হবে স্কুলের পাঠক্রম থেকে, যেখানে ভাষা

শিক্ষা, ব্যাকরণ শিক্ষার উপর জোর দেওয়া দরকার। প্রয়োজন হলো এখন ভিয়েতনামী ভাষার এক ব্যাকরণ রচনা করা, দেশের কিশোর কিশোরীদের জন্যে এবং বিদেশী সেইসব বন্ধুদের জন্যে যারা ভিয়েতনামের ভাষা শিখতে আগ্রহী।

কিন্তু সেখানেও সমস্যা এই ব্যাকরণ রচনার ভিত্তি, পদ্ধতি কী হবে? ভাষার মৌলিকতা, মর্মবস্তু অক্ষুন্ন রেখে কোন পদ্ধতিতে তার নিয়ম রীতিগুলি গঠন করতে হবে, সে কাজ যেমন কঠিন তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। ভিয়েতনাম বিপ্লবের স্বার্থেই প্রয়োজন হল এই ভাষা শিক্ষা, ব্যাকরণ শিক্ষা, তার রীতি ও পদ্ধতি-গুলিকে কালোপযোগী করা। এর জন্যে দরকার ভাষার চিরায়ত রূপ এবং পরিবর্তনশীলতার মধ্যে এক মেলবন্ধন। তার মধ্যে ভাষা নিয়ত নিজেকে যেমন নবীন করতে পারবে তেমনি তার চিরায়ত মর্মবস্তু ও মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাবে না।

ফ্যান ভন দঙ এই ভাষাগত তাগিদকে মেটানোর জন্য এক অভিধান রচনার কথা বলেছিলেন। তার জন্যে প্রথমেই দরকার শব্দচয়ন। সাহিত্য সংস্থার ভাষাতত্ত্ব বিভাগকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে। চলতি ব্যবহার থেকে বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রকাশ পর্যন্ত সবকিছু যাতে সহজ স্বচ্ছন্দ হয় তার দিকেই নজর রাখতে হবে বেশি। সে কাজে বিদেশী শব্দ সংগ্রহের বদলে খুঁজে নিতে হবে ভিয়েতনামি প্রতিশব্দ। দ্বিতীয় জরুরি কাজ হল, সুদক্ষ ভাষাকর্মীদের সহযোগিতায় কবি সাহিত্যিকদের সাহায্যে, যথাযথ পদ্ধতিতে এক নতুন ভিয়েতনামি ব্যাকরণ রচনা করা। তৃতীয়ত লেখক সাংবাদিক থেকে শুরু করে কলমজীবী সমস্ত মানুষকে শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে হুঁশিয়ার হতে হবে। অসতর্কতায় যেন এখন কোনো শব্দ, বাক্যরীতি, ইডিয়ম অনুপ্রবেশ না করে সমাজের স্বার্থে যা ক্ষতিকর।

মার্কসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিপ্লব সমগ্রতার সাধনা। মার্কস তাঁর সারা জীবনে এই বিপ্লবের তত্ত্বকেই হাতিয়ার হিসেবে গড়েছিলেন; তা যেমন পুরোন ব্যবস্থাকে ভাঙে, তেমন নতুন ব্যবস্থাও গড়ে। মার্কসবাদ তাই সমাজের সৃজনশীল শিল্পকর্ম।

বিপ্লবের নিরন্ত উৎস

অ্যাঙ্গোলা, নিকারাগুয়া, এল সালভাদোর

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১৮৮৩-তে যখন মার্কস চিরদিনের মতো চোখ বুজলেন, তখন পৃথিবীতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের দাপট ছিল অপ্রতিহত। পৃথিবীর শতকরা সত্তর ভাগ অঞ্চলকে পরাধীন বা অর্ধপরাধীন করে রেখেছিল মুষ্টিমেয় কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। ১৮৭১-এ প্যারি শহরে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রথম বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়েছিল ধনিকশ্রেণী। তবু মার্কসের সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ১৮৮৩-র ১৪ মার্চ এঙ্গেলস বলেছিলেন যে মার্কসের বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্দীপিত হয়ে শোষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার জন্য লড়ছে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত কোটি কোটি মেহনতি মানুষ। তারপর এক শতাব্দী ধরে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের রাতের ঘুম কেড়েছে সর্বহারা বিপ্লবের দুঃস্বপ্ন। ১৯১৭-র নভেম্বরে দুনিয়া কাঁপানো সেই ১০টি দিনে রাশিয়াতে বিজয়ী হয়েছিল প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। তারপর সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের সমস্ত চক্রান্তকে পরাজিত করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুনে পুড়ে, পৃথিবীর সব রাস্তাই চলেছে আজ কমিউনিজমের দিকে। মার্কসের মশাল হাতে মুক্তিবিপ্লবকে জয়ের পথে নিয়ে গেছে পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশের ও সমুদ্রের দ্বীপমালার মানুষেরা। পৃথিবীর প্রতি-তিনজন মানুষের একজন বসবাস করে সেই সব বিপ্লবী রাষ্ট্রে, যে-সব রাষ্ট্র নিজেদের ঘোষণা করেছেন মার্কসের অনুগামী বলে।

এঁদের মধ্যে অনেকেই বিচিত্র পথ ধরে এগিয়েছেন বিপ্লবের দুর্গম, রক্তরাঙা

রাস্তায়। কিন্তু মার্কসের বিপ্লবী চিন্তাধারা ও কর্মনীতিই থেকেছে তাঁদের ধ্রুবতারা। সত্তরের দশকে ও আশির দশকে যে দুটি মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদের শেষ দুর্গ ধ্বসিয়ে দিচ্ছেন বিপ্লবীরা, সেই আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা মহাদেশের তিনটি দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতিই হবে এই প্রবন্ধের আলোচনার মূল বিষয়।

এক

কৃষ্ণ আফ্রিকাতে প্রথম যে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ স্থাপন করল, তারা হচ্ছে পর্তুগিজ উপনিবেশবাদী, আর ১৫৮০-তে তারা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলাতেই স্থাপন করল তাদের প্রথম দাস-রাজত্ব। ১৫৮০ থেকে ১৮৩৬ পর্যন্ত, আড়াই শত বছরে পর্তুগিজ অধিকৃত আফ্রিকা থেকে আমেরিকা মহাদেশে পর্তুগিজ শাসকরা চালান করেছিল ৪০ লক্ষ কৃষ্ণ আফ্রিকান ক্রীতদাসকে, যাদের মধ্যে ৩০ লক্ষই চালান হয়েছিল অ্যাঙ্গোলার বন্দর লুয়াণ্ডা থেকে। এই ক্রীতদাসদের মধ্যে ২০ লক্ষ চালান হয়েছিল ব্রেজিলে, প্রায় ১৫ লক্ষ চালান হয়েছিল কিউবা সহ ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে, বাকিরা অন্যত্র।

ক্রীতদাস সংগ্রহ করা হত নানাভাবে। অ্যাঙ্গোলার গভীর অভ্যন্তরের আফ্রিকেয় সর্দাররা পর্তুগিজ শাসকদের করের বদলে সরবরাহ করত নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রীতদাস। খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা ধর্মপ্রচারের নামে সংগ্রহ করত হাজার হাজার ক্রীতদাস। আর সাম্রাজ্যবাদের বন্দুকধারী সেপাইরা, গ্রামের জোয়ান মেয়ে-পুরুষকে জোর করে ধরে বেঁধে নিয়ে যেত লুয়াণ্ডাতে। তারপর ছাগল-ভেড়া-শুয়োরের মতো জাহাজের খোঁয়াড়ে পুরে, শৃঙ্খলিত করে তাদের চালান করা হত আমেরিকা মহাদেশে। রুশ বিপ্লবের কবি এই সব রক্তাক্ত ইতিহাস মনে রেখেই, পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের আফ্রিকা অভিযানকে বিদ্রূপ ও ধিক্কার দিয়ে লিখেছিলেন: 'তোমরা চলেছ "সভ্য" করার অভিযানে, হাতে তোমাদের বাইবেল, রোগের বীজাণু আর চাবুক!'[১]

ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে পৃথিবী জোড়া আন্দোলনের চাপে, ১৮৩৬-এ পর্তুগিজ সাম্রাজ্যবাদীরা আনুষ্ঠানিকভাবে দাস-প্রথার অবসান ঘটাল। তথাপি কার্যত বজায় রইল দাস-প্রথা। ১৮৪৬-এর সরকারি হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাঙ্গোলার বাসিন্দাদের মধ্যে ৪ লক্ষ হচ্ছে আফ্রিকান, আর মাত্র দু হাজার

১। ভ্লাদিমির মায়াকভ্স্কি: লেনিন

শ্বেতাঙ্গ। অথচ ৯৫০ জন শ্বেতাঙ্গর তখনও ছিল ৯০ হাজার আফ্রিকান ক্রীতদাস। এই ছিল পর্তুগিজ শাসিত আফ্রিকাতে সাদা চামড়ার 'সভ্য' মানুষদের শাসনের স্বরূপ, এমন কি উনবিংশ শতাব্দীতেও।[২]

বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে ইংরেজ উদারপন্থী সাংবাদিক হেনরি নেভিনসন অ্যাঙ্গোলা ঘুরে এসে লিখলেন 'অ্যাঙ্গোলাতে এখন যাকে বলা হচ্ছে বাধ্যতামূলক শ্রম, তাতে আর ক্রীতদাসত্বে খুব একটা তফাৎ নেই। দেশের গভীর অভ্যন্তর থেকে এই সব দাস-শ্রমিকদের যে রাস্তা দিয়ে উপকূলের দিকে হাঁটিয়ে আনা হয়, সেই সব রাস্তা ঐ হতভাগ্যদের সাদা হাড়ে ভর্তি রয়েছে। তোমার সামনে মাঝে মাঝেই চোখে পড়বে কোনও মানুষের উরুদেশের বড় বড় হাড়, আর ঝোপের মধ্যে পড়ে রয়েছে অজস্র মাথার খুলি। এ সবই ক্রীতদাসদের মৃতদেহের ধ্বংসাবশেষ—যারা পথেই অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছিল, বা যাদের নৃশংসভাবে খুন করেছিল শ্বেতাঙ্গ প্রহরীরা।'[৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয় ও এশিয়ার দেশে দেশে মুক্তি-বিদ্রোহের জয়যাত্রার সময়েও কিন্তু পর্তুগিজ আফ্রিকা রইল সাদা চামড়ার বর্ণবিদ্বেষী ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের শাসনে। ঐ সময়ে অ্যাঙ্গোলা ঘুরে এসে একজন মার্কিন সাংবাদিক লিখলেন, 'যখন একজন শ্বেতাঙ্গ বাগিচা-মালিকের অ্যাঙ্গোলাতে তার কাজের জন্য 'শ্রমিক' দরকার হয়, তখন সে সরকারকে তার প্রয়োজনটা জানায়। সরকারি বড়কর্তা তখন গ্রামাঞ্চলের সর্দারদের জানায় যে কয়েক শত 'শ্রমিক' দরকার। সর্দাররা যদি সময়মত নির্দিষ্ট সংখ্যক 'শ্রমিক' না সরবরাহ করতে পারে, তখন বন্দুকধারী পুলিশ গিয়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে 'শ্রমিক'দের।[৪]

কী পরিমাণ মুনাফা করত শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীরা, তার ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত। ডায়ামংএ অবস্থিত হীরার খনির মালিক ছিল ইংরেজ, মার্কিন, বেলজিয়াম ও পর্তুগিজ ধনপতিরা। ১৯৪৭-এ সেই খনিতে কাজ করত ১৭৫০০ শ্রমিক, যাদের মধ্যে ৬০০০ ছিল কার্যত দাস-শ্রমিক। সারা বছরে তাদের মাইনে ছিল ১৬০ টাকা। ১৯৫৪তে সেই শ্রমিকরা ৩০০ টাকা বাৎসরিক মাইনের দাবি করে, যে দাবি অগ্রাহ্য করে শ্বেতাঙ্গ মালিকরা। অথচ ঐ

২। বেসিল ডেভিড্‌সন : ইন দি আই অব দি স্টর্ম, পেলিক্যান, লণ্ডন, ১৯৭৪
৩। হেনরি নেভিনসন : এ মডার্ন স্লেভরি, নিউ ইয়র্ক, ১৯০৬
৪। নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

১৯৫৪ তেই মাত্র কয়েকশত শ্বেতাঙ্গ মালিক ঐ খনিটি থেকে নিট মুনাফা করেছিল প্রায় তিন কোটি টাকা।[৫]

আর শিক্ষা, সংস্কৃতি? ১৯৫৮তে অ্যাঙ্গোলার শতকরা ৯০ জন মানুষই ছিল নিরক্ষর। ১৯৬৫ পর্যন্ত অ্যাঙ্গোলাতে উচ্চশিক্ষার উপযোগী একটি বিদ্যায়তনও ছিল না। ঐ বছরের সরকারি হিসাবে আফ্রিকানদের জনসংখ্যা ছিল অ্যাঙ্গোলাতে প্রায় ৪৪ লক্ষ। তার মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল মাত্র ১১০১ জন। আর পর্তুগালে গিয়ে কলেজে পড়েছিল সর্বসাকুল্যে ৪৭ জন।[৬]

দুই

১৯৪৮ এ মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত ও প্রগতিশীল আফ্রিকান মিলে লুয়াণ্ডাতে পর্তুগিজ ভাষাতে একটি সাংস্কৃতিক পত্রিকা বের করলেন। তার নাম দিলেন 'মেনসাজেম' বা 'বক্তব্য'। এই পত্রিকার প্রথম পাতাতে বড় হরফে লেখা থাকত: আসুন, আমরা অ্যাঙ্গোলাকে আবিষ্কার করি। ইউরোপীয় 'সভ্যতার' বিরুদ্ধে পত্রিকাটি নিয়মিত তুলে ধরতে থাকে কৃষ্ণ আফ্রিকার ঐতিহ্যমণ্ডিত সভ্যতা। লেখা হতে থাকে যে পর্তুগিজ ও পাশ্চাত্য প্রভাবের অবসান ঘটিয়ে তবেই আফ্রিকার মহাদেশীয় সংস্কৃতির পুনরুত্থান সম্ভব হবে। লুয়াণ্ডার প্রগতিশীলদের এই বক্তব্যকে সোচ্চার সমর্থন জানান লিসবনে পাঠরত কৃষ্ণকায় কয়েকজন ছাত্র—গিনিবিসাউ-এর ইনজিনিয়ারিং ছাত্র আমিলকার কাব্রাল (পরে গিনিবিসাউ-এর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নেতা), অ্যাঙ্গোলার মেডিকেল ছাত্র অগস্তিনো নেটো (পরে অ্যাঙ্গোলার মুক্তিযুদ্ধের নায়ক ও স্বাধীন অ্যাঙ্গোলার প্রথম রাষ্ট্রপতি)।

পর্তুগাল তখন স্বৈরাচারী সালাজারের ফ্যাসিবাদী শাসনের বুটের নীচে। উদারপন্থী মতবাদের চিহ্নমাত্র নেই। লিসবনের এই কৃষ্ণকায় ছাত্ররা তখন একমাত্র সমর্থন পেলেন, ফ্যাসিস্ট শাসনে নির্যাতিত, বেআইনি পর্তুগিজ কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকেই। এইভাবেই নেটো, কাব্রাল বা স্যামেরা ম্যাশেল প্রথম পরিচয় পেলেন মার্কসের চিন্তাধারার ও বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতার। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় বিপ্লবী সংগঠকরা এটাও বুঝেছিলেন যে পর্তুগিজ শাসিত আফ্রিকার অগণিত দরিদ্র মানুষের আস্থা তাঁদের অর্জন করতে হবে, এবং

৫। বেসিল ডেভিডসন: ইন দি আই অফ দি স্টর্ম

৬। ঐ

মার্কসের চিন্তাধারাকে কৃষ্ণ আফ্রিকার বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে স্থির করতে হবে সঠিক বিপ্লবী রণকৌশল ও তৈরি করতে হবে বিপ্লবের অগ্রগামী বাহিনী।

অগস্তিনো নেটোর নিজের ভাষাতেই বলি :

'গোড়ার দিকে, পুলিসি সন্ত্রাস এত তীব্র ছিল যে আমরা গড়ে তুললাম ছোট ছোট রাজনৈতিক গোষ্ঠী, যাদের সবারই লক্ষ্য ছিল এক। এর বেশির ভাগ গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে, বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতে ১৯৫৭র ডিসেম্বর মাসে গড়ে উঠল অ্যাঙ্গোলার মুক্তির জন্য জনগণের আন্দোলন বা এম. পি. এল. এ। ১৯৬১-র ৪ ফেব্রুয়ারি এম. পি. এল. এ. দেশবাসীকে প্রকাশ্য ঘোষণা করে জানাল : সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু কর। অ্যাঙ্গোলার মুক্তিসংগ্রাম একটা নতুন স্তরে পদক্ষেপ করল।'[৭]

জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে নেটো বলছেন : '১৯৬১তে আচমকা যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হল, তখন পর্তুগিজরা পিছু হঠতে বাধ্য হল। উত্তর অ্যাঙ্গোলার অর্ধেক ছেড়ে পালিয়ে গেল পর্তুগিজরা। তারপর তারা ফিরে এল পদাতিক বাহিনী, হেলিকপ্টার ও বোমারু বিমান নিয়ে। তখন চোরাগোপ্তা আক্রমণই হল গেরিলাদের প্রধান পদ্ধতি। শত্রুদের যানবাহন ধ্বংস করা হল, নিহত করা হল বহু সেনাদলকে। পর্তুগিজরা পাল্টা আক্রমণ করল আকাশপথে বোমারু বিমান দিয়ে। আমাদের সমর্থক গ্রামগুলিতে বেপরোয়া বোমাবর্ষণ করল।'[৮]

এম. পি. এল. এ. অ্যাঙ্গোলার সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করল যে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে পর্তুগিজ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করে, বিপ্লবী স্বাধীন গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করলে, অ্যাঙ্গোলার দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও দুর্গতির কোনও সমাধান হবে না। সাম্রাজ্যবাদের নৃশংস ব্যবহারে অ্যাঙ্গোলার মানুষের মনেও সেই বিশ্বাসই গভীরভাবে গেঁথে গেল। গণমুক্তি বাহিনীতে কাতারে কাতারে যুবক-যুবতী যোগ দিতে লাগল। এম. পি. এল. এ-কে কোনঠাসা করার জন্য পর্তুগিজরা প্রচার করল যে সমগ্র মুক্তিযুদ্ধটাই 'কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র।'

অগস্তিনো নেটো এর দ্ব্যর্থহীন উত্তর দিলেন ১৯৭২ এর ৩০ এপ্রিল এক গোপন বেতার-ভাষণে, 'ওরা বলছে এম. পি. এল. এ. কমিউনিস্ট। প্রমাণ?

৭। অগস্তিনো নেটো : পর্তুগিজ কলোনিজ : ভিক্টরি অর ডেথ, হাভানা, ১৯৬৯।

৮। ঐ

আমরা নাকি নিয়মিত সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে যাই। আমরা লড়ছি জাতীয় স্বাধীনতার জন্য। যারাই আমাদের শর্তহীন সাহায্য করবে, আমরা তাকেই বন্ধু বলে গ্রহণ করব। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক, কূটনৈতিক ও বাস্তব সাহায্য করেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশদের এই বৈপ্লবিক ভূমিকাকে এম. পি. এল. এ. বা কোনও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনই অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু আমাদের সংগঠন সর্বস্তরের, ধর্মের ও শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে মিলিত সংগঠন। আমাদের দেশের ও জনগণের স্বার্থেই আমাদের স্বাধীন কর্মসূচি রচিত।'[৯]

জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর এম. পি. এল. এ. কী করবে? এম. পি. এল. এ-র অন্যতম নেতা স্পার্টাকাস মনিমাম্বু ১৯৬৮তে দ্ব্যর্থহীন ভাষাতে বললেন, 'স্বাধীনতা অর্জন করার পর আমরা একটাই পথ অনুসরণ করব—সমাজতন্ত্রের পথ। এখন আমরা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ একটি জনপ্রিয় সংগঠন মাত্র। আগামীকাল আমরা এর মধ্যে থেকেই গড়ে তুলব একটি নির্দিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী, সুসংগঠিত বিপ্লবী পার্টি। তবে সেই স্তরে পৌঁছবার জন্য আমাদের এখন থেকেই সচেতন প্রয়াস চালাতে হবে।'[১০]

১৯৭৪এর ২৫ এপ্রিল পর্তুগালের সশস্ত্র বাহিনীর বিপ্লবী অংশ, কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন পুষ্ট হয়ে এক বিপ্লবী উত্থানের মারফৎ পর্তুগালে ৪০ বছরের ফ্যাশিষ্ট স্বৈর শাসনের অবসান ঘটাল। এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে পর্তুগিজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে আরো জোরদার করল গিনি-বিসাউ, মোজাম্বিক ও অ্যাঙ্গোলার বিপ্লবী নেতৃত্ব। ১৯৭৪ এই গিনি-বিসাউ-এর প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতাকে মেনে নিল পর্তুগালের নতুন গণতান্ত্রিক সরকার। ১৯৭৫-এর ২৫ জুন মোজাম্বিক পরিণত হল স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে। আর ১৯৭৫-এর ১১ নভেম্বর এম. পি. এল. এ-র গণবাহিনী প্রবেশ করল লুয়াণ্ডাতে, ঘোষিত হল অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতা।

ঐদিনই ঘোষিত হল অ্যাঙ্গোলার গণপ্রজাতন্ত্রের সংবিধান।[১১] তার প্রথম দুটি ধারাতেই লেখা হল

১। 'অ্যাঙ্গোলার গণপ্রজাতন্ত্র হচ্ছে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক

৯। গ্রাম্মা, হাভানা, ৫ মে ১৯৭২

১০। বার্নেট: উইথ দি গেরিলাজ্ ইন অ্যাঙ্গোলা, লণ্ডন ১৯৭০

১১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়: ট্রায়াম্ফ্ অফ অ্যাঙ্গোলা, পরিশিষ্ট 'বি' কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশনী, দিল্লী, ১৯৭৫

রাষ্ট্র, যার প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের হাত থেকে দেশের সম্পূর্ণ শৃঙ্খল মুক্তি ঘটানো এবং দেশকে একটি সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা, যেখানে কোনও মানুষ অপরকে শোষণ করতে পারবে না এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করা হবে।

২। জনগণই হবে সমস্ত ক্ষমতার উৎস, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে গঠিত ব্যাপকতম মোর্চা এম. পি. এল. এ. হবে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্ণধার।'[১২]

স্বাধীনতার পর গণরাষ্ট্রের প্রধান বিরোধ কী রইল? এম. পি. এল. এ-র নেতা জবাব দিচ্ছেন, 'আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও অ্যাঙ্গোলার জনগণের মধ্যে বিরোধই প্রধান···কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর আদর্শ ও শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শের মধ্যেও ক্রমাগত সংঘাত চলছে। আমরা চাই, বা না চাই, একটা শ্রেণীসংগ্রাম অবিরাম চলেছে।'[১৩]

১৯৭৫ এর শেষে ও ১৯৭৬ এর গোড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্যাসিষ্ট সরকারের সেনাবাহিনী দক্ষিণ অ্যাঙ্গোলায় ঢুকে, বিপ্লবকে ধ্বংস করার চেষ্টা করল। বিপন্ন অ্যাঙ্গোলার পাশে এসে দাঁড়াল কিউবার গণবাহিনীর বীর স্বেচ্ছাসেবকরা, প্রতিহত করল সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে। ফিদেল কাস্ত্রো দ্ব্যর্থহীন ভাষাতে বললেন যে কিউবা তার সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার দায়িত্ব পালন করেছে মাত্র।

তারপর প্রায় ১০ বছর কেটে গেছে। এম. পি. এল. এ-র অগ্রগামী বিপ্লবীরা নিজেদের রূপান্তরিত করেছে একটি মার্কসবাদী দলে, যাদের লক্ষ্য স্বাধীন অ্যাঙ্গোলার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধন ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এখানে লক্ষণীয় যে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের পর্বে এম. পি. এল. এ. ছিল একটি ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ দেশপ্রেমিক মোর্চা। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর তা রূপান্তরিত হল একটি মার্কসবাদী অগ্রগামী বাহিনীতে, রাষ্ট্রেরও লক্ষ্য হল সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর। সারা পৃথিবীর কমিউনিস্টরা নেটো ও তাঁর সহযোদ্ধাদের মার্কসবাদী বলেই জেনেছে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনে তাঁরা সাদর আমন্ত্রণও একাধিকবার পেয়েছেন।

১২। ঐ

১৩। ডেভিডসন, স্লোভো ও উইলকিনসন: সাদার্ন আফ্রিকা, দি নিউ পলিটিক্স অফ রিভলুশন, লণ্ডন ১৯৭৬, পৃঃ ৯৩

গণপ্রজাতন্ত্রী অ্যাঙ্গোলাকে বলা হচ্ছে একটি সমাজতন্ত্রমুখী গণপ্রজাতন্ত্র। বিগত দশকের সশস্ত্র গণমুক্তি বিপ্লবের সংগঠন এম. পি. এল. এ. আজ একটি মার্কসবাদী অগ্রগামী বাহিনী বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। আশা ও ভরসা রাখা হচ্ছে যে তাদের নেতৃত্বেই অ্যাঙ্গোলার গণপ্রজাতন্ত্র অদূর ভবিষ্যতে রূপান্তরিত হবে একটি সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রে। প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে ও বিজয়ী হয়েছে মোজাম্বিকেরও গণমুক্তিবিপ্লব, এম. পি. এল. এ-র দোসর, ফ্রেলিমোর নেতৃত্বে। বিপ্লবের পর ফ্রেলিমোও রূপান্তরিত হয়েছে একটি ব্যাপক মুক্তি মোর্চা থেকে একটি অগ্রগামী বাহিনীতে, মার্কসবাদী আদর্শই সে দলেরও বনিয়াদ।[১৪]

১৯৭০-এ নেটো ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে লিখেছিলেন, 'আজ আমরা সবাই পর্তুগিজ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধনের প্রশ্নে আমাদের মধ্যে আদর্শগত মতবিরোধ দেখা দিতেই পারে।'[১৫] তাই তাঁর অকালমৃত্যুর আগেই ১৯৭৭-এ নেটো এম. পি. এল. এ-র মার্কসবাদীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এক অগ্রগামী বাহিনী।

অ্যাঙ্গোলা বা মোজাম্বিকের মতো দেশের সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ কি নিশ্চিত? এর চূড়ান্ত উত্তর ইতিহাসই দেবে। কিন্তু এই দুটি মুক্তিবিপ্লবের নেতারা প্রথম থেকেই মার্কসবাদী। সমাজের মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের অংশ হলেও, তাঁরা সচেতনভাবে বহু নিপীড়ন ও দীর্ঘ মেয়াদি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দুই দশক ধরে অর্জন করেছেন তাঁদের দেশের দরিদ্রতম মানুষের সঙ্গে একাত্মতা। সশস্ত্র গণ-মুক্তিবাহিনীর মারফৎ সেই দুর্গত, বিচ্ছিন্ন জনগণের মধ্যে জাগিয়েছেন সমষ্টিগত সংগ্রামে ও নিজেদের সংঘশক্তির উপর আস্থা। তাদের কাছে শৃঙ্খল-মুক্তির মানে হয়েছে বৈদেশিক দাসত্ব মুক্তি, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, আশঙ্কা ও মহামারীর হাত থেকে মুক্তি—একটা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামী রাস্তা। সেই রাস্তাতেই ধাপে ধাপে তাদের এগিয়ে নিয়ে এসেছে এম. পি. এল. এ. বা ফ্রেলিমোর নেতৃত্বে অবস্থিত স্বল্পসংখ্যক মার্কসবাদীরা। বিদেশী দাসত্ব অবসানের পর দেশের মধ্যে সমাজ রূপান্তরের পথে আভ্যন্তরীণ শ্রেণী বিরোধ বেড়েছে। কিন্তু প্রাক্তন দাস-শ্রমিক ও দরিদ্রতম চাষীর জঙ্গি ছেলেমেয়েদের

১৪। ডেভিডসন, স্লোভো ও উইলকিনসন: সাদার্ন আফ্রিকা, দি নিউ পলিটিকস অফ রিভল্যুশন, লণ্ডন, ১৯৭৬ পৃ ৮৮-৯৪

১৫। ঐ, পৃ ৯৪

উপর নির্ভর করে স্বল্পসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত প্রশাসকদের বহু 'আমলাতান্ত্রিক' ও 'সংস্কারবাদী' ঝোঁককে পরাজিত করেই ফ্রেলিমো বা এম. পি. এল. এ. নিজেদের পরিণত করতে পেরেছে মার্কসবাদী অগ্রগামী বাহিনীতে, জটিল ও কঠিন পথে এগোচ্ছে দৃঢ়ভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে। অথচ সীমান্তে ফ্যাশিস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার আগ্রাসী বাহিনীর উপস্থিতির ফলে, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী জনগণের সর্বাত্মক ব্যাপক যুক্তমোর্চা গড়ার জরুরি প্রয়োজনও আজও অব্যাহত আছে। এই দুই দায়িত্ব পালন করা দুরূহ কাজ। কিন্তু চার শতাব্দীর ক্রীতদাস-সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়েছে রক্তের মূল্যে যে-বিপ্লবী নেতৃত্ব, তারা এই দায়িত্ব পালন করতে পারবে, পথ দেখাতে পারবে কৃষ্ণ আফ্রিকার সমস্ত নিপীড়িত মানুষকে সৃষ্টিশীল মার্কসবাদের মশালের আলোয়—তাঁদের অতীতের দিকে তাকিয়ে এ বিশ্বাস আমরা নিশ্চয় তাঁদের উপর রাখতে পারি।

তিন

মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকো থেকে শুরু করে, ছোট্ট কয়েকটি দেশ (যথা পানামা, এল সালভাডর, হণ্ডুরাস, কোস্টারিকা, গুয়াতেমালা ও নিকারাগুয়া) হয়ে সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ ও ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জসহ বিশাল অঞ্চলকে বলা হয় লাতিন আমেরিকা। ষোড়শ শতাব্দীতে, আজ থেকে চারশত বছর আগে এই সমগ্র অঞ্চলটিকে জয় করে তিনশত বছর নিষ্ঠুর ভাবে শোষণ ও শাসন করেছিল স্পেনীয় ও পর্তুগিজ সাম্রাজ্যবাদ। তারপর ফরাসি বিপ্লবের ও আমেরিকান স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে সমগ্র লাতিন আমেরিকা মহাদেশ জুড়ে চলেছিল শিকল ভাঙার লড়াই—সাইমন বলিভার, সান মার্তিন ও অন্যান্য মহান বিপ্লবীর নেতৃত্বে। মধ্য আমেরিকার অন্যতম ছোট্ট দেশ নিকারাগুয়াও এই বিপ্লবের জোয়ারে, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করল ১৮২১এ। আর সেইদেশে ক্রীতদাসপ্রথা আইন করে অবলুপ্ত করে দেওয়া হল ১৮২৪এ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪০ বছর আগেই।

প্রায় সেই সময় থেকেই রাষ্ট্রপতি মনরোর 'আমেরিকা আমেরিকানদের জন্যই' এই গালভরা বুলির আড়ালে মার্কিন মাম্রাজ্যবাদ চেষ্টা করতে লাগল মধ্য আমেরিকার এই দেশগুলিকে নিজেদের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের দাসপ্রথার

উগ্র সমর্থক উইলিয়াম ওয়াকার নিকারাগুয়াতে ক্ষমতা দখল করে, রাষ্ট্রপতি হয়ে বসল (১০ জুন, ১৮৫৮)।[১৬] স্পেনীয় ভাষার বদলে ইংরেজি হল নতুন সরকারি ভাষা এবং ক্রীতদাস-প্রথার পুনঃ-প্রবর্তন হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন পিয়ার্স কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেন ওয়াকারের সরকারকে।[১৭] কিন্তু নিকারগুয়ার মানুষ গণবিদ্রোহ করল ওয়াকারের তাঁবেদার সরকারের বিরুদ্ধে। ওয়াকার পরাজিত হল ও ১৮৬১-র সেপ্টেম্বরে বিদ্রোহীরা তাঁকে গুলি করে মারল।[১৮]

১৯০৯-তে নিকারাগুয়াতে গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে মার্কিন নৌ সেনারা সেই দেশে অবতরণ করে, নিজেদের তাঁবেদার আলফ্রেড ডিয়াজকে রাজধানী মানাগুয়াতে ক্ষমতাতে অধিষ্ঠিত করে। নিকারাগুয়ার দেশপ্রেমিক মানুষ মাথা নিচু করে তা মেনে নেয়না। ১৯১২-তে তাঁবেদার ডিয়াজের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ ফেটে পড়ে। ডিয়াজের আমন্ত্রনে ছুটে আসে মার্কিন নৌ-সেনারা, রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেয় গণবিদ্রোহকে। একটা ভুয়া রাষ্ট্রপতি 'নির্বাচন' হয়। নিকারাগুয়ার ১০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৪ হাজার মাত্র ভোটদান করে।[১৯]

প্রায় ১৫ বছর, মার্কিন নৌ-সেনাদের পাহারায় ডিয়াজের তাঁবেদার শাসন চলে ঐ দেশে। তখন মার্কিন শাসকরা ভাবে যে তারা নিকারাগুয়ার জনগণের প্রতিরোধ-ক্ষমতাকে একেবারে খতম করে দিয়েছে। ফলে মার্কিন নৌ-সেনারা দেশে ফিরে যায়। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম। নেতৃত্ব দেন অগাস্টো সিজার স্যাণ্ডিনো, প্রগতিশীল জাতীয় বিপ্লবী, যাঁর নিবিড় সংযোগও ছিল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে। তাঁর গেরিলা-বাহিনী গড়ে উঠেছিল প্রধানত কফি-বাগিচার শ্রমিক ও গরিব চাষিদের মধ্য থেকে। নিকারাগুয়ার যে-সব অঞ্চল স্যাণ্ডিনোর গণবাহিনী মুক্ত করেছিল, সেখানে মৌলিক ভূমি সংস্কার করা হয়েছিল, শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছিল মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার।

১৬। উইলিয়াম ওয়াকার : দ ওয়ার ইন নিকারাগুয়া। নিউইয়র্ক, ১৮৬০

১৭। ঐ

১৮। মার্সেল লিভারগ্যাং : দি টোয়েন্টি ল্যাটিন আমেরিকান, প্রথম খণ্ড, পেলিক্যান, লণ্ডন ১৯৭১

১৯। র‍্যাফায়েল ডি নোগালেস : দি লুটিং অফ নিকারাগুয়া, নিউইয়র্ক, ১৯২৮, পৃঃ ৫৭

সারা পৃথিবী ১৯২৭-২৮-এ অভিবাদন জানিয়েছিল স্যাণ্ডিনো ও তাঁর গেরিলা বাহিনীকে। প্রসিদ্ধ ফরাসি সাহিত্যিক ও কমিউনিষ্ট আঁরি বারবুস স্যাণ্ডিনোকে বলেছিলেন 'মুক্ত মানুষদের সেনাপতি' আর রোমাঁ রোলাঁ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন 'তোমরা নিকারগুয়ার পকেটমার'। চিলির মহাকবি গাব্রিয়েল মিস্ত্রাল, মহাকাব্য লিখলেন স্যাণ্ডিনোর 'দামাল ছেলেদের বীর সেনাদলের' জয়গান গেয়ে। ব্রুসেলসে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘের প্রথম অধিবেশনে (১৯২৭) অনুপস্থিত স্যাণ্ডিনোকে নির্বাচিত করা হল সম্মেলনের সভাপতি মণ্ডলীতে।[২০]

প্রায় এক দশক ধরে স্যাণ্ডিনো ও তাঁর গেরিলা বাহিনী কার্যত নিয়ন্ত্রণ করলেন নিকারাগুয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভাগ্য। তাঁকে পরাজিত করতে না পেরে ছলচাতুরির আশ্রয় নিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। মানাগুয়াতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্যাণ্ডিনোকে আলাপ আলোচনার জন্য নিমন্ত্রন করে, তাঁকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে।[২১] এই কাপুরুষোচিত হত্যার পূর্ণ বিবরণ বিবৃত করেছেন স্যাণ্ডিনোর বাহিনীর অন্যতম সদস্য ও নিকারাগুয়ার বর্তমান বিজয়ী বিপ্লবের অন্যতম নেতা টমাস বোর্দের বাবা।[২২]

এরপর মার্কিন তাঁবেদার ও নিকারাগুয়ার জনতার বিরুদ্ধে গণহত্যা অভিযানের নেতা আনাস্তাসিও সোমোজা, মার্কিন বেয়নেটের জোরে নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রপতির পদ দখল করল এবং ১৯৩৬-এ মার্কিন সরকার তাকে পূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃত দিল। তখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টকে, নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, 'সোমোজাকে কেন কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেন? ও তো একটা শুয়োরের বাচ্চা!' উত্তরে রুজভেল্ট বলেন, 'আমি তা জানি, কিন্তু সোমোজা যে আমাদের নিজস্ব শুয়োরেরই বাচ্চা।'[২৩]

১৯৩৬ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত সোমোজা ও পরে তার দুই ছেলে নিকারাগুয়াতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, মার্কিন সমর্থনের জোরে নিকারাগুয়ার একটানা সর্বনাশ করে চলে।

১৯৭৮ এর সরকারি হিসেব থেকে দেখা যায় যে নিকারাগুয়ার দেড় লক্ষ

২০। হেনরি ওয়েবার: নিকারাগুয়া, দি স্যাণ্ডিনিস্ট রিভল্যুশেন, লণ্ডন, ১৯৮১
২১। গ্রামমা. হাভানা, ৫ অগাষ্ট ১৯৭৯
২২। হেনরি ওয়েরার: নিকারাগুয়া অ্যাণ্ড দি স্যাণ্ডিনিস্ট রিভল্যুশন, লণ্ডন ১৯৮১, পৃঃ ১৫
২৩। গ্রামমা, হাভানা, ৫ অগাষ্ট, ১৯৭৯

বর্গমিটার আয়তনের মধ্যে ২০০০০ বর্গমিটার চাষের জমির মালিক সোমোজা পরিবার। তাছাড়া তাদের ছিল ৫১টি গো-পালন কেন্দ্র ও ৪৬টি কফি-বাগিচা। ১৯৭২এ নিকারাগুয়ায় যে নিদারুণ ভূমিকম্প হয়, তাতে মারা যায় ১০ হাজার মানুষ, ধূলিসাৎ হয় ২ লক্ষ বাড়ি তখন সারা পৃথিবী থেকে সাহায্য হিসেবে যে ৬০ কোটি ডলার আসে, তা অর্ধেকই পকেটস্থ করে সোমোজার পরিবার।[২৪]

১৯৫৮তে স্যাণ্ডিনোর পুরনো সহযোদ্ধা র‍্যামন রাউডেলোস্ উত্তর নিকারাগুয়ার পার্বত্য অঞ্চলে সোমোজার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গেরিলা সংগ্রাম শুরু করেন। ১৯৫৯এ বিজয়ী হয় কিউবাতে গণবিপ্লব—ফিদেল কাস্ত্রো ও তাঁর বন্ধুদের নেতৃত্বে। সমগ্র মধ্য আমেরিকা জুড়ে একটা উল্লাস দেখা যায় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে। মামাগুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কার্লস যানসেকা আমাডর ও তার বন্ধুরা চলে যায় পাহাড়ে। যোগ দেয় রাউডেল্সের গেরিলা বাহিনীতে। কার্লস যানসেকা ছিলেন নিকারাগুয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য। ১৯৫৭তে সোভিয়েত ঘুরে এসে তিনি পুস্তিকা লেখেন : এ নিকারাগুয়ান ইন মস্কো। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের রণকৌশল তাঁর পছন্দ হয় না। বন্দুক কাঁধে তিনি চলে যান পাহাড়ে। তাঁর বন্ধু টমাস বোর্জ ও সিলভো মায়োরগার সঙ্গে মিলে ১৯৬২-র জুলাই মাসে তিনি স্থাপন করেন এক নতুন সংগ্রামী সংগঠন—'স্যান্তিনিস্টা জাতীয় মুক্তিমোর্চা বা এফ. এস. এল. এন। প্রতিষ্ঠার সময় গৃহীত ঘোষণাপত্রে বলা হয়: 'স্যান্তিনিস্টা গণবিপ্লবের লক্ষ্য জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—উভয়ই। আমরা সমাজতন্ত্রের শিবিরের বন্ধু, তবে তাঁদের সমালোচনা করার অধিকারও আমাদের থাকবে।[২৫]

১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ এফ. এস. এল. এন এর মধ্যে বিপ্লবের রণকৌশল নিয়ে মতভেদ চরমে ওঠে। সংখ্যাগরিষ্ঠর মত হয়, ভিয়েতনামের কায়দায়, গ্রামাঞ্চলকে ঘাঁটি করে, দীর্ঘমেয়াদি জনযুদ্ধ চালাতে হবে। এই মতের প্রবক্তা হল টমাজ বোর্জ, হেনরি রুইজ ইত্যাদি। ড্যানিয়েল ও হুমবার্টো ওর্টেগার উপদল বেছে নিলেন শহরাঞ্চলে গেরিলা আক্রমনের নীতি। আর জেমস হুইলকক, কার্লস নুনেজ প্রভৃতি জোর দিলেন শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে গভীর শিকড় গাঁথাকে

২৪। হুইলক্ : ইম্পিরিয়ালিজম্ অ্যাণ্ড ডিক্টেটরশিপ, মেক্সিকো, ১৯৭৯, পৃঃ ১৬৩—৬৬

২৫। কার্লস যানসেকা আমাডর : বক্তৃতাবলি, মানাগুয়া ১৯৮০

অগ্রাধিকার দেবার নীতিকে। কার্লস যানসেকা মারা গেলেন এক খণ্ড সংঘর্ষে। সাময়িকভাবে তিন টুকরো হয়ে গেল এফ. এস. এল. এন।[২৬]

১৯৭৭-এ অকমিউনিষ্ট, অবামপন্থী উদারপন্থীরা, 'লা প্রেমসা' পত্রিকাতে ১২ জুন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর নামে এক বিশাল আবেদন ছেপে, সোমোজার স্বৈরশাসনের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক বিকল্পের দাবি জানালেন। সোমোজা উত্তর দিল ১৯৭৮-এর ১০ জানুয়ারি 'লা প্রেনসার' প্রগতিশীল সম্পাদক পেড্রো জোয়াকুইন চ্যামেওরোকে হত্যা করে।[২৭] ফলে নিকারাগুয়ার জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে কোনও মধ্যপথ নেই—হয় সোমোজার স্বৈরশাসন ও মার্কিন তাঁবেদারগিরি সহ্য করা, আর নয় স্যান্তিনিষ্টা জাতীয় মুক্তিমোর্চার সঙ্গে হাত মিলিয়ে সশস্ত্র গণবিপ্লবের পথে স্বাধীনতা অর্জন করা ও সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রা করা।

হাভানাতে পাঠানো এক গোপন বিবৃতিতে এফ. এস. এল. এন-এর অন্যতম নেতা হুমবার্টো ওর্টেগা বলেন: 'চ্যামেওরোকে হত্যা করায় বারুদের স্তূপে আগুণের ফুলকি পড়ল, দাবানল জ্বলে উঠল। এখন থেকে চলবে, মিছিল, সাধারণ ধর্মঘট ও গণমুক্তির সশস্ত্র সংগ্রাম।'[২৮]

চ্যামেওরোর শোক-মিছিলে যোগ দিল লক্ষাধিক নরনারী। 'সোমোজার পদত্যাগ চাই, হল প্রধান দাবি। ১৩ থেকে ২৪ জানুয়ারি একটানা সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট হল।[২৯] এক বছর পরে ১৯৭৯র ১০ জানুয়ারি ইতিহাসের বৃহত্তম সাধারণ ধর্মঘট হল নিকারাগুয়াতে। এফ. এস. এল. এম. এর তিনটি উপদল একসঙ্গে আলোচনা করল, রচনা করল বিপ্লবের সম্মিলিত কর্মসূচি ও প্রতি উপদল থেকে ৩ জনকে নিয়ে আবার গড়ে তুলল ৯ জনের যৌথ নেতৃত্ব। শহরে গেরিলা সংগ্রাম নীতির সমর্থক উপদলের থেকে নেতৃত্বে এলেন ড্যানিয়েল ওর্টেগা, হুমবার্টো ওর্টেগা ও ভিক্টর টিরাডো, জনযুদ্ধের নীতির সমর্থকদের তরফ থেকে নেতৃত্বে এলেন টমাস বোর্জ, হেনরি রুইজ ও বায়ার্ডো আরসি; সর্বহারা নেতৃত্বের সমর্থকদের তরফ থেকে নেতৃত্বে এলেন জেমস হুইলক, লুই ক্যারিয়ন ও কার্লস যুনেজ।[৩০]

২৬। হুইলকক: ইম্পিরিয়ালিজম অ্যাণ্ড ডিক্টেটরশিপ, পৃঃ ১৮২
২৭। নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌, ১২ জানুয়ারি, ১৯৭৮
২৮। গ্রান্‌মা, হাভানা, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৭৮
২৯। ঐ
৩০। গ্রান্‌মা, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯

১৯৭৯র মে মাসে স্যাণ্ডিনিস্টরা চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু করল। জুন-জুলাই মাস ধরে তাসের বাড়ির মতো ধ্বসে যেতে লাগল সোমোজার স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা। ১৯৭৯র ১০ জুলাই স্যাণ্ডিনিস্ট গণবাহিনী দখল করল রাজধানী মানাগুয়া, লাল-কাল পতাকা উড়ল সারা দেশে। সোমোজা পালাল দেশ থেকে। নতুন বিপ্লবী সরকারকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিল সমাজতান্ত্রিক কিউবা, তার পরই সোভিয়েত ইউনিয়ন। মানাগুয়া বেতারে ১৯ ও ২০ জুলাই অবিরাম এই খবর দিয়ে ধ্বনি দেওয়া হলঃ 'ভিভা নিকারাগুয়া' 'ভিভা কিউবা'[৩১]

২৩ লক্ষ মানুষের বাসভূমি ছোট্ট দেশ নিকারাগুয়া। বিপ্লবের জয়ের জন্য তাকে বলি দিতে হয়েছে অর্ধ লক্ষ নরনারীকে মুক্তিযুদ্ধে, দেশ পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। ক্ষমতা দখলের পরদিনই স্যাণ্ডিনিস্ট সরকার নিষিদ্ধ করল সোমোজার জাতীয় রক্ষীদলকে, ভেঙে দিল সম্পূর্ণভাবে পুরনো আমলাতন্ত্রকে, বাজেয়াপ্ত করল সোমোজা পরিবারের সমস্ত কলকারখানা, বাগিচা ও জমিজমা। একেবারে মার্কসীয় পদ্ধতিতে গড়া বিপ্লব, সরকার বদল নয়, পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে চুরমার করে, নতুনের জন্ম দেওয়া।

জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হল, কিন্তু রেগনশাহি ঘরের পাশে প্রতিবিপ্লবকে সশস্ত্র করল (এখনও করছে), হুমকি দিল প্রত্যক্ষ আক্রমণের। সেই হামলার মুখে বিপ্লবী গণ-ঐক্যকে ব্যাপক ও অটুট রেখেও, তাকে গভীরতর করার পথে পা বাড়িয়েছেন স্যাণ্ডিনিস্টরা। ১৯৮২-র মে দিবসে মানাগুয়াতে লক্ষ শ্রমিকের সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে স্যাণ্ডিনিস্ট শ্রমিক নেতা লুসিও জিমিনেজ বলেছেনঃ 'আমরা লড়ছি সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য।'[৩২]

ঐ একই সমাবেশে অন্যতম রাষ্ট্রনেতা ড্যানিয়েল ওর্টেগা বলেনঃ 'এই শতাব্দীর বিশের দশকে লেনিনের রাশিয়া ছিল পৃথিবীর বিপ্লবীদের কাছে ধ্রুবতারা। শতাব্দীর আশির দশকে লাতিন আমেরিকা মহাদেশের বিপ্লবীদের কাছে তেমনই ধ্রুবতারা হচ্ছে কাস্ত্রোর কিউবা।'[৩৩]

নিকারাগুয়ার বিপ্লব এখন পর্যন্ত কি কি মৌলিক সাফল্য অর্জন করেছে? প্রথম সাফল্য তাঁদের অসামান্য সাক্ষরতা অভিযান। ১৯৭৯-র আগস্ট মাসে

৩১। প্রাভ্দা, ২২ জুলাই, ১৯৭৯
৩২। প্রাভ্দা, ৫ মে ১৯৮২
৩৩। ঐ

নিকারাগুয়াতে শতকরা ৫৫ জন মানুষ ছিল নিরক্ষর। ১৯৮০র মে দিবসে, গণ-সাক্ষরতা অভিযানের ফলে নিকারাগুয়াতে নিরক্ষরতা নেমে গেল শতকরা ১৪-তে। এই অসামান্য সাফল্যের জন্য ইউনেস্কো, সে বছরের সাক্ষরতা পুরস্কারটি তুলে দিল নিকারাগুয়ার শিক্ষামন্ত্রী কার্লস টুনেরমানের হাতে।[৩৪]

এই অসাধ্য সাধন হল কী ভাবে? বিপ্লবী সরকারের ডাকে সাড়া দিয়ে এক লক্ষ তরুণতরুণীর স্বেচ্ছাবাহিনী বেরিয়ে পড়ল গ্রামে-গ্রামে, গণ-সাক্ষরতা অভিযানে, চাষিদের সঙ্গে আধপেটা খেয়ে রইল, মাটির ঘরে ঘুমোল, প্রতি-বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ পর্যন্ত দিল, কিন্তু পিছু হঠল না। তাদের প্রতিজ্ঞা 'সোমোজাকে তাড়িয়েছি, নিরক্ষরতাকেও তাড়াব।' তাদের সাহায্য করল প্রায় তিন হাজার কিউবান স্বেচ্ছাসেবক, তাদেরও ৪ জন প্রাণ দিয়েছিল প্রতি-বিপ্লবীদের চোরাগোপ্তা গুলিতে।[৩৫] ১৯৮২-র মে দিবসে নিরক্ষরতা কার্যত বিলুপ্ত হল নিকারাগুয়া থেকে, স্কুল-ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে হল ১০ লক্ষ, যেখানে দেশের লোকসংখ্যা এখনও ৩০ লক্ষের কম। সমগ্র মধ্য আমেরিকার পক্ষে এ এক অভূতপূর্ব ব্যাপার।

বিপ্লবী নেতা লুই ক্যারিয়ন ১৯৮২-র ২৩ মে গরিব চাষিদের সমবায়গুলির এক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন: 'স্যাণ্ডিনিস্টরা বিপ্লব করে নি নিজেরা বড়লোক হবে বলে। গ্রামের গরিবদের ঘরেই তারা লুকিয়ে থেকেছে, ক্ষুধাতৃষ্ণা রোগ জয় করে বছরের পর বছর বুকের রক্ত দিয়ে লড়েছে কিসের জন্য? সেই বিপ্লবের জন্য, যার মানে প্রকৃত মুক্তি, গ্রামাঞ্চলে যার মানে আমূল ভূমিসংস্কার। আমরা লড়েছি প্রতিটি শ্রমিক ও চাষিকে বাঁচবার মতো কাজ ও জমি দেবার জন্যে।'[৩৬]

বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নেতা টমাস বোর্জ, পেরুর রাজধানী লিমা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক 'লাতিন আমেরিকা প্রেস'-এ ১৯৮২-র ৪ জুন এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে বহু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে নিকারাগুয়া কি 'সোভিয়েত-কিউবা ছাঁচের' বিপ্লব করেছে? রেগন তো তাই বলছেন। বোর্জ উত্তরে বলেন:

'সাম্রাজ্যবাদকে আমরা কোনও কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই। তবে আপনাদের, লাতিন আমেরিকার জনগণকে বলছি: আমরা কিউবার কার্বন

৩৪। হেনরি ওয়েবার: নিকারাগুয়া, দি স্যাণ্ডিনিষ্ট রিভল্যুশন

৩৫। গ্রাম্মা, ৯ মে, ১৯৮০

৩৬। জেন হ্যারিস: ইণ্টারকন্টিনেণ্টাল প্রেস, নিউ ইয়র্ক, ৭ জুন ১৯৮২

কপি নই। আবার, আমরা চাই না যে কেউ নিকারাগুয়ার কার্বন কপি হোক। প্রত্যেক বিপ্লবেরই নিজস্বতা আছে, থাকতে বাধ্য। কিউবার বিপ্লব নিঃসন্দেহে আমাদের পথ দেখিয়েছে। তা আমরা কখনই অস্বীকার করিনা।...আর সমাজতন্ত্রের শিবির থেকে আমরা অজস্র ধারে নিঃশর্ত সাহায্য পাচ্ছি, পাবও। আমরা নিশ্চিত যে সোভিয়েত নেতৃত্ব আমাদের বিপ্লবের বন্ধু, তাকে বোঝেন এবং আমাদের উপর মাতব্বরির কোনও চেষ্টাই তারা করবেন না। সোভিয়েত ইউনিয়ন, কিউবা বা অন্য কোনও সমাজতন্ত্রী দেশের নেতাই আমাদের উপর কোনওরকম চাপ দেন নি। তাঁদের সৌহার্দ্য বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টান্তই হয়ে থাকবে।'[৩৭]

নিকারাগুয়ার বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সে দেশের ছোট্ট কমিউনিস্ট পার্টি সেখানকার গণমুক্তি বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় নি, তা দিয়েছে মার্কসবাদে বিশ্বাসী অথচ লাতিন আমেরিকার ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম স্যাণ্ডিনিস্ট জাতীয় মুক্তি মোর্চার অগ্রগামী নেতৃত্ব। তাঁদের রণধ্বনি থেকেছে ঃ এই মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা ও গণমুক্তি অর্জনই প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু তারপর থামলে চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে সমাজতন্ত্রের দিকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই নিকারাগুয়ার নেতৃত্বকে বলে 'কমিউনিস্ট' 'সোভিয়েত বা কিউবার চর' ইত্যাদি। কারণ তাদের ঘরের উঠানে বিপ্লবের আগুন জ্বলছে। তাকে নেভাবার সাধ্য আজ সাম্রাজ্যবাদের নেই। নিকারাগুয়ার পাশে আছে কিউবা, আছে সমগ্র সমাজতন্ত্রের শিবির, আছে পৃথিবী জোড়া জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম।

কিউবার বিপ্লবী কবি নিকোলাস গ্যিয়েনের ভাষাতে, নিকারাগুয়ার বিপ্লবীদের সৃজনশীল রণনীতি হচ্ছে ঃ

বন্ধুর হৃদয়ের সামনে, প্রাচীরটা ফাঁক কর।
বিষ আর উদ্যত মুষ্টির সামনে, প্রাচীরের ফাঁক বন্ধ কর।
এসো, সবাই মিলে প্রাচীর গাঁথি,
সবাই মিলে হাত লাগাই—
কালোরা কালো হাত, সাদারা সাদা হাত।
প্রাচীর গাঁথা হবেই—
সমুদ্রতট থেকে পাহাড় অবধি
পাহাড়ের সারি থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত—
সপ্তসিন্ধু, দশদিগন্ত জুড়ে।

৩৭। লাতিন আমেরিকা প্রেস, লিমা, ৪ জুন ১৯৮২

চার

এবার যে দেশটির বিপ্লবের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হবে, সে দেশে বিপ্লব এখনও অসমাপ্ত, তুমুল লড়াই চলছে। মধ্য আমেরিকারই অন্য একটি ছোট সে দেশ—এল সালভাডর। ৮২৫৬ বর্গ মাইল দেশটির আয়তন, জনসংখ্যা ১৯৮০তে ছিল ৪০ লক্ষর সামান্য বেশি। দেশের সমস্ত সম্পদ—আম, কলা, কোকো, তুলো—১৪টি মাত্র অভিজাত পরিবারের মুঠোর মধ্যে। তাদের পিছনে রয়েছে মার্কিন ধনকুবের গোষ্ঠী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

'এল সালভাডরের সমগ্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে কব্জা করে রেখেছে ১৪টি শ্বেতাঙ্গ অভিজাত পরিবার। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, ব্যবসায়, সব কিছুর মাথায় বসে আছে ঐ পরিবারগুলির ছেলে, ভাই পো, ভাগ্নে অথবা শ্যালক, জামাতারা।'[৩৮] ১৯৭০-এ রাষ্ট্রসংঘের একটি পরিদর্শক দল এল সালভাডর ঘুরে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে এল সালভাডরের শতকরা ৭৫ জন মানুষই নিরক্ষর, শতকরা ৫টি পরিবারের বাসস্থানেও স্বাস্থ্যকর শৌচাগার নেই, বাগিচায় কাজ করে যে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী, মাছমাংস তারা বছরে একদিনও খেতে পায় কিনা সন্দেহ।[৩৯]

এল সালভাডরের গরিব মানুষেরা ও ছাত্রযুবসমাজ সব সময়ই এই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। ১৮৯৩তে এক গরিব চাষির ঘরে জন্মেছিলেন অগাস্টিন ফারাবুণ্ডো মার্তি। নিজের প্রতিভার জোরে তিনি পড়তে পেরেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়তেও। ১৯১৭-তে রাশিয়ায় যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল, তা গভীরভাবে প্রভাবিত করল ফারাবুণ্ডো মার্তিকে। সমাজতন্ত্রই হল তাঁর জীবনের আদর্শ এবং ছাত্র ও গরিব চাষিদের নিয়ে তিনি ১৯১৮তেই শুরু করলেন বিপ্লবী সংগ্রাম। এল সালভাডরের সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে, ১৯২০-এ তাঁকে ৭ বছরের জন্য নির্বাসিত করল দেশ থেকে।

মার্তি চলে গেলেন পাশের দেশ গুয়াতেমালাতে। সেখানে অন্য অনেকের সঙ্গে মিলে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন মধ্য আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯২৮-এ তিনি ফিরে এলেন এল সালভাডরে, কিন্তু শীঘ্রই চলে গেলেন নিকারাগুয়াতে, যোগ দিলেন স্যাণ্ডিনোর গেরিলা বাহিনীতে। ১৯৩০এ মার্তি ফিরে এলেন এল সালভাডরে, গড়ে তুললেন কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বিপ্লবীদের যুক্তমোর্চা।

৩৮। মার্সেল নিয়েডারগাং : দি টোয়েন্টি ল্যাটিন আমেরিকান, প্রথম খণ্ড, লণ্ডন ১৯৭১, পৃঃ ৩৩৬

৩৯। গ্রামমা, ১ জুলাই, ১৯৭৪

১৯৩০-এর মে দিবসে মধ্য আমেরিকাতে সর্বপ্রথম লালঝাণ্ডা হাতে ১০ হাজার শ্রমিক ও গরিব চাষি স্যান সালভাডরের রাজপথে মিছিল বের করল। আবার নির্বাসিত হলেন মার্তি, কিন্তু গোপনে ফিরে এলেন এল সালভাডরে ১৯৩১-এ। সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে, জেলে তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার করল। প্রতিবাদে মার্তি জেলে অনশন ধর্মঘট করলেন। সমগ্র মধ্য আমেরিকা জুড়ে তাঁর মুক্তির দাবি উঠল। সরকার মার্তিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।[৪০]

১৯৩১এ মার্তি প্রকাশ্য আহ্বান জানালেন, সশস্ত্র গণসংগ্রামের পথে সালভাডরের স্বৈরাচারী সরকারকে উচ্ছেদ করার। এই সময়ই উচ্চারিত হল তাঁর প্রসিদ্ধ রণধ্বনি: 'ইতিহাস যখন কলম দিয়ে রচনা করা যায় না, তখন তা রচনা করতে হয় রাইফেল দিয়ে।"[৪১]

১৯৩২এর ২২ জানুয়ারি এল সালভাডরের লক্ষাধিক মানুষ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গণবিদ্রোহ শুরু করল। মার্তি ও সালভাডরের তরুণ কমিউনিস্টরা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিলেন। কিন্তু, ঠিক নিকারাগুয়ার মতোই, স্বৈরাচারী তাঁবেদারদের আমন্ত্রণে সালভাডরে এসে নামল কয়েক সহস্র মার্কিন নৌ সেনা। কামান থেকে বিদ্রোহীদের উপর অবিরাম গোলাবর্ষণ করল মার্কিন যুদ্ধের জাহাজ 'রোচেষ্টার'। জাহাজের অধিনায়ক ও স্বৈরতন্ত্র সেনাপতি ক্যালডেরন সদম্ভে বললেন যে তাঁরা '৫ হাজার বলশেভিককে খতম করেছেন।' আধুনিক ইতিহাসবিদরা বলছেন যে হত্যা করা হয়েছিল কমপক্ষে ৩০ হাজার বিদ্রোহীকে।[৪২]

মার্তি ও দু জন ছাত্রনেতা—মারিয়ন জাপাতা ও অ্যাকেহুসেনা—বন্দী হলেন। সামরিক স্বৈরাচারীরা তাঁদের গুলি করে হত্যা করল—১৯৩২-এর ১ ফেব্রুয়ারি। সামরিক আদালতে দাঁড়িয়ে কারাবুণ্ডো মার্তি দৃপ্ত ঘোষণা করলেন: 'আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও প্রয়োজন আমার নেই। ইতিহাসই রায় দেবে আমাদের বিপ্লবের স্বপক্ষে।'[৪৩]

তারপর তিন দশক ধরে এল সালভাডরে চলে ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস এবং

৪০। গ্রামমা: ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮০

৪১। ঐ

৪২। নিয়েডারগাং: দি টোয়েন্টি ল্যাটিন আমেরিকান, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯-৪০

৪৩। ঘ্যান্সি কোল: কারাবুণ্ডো মার্তি: হিজ লাইফ অ্যাণ্ড স্ট্রাগ্‌ল নিউইয়র্ক, ১৯৮০।

দেশ পরিণত হয় মার্কিন প্রশাসনের আজ্ঞাবহ এক রাষ্ট্রে। ১৯৫৯-এ কিউবাতে গণবিপ্লব বিজয়ী হবার পর আবার নতুন সাহস সঞ্চয় করে মধ্য আমেরিকার সমস্ত বিপ্লবীরা। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত এল সালভাডরের কমিউনিষ্ট পার্টি বর্জন করে সশস্ত্র গণমুক্তিসংগ্রামের পথ, প্রধান জোর দেয় নির্বাচন ও শান্তিপূর্ণ গনআন্দোলনের উপর। তার ফলে অন্যান্য বামপন্থী বিপ্লবী দল ও গোষ্ঠীরা হাভানাতে গিয়ে কাস্ত্রো ও চে গুয়েভারার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে গ্যেরিলা সংগ্রামের পথ গ্রহণ করে। এই যুগের রাজনীতির গভীর পর্যালোচনা ও তীক্ষ্ণ আত্মসমালোচনা করে এল সালভাডরের কমিউনিষ্ট পার্টির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ও মুক্তিযুদ্ধের চারজন প্রধান নেতার অন্যতম জর্জ শাফিক হাণ্ডেল, হাভানাতে ১৯৮০তে এক সাক্ষাৎকারে যা বলেন তা গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য।

হাণ্ডেল বলেন: '১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ আমরা প্রধানত আইনি গণসংগ্রাম ও নির্বাচনী পথের উপরই নির্ভর করেছিলাম। সেটা আমাদের ভুল হয়েছিল। কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশ্যে তার ভুল স্বীকার করে আত্মসমালোচনা করেছে এবং ১৯৭৭-র এর মার্চ মাসে তারাও সশস্ত্র গণবিপ্লবকেই এল সালভাডরের সঙ্কট মোচনের একমাত্র পথ বলে গ্রহণ করেছে। এই পথ গ্রহণ করতে আমাদের দেরি হলেও সালভাডরের মুক্তির সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির অকুতোভয় সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কথা দেশের শ্রমজীবী মানুষের ভালভাবেই জানা আছে। ১৯৩০এ আমাদের কমিউনিষ্ট পার্টির জন্মের সময় থেকে আজ অবধি আমরা দেশের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি ও প্রগতির জন্য বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি।'[৪৪]

১৯৭৯র জুলাই মাসে নিকারাগুয়াতে গণবিপ্লব বিজয়ী হলে এল সালভাডরে নতুন উদ্দীপনা দেখা দেয়। ১৯৮০র নভেম্বর মাসে ফারাবুণ্ডো মার্তি গণমুক্তি বাহিনী, জাতীয় প্রতিরোধের সশস্ত্র বাহিনী ও কমিউনিষ্ট পার্টি—এই তিনটি পক্ষ মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গড়ে তোলে ফারাবুণ্ডো মার্তি জাতীয় মুক্তি মোর্চা। ১৯৮০র ডিসেম্বর মাসে সালভাডরের প্রায় সমস্ত বিপ্লবী দল ও গোষ্ঠী যোগ দেয় এই মুক্তি মোর্চায়, শুরু হয়ে যায় গনমুক্তির চূড়ান্ত পর্বের সংগ্রাম।[৪৫]

১৯৮১র ১০ জানুয়ারি, সালভাডরের সর্বোচ্চ বিপ্লবী নেতৃত্ব গোপন বেতারে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন: 'এল সালভাডরের বীর জনগণ, শ্রমিক, কৃষক

৪৪। গ্রামমা: ১ ও ৮ জুন, ১৯৮০
৪৫। গ্রামমা: ২২ ডিসেম্বর, ১৯৮০

বিপ্লবী নরনারীরা গণতন্ত্রীরা, দেশভক্তরা : জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দখল করার ও একটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করার জন্য সশস্ত্র গণউত্থানের পথে এগিয়ে যাবার ঐতিহাসিক মুহূর্ত এসেছে। সবাই মিলে অস্ত্র ধর! আমাদের সাথে রয়েছে মধ্য আমেরিকার সমস্ত বিপ্লবী ভাইবোনেরা। আমাদের পাশে থাকবে লাতিন আমেরিকার গণতান্ত্রিক জনমত। সাধারণ ধর্মঘট কর! ব্যারিকেড রচনা কর! গেরিলা দল গড়! হয় বিপ্লবের জয়, নয় বীরের মৃত্যু!'[৪৬]

তারপর গত ৩ বছর ধরে চলেছে ক্ষমতা দখলের বৈপ্লবিক সংগ্রাম। রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, লক্ষ বাসিন্দা যেখানে থাকে, সেই সান্টা আমা ও উত্তরাঞ্চলের প্রধান শহর চালাটেনাঙ্গা সহ এল সালভাডরের তিনভাগের এক ভাগ অঞ্চল এখন মুক্ত, ফারাবুণ্ডো মার্তি জাতীয় মুক্তি মোর্চার শাসনাধীন। বাকি সর্বত্র চলছে গেরিলা লড়াই। বন্দুকের রাজত্বে ভুয়ো নির্বাচন বা মার্কিনি হুমকি কোনটাই সালভাডরের মুক্তিযোদ্ধাদের দমাতে পারছে না।

হেগ যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন 'এল সালভাডরের কমিউনিষ্ট বিরোধী সরকারকে আমরা সর্বপ্রকারে সাহায্য করব, কারণ ভিয়েৎনামকে রক্ষা করার চেয়েও, আমাদের কাছে অনেক বেশি জরুরি এল সালভাডরকে রক্ষা করা।'[৪৭] একই কথার আরো জোরালো প্রতিধ্বনি করেছেন স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রতি রেগন, মার্কিন সেনেটের সামনে প্রদত্ত এক লিখিত বক্তব্যে।[৪৮] শত শত কোটি ডলারের সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র ও মার্কিন সমর-বিশারদদের পাঠানো হচ্ছে নিয়মিত সালভাডরে।

১৯৮৩-এর ২ ফেব্রুয়ারি মার্কিন কংগ্রেস সদস্য বার্নেস্ বলেন, 'ভাল করে খবরের কাগজ যারা পড়ে থাকেন, তারা সবাই বুঝতে পারছেন যে এল সালভাডরে আমরা জিততে পারছি না। আমাদের বর্তমান নীতি গেরিলাদের জয়কে প্রায় অনিবার্য করে তুলেছে।'[৪৯] একই দিনে, মার্কিন সেনেটে বক্তৃতা করতে গিয়ে সেনেটর ক্রিস্টফার ডড বলেন : 'গত ৩ বছরে এল সালভাডরে সামরিক জুন্টাকে যুদ্ধ চালাবার জন্য আমরা সাহায্য দিয়েছি ৭৪৮০ লক্ষ ডলার। কিন্তু এগোতে পারিনি এক চুলও। এ তামাশার মানে কী?'[৫০]

৪৬। গ্রামমা : ১৬ জানুয়ারি, ১৯৮১
৪৭। নিউইয়র্ক টাইমস্, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২
৪৮। নিউইয়র্ক টাইমস্, ২৭ মার্চ, ১৯৮৪
৪৯। নিউইয়র্ক টাইমস, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩
৫০। ঐ

শুধু কিউবা বা নিকারাগুয়া বা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্ররাই নয়, মেক্সিকো ও ফ্রান্সও কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছে সালভাডরের বিপ্লবী সরকারকে। ফ্রান্স ও মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সালভাডরে ও নিকারাগুয়াতে হস্তক্ষেপ বন্ধ করার জন্য প্রকাশ্যে যৌথ আহ্বানও জানিয়েছেন। খাস মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রেও কালো মানুষদের মধ্যে ও ছাত্রদের মধ্যে প্রতিবাদের ঢেউ উঠতে শুরু করেছে এই নোংরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে। প্রায় ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা মিছিল করে ধ্বনি তুলেছেঃ ওয়ান, টু, থ্রি, ফোরঃ ইউ. এস্. এ. আউট অফ এল সালভাডর!

১৯৮৩-র ১৬ ডিসেম্বর সালভাডর বিপ্লবী মোর্চার অন্তর্ভুক্ত ৫টি দলের পক্ষে ৫ জন সর্বোচ্চ নেতারা স্বাক্ষর দিয়ে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে করেছেন, সেটি দিয়েই আমরা সালভাডরের বিপ্লবের গতি-প্রকৃতির আলোচনা শেষ করব ঃ

'ফারাবুণ্ডো মার্তি জাতীয় মুক্তি মোর্চা এখন উচ্চতর পর্যায়ের ঐক্যের পথ প্রশস্ত করছে। মোর্চার মধ্যে আলাদা আলাদা বিপ্লবী দল হিসাবে আমাদের অস্তিত্বের কারণ ধাপে ধাপে অপসৃত হচ্ছে। যে চরম লক্ষ্যের সাফল্যের জন্য জনগন ও আমরা উভয়েই আগ্রহী—অর্থাৎ সমস্ত বিপ্লবী সংস্থার নীতিনিষ্ঠ ঐক্যের ভিত্তিতে একটিমাত্র ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী দলের জন্ম দেওয়া—তা আর বেশি দূরে নয়। সেই ধ্রুবতারাকে দিগন্তে স্থিরলক্ষ রেখেই আমরা এগিয়ে চলেছি।. চাই সংগ্রামী ঐক্য, লক্ষ চূড়ান্ত বিজয়।' স্বাক্ষর করেছেন ৫টি বিপ্লবী সংস্থার প্রধান ও বিপ্লবী মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়করা—লায়োনেল গণজালোজ, ফেরিলাম সিয়েমফুগোজ, রবার্টো রোক, জোয়াকিম ভিলালোবস এবং জর্জ সাফিক হাণ্ডেল।[৫১] শেষোক্ত স্বাক্ষরকারী হচ্ছেন এল সালভাডরের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

১৬ ডিসেম্বরের এই ঘোষণাপত্রটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কিউবার রাষ্ট্রনায়ক ফিদেল কাস্ত্রো ও নিকারাগুয়ার অন্যতম বিপ্লবী রাষ্ট্রনায়ক ড্যানিয়েল ওর্টেগা।[৫২] সমগ্র লাতিন আমেরিকা জুড়েই স্বাগত জানানো হয়েছে বিপ্লবী ঐক্যের পক্ষে এই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রকে। ৪ বছর আগেই কমিউনিষ্ট নেতা হাণ্ডেল এই ইঙ্গিত স্পষ্ট ভাবে করে বলেছিলেনঃ "বহু বিপ্লবী ধারা মিলে এল সালভাডরের গণবিপ্লবের নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে, কমিউনিষ্ট পার্টিই

৫১। গ্রামমা ঃ ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৩

৫২। ঐ

এখানে একমাত্র বিপ্লবী শক্তি নয়। এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় বিপ্লবী কর্তব্য হল সব কটি বিপ্লবী ধারার সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলা। আমাদের কমিউনিষ্ট পার্টি সেই সংগ্রামী ঐক্য গড়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। আমরা বিশ্বাস করি যে শুধু এই সংগ্রামী ঐক্যই বজ্রকঠিন ভিত্তির উপর রচিত হবে তাই নয়। শেষ পর্যন্ত আমরা এল সালাভাডরে একটি ঐক্যবদ্ধ মার্কসবাদী—লেনিনবাদী দলও আবার গড়ে তুলতে পারব। তাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ।"[৫৩]

সালভাডরের এই অসমাপ্ত বিপ্লবের অদূর ভবিষ্যতে চূড়ান্ত সাফল্য লাভের সম্ভাবনা কতটা? তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বানী করা মার্কসবাদীর কাজ নয়। তবে কয়েকটি কথা মনে রাখা ভাল। তাঁদেরই একজন বিপ্লবী সাংবাদিকের মূল্যায়ণ দিয়ে শেষ করছি: 'এল সালভাডরের এক-তৃতীয়াংশ এখন মুক্তাঞ্চল তার মধ্যে আছে ৫৫টি ছোটবড় শহরও। সমগ্র দেশে বিপ্লবী গণঐক্য ব্যাপক এবং গভীর। গেরিলাদের আক্রমনে সরকারি সেনাদল সর্বদাই শঙ্কিত থাকে। শুধু মধ্য আমেরিকার বা লাতিন আমেরিকার নয়, বিশ্বজনমতই এখন রেগনশাহীর হস্তক্ষেপের নীতির বিরুদ্ধে। তাদের সহানুভূতি ফারাবুণ্ডো মার্তি জাতীয় মুক্তিমোর্চার দিকেই। তবে চূড়ান্ত জয় নির্ভর করেনা শুধু সালভাডরের বিপ্লবী জনগণের উপর, তা নির্ভর করে আশে পাশের দেশ, বিশেষত গুয়াতেমালার গণবিদ্রোহ কত দ্রুত বিস্তার লাভ করবে, তারও উপর।'[৫৪]

প্রবন্ধের আয়তন দীর্ঘ হয়ে গেছে। ইচ্ছা ছিল গুয়াতেমালার অসমাপ্ত গণবিপ্লবের গতিপ্রকৃতির ও গ্রেনাডার সাময়িকভাবে পরাজিত বিপ্লবের কারণসমূহের উপরও কিছুটা আলোকপাত করার। ভবিষ্যতে কোনও সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম।

৫৩। গ্রাম্মা, ৮ জুন ১৯৮০

৫৪। সেরজিও রডরিগেজ: ইন্টারন্যাশনাল ডিট্রয়েন্ট, মন্ট্রিউল, ফ্রান্স, ১ এপ্রিল, ১৯৮৪

মার্কস, স্রাফা, স্টিড্‌ম্যান

সৌরীন ভট্টাচার্য

১৯৮৩ মার্কস-এর মৃত্যু শতবার্ষিকীর বছর। পিয়েরো স্রাফারও মৃত্যু হল ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩। স্রাফাকে কেন্দ্র করে মার্কস-এর মূল্যতত্ত্ব বিতর্ক দানা বাঁধছে গত কয়েক বছর ধরে। এর সূত্রপাত করেন আয়ান স্টিড্‌ম্যান তাঁর 'স্রাফার পরে মার্কস' (Marx After Sraffa, NLB, 1977) বইতে। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিতর্কের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হল। দরকারি বই জোগাড় করে দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌ. ভ.

পিয়েরো স্রাফা (১৮৯৮-১৯৮৩)-র 'দ্রব্যের সাহায্যে দ্রব্যের উৎপাদন' (Production of Commodities by means of Commodities, Cambridge University Press) বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। এই বই প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এ বইয়ের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য রিভিউ বিভিন্ন উচ্চমানের গবেষণাপত্রে প্রকাশিত হয়। সেই সব রিভিউ লেখকদের মধ্যে মরিস ডব্, রোনাল্ড মিক্ থেকে আরম্ভ করে একালের অনেক বড় বড় অর্থনীতিবিদ্ রয়েছেন। শুধু তাই নয়। বইটার সম্বন্ধে উৎসাহে কিন্তু এই প্রথম পর্বের রিভিউ-এর পরেই ভাঁটা পড়ে নি। গত বিশ বছর ধরে এই বই নিয়ে আলাপ আলোচনার অন্ত নেই। মূলত এই বইকে কেন্দ্র করে অর্থনীতির তাত্ত্বিক চেহারায় যেন একটা বৈপ্লবিক কিছু ঘটে গেছে এরকম ধারণা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কেউ কেউ 'স্রাফা বিপ্লব' কথাটি

ব্যবহার করেছেন। ঠিক যেমন তিরিশের দশকে জন মেইনার্ড কেইন্‌স্-এর জেনারেল থিওরিকে ঘিরে একটা বৈপ্লবিক চিন্তার স্বাদ পাওয়া গিয়েছিল যেন তেমনি। অথবা, অন্য ক্ষেত্রে আধুনিক কালের নোঅম্ চোম্‌স্কি। ভাষা-তত্ত্বের ক্ষেত্রে যে-অর্থে 'চোম্‌স্কি বিপ্লবের' কথা বলা হয়, যেন অর্থনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে তেমনি 'স্রাফা বিপ্লব'। এই স্রাফা বিপ্লবের অন্যতম ফল হল অর্থনৈতিক তত্ত্বের নানা দিকের পুনর্বিচার। স্রাফা প্রতিকল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্য ও বণ্টনতত্ত্ব, মূলধনের তত্ত্ব এবং খুব সম্প্রতি কেইন্‌সীয় তত্ত্ব-কাঠামোর[২] দিকে ফিরে তাকানো এই পুনর্বিচারের অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গেই আসে স্টিড্‌ম্যানের মার্কস বিচারের কথা। ইদানীং স্রাফাকে মার্কস-এর বিপরীতে দাঁড় করিয়ে মার্কসীয় তত্ত্বকাঠামোর এক জোরালো সমালোচনা তৈরি করা হয়েছে। এই ধারার উল্লেখযোগ্য রচনা আয়ান স্টিড্‌ম্যানের ১৯৭৭-এ প্রকাশিত 'স্রাফার পরে মার্কস' (Marx After Sraffa) নামের বই।

স্টিড্‌ম্যান মনে করেন যে, বর্তমানে যে কোনো ধরনের বামপন্থী রাজনৈতিক চিন্তার পেছনে মার্কসীয় পলিটিক্যাল ইকনমির একটা ভূমিকা রয়েছে। পক্ষে বা বিপক্ষে যাই হোক-না কেন, আজকের বামপন্থী তত্ত্বচিন্তায় মার্কস-এর অর্থনীতিকে পাশ কাটিয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। অথচ স্টিড্‌ম্যানের মতে মার্কসীয় অর্থনীতির বড় দুর্বলতা হল তার মূল্যের শ্রমতত্ত্ব। এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারলে মার্কসীয় অর্থনীতি তার স্বাস্থ্য ফিরে পেতে পারে। লক্ষণীয় যে, শ্রমতত্ত্বের এই দুর্বলতা কাটাবার প্রয়োজনীয়তা স্টিড্‌ম্যানই প্রথম উপলব্ধি করলেন তা নয়। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই এ কথা অনেকে ভাবছিলেন। ব্যোম-বাভার্ক-এর তীব্র সমালোচনা (Karl Marx and the Close of His System, ১৮৯৬) প্রকাশিত হবার পর থেকে তো নিয়মিত চেষ্টাই চলছিল। এই শতাব্দীর প্রথম দশকেই (১৯০৭) প্রকাশিত হয়েছিল লাদিস্লাউস্ ফন্ বোর্টকিয়েভিচের প্রবন্ধ। মার্কসীয় মূল্যতত্ত্ব প্রসঙ্গে রূপান্তর সমস্যার ত্রুটি সংশোধন করাই ছিল বোর্টকিয়েভিচের মূল লক্ষ্য। কিন্তু এই ত্রুটি সংশোধন করতে গিয়ে তিনি গোটা শ্রমতত্ত্বকেই বর্জন করেন নি। কাজেই স্টিড্‌ম্যানের অনুরূপ চিন্তা তাঁর আগেও ছিল। তবে স্টিড্‌ম্যানের প্রসঙ্গে যা নতুন তা হল তাঁর মার্কস সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি। সেটা সত্যিই নতুন।

শ্রমতত্ত্বের দুর্বলতা কাটাবার জন্যে স্টিড্‌ম্যান স্রাফার মডেল ব্যবহার

করছেন। স্রাফার তত্ত্বকাঠামো নিঃসন্দেহে নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সে গুরুত্ব আলাদাভাবে বিচার্য। কিন্তু স্টিড্‌ম্যান যে স্রাফাকে মার্কসের বিপরীতে দাঁড় করাচ্ছেন এ ব্যাপারটা খুঁটিয়ে আলোচনা করা দরকার। কারণ, কথাটা জরুরি। স্টিড্‌ম্যান নিজেও এখান থেকে শুরু করছেন যে, মার্কসীয় অর্থনীতিতে এই মুহূর্তে সব রকম বামপন্থীদের প্রয়োজন রয়েছে। এমন যদি হত যে মার্কসে আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে তা হলে সে অর্থনীতির শ্রমতত্ত্ব নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলত। কিন্তু স্টিড্‌ম্যান কখনোই মনে করেন না যে, সে প্রয়োজন সত্যিই ফুরিয়েছে। কিন্তু স্টিড্‌ম্যান এটা জোরের সঙ্গেই মনে করেন যে, মার্কসবাদকে বাঁচাতে গেলে, বা অন্তত তার অর্থনীতির কাঠামোকে কোনো-রকমে সামলাতে গেলেও মূল্যের শ্রমতত্ত্বকে বর্জন করা দরকার। আর এ ব্যাপারে তিনি স্রাফার দ্বারস্থ। এই স্রাফা প্রায় তিরিশ বছর ধরে মাথায় বয়ে বেড়িয়েছেন তাঁর এই তত্ত্বকে। বস্তুত, এই শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে স্রাফা কেম্ব্রিজ অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অধিকার করে রয়েছেন। ১৯২৭-এ তিনি যখন প্রথম কেম্ব্রিজে এসেছিলেন (কেইন্‌সের আমন্ত্রণে ও সহায়তায়) তখন সেখানে আলফ্রেড মার্শালের প্রভাব প্রায় সর্বব্যাপী। কেইন্‌সের প্রথম যুগের অর্থনীতি শিক্ষারও ভিত্তি ছিল স্বাভাবিকভাবে মার্শালীয় তত্ত্ব এবং সেকালে তাঁর প্রধান সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন আর্থার সিসিল পিগু ও ডি. এইচ. রবার্টসন। পরে অবশ্য কেইন্‌স্ এঁদের থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যান। তাঁর নতুন সহযাত্রীদের মধ্যে ক্রমশ উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেন রিচার্ড কান্, জোন রবিনসন ও ইতালীয় পিয়েরো স্রাফা।

এই নতুন গোষ্ঠীর চিন্তার সাধারণ ধারাটা এখানে একটু বুঝে নেওয়া দরকার। তদানীন্তন ইংরেজ অর্থনীতির হাওয়ায় কেম্ব্রিজ ও এল. এস. ই. (লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্‌স্)-র মধ্যে এক ধরনের বিরোধী সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এল. এস. ই. ধারার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল অস্ট্রিয়ান স্কুলের চিন্তাধারার ছোঁয়ায়। মার্শাল-শাসিত কেম্ব্রিজ কখনোই সে ধারা গ্রহণ করে নি। অস্ট্রিয়ান স্কুলের চিন্তাধারা গত শতাব্দীর কার্ল মেঙ্গারের দিন থেকে আরম্ভ করে ব্যোম-বাভার্ক, ক্নুট ভিক্‌সেল্-এর ধারায় প্রবাহিত হয়ে ঐ সময়ে হায়েকের প্রভাবে এল. এস. ই.তে প্রতিষ্ঠিত। এঁরা সাধারণ সাম্যাবস্থার পদ্ধতিতে সমগ্র অর্থনীতিকে বিশ্লেষণ করতেন। ফলে, প্রথমত, এঁদের চিন্তায় তত্ত্বকাঠামোর ন্যায়তাত্ত্বিক ভিত্তি যত গুরুত্ব পেয়েছিল, সমসাময়িক

অর্থনৈতিক ঘটনাবলি বা অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ তত নয়। দ্বিতীয়ত, এঁরা অর্থতত্ত্বকে অর্থনীতির সাধারণ তত্ত্বের থেকে আলাদা করে বিবেচনা করেন নি। এঁদের অর্থতত্ত্ব সাধারণ সাম্যাবস্থার প্রতিকল্পের মধ্যেকার এক অঙ্গ। তথাকথিত 'প্রকৃত' অর্থনীতি এবং 'আর্থিক' অর্থনীতির ফারাক এঁদের চিন্তায় আদৌ গুরুত্ব পায় নি। ঐ সময়ে এল. এস. ই.-র আশ্রয়পুষ্ট জন্ হিক্স্ (বর্তমানে স্যার) তাঁর 'মূল্য ও মূলধন' (Value and Capital) গ্রন্থেও ঠিক এই সাধারণ সাম্যাবস্থার প্রতিকল্প রচনা করেছেন। এবং হিক্স্-অ্যালেন্ (ইনিও এল. এস. ই.-র) সমউপযোগ রেখা তত্ত্বের চারিত্রিক কুললক্ষণ নিঃসন্দেহে লণ্ডন-প্রভাবিত।

লণ্ডনের মহাদেশীয় হাওয়ার বিপরীতে মার্শালের চিন্তায় পদ্ধতিগতভাবে আংশিক সাম্যাবস্থার গুরুত্ব আর অর্থের বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট। 'Money does matter' এই বুলির প্রভাবে এবং আংশিক সাম্যাবস্থা পদ্ধতির জোরে মার্শালের কেম্ব্রিজ তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখছিল। সম্ভবত অর্থের কথা মাথায় রেখেই কেইন্‌স্ জন স্টুয়ার্ট মিল, মার্শাল, এজওয়ার্থ ও পিগুকে রিকার্ডীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহী ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্ বলে বর্ণনা করেছিলেন। মার্শাল-শিষ্য কেইন্‌স্ কখনোই এল. এস. ই. প্রভাবে পড়েন নি এ কথা ঠিক। তবে আংশিক সাম্যাবস্থার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে যে তাঁর খুব বেশি দেরি হয় নি এতেও কোনো সন্দেহ নেই। অর্থের স্বতন্ত্র প্রভাব অবশ্য তাঁর চিন্তায় সারা জীবনই ছিল। কেম্ব্রিজ ধারার আর-একটা দিকও লক্ষণীয়। তা হল এর সমসাময়িকতা এবং সাম্প্রতিকে এর প্রাসঙ্গিকতা। ঠিক 'শুদ্ধ' অর্থনৈতিক তত্ত্ব কখনোই কেম্ব্রিজের জাতিধর্ম নয়। কেইন্‌সের সমগ্র রচনাবলিতে এই প্রাসঙ্গিকতার সাক্ষ্য রয়েছে। 'ভারতীয় মুদ্রা ও আর্থিক ব্যবস্থা' (Indian Currency and Finance) থেকে আরম্ভ করে 'শান্তির অর্থনৈতিক ফলাফল' (Economic Consequences of Peace), 'অর্থবিষয়ক আলোচনা' (Treatise on Money), ও 'কর্মসংস্থান, সুদ ও অর্থবিষয়ক সাধারণ তত্ত্ব' (General Theory of Employment, Interest and Money) পর্যন্ত তাঁর সব বইয়েই এই প্রাসঙ্গিকতার সাক্ষ্য বর্তমান। স্রাফার 'দ্রব্যের সাহায্যে দ্রব্যের উৎপাদন' তুলনায় অনেক দূরস্থিত মনে হলেও তার মধ্যেও এই প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন উপেক্ষণীয় নয়।

স্রাফা চিন্তার রক্তমাংস এই কেম্ব্রিজের জল-হাওয়ায় পুষ্ট। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, স্রাফা জন্মেছিলেন ভিন্‌দেশে। তিনি কেম্ব্রিজে এসেছিলেন

পরিণত বয়সে। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও চেতনা তখনই তাঁর ছিল। তিনি যেমন একদিকে ছিলেন দার্শনিক ভিট্‌গেনষ্টাইনের বন্ধু, তেমনি অপর দিকে আযৌবন সুহৃদ ছিলেন ইতালীয় কমিউনিস্ট নেতা আন্তোনিও গ্রাম্‌শির। ইতালীয় রাজনীতিতে মার্কসবাদের গোড়াপত্তন, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও মুসোলিনীর উত্থান এ সবই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কাজেই স্রাফা যখন কেম্ব্রিজে এলেন তখন তিনি শুধু প্রতিভাদীপ্ত আনকোরা এক যুবা নন, ইতিমধ্যেই পরিণত এবং তাঁর নিজের চিন্তার একটা ধাঁচ স্পষ্ট গড়ে উঠেছে। কেম্ব্রিজে যখন তিনি কেইন্‌স্‌-চক্রের অন্তর্ভুক্ত, কেইন্‌স্‌ নিজে ততদিনে মার্শাল-বিদ্রোহের পথে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। যদিও 'সাধারণ তত্ত্ব' তখনো প্রায় এক দশক দূরে।

মার্শাল-বিদ্রোহের এই পথে বহিরাগত স্রাফা অনেক অগ্রবর্তী। বস্তুত, স্রাফা তো কখনোই মার্শাল-প্রভাবিত ছিলেন না, তাঁর অনুপন্থীও নন তিনি। ফলে মার্শালীয় চিন্তার আবরণ কাটাবার প্রশ্ন তাঁর বেলায় ওঠে না। কেইন্‌সের মার্শালীয় দ্বিধা তাঁর ছিল না বলেই হয়তো তিনি অনেক সহজে মার্শালের আংশিক তত্ত্বকাঠামোর অসঙ্গতি দেখতে পেয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে, স্রাফার ১৯৬০-এ প্রকাশিত মূল বইয়ের অনেক আগেই ১৯২৬-এ প্রকাশিত ইকনমিক জার্নালের প্রবন্ধে তিনি মার্শালীয় কাঠামোর মৌলিক সমালোচনা করেছিলেন।

কাজেই আমরা যাকে নিওক্ল্যাসিকাল চিন্তা বলি, তিরিশের দশকে ইংলণ্ডে এল. এস. ই. যে-চিন্তার মূল ধারক, স্রাফা কখনো তার অংশীদার ছিলেন না। একটু ব্যাপক অর্থে নিওক্ল্যাসিকাল চিন্তার যে-রূপ কেম্ব্রিজের বৈশিষ্ট্য, স্রাফা ঠিক তারও শরিক হন নি কখনো। বস্তুত, তাঁর রক্তে ছিল ক্ল্যাসিকাল ধারা। সম্ভবত, প্রাক্‌-কেম্ব্রিজ পর্বেই রাজনীতিসূত্রে তাঁর মার্কস-চর্চায় হাতেখড়ি। এ সম্বন্ধে জীবনীভিত্তিক তথ্য অবশ্য আমাদের হাতে এখনো যথেষ্ট নেই। তবে কেম্ব্রিজে তিনি জীবনের বৃহৎ সময় যে-বড় কাজে ব্যয় করেছেন তা হল এগারো খণ্ড রিকার্ডোর গ্রন্থ ও পত্রাবলি সম্পাদনা। এবং এই কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন কেম্ব্রিজের প্রখ্যাত মার্কসীয় অর্থনীতিবিদ্‌ মরিস্‌ ডব্‌। অর্থাৎ, মার্কসীয় প্রভাব ও ক্ল্যাসিকাল চিন্তার অনুষঙ্গ স্রাফার মানসিক গঠনে ইতিমধ্যেই অন্যতম বড় উপাদান হিসেবে দেখা দিয়েছে। অতএব তাঁর রচনার কেন্দ্রবিন্দু কখনোই বোম্‌-বাভার্কের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। বোম্‌-বাভার্কের মার্কস সমালোচনার মধ্যেও তাঁর কেন্দ্রীয়

নিওক্ল্যাসিকাল দৃষ্টিভঙ্গির ছায়াপাত মোটেই অদৃশ্য নয়। কিন্তু স্রাফার জাতিগোত্র তো আলাদা। অতএব তাঁর রচনায় যদি কোনো মার্কস সমালোচনা প্রচ্ছন্ন থাকে, তবে তাকে অবশ্যই অন্য দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে। কাজেই স্টিড্ম্যান যখন স্রাফাকে মার্কসের বিপরীতে দাঁড় করান তখন সেটা আমাদের ভাবায়।

স্রাফা ও ব্যোম্-বাভার্ক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য স্টিড্ম্যানের রচনাতেও স্বীকৃত। শুধু ব্যোম্-বাভার্ক নয়, অস্ট্রিয়ান গোষ্ঠীর সহধর্মী ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ পি. এইচ. ভিক্স্টিডের কথাও স্টিড্ম্যান উল্লেখ করেন। তাঁর 'স্রাফার পরে মার্কস' গ্রন্থের পরবর্তী রচনা 'রিকার্ডো, মার্কস, স্রাফা' নামক প্রবন্ধ ১৯৭৯তে বিলেতের নিউ স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি পরে 'মূল্য বিতর্ক' (The Value Controversy, Verso, 1981) নামের প্রবন্ধ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। স্টিড্ম্যানের চিন্তাধারা বুঝতে সাহায্য করবে বলে একটু লম্বা উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি:

> The criticisms of Marx's political economy which have been most influential are perhaps those of the Austrian economist E. von Bohm-Bawerk, (Although those of the English economist P. H. Wicksteed, who converted Bernard Shaw to 'Jevonian' economics, played an important role in Fabian thought.) The criticisms of both Bohm-Bawerk and Wicksteed were launched from the standpoint of an economic theory fundamentally different from that of Marx (and from that of the physiocrats, Adam Smith, and Ricardo, upon whose works Marx drew). Marx like his classical predecessors, conceived the economic process as involving the creation of a *surplus* product, over and above the needs of input replacement and workers' consumption, that was appropriated as profit, interest, and rent. Bohm-Bawerk and Wicksteed, by contrast, conceived that process as involving production through the mutual co-operation of various 'factors',

there being *no* element of asymmetry as between labour and the other 'factors'. Criticism of Marx's entire analysis thus became strongly associated both with the rejection of the 'labour theory of value' and with the adoption of this alternative view of the economic process.[২] (ইটালিকগুলো স্টিড্‌ম্যানের)

মার্কসীয় (বা এই প্রসঙ্গে ক্ল্যাসিকাল) অর্থনীতির 'উদ্বৃত্ত'-এর অনুসন্ধান যে বোম্‌-বাভার্ক-ভিস্‌স্টিড্‌দের অনুসন্ধানের থেকে মূলত আলাদা এ কথা স্টিড্‌ম্যান পরিষ্কার বলেছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক তত্ত্বের এই দুই শিবিরের দৃষ্টিভঙ্গি যে কোথায় মূলত ভিন্ন এ সম্বন্ধে স্টিড্‌ম্যানের উক্তি যথেষ্ট স্পষ্ট হল না। ব্যোম্‌-বাভার্ক-ভিক্‌স্টিড্‌ বা যে চিন্তাধারাকে 'প্রান্তিক অর্থনীতি' বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তাতে যে বিভিন্ন উৎপাদনের উপাদানের (factors) মধ্যে শুধু সহযোগিতা দেখা হয় তাই তো নয়। এরকম তত্ত্বধারণায় তাঁরা পৌঁছলেন কোন চিন্তাকাঠামোর ভিত্তিতে সেটা বিবেচনা করলেই দুই শিবিরের মূল তফাত ধরা পড়বে। তাত্ত্বিক ধারণা তো স্বয়ম্ভু নয়। নির্দিষ্ট চিন্তা-কাঠামোয় তার উৎপত্তি। এই চিন্তা-কাঠামোর মধ্যেই নিহিত থাকে তাত্ত্বিকের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজ-মূল্যবোধ ইত্যাদি, এক কথায় তাঁর সামাজিক ঝোঁক। এই দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও ঝোঁকও গড়ে ওঠে তাত্ত্বিকের সমকালীন অভিজ্ঞতা থেকে। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতা দুইই ধরা থাকে। অর্থনৈতিক তত্ত্ব বা সামাজিক তত্ত্বও যেখানে সৃজনশীল চিন্তাকর্ম সেখানে এইসব অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিমানসে তাদের অভিঘাতের প্রশ্ন উঠবেই। অ্যাডাম স্মিথ থেকে শুরু করে যে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল সেখানে পরিবর্তনের প্রশ্ন প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। কারণটা স্বাভাবিক। আঠারো শতকের যে-সময়ে অ্যাডাম স্মিথ তাঁর সমাজদর্শন গড়ে তুলেছিলেন সে-সময়ে তাঁর সমাজের সর্বস্তরে দেখা দিয়েছিল পরিবর্তন। আঠারো শতক ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের শতক। এর বেশি আর এখানে না বললেও চলবে। অ্যাডাম স্মিথ ষোল শতকের মানুষ হলে তাঁর চিন্তার চরিত্রও ভিন্ন হত।

কিন্তু প্রান্তিক অর্থনীতির সূত্রপাত ১৮৭০-এর পরবর্তী সময়ে। ইতিমধ্যে শিল্প বিপ্লব এক শতাব্দীর বেশি পুরনো হয়ে গেছে। একচেটিয়া ব্যবসার বিস্তার হয়েছে অর্থনীতিতে। ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক অর্থনীতি ক্রম-

বিবর্তনের পথে তখন যে পর্যায়ে এসে পৌছেছিল সেখানে সংকট মনে হচ্ছিল অনিবার্য। একদিকে অর্থনৈতিক সংকট, একচেটিয়া পুঁজির প্রতিপত্তি ও অন্য দিকে ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রসার। ১৮৭১ পারি কমিউনের বছর। সংক্ষেপে, প্রান্তিক অর্থনীতির জন্মলগ্নে এই ছিল পরিপ্রেক্ষিত। এই অর্থনীতিতে পরিবর্তন বা বিবর্তনের প্রশ্ন আর অত প্রাসঙ্গিক মনে হল না। বদলে সাম্প্রতিক মনে হল খুব জরুরি। ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গুণাগুণ বিচার প্রান্তিক শিবিরের বড় সমস্যা। কোনো স্থির বর্তমানে সমাজের সবচেয়ে মঙ্গলজনক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? প্রান্তিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত কল্যাণমূলক অর্থনীতির এই তো মূল প্রশ্ন! পজিটিভিস্ট পারেতো এ প্রশ্নের উত্তর বাতলে দিলেন তাঁর 'শীর্ষ' অবস্থার ধারণায়। এই 'শীর্ষ' অবস্থাই 'পারেতো শীর্ষ' নামে বিখ্যাত। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে (আরো কিছু কিছু শর্ত মেনে নিতে হবে অবশ্য) এগোলে পারেতো শীর্ষ অবস্থায় সমাজ পৌছতে পারে প্রান্তিকতাবাদীদের এই গাণিতিক তত্ত্ব নির্ভুল। কিন্তু পারেতো শীর্ষ ধারণার সঙ্গে সমাজে বণ্টনের প্রশ্ন কী ভাবে জড়িত? এ কথা আজ স্নাতকস্তরের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে, বণ্টনের অসাম্য বৃদ্ধির সঙ্গে পারেতো শীর্ষ অবস্থার কোনো বিরোধ নেই। এই তত্ত্বচিন্তা বণ্টন সম্বন্ধে, সামাজিক অসাম্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। গাণিতিক প্রমাণের এই 'বৈজ্ঞানিক' নির্মোকের মধ্যেও এই সমাজদৃষ্টির কথা মনে না রাখলে স্টিড্‌ম্যানের আলোচিত সমস্যার খেই পাব না আমরা। এই প্রসঙ্গে লক্ষ করতে বলেছি যে, উপরে উদ্ধৃত অংশে 'no' কথাটিকে ইটালিক করে জোর স্টিড্‌ম্যান নিজেই দিয়েছেন। অথচ আমরা পরে দেখব যে, তিনি নিজেই এই জোরটাকে আর ব্যবহার করছেন না। ব্যোম-বাভার্কদের তত্ত্বে শ্রম (মার্কসের প্রসঙ্গে হবে শ্রমশক্তি) এবং অন্যান্য উপাদানের মধ্যে যে কোনো অপ্রতিসাম্য নেই এ ব্যাপারটার গুরুত্ব স্টিড্‌ম্যান ভুলে যাচ্ছেন। নইলে তাঁর খেয়াল করা উচিত ছিল যে, শুধু এই একটা কারণের জন্যেই তো তিনি শ্রমতত্ত্বকে মূল্যবান বলে মনে করতে পারতেন। মার্কসীয় তত্ত্বে মানুষের শ্রমশক্তি ও অমানবিক অন্যান্য উপাদানের মধ্যে একটা স্পষ্ট অপ্রতিসাম্য বর্তমান। এই অপ্রতিসাম্যের কথা চোখে আঙুল দিয়ে দেখালে একটা ধরনের সামাজিক দৃষ্টি খুলে যায়। এই সামাজিক দৃষ্টির সঙ্গে রাজনীতিরও যোগ প্রত্যক্ষ।

প্রান্তিকতাবাদীদের মূল সমস্যা তাই দাঁড়ালো এমন এক মূল্যাবলি নির্ধারণ করা যে মূল্যাবলিতে সমাজের সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ চাহিদা ও জোগানের সমতা বজায় রেখে ঠিকমতো তাদের ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে যাবে। কোথাও যদি চাহিদা ও জোগানের কোনো অসমতা দেখা না দেয় তা হলে অর্থনৈতিক 'খেলা'য় অংশগ্রহণকারী সকলেই সন্তুষ্ট এবং ঐ অবস্থাকে বলা হবে সাম্যাবস্থা। কারণ সংশ্লিষ্ট কেউই তো কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করবে না। এবং প্রমাণ করা হল যে, এইরকম মূল্যাবলিতে পারেতো শীর্ষ অবস্থা লভ্য। অতএব সমাজের দিক থেকে বিচার করলে এর চেয়ে কাম্য অবস্থা কী হতে পারে? প্রসঙ্গত, প্রান্তিক অর্থনীতিতে এই সামাজিক বিচার কিন্তু একেবারেই ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে।

সংক্ষেপে এই হল প্রান্তিকতাবাদীদের দামের সমস্যার স্বরূপ। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির, বিশেষত মার্কসের সমস্যা তো মূলত মূল্য নিয়ে। কারণ, ওঁদের প্রশ্ন হল সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এমন কোনো পারস্পরিক হার পাওয়া সম্ভব কিনা যার সাহায্যে বিভিন্ন পণ্যকে একটা সাধারণ মানে বিচার করা সম্ভব হবে। এরকম সাধারণ মান না পেলে তো উদ্‌বৃত্তের ধারণাই দাঁড় করানো যাবে না। সামাজিক উৎপাদনে উদ্‌বৃত্ত সমাজ পরিবর্তনের মূলভিত্তি। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা তার বিশেষ সামাজিক কাঠামোয় কী ভাবে উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন করে এবং সে উদ্‌বৃত্ত সমাজের কোন শ্রেণীর হাতে সঞ্চিত হয়, কী ভাবে তার ব্যবহার হয় বা হতে পারে এই সবই তো মার্কসের মৌলিক প্রশ্ন। দ্রব্যের বাজারভিত্তিক বিনিময় হার নির্ধারণ কখনোই মার্কসের মূল সমস্যা নয়। অ্যাডাম স্মিথেরও তা নয়, এ কথা লক্ষণীয়। অ্যাডাম স্মিথ বা মার্কস বাজার দামের প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না তা আদৌ সত্যি নয়। ওঁদের রচনায় চাহিদার ভূমিকা অবহেলিত বলে যে-অভিযোগ হামেশাই তোলা হয় তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। অ্যাডাম স্মিথ বা মার্কসের রচনা অনুধাবন না করে শুধু পড়ে গেলেও ধরা পড়বে যে, যেখানেই তাঁরা বাজার দামের কথা বলছেন সেখানেই চাহিদার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁদের নিজেদের মূল্য সমস্যায় (দামের সমস্যা নয়) চাহিদার প্রসঙ্গ যে অবান্তর এই দৃষ্টি সমালোচকদের প্রায়শ থাকে না। সম্ভবত তাঁরা বাজার দামের প্রশ্নে আচ্ছন্ন বলেই। যে-কোনো রকমের পারস্পরিক হার মাত্রই ওঁদের কাছে বাজার দাম বা বাজারভিত্তিক বিনিময় হার বলে মনে হয়। স্টিড্‌ম্যান সম্বন্ধে অবশ্য এ অভিযোগ একেবারেই ওঠে না।[৩] তবে তাঁর

মার্কস সমালোচনায় এই তফাৎ তিনি সব সময় খেয়াল রাখেন বলে মনে হয় না।

ব্যোম্-বাভার্ক ভিক্স্টিড্দের সঙ্গে মার্কসের চারিত্রিক পার্থক্য স্টিড্ম্যান তুলে ধরেছেন। কিন্তু বলেন নি তফাতটা কোথায় আর কেন। সম্ভবত এই কারণেই স্টিড্ম্যানের নিজের সমালোচনাতেও দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে। প্রান্তিকতাবাদীদের সমালোচনা ছাড়াও স্টিড্ম্যান আর এক শ্রেণীর মার্কস-সমালোচনার উল্লেখ করেন। এই ধারায় উনি বেছে নিয়েছেন ভি. কে. দিমিত্রিয়েভ্ (পাশ্চাত্য আলোচনায় হালে আবিষ্কৃত) ও লাদিস্লাউস্ ফন্ বোর্ট্কিয়েভিচ্। স্টিড্ম্যান ঠিকই বলেছেন যে, এঁরা 'উদ্বৃত্তমূল্য' ধারার সমালোচক। স্টিড্ম্যান স্রাফাকে এই ধারার অন্তর্গত করেছেন। এতেও এমনিতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, পিয়েরো স্রাফার রচনায় মার্কসের নামোল্লেখ একবারও নেই। এমনকি তাঁর রচনা প্রত্যক্ষত আদৌ মার্কসের কাঠামোর প্রতি নির্দিষ্ট নয়। যদি কোনো পূর্বসূরি স্রাফার রচনার লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে থেকে থাকেন তিনি অবশ্যই ডেভিড রিকার্ডো, কার্ল মার্কস কখনোই নন। স্রাফা তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনায় মার্কসের প্রসঙ্গ ছুঁয়ে যান নি, তবে মার্কসীয় সমাজদর্শনের তিনি শরিক (অন্তত ব্যাপক কোনো অর্থে) এ কথা তো মেনে নেওয়া যেতেই পারে। ইতালীয় মার্কসচর্চায় তিনি অংশীদার। তোলিয়াত্তি প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে পত্র বিনিময়ে তার প্রমাণ রয়েছে।[৪]

এই স্রাফার মূল রচনার উদ্দেশ্য স্টিড্ম্যান কী ভাবে দেখছেন ?

> In 1960 Piero Sraffa published his *Production of Commodities by Means of commodities*, the explicit purpose of which was to lay the foundation for an internal logical critique of all those economic theories that presupposed the existence of a 'factor of production', capital, conceived as a given aggregate value.[৫]

শুধুই মূলধনের ধারণার সমালোচনা ? শুধু এই একটা টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য স্রাফা এত বছর সময় ব্যয় করলেন তাঁর ঐ চটি বইয়ের ওপর ? আর টেকনিক্যাল সমস্যার কথাই যদি ওঠে তা হলে রিকার্ডোর 'অপরিবর্তনীয় মূল্যমান' (invariant measure of value)-এর সমস্যা অন্তত সমান মর্যাদা

পাবে না কেন ? রিকার্ডো রচনাবলি সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনি যে এই অপরিবর্তনীয় মূল্যমানের সমস্যাটিকে বেশ মৌলিক মনে করেছিলেন এ কথা তাঁর সম্পাদকীয় ভূমিকাতেই টের পাওয়া যায়। মূলধনের চরিত্র নির্ণয়ের যে-কথা স্টিড্‌ম্যান বলেছেন তা নিশ্চয়ই স্রাফার রচনা থেকে বেরোচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সেটাকেই এই বইয়ের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য মনে করা, শুধু টেক্‌নিক্যাল দিক থেকে ভাবলেও বড় সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না কি ? আর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যের কথা যদি ভাবতেই হয় তা হলে আমরা কেন লক্ষ করব না যে, স্রাফা তাঁর বইয়ের প্রথম ছত্রে একটা কল্পিত অর্থনীতির কল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন ? উৎপাদনের দিকে এই নজর ফেরানো স্রাফা-চিন্তার ক্ল্যাসিকাল ধাঁচ। নিওক্ল্যাসিকাল চিন্তাপদ্ধতি থেকে তিনি যে অন্য দিকে মুখ ফেরাচ্ছেন তার পরিচয় এই প্রথম ছত্রেই রয়েছে। আধুনিক কালের অন্যতম বিশিষ্ট কেম্ব্রিজ অর্থনীতিবিদ্ লুইজি পসিনেত্তি তাঁর 'উৎপাদন বিষয়ক বক্তৃতাবলি' বইতে স্পষ্ট করে এদিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। প্রসঙ্গত, পসিনেত্তিও জন্মসূত্রে ইতালীয় এবং কর্ম ও চিন্তাসূত্রে কেম্ব্রিজ-লগ্ন। বর্তমান মুহূর্তে স্রাফা-চিন্তার খুব কাছের মানুষ যে কজন উনি তাঁদের অন্যতম। কয়েক বছর আগে এই শহরে তাঁর বক্তৃতায় উৎপাদন সূত্রে ক্ল্যাসিক্যাল চিন্তার সঙ্গে ফিজিও-ক্র্যাট্‌দের ও নিওক্ল্যাসিকাল চিন্তার সঙ্গে মার্কেন্টাইলিস্টদের সাযুজ্য লক্ষ করবার কথা তিনি বলে গেছেন। ব্যাপারটাকে এতদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যদি বাড়াবাড়ি মনে হয়ও, তা হলেও মনে রাখতে হবে যে, স্রাফার বইয়ের উপ-শিরোনামা ছিল A Prelude to a Critique of Economic Theory। স্রাফার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য বিচার করবার সময় এই উপ-শিরোনাম ভুলে গেলে চলবে না।

স্রাফা এমন একটি অর্থনীতি কল্পনা করছেন যেখানে দ্রব্যের সাহায্যে দ্রব্য উৎপাদিত হয়। এ কথার তাৎপর্য এই যে, মূলধন ও ভোগ্যদ্রব্যের মধ্যে কোনো চরিত্রগত পার্থক্য নেই। মূলধন ও ভোগ্যদ্রব্য এই দু রকমের শ্রেণীবিন্যাস প্রান্তিক অর্থনীতিতে ব্যবহার করা হয়। স্রাফা গোড়াতেই তা বর্জন করছেন। তাঁর আগেও ভাসিলি লিওনটিয়েফ্ ইনপুট আউটপুট্ মডেলে এ চিন্তা ব্যবহার করেছেন। স্রাফা অর্থনীতির প্রাথমিক তথ্য হল বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যের পরিমাণ। এখন প্রশ্ন হল : এই প্রাথমিক তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদন অব্যাহত রাখার শর্ত কী ? উৎপাদন অব্যাহত রাখতে গেলে

বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিমাণ দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কী ভাবে এই সরবরাহ নিশ্চিত হবে? উপযুক্ত রকম বিনিময় হারের মাধ্যমে। তাই চূড়ান্ত প্রশ্ন হল: এমন কোনো বিনিময় হার (নিওক্ল্যাসিকাল চিন্তার বাজার দাম নয় কিন্তু) আছে কি যাতে করে যে-কোনো প্রাথমিক অবস্থা এবং উৎপাদন-শর্ত সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে? এ রকম বিনিময় হার নির্ধারণ স্রাফার মূল সমস্যা। এ সমস্যার আলোচনা করতে গিয়ে উনি দেখছেন যে, অর্থনীতিতে যদি উদ্বৃত্ত উৎপাদিত হয় তা হলে লাভের হারও একটা নির্ধারণযোগ্য রাশি হিসেবে দেখা দেয়। লাভের হার ও বিনিময় হার একই নির্ধারণপ্রক্রিয়ার ফল। এই প্রক্রিয়ার পেছনে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রভাব হিসেবে কাজ করছে বণ্টন। সমাজের মোট উদ্‌বৃত্ত বণ্টিত হচ্ছে শ্রমিকের মজুরি ও মূলধনের ওপর অর্জিত লাভ হিসেবে। মূলধনের পরিমাণ স্রাফাতন্ত্রে দামের ওপর নির্ভরশীল, প্রান্তিক অর্থনীতির মতো দাম-নিরপেক্ষ নয়। নিওক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব বিষয়ে স্রাফার সমালোচনার এটা একটা বড় অংশ। নিওক্ল্যাসিকালদের কাঠামোয় বণ্টনের কোনো আলাদা ভূমিকা নেই; মূলধনের পরিমাণ স্বতন্ত্রভাবে পরিমাপযোগ্য, অতএব মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার ভিত্তিতে লাভের হার নির্ধারিত হবে। অন্যান্য উৎপাদনের উপাদানের ক্ষেত্রেও তাই। অর্থাৎ, বণ্টনতত্ত্ব দামতত্ত্বেরই একটা বিশেষ প্রয়োগ মাত্র। আর স্রাফাতন্ত্রে বণ্টন-তত্ত্ব দামের তত্ত্ব থেকে ক্ষেত্র হিসেবে আলাদা এবং তা নির্ভর করতে পারে নানারকম সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ঘাতপ্রতিঘাতের ওপর। দাম নির্ধারণে বণ্টন বহিঃনির্দিষ্ট এবং দাম নির্ধারণ বণ্টনের ওপর নির্ভর করছে। সংক্ষেপে এই হল স্রাফাতন্ত্রের মূল চিন্তা। উদ্বৃত্ত উৎপাদনে শ্রমের ভূমিকা শ্রমশক্তির মালিক শ্রমিকের সামাজিক অবস্থান, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমের অবদান ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্রাফাতন্ত্রে অনুপস্থিত। কারণ, উপ-শিরোনামের নির্দেশমতো আমরা ভাবতে পারি যে, স্রাফার সমালোচনার মূল লক্ষ্য নিওক্ল্যাসিকাল দামের তত্ত্ব। মার্কসীয় সমাজদর্শনের শরিক বলেই তিনি অর্থনীতির তত্ত্বচিন্তায় বণ্টনের ভূমিকা নির্দিষ্ট করায় আগ্রহী; এখানেই তিনি প্রান্তিকতাবাদীদের প্রতিপক্ষ।

স্রাফার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য যাই হোক, দেখা যাক স্টিড্‌ম্যান স্রাফাকে কী ভাবে পড়ছেন এবং কী ভাবেই বা সেই পড়া থেকে উনি মার্কস সমালোচনায় পৌঁছচ্ছেন। স্রাফার 'উদ্দেশ্য' প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, স্টিড্‌ম্যান উদ্দেশ্যটাকে পরিপ্রেক্ষিত থেকে সরিয়ে সঙ্কীর্ণ করে নিচ্ছেন। মার্কসের মূল্যতত্ত্বের প্রসঙ্গেও স্টিড্‌ম্যান ঠিক সেই ভুল করছেন। স্টিড্‌ম্যান লিখছেন

যে, অর্থনীতিবিদ্ নন যাঁরা তাঁদের কাছে মূল্যের শ্রমতত্ত্ব বলতে মনে হয় এই প্রতিপাদ্য :

> Under normal Capitalist conditions, the relative prices of commodities will tend to equal the relative quantities of labour-time required for the production of those commodities.[৬]

স্টিড্‌ম্যান স্পষ্ট করে বলছেন যে, এটা কখনোই শ্রমতাত্ত্বিকদের মূল প্রতিপাদ্য ছিল না। না অ্যাডাম স্মিথের, না রিকার্ডোর, না মার্কসের। ঠিক কথা। কিন্তু এই জরুরি কথাটা আবার অনুক্ত রইল যে, আপেক্ষিক দাম, অর্থাৎ বাজারভিত্তিক বিনিময় হার নির্ধারণ অন্তত মার্কসের মূল সমস্যা ছিল না। মার্কসীয় মূল্যতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল একটি নির্দিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আওতায় পণ্যোৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত পণ্যাবলির পারস্পরিক হার নির্ধারণ। অর্থাৎ, ধরা যাক, এক নির্দিষ্ট ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় দুটো পণ্য উৎপাদন করা হল। দুই পণ্যের উৎপাদনগত ফারাকের মধ্যেই এমন কিছু নিহিত আছে যাতে করে হয়তো প্রথম পণ্যের এক একক আর দ্বিতীয় পণ্যের দুই একক সমতুল্য। কী সেই নিহিত সূত্র? মূল্যের শ্রমতত্ত্বের দায় হল এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। উৎপাদন সূত্রে নির্ধারিত ঐ যে পারস্পরিক হার তাই হল পণ্যের মূল্য-হার। ঐ দুই পণ্যের বাজারভিত্তিক বিনিময় হার এর সমান হবে কিনা সেটা আপাতত বড় প্রশ্ন নয়। ধারণাগতভাবে এই দুই হার সম্পূর্ণ আলাদা। স্টিড্‌ম্যান এ কথাটা দেখছেন না। অথচ তিনি যে অবহিত নন তা নয়। মার্কসের কাছে মূল্যতত্ত্বই (দামের তত্ত্ব নয়) বা এত মূল্যবান কেন? কারণ, তাঁকে বুঝে নিতে হচ্ছে সামাজিক কাঠামোর নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিকতায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য কোথায়। সেই উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত যে মূল্য-হার তা পণ্যাবলির উৎপাদনগত বৈচিত্র্যের নির্দেশক। সেই কারণেই তা মৌলিক এবং মার্কসের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। কারণ, তাঁর ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণে এই উৎপাদন প্রণালীর ভূমিকা প্রাথমিক। উৎপাদনই মানুষের বস্তুগত জীবনের ভিত্তি এবং সচেতন উৎপাদন ক্ষমতার জোরেই প্রাণিকূলে মানুষের বৈশিষ্ট্য। এই দার্শনিক প্রতিজ্ঞার দিকে চোখ বুজে থাকলে আমরা বুঝব না কেন ডাস কাপিটাল-এর প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু পণ্যোৎপাদন। স্রাফার বইয়েরও প্রথম কল্পিত অর্থনীতি উৎপাদন ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়ে চিহ্নিত।

অর্থনীতির বাইরের মানুষদের ভুল ধারণা ভেঙে দেবার পরে স্টিড্ম্যান মূল্যতত্ত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্যটা এইভাবে বলছেন :

> If a 'labour theory of value' is not to be dismissed out of hand, it must amount,...to the proposition that 'the rate of profit and normal prices, under capitalist condition can be *explained in terms of* labour quantities'.[৭] (ইটালিক স্টিড্ম্যানের)

সত্যিই কি তাই ? আবার কী সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না সমস্যাটা ? 'লাভের হার' এবং 'স্বাভাবিক দাম' শ্রমের হিসেবে ব্যাখ্যা করাই মার্কসের মূল উদ্দেশ্য ? লাভের হার তাঁর মূল্যতত্ত্ব থেকে তিনি নিশ্চয়ই পেতে চাইছেন। কিন্তু কেন তিনি মূল্যতত্ত্ব থেকে শুরু করছেন ? শুধুমাত্র একটা লাভের তত্ত্ব নির্মাণই কি তাঁর উদ্দেশ্য ? কেন সমস্ত হিসাবপত্র মার্কস শ্রমের, অর্থাৎ মূল্যের, বিচারে করছেন ? শ্রমের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থা ও তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জড়িত। সেই কারণে মূল্যবিচার মৌলিক। সমাজ সংস্থানের কথা জানতে গেলে মূল্যের কথা ভাবতেই হবে।

উপরের উদ্ধৃতির ঠিক পরে স্টিড্ম্যান বিচার করছেন কী ভাবে মার্কসের যুক্তি ভুল পথে হারিয়ে গেল। মার্কসের হারিয়ে যাওয়া খুঁজতে গিয়ে এখান থেকে স্টিড্ম্যান কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবে হারিয়ে যাবেন। কারণ, মার্কসের সমস্যাটাকে ইতিমধ্যে তিনি এমনভাবে ছেঁটে সঙ্কীর্ণ করে নিয়েছেন যাতে স্রাফা থেকে এর একটা সরাসরি উত্তর পাওয়া যায়। স্টিড্ম্যানের মার্কস সমালোচনার মূল ত্রুটি এখানে। দেখা যাক স্টিড্ম্যান কী ভাবে তাঁর যুক্তি পরম্পর সাজাচ্ছেন।

স্টিড্ম্যান বলছেন মার্কসতন্ত্রে লাভের হার নির্ধারিত হচ্ছে $r=S/(C+V)$ এই সূত্র থেকে। এই সূত্রের মধ্যে r হল লাভের হার, S, C এবং V হল যথাক্রমে মোট উদ্বৃত্ত মূল্য, ধ্রুব মূলধন এবং মোট পরিবর্তনশীল মূলধন (সবই শ্রমের হিসাবে)। এই বক্তব্য সম্বন্ধে দুটো আপত্তি। এক, এই সূত্র থেকে মার্কস কখনোই লাভের হার নির্ধারণের কথা বলেন নি। নির্ধারিত হওয়া যদি একটা প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হয় তা হলে লাভের হার কী ভাবে নির্ধারিত হচ্ছে জানতে গেলে উদ্বৃত্তমূল্য কী ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে তা জানতেই হবে। দুই, এই সূত্র প্রকৃত অর্থে একটি সংজ্ঞা মাত্র। কিসের সংজ্ঞা ? মার্কসের নিজের রচনায় তিনি এটাকে বলেছেন 'গড় লাভের হার' (average rate of profit)

বা 'সাধারণ লাভের হার' (general rate of profit)। রূপান্তর সমস্যা (transformation problem)-র সমাধানে মার্কস এই ধারণা ব্যবহার করছেন কেন? কারণ, তাঁর কাছে সমস্যা হল প্রতিটি উৎপাদিত পণ্যের এমন একটি উৎপাদন দাম (price of production) নির্ধারণ করা যে দামে প্রত্যেক মূলধন নিয়োগকারী তার নিযুক্ত মূলধনের ওপর একই হারে লাভ উপার্জন করতে পারে। সমহারের এই লাভকে বলা হচ্ছে গড়পড়তা হার অনুসারে অর্জিত লাভ। সমাজে মোট নিযুক্ত মূলধনের ওপর উৎপাদিত মোট উদ্বৃত্ত মূল্যের ভিত্তিতে যে-লাভের হিসাব পাওয়া যাবে সেই হার সংজ্ঞানুসারে, মার্কসের সাধারণ লাভের হার। মার্কস উৎপাদন দাম এমনভাবে নির্ধারণ করতে চাইছেন যাতে করে সব বিনিয়োগকারীই তার নিযুক্ত মূলধনের ওপর এই সাধারণ লাভের হার পায়। তা হলে গড়পড়তা লাভের হারে সমতা রক্ষা হয়। আবার এই উৎপাদন দামের হিসাব দেখাতে গিয়ে মার্কস এটাও চাইছেন যে, তাঁর মূল্যের হিসাবের সঙ্গে এই হিসাব যেন সম্পর্কহীন না হয়। অর্থাৎ, এক সময়ে অনেকে যেমন ভেবেছিলেন, উৎপাদন দামের হিসাব দেখানোর সময়ে মার্কস যেন মূল্যের হিসাব বর্জন করছেন। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। মূল্যের হিসাব মার্কসতত্ত্বে মার্কস অন্তত কখনো বর্জন করেন নি। যেন তেন প্রকারেণ লাভের হার নির্ধারণ আদপেই মার্কসের উদ্দেশ্য ছিল না।

স্টিড্‌ম্যানের গোলমালটা তা হলে দাঁড়াল কোথায়? তিনি 'লাভের হার' এবং 'সাধারণ লাভের হার'-এর মার্কসীয় তফাত এবং মার্কসের 'উৎপাদন দাম' ও 'দাম' এই ধারণাগুলোর তফাত মাথায় রাখছেন না। অথচ অন্তত শেষোক্ত দুই ধারণার তফাত সম্বন্ধে স্টিড্‌ম্যান অবগত। তবে কি যুক্তি সাজাবার সময়ে তিনি এই তফাত ভুলে গেলেন? অন্তত তফাতের তাৎপর্য সম্বন্ধে তিনি এখন নীরব এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং 'লাভের হার' ও 'দাম' এই দুই ধারণা নিয়ে কথা বলতে শুরু করে তিনি আস্তে আস্তে আরো দূরে হারিয়ে যাচ্ছেন। এই দুই ধারণা মাথায় নিয়ে তিনি স্রাফাতন্ত্রের দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন। স্রাফাতন্ত্রে এ দুটোই নির্ধারণ করা হয়েছে এতে সন্দেহ নেই। 'লাভের হার' ও 'দাম'-এর সহনির্ধারণ প্রয়োজন স্রাফাতন্ত্রে এ কথাও স্পষ্ট। কারণ, উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী সমাজের বর্ণনায় প্রাপ্য সমীকরণের সংখ্যা এবং নির্ণেয় অজ্ঞাতরাশির সংখ্যা তা না হলে সমান হবে না। মার্কসের 'লাভের হার' ও 'দাম' নির্ধারণের প্রক্রিয়া তাঁর যুক্তি অনুসারে অসঙ্গতিপূর্ণ এটা

বলবার পরে স্টিড্ম্যান মার্কসের সমস্যা সমাধানে স্রাফাতন্ত্র থেকে শিক্ষা নিতে চাইছেন। তাঁর মতে মার্কসের বড় ভুল হল আগে 'লাভের হার' ও পরে 'দাম' নির্ধারণ করা। এই প্রসঙ্গে 'দাম' বলতে স্টিড্ম্যান অবশ্য উৎপাদনের দামই বুঝিয়েছেন।

এর পর তিনি খোলাখুলি বলছেন যে, সমস্যা যখন 'লাভের হার' ও 'দাম' নির্ধারণ করা তখন স্রাফার যত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেওয়া আছে এখান থেকেই শুরু করা যাক। 'স্রাফার পরে মার্কস' গ্রন্থে স্টিড্ম্যান দখিয়েছেন যে, এই জায়গা থেকে শুরু করে 'লাভের হার' ও 'দাম' তো নির্ধারণ করা যায় বটেই, উপরন্তু আরো অনেকগুলো প্রয়োজনীয় ফলাফল পাওয়া যায়। এসব ফলাফল পেতে গেলে স্টিড্ম্যান জোর দিয়ে বলেছেন যে পণ্যের (স্টিড্-ম্যানের কাছে আসলে দ্রব্যের) অন্তর্গত প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ জানবার কোনো দরকার হচ্ছে না। অতএব মূল্যের শ্রমতত্ত্ব অপ্রয়োজনীয়।

এখন আমরা বুঝতে পারছি স্টিড্ম্যানের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু কোথায়। 'লাভের হার' ও 'দাম' নির্ধারণ করতে যদি হয় তা হলে স্রাফাতন্ত্রের ব্যবস্থা-মতো সেটা করলেই তো হয়। অন্য পন্থার প্রয়োজন কোথায়? এই প্রয়োজন স্টিড্ম্যান কেন যে কিছুতে দেখতে চাইছেন না সেটা বুঝতে পারা যায় যদি মনে রাখি যে, স্টিড্ম্যানের আলোচনায় মার্কসের সামগ্রিক বিশ্ববীক্ষা অনুপস্থিত। উপরন্তু এসব কথা তুললেই তিনি চটে ওঠেন। ' "স্রাফার পরে মার্কস" গ্রন্থের রচনাশৈলী তো রীতিমতো মল্লযুদ্ধের কথা মনে করায়।'[৭] কিন্তু ব্যাপারটা তো ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখবার। একটা তাত্ত্বিক কাঠামোর ধারণাগুলিকে অন্য কাঠামোর ধাঁচে ফেলে বিচার করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে সামগ্রিক প্রেক্ষাপট হারিয়ে যায়। ইংরেজিতে যাকে বলে problematic, বাংলায় যদি তাকে বলি সমস্যাপট, তা হলে সেই বিচার না করে দুই তত্ত্ব কাঠামোর পাশাপাশি ব্যবহার বিপজ্জনক। স্টিড্ম্যান এই সমস্যাপটের কথা মাথায় না রেখে মার্কস এবং স্রাফা দুজনের প্রতিই অবিচার করেছেন।

মার্কসের সমস্যাপটের মূল কথা ছিল সমাজবিবর্তনের স্বরূপ নির্ণয়। নির্দিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত উৎপাদন ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতির মধ্যে থেকে কী ভাবে পরিবর্তনের সূত্রপাত হয় এটা আলোচনা করাই ছিল মার্কসের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যেই ডাস কাপিটাল-এ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এই বইয়ে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত সেই নির্দিষ্ট

সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইতিহাসের বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে উদ্ভূত। তা কখনোই স্থান ও কাল নিরপেক্ষ সর্বজনীন কোনো ব্যবস্থা নয়। মার্কসতন্ত্রে মূল্যতত্ত্ব, লাভ, রূপান্তর সমস্যা ইত্যাদিকে এই সমস্যাপটে বিচার করতে হবে। স্টিড্‌ম্যান অভিযোগ তুলছেন যে, মার্কস 'লাভের হার' ও 'দাম' একই সঙ্গে নির্ধারণ করেন নি, আগে লাভের হার ও তার ভিত্তিতে দাম নির্ধারণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে মার্কসের ব্যবহৃত ধারণা 'লাভের হার' নয়, 'সাধারণ লাভের হার'। এবং মার্কস কেন এটাকে প্রথমে নির্ধারণ করছেন? কারণ, এই 'সাধারণ লাভের হার' নির্ধারিত হচ্ছে সমাজে উৎপাদিত মোট উদ্‌বৃত্ত মূল্য এবং মোট নিযুক্ত মূলধনের ভিত্তিতে। কোনো, নির্দিষ্ট মূলধনের ভিত্তিতে মোট উদ্‌বৃত্ত মূল্য কত হবে সেটা নির্ভর করছে উৎপাদনের জৈব গঠন (organic composition of capital) এবং উদ্‌বৃত্ত মূল্যের হার (rate of surplus value)-এর ওপর। উদ্‌বৃত্ত মূল্যের হার নির্ভর করছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ওপর। উদ্‌বৃত্ত মূল্য জানতে গেলে প্রয়োজনীয় শ্রমের ও মোট শ্রমের হিসাব নিতে হয়। এ সবের পরিচয় জানা মানেই কিন্তু সামাজিক-সাংস্কৃতিক চরিত্র ও শ্রম আইন ইত্যাদির পরিচয় জানা। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চেহারা ধরা পড়ছে উদ্‌বৃত্ত মূল্যের হারের হিসাবে। এই উদ্‌বৃত্ত মূল্যের হারের মাধ্যমে নির্ধারিত হচ্ছে 'সাধারণ লাভের হার'। তাই প্রশ্ন হল: কোন উৎপাদনের দামে সমাজের সব উৎপাদন বিভাগ তাদের নিযুক্ত মূলধনের ভিত্তিতে সমহারে (অর্থাৎ, এই সাধারণ লাভের হারে) লাভ অর্জন করতে পারবে? মার্কসের উৎপাদনের দাম ঠিক এই প্রশ্নের উত্তর। এখানে মার্কসের সমাধানে যে টেক্‌নিক্যাল গোলমাল ছিল সেকথা আলাদা। কিন্তু স্রাফার ভিত্তিতে স্টিড্‌ম্যান যে সমালোচনা করছেন তার যৌক্তিকতা কোথায়? কেন মার্কসতন্ত্রে লাভের হার (সাধারণ লাভের হার বলছেন না স্টিড্‌ম্যান, এটা লক্ষনীয়) ও দাম-এর সহনির্ধারণ প্রয়োজন?

স্রাফাতন্ত্রে এই সহনির্ধারণের কথা বলা হয়েছে কেন? আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্রাফার সমালোচনার লক্ষ্য ছিল প্রান্তিকতাবাদী নিওক্ল্যাসিকাল তত্ত্বকাঠামো। এই তত্ত্বকাঠামোয় এক অর্থে বণ্টনতত্ত্ব প্রায় বর্জিত। কারণ, সেখানে দামের তত্ত্ব ও বণ্টনতত্ত্বের মধ্যে কোনো মৌলিক ফারাক নেই। বণ্টনতত্ত্ব সেখানে দামের তত্ত্বেরই একটা বিশেষ প্রয়োগ মাত্র। স্রাফার ক্ল্যাসিকাল ধাঁচের চিন্তার কাছে এই অবস্থা অগ্রাহ্য, কারণ, তাঁর সমস্যাপটের অন্যতম মূল কথা হল বণ্টনের সঙ্গে মূল্যের সম্পর্ক বিচার করা। বিশেষ করে

স্রাফাতন্ত্রে বণ্টন যে বহিরাগত এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করা দরকার। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অর্থ নৈতিক চল দামের ওপরে কীভাবে পড়ছে এটা স্রাফার বড় বিচার্য বিষয়। সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকতে পারে কিনা তা অংশত নির্ভর করছে এই দাম বা দ্রব্যাদির মধ্যেকার বিনিময় হারের ওপর। আর দ্রব্যাদির দাম নির্ভর করছে সমাজের উদ্‌বৃত্ত কীভাবে লাভ ও মজুরির মধ্যে বণ্টিত হচ্ছে তার ওপর। এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, স্রাফার অন্যতম লক্ষ্য হল মূলধনের প্রান্তিকতাবাদী ধারণার বিচার করা। একদ্রব্য বিশিষ্ট সমাজে ছাড়া 'মূলধনের পরিমাণ' এই ধারণা দামনিরপেক্ষ হতে পারে না। আর লাভ যেহেতু মূলধনের আয়, তাই লাভের সঙ্গে মূলধনের পরিমাণের সম্পর্ক রয়েছে। অথচ সেই মূলধনের পরিমাণ দাম নিরপেক্ষ নয়। অতএব? দাম ও লাভের হার সহনির্ধারিত হওয়া দরকার। মার্কস ও স্রাফার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে এগোলে দেখতে পাওয়া সম্ভব কেন মার্কস সাধারণ লাভের হারের ভিত্তিতে উৎপাদনের দাম নির্ধারণ করছেন, আর কেনই বা স্রাফা লাভের হার ও দ্রব্যাদির দাম একই সঙ্গে নির্ধারণ করছেন। স্রাফাকে তাই মার্কসের প্রতিপক্ষ না ভেবে পরিপূরক ভাবাই সঙ্গত।

সূত্র

১. Murray Milgate—Capital and Employment [Academic Press, 1982]

২. The value controversy, পৃ. ১২

৩. দ্র. Ian Steedman—Marx After Sraffa [Verso, 1981 সংস্করণ], পৃ. ১৩, পাদটীকা ১

৪. দ্র. Paolo Spriano—Antonio Gramsci and the Party Lawrence and Wishart, 1979] এই বইয়ের সংযোজন অংশে স্রাফা সংক্রান্ত পাঁচখানি চিঠি সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম চিঠির তারিখ ২৬ ডিসেম্বর ১৯২৮, আর শেষ চিঠির তারিখ ২০ মে, ১৯৩৭। শেষ চিঠিতে গ্রামশির লেখাপত্র ছাপানোর ব্যাপারে তোলিয়াত্তি স্রাফাকে লিখছেন: "I have let our friends know that I think we should refrain from publishing unpublished things of his until we have precise

knowledge of his last wishes, which you *alone* can pass on to us." (ইটালিক্ আমার। সৌ. ভ.)

৫. The Value Controversy, পৃ. ১২

৬. ঐ, পৃ. ১৩

৭. ঐ, পৃ. ১৩-১৪

৮. Ian Steedman—Marx After Sraffa বি. দ্র. পরিচ্ছেদ ২-৫

৯. ঐ, বি. দ্র. পৃ. ১৫, ২১-২২, ২৫

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় চিন্তা

একশত বছর আগে এবং পরে

রণবীর সমাদ্দার

বিপ্লবী মার্কসবাদের মর্মবস্তু যে-কটি মূল বিষয়ে এখনো অনেকাংশে অবোধ্য থেকে গেছে, রাষ্ট্র সম্পর্কিত মার্কসীয় বক্তব্য তার অন্যতম। বোঝা, দার্শনিক অর্থে নয়, প্রয়োগের অর্থে; অর্থাৎ, রাষ্ট্রীয় বাস্তবতাকে পরিবর্তিত করা ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অর্থে, রাষ্ট্রকে এখনো বোঝা বাকি থেকে গেছে। মানুষের মুক্তির অর্থ সামাজিক মুক্তি, তার সংগ্রাম সামাজিক সংগ্রাম—মার্কস এই সার্বিকতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রাজনীতিকে বিচার করেছেন। ফলে, রাজনৈতিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় সত্তার প্রতি মার্কসের সমালোচনা প্রবাহিত হয়েছে সামগ্রিকতার উৎসমুখ থেকে। যা আংশিক, খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন এবং সাময়িক, তা কখনো আচ্ছন্ন করে ফেলেনি সামগ্রিকতাকে। ধর্মের প্রভাব থেকে রাজনীতির মুক্তি ঘটেছে, কিন্তু রাজনৈতিক জগৎ, বিশেষত রাষ্ট্রকে ঘিরে থেকেছে ধর্মীয় রহস্য। রাষ্ট্র সর্বদাই সম্পূর্ণ জানা, বোঝা বা উপলব্ধির বাইরে থেকে গেছে। বুদ্ধিগত স্তরে তা সম্ভব নয় বলেই রাষ্ট্র ও বিপ্লবের তাৎপর্য এত অধিক। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শুধু একটি রাষ্ট্রীয় বিপ্লব সাধন করে নয়, সামাজিক বিপ্লব সাধন করেই রাষ্ট্রকে অতিক্রম করা যায়।

যে সামাজিক গঠন রাষ্ট্রের জন্ম দেয় এবং রাষ্ট্রের আধিপত্যকে সহ্য করে, সেই সামাজিক সংগঠনে শ্রমবিভাগ, মানুষের ব্যক্তি জীবন ও নাগরিক জীবনের মাঝে বিভাগ এবং সামগ্রিক মানবিক চৈতন্য ও রাজনৈতিক চেতনার মাঝে

বিভাগই এই রাষ্ট্রীয় আধিপত্যর মূলে দায়ী। কাজেই রাষ্ট্রে মানুষের পূর্ণমুক্তি নয়, রাষ্ট্রীয় স্বার্থে মানবীয় স্বার্থের বিসর্জন—এই ছিল হেগেলীয় রাষ্ট্র দর্শনের বিরুদ্ধে মার্কসের প্রধান সমালোচনা। পঁচিশ বছর বয়সে লেখা এই মূল সুর অব্যাহত ছিল মার্কসের শেষ রাজনৈতিক রচনাতেও। তরুণ মার্কস ও পরবর্তীকালের মার্কসের মাঝে মানুষের মুক্তিকামী চিন্তাধারার এই যোগসূত্রটি যে ছিল অত্যন্ত জীবন্ত, তা তাঁর 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' পড়লে বোঝা যায়।

হেগেলীয় অধিকারতত্ত্বকে সমালোচনা করে মার্কস্ ১৮৪৩-এ লিখেছিলেন ঃ 'এই সমালোচনা পরিষ্কারভাবে এবং সিদ্ধান্তমূলকভাবে জার্মান রাজনৈতিক ও আইনগত চেতনার সমগ্র পূর্বতন পদ্ধতিকে খণ্ডন করছে, যার প্রধান ও সর্বাপেক্ষা ব্যাপক রূপ একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হয়ে ভাবমূলক আইন-শাস্ত্রেরই আকার নিয়েছিল। এই ভাবমূলক আইনশাস্ত্র বা speculative jurisprudence, যা হল আধুনিক রাষ্ট্রের বিমূর্ত এবং বেগবান চিন্তাপ্রক্রিয়া, তা শুধু জার্মানিতেই সম্ভব। অন্য দিকে আধুনিক রাষ্ট্রের জার্মান ধারণা যা জীবন্ত, বাস্তব মানুষের বিমূর্তায়ন করে, তা সম্ভব হয়েছিল শুধু সেই কারণে বা সেই মাত্রায়, যতদূর আধুনিক রাষ্ট্র নিজেই বাস্তব মানুষগুলিকে বিমূর্ত করে তোলে অথবা মানুষের সামগ্রিকতাকে সন্তুষ্ট করে কাল্পনিক ভাবে'।

ধর্ম ঠিক যেভাবে মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করে কাল্পনিকভাবে, রাষ্ট্রও মানুষের সামাজিকতাকে বা তার সামগ্রিক সত্তাকে পূর্ণ করে কাল্পনিকভাবে, আরও নিখুঁতভাবে বলা যায় কাল্পনিক স্তরে, তা সে যত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই হোক না কেন। গণতন্ত্র যত নিখুঁত হয়ে উঠছে, তত মানুষের রাজনৈতিক সত্তা অন্যান্য সকল দিককে ছায়ায় ঢেকে ফেলেছে; তার ব্যক্তিজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের বিচ্ছেদ রীতিসম্মত বা সমাজসম্মত হয়ে উঠছে। নির্বাচন, প্রজাতন্ত্র, বহুদলীয় গণতন্ত্র—এর কোনোটিই সমাজের অস্তিত্বশীল স্তর বা বিভাগগুলিকে লুপ্ত করে না, বরং সেগুলিকে স্থায়ী করে, সেগুলির অস্তিত্বের স্বাক্ষর। সর্বহারা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের যন্ত্রটিকে শ্রমিকরা ধ্বংস করে, এবং তার নিজের রাষ্ট্রও সাময়িক মাত্র; ততক্ষণই, যতক্ষণ পর্যন্ত না নতুন সামাজিক শক্তিগুলি সমাজ সংগঠন ও পরিচালনার রাষ্ট্রীয় কর্তব্যগুলি নিজেদের কাঁধে তুলে নিচ্ছে। অবশ্যই এই সময়টি দ্বন্দ্বসংকুল। রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় শব্দগুলির মাঝে দ্বন্দ্ব দিয়ে এই সময়কাল চিহ্নিত। সর্বহারা বিপ্লবকে মার্কস তাই দেখেছিলেন ত্রিলক্ষ্য বিশিষ্ট ঃ গণতন্ত্রের বিকাশ, সর্বহারা একনায়কত্ব এবং রাষ্ট্রের অবলুপ্তি।

দুই

রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি সামাজিক স্বার্থ থেকে পৃথক হয়, যদি আংশিক স্বার্থ বা খণ্ডিত স্বার্থ প্রাধান্য ভোগ করে সঠিক স্বার্থের ওপর, তবে সেই স্বার্থের রূপ কী? এই আংশিকতার রূপ হল আমলাতন্ত্র। যুক্তি অর্থাৎ রূপগঠনের দিক থেকে, রাজনীতি অর্থাৎ অধিকারের দিক থেকে এবং অর্থনীতি অর্থাৎ সম্পত্তির দিক থেকে রাষ্ট্র ও তার আমলাতন্ত্রকে মার্কস সমালোচনা করেছিলেন।

কোনো একটি বস্তু বা সত্তার গঠনের প্রতি মার্কস বরাবরই অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, গঠন বা কাঠামোর বিশ্লেষণ না করে তার সত্তাকে, ধরা সম্ভব নয় বা দ্বন্দ্বগুলির পারস্পরিক অবস্থান ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে মার্কসের সমালোচনা ছিল প্রথমত এই কাঠামোগত বা রূপগত বিশ্লেষণের স্তরে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমালোচনায় আমলাতন্ত্রের স্বরূপোদ্‌ঘাটন অত গুরুত্ব পেয়েছিল, কারণ আমলাতন্ত্রকে মার্কস গণ্য করতেন রাষ্ট্রের আত্মারূপে। কিন্তু তা এমনই এক আত্মা, যা রাষ্ট্রের সামাজিকতাকেও নিঃশেষ করে এবং তার বহিরাবরণ, বা কাঠামো বা রূপ, যা হল আমলাতন্ত্র নিজেই, তাকে সর্বময় করে তোলে। তা এমনই এক রূপ বা আবরণ, যা অন্তরকে জীবনশূন্য করে তোলে, এবং কাঠামো বা আবরণকে করে তোলে স্বয়ম্ভু এক লক্ষ্যরূপে—an end in itself। যে সামাজিক শ্রমবিভাগ থেকে শাসক-শাসিতের পার্থক্যের জন্ম এবং বিকাশ, সাধারণ স্বার্থ ও অংশগত বা বিশেষ স্বার্থের তারতম্য, সেই তারতম্যকে আকৃতি দেয় আমলাতন্ত্র। কোনো যাদুবলে নয়, প্রত্যেকটি অংশ, যাকে মার্কস বলেছেন estate corporation, তার সামাজিকতার দিকটিকে, অর্থাৎ সম্পর্কের দিকটি বা সামগ্রিকতার দিকটিকে আত্মসাৎ করে। আমলাতন্ত্রের ভঙ্গিই হল এইরকম যে, তা প্রত্যেকটি আংশিক দাবির সম্মুখীন হয় তার সার্বিকতা বা সামাজিক সম্পর্কের উত্তরাধিকারী রূপে। ফলে, প্রতিটি আংশিক স্বার্থই রাষ্ট্রের বিরোধিতা করলেও, এবং বিশেষত আমলাতন্ত্রের বিরোধী হলেও আমলাতন্ত্রকেই ব্যবহার করে অন্য আংশিক স্বার্থের বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে। এবং আমলাতন্ত্র লাভবান হয় রাষ্ট্রের এই অবশ্যম্ভাবিতা এবং আংশিক স্বার্থগুলির ওপর তার সামগ্রিক আধিপত্য বা overwhelming ভূমিকা থেকে। যে অস্পষ্টতা, ও প্রতিযোগিতাকে সে সৃষ্টি করে বা বাড়িয়ে তোলে, তা শক্তিশালী করে তোলে আমলাতন্ত্রের পিতৃসুলভ ভূমিকাকে। রাষ্ট্রের কর্ণধার ও কর্মচারীবৃন্দ সমাজের সার্বিকতাকে দাবি করার

আড়ালে তুলে ধরে নিজের আংশিক স্বার্থকে, যাকে মার্কস আখ্যায়িত করেছেন, 'বিশেষ স্বার্থের কল্পিত সার্বিক রূপ' বলে। এইভাবে রাষ্ট্র যেমন বিশেষ শ্রেণীর অস্ত্ররূপে কাজ করে, তেমনই রাষ্ট্র নিজেই হয়ে ওঠে বিভিন্ন স্বার্থের দ্বন্দ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র। এবং যে জীবন জন্ম নেয় এই দ্বন্দ্ব থেকে, তা কখনোই নিষ্ক্রিয়, বা নিছক অস্ত্ররূপী ভূমিকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না, তা হয়ে ওঠে সর্বগ্রাসী।

লক্ষণীয় বিষয় হল, নিষ্ক্রিয়তা থেকে সক্রিয়তায়, আংশিক সত্তা থেকে সার্বিক রূপে, কর্ম থেকে কর্তায় এই যে পরিবর্তন বা উত্তরণ—এই যে transmutation, তা আসে কিন্তু আবরণ, কাঠামো, আকৃতি বা রূপ ধরেই। আমলাতন্ত্র তাই হল এমন এক সমাজের রূপ, যে সমাজের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে রাষ্ট্র। ফলে আমলাতন্ত্র নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত করে, বা নিজস্ব রূপকে সামাজিক সত্তার ওপর চাপিয়েই ক্ষান্ত হয় না। আনুষ্ঠানিকতাকেই সে করে তোলে আদর্শ, নিজের বেঁচে থাকার যুক্তি। আনুষ্ঠানিকতা বা ফর্ম্যালিজম রূপে আমলাতান্ত্রিকতা উপস্থাপিত করে রাষ্ট্রীয় সত্যকে। 'প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা' হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রের ইচ্ছা। নগ্ন সামাজিক বাস্তবতার গায়ে পোশাক চাপিয়ে হাজির হয় এই অনুষ্ঠানসর্বস্বতা, নিজেকে জাহির করে 'উন্নততর চেতনা' রূপে। কিন্তু শুধু রূপের স্তরে আবদ্ধ থাকলে, এই রূপোন্নতি বাস্তব হয়ে উঠত না। বরং নিজেকে প্রকৃত ক্ষমতা রূপে সংগঠিত করেই আমলাতন্ত্র নিজেকে এক সত্তা প্রদান করে। এবং অন্যান্য সামাজিক বাস্তবতার মতোই হয়ে ওঠে নিজে এক সামাজিক বাস্তবতা, যার মধ্যে বাস্তব, কল্পনা, মোহ সব মিলে মিশে এই ধারণাকে অনিবার্য করে তোলে যে রাষ্ট্র, হল সঠিক, সঙ্গত এবং অবশ্যম্ভাবী। মার্কস তাই আমলাদের অভিহিত করেছিলেন রাজনীতির পাদ্রি। রাষ্ট্র হল সংগঠিত পুরোহিততন্ত্র। শ্রেণীশাসন যাতে শ্রেণীশাসনরূপে আবির্ভূত না হয়, আমলাতন্ত্র তার দেখাশোনা করে। সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে সামলায় আনুষ্ঠানিকতা বা formalism দিয়ে।

গণতন্ত্র কি আমলাতন্ত্রকে বশীভূত করে বা দমন করে? বহু রাষ্ট্রদার্শনিকের তখনও ধারণা ছিল, আজও তাই, যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো আমলাতন্ত্রকে খর্ব করে। বহুদলীয় অস্তিত্ব, ভোট, রাজনৈতিক প্রাধান্য, সংসদীয় সার্বভৌমত্ব, গণতদারকি—এই সব মিলিয়ে আমলাতন্ত্রকে বশীভূত করে রাখা সম্ভব। এক্ষেত্রেও মার্কস বিচার করেছিলেন, রাজনৈতিক গণতন্ত্র কী ভাবে অধিকারবোধের সঙ্গে যুক্ত এবং অধিকারবোধ, তা সে যত উন্নত স্তরেরই হোক না কেন, মানুষের সামাজিক সত্তাকে ফুটিয়ে তোলার পরিবর্তে চরম করে

তোলে ব্যক্তি সত্তাকে, এবং এক ব্যক্তিত্বকে ব্যক্তির আদর্শ করে তোলে, যাকে অর্জন করার জন্য মানুষকে আত্মসমর্পণ করতে হয় মানবেতর একটি অস্তিত্বের প্রাধান্যের কাছে। অধিকারবোধ রাজনৈতিক জীবনকে চরম এবং উগ্র করে তোলে, তা দমন করে প্রকৃত মানুষগুলির জীবনকে। 'পভার্টি অফ্ ফিলজফি'তে মার্কস লিখেছেন,

> তার বিকাশের ধারায় শ্রমিকশ্রেণী পৌর সমাজকে স্থানান্তরিত করবে এমন এক সমিতি দিয়ে যা শ্রেণীসমূহ ও তাদের বৈষম্যকে বিলোপ করবে। যথার্থ অর্থে, কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা তখন আর থাকবে না, কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা হল পৌর সমাজের (civil society) অভ্যন্তর বিরোধের সরকারি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র।

কাজেই, পলিটিক্যাল পাওয়ারের পূজা নয়, তার কীর্তিগাথা নয়, শ্রমিক-শ্রেণী সামাজিক বিপ্লব সাধন করে সামাজিক সার্বিকতাকে ফিরিয়ে আনবে পূর্ণ মহত্বে, অবশ্যই অনেক বিকশিতভাবে। যে-রাজনৈতিক জীবন সামাজিক শ্রেণীবৈষম্যসমূহের ঘনীভূত রূপ, এবং যে-রাজনৈতিক জীবন রাজনৈতিক ক্ষমতাকে চরম করে তোলে, মার্কসের সমালোচনা সেই রাজনৈতিক জীবনেরই বিরুদ্ধে ধাবিত হয়েছিল। মার্কস লিখছেন, 'উচ্চে উন্নীত সচেতনতার মুহূর্ত-গুলিতে রাজনৈতিক জীবন চায় তার অস্তিত্বের মৌল সর্তগুলিকেই দমন করতে, দমন করতে পৌর সমাজ ও তার উপাদানগুলিকে এবং চায় নিজেকেই ব্যক্তির আসল এবং সম্পূর্ণ (uncontradictory) বাস্তব বা আদি জীবন রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু তা তার পক্ষে সম্ভব নিজের বেঁচে থাকার সর্তকে বিষমভাবে লঙঘন করে, এই কথা ঘোষণা করে যে বিপ্লব হল চিরন্তন।'

রাজনৈতিক জীবনের উগ্রতা মানুষের সামাজিক বোধকে ধ্বংস করতে পারে, অধিকারবোধকে প্রখর করে তুলে সার্বিকতাকে বিনষ্ট করতে পারে, রাজনৈতিক দাবি সামাজিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারে, পুনর্প্রতিষ্ঠিত করতে পারে বর্তমানকে, যার বিরুদ্ধে রাজনীতি পরিচালিত। রাজনৈতিক গণতন্ত্র হল প্রকৃত ধার্মিক, মার্কসের ভাষায় 'ক্রিশ্চিয়ান', কারণ তা প্রতিটি ব্যক্তিকে গণ্য করে চরম ও সার্বভৌম জীব রূপে—আসলে তার অর্থ ব্যক্তি প্রশ্রয় পায়, তার অসামাজিক, অকৃষ্টিগত, তার ভাগ্যগত বা আকস্মিকরূপে। মানুষ যেখানে অমানবীয় অবস্থায় ধ্বংস হচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে, বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, রাজনৈতিক গণতন্ত্র সেই atomized মানুষের দাবিকে চরম বলে ঘোষণা

করে। ফলে, সেই atomized সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করে রাজনৈতিক রাষ্ট্র, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি। আমলাতন্ত্র এই প্রতিষ্ঠানগুলিরই বাহু। কাজেই, শ্রেণীয় স্বৈরতন্ত্র থেকে রাজনৈতিক গণতন্ত্রে উত্তরণ হলেও, রাষ্ট্রীয় কর্মচারীবৃন্দের ত্রাস তাতে কমে যায় না। আমলাতন্ত্র হয়ে ওঠে সভ্য, মার্জিত এবং 'জনমুখী'। কিন্তু, যত সভ্য, মার্জিত বা জনমুখীই হোক না কেন, আমলাতন্ত্র তার কাজকর্মকে সর্বদা গোপনীয় রাখে, কারণ রাষ্ট্রের যে প্রশাসনিক একাধিপত্য বা exclusiveness, তাকে আমলাতন্ত্রের গোপনীয়তা ছাড়া বজায় রাখার কোনো উপায় নেই। এই জন্যই যে কোনো গণপ্রতিবাদই প্রথমে উত্তাল হয়ে ওঠে আমলাদের গোপনীয়তার বিরুদ্ধে, যা কুকর্ম প্রকাশিত হয়, সর্বদাই দেখা যায়, তা হল জলে ঢাকা ডুবোপাহাড়ের ওপরের অংশটুকু মাত্র। এই যে গোপনীয়তা, তা যে শুধু ইচ্ছাকৃত তাই নয়, আমলাতন্ত্র তার নিজের বদ্ধ-জগৎকে মনে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সমালোচনা তাই অসহ্য। নিজের সৃষ্ট অলীক জগৎই তার কাছে সত্য। জ্ঞান এইভাবে রূপান্তরিত হয় গোপনীয়তায়। স্বার্থ অনুসরণের তাগিদে উচ্চ গোপন করে রাখে নীচকে, নীচ উচ্চকে এবং উভয় মিলে গোপন করে জনগণকে। কর্তৃত্বপূজা, যা আমলা মানসিকতার অন্তর্নিহিত কথা, জ্ঞান ও কর্মের প্রকাশ্যতার বিরোধী। এইভাবে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অপর দিকটি হয়ে দাঁড়ায় গোপনীয়তা, পৃষ্ঠপোষকতা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিভিত্তিক অধিকারের জন্য পারস্পরিক সংগ্রাম।

এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে মার্কসের এই সমালোচনা ছিল দর্শন এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমালোচনার অঙ্গ। নচেৎ, মার্কসের এই সমালোচনাকে মনে হবে নিছক এক নৈরাজ্যবাদী সমালোচনা এবং যে-কোনো সামাজিক শক্তির প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে এক নৈরাজ্যবাদী মতবাদ। এটা ঠিক যে, হেগেলের অনুসরণে মার্কস এ কথা গণ্য করেন নি যে, প্রতিটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যে সেই নির্দিষ্ট সমাজের এক যথার্থতা বা rationality প্রকাশিত হয়। এবং আমলাতন্ত্র বা অন্যান্য রাষ্ট্রীয় বাহুগুলিতে সমর্থন করার কোনো কারণও খুঁজতে যান নি। কিন্তু, রাষ্ট্রের ও প্রতিটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পেছনে যে এক সামাজিক কারণ রয়েছে, সেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রকৃত সামাজিক সংগ্রামসমূহ, সামাজিক প্রয়োজনসমূহ, এবং প্রকৃত সামাজিক বাস্তবতাগুলি প্রকাশিত হয়, যদিও পরিবর্তিত রূপে, বিকৃত ভাবে, রাষ্ট্রের মাধ্যমে। এমন কোনো রাষ্ট্র নেই, যা আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম-মুক্ত। যার মধ্যে নেই তার নিজস্ব ধ্বংসের বীজ। ফলে রাষ্ট্রকে দেখতে হবে

নৈরাজ্যবাদী ভঙ্গিতে নয়, বরং সামাজিক প্রয়োজন, সংগ্রাম ও বাস্তবতাগুলির সমষ্টিরূপে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমালোচনার সূচনার সূত্রপাত এই স্বীকৃতি থেকে যে, রাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে বাস্তবতা, যদিও ছদ্মবেশে, লুক্কায়িতভাবে, এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উদ্‌ঘাটন করে এই বাস্তবতাকে। 'ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম'. 'লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার', 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' বা এঙ্গেলসের লেখা 'ইতিহাসে শক্তির ভূমিকা' এইরকম বিশ্লেষণের নিদর্শন। সামাজিক বাস্তবতা নিহিত আছে রাষ্ট্রের মধ্যে, তাকে প্রকাশ্যে এনেছেন মার্কস সম্পত্তি ব্যবস্থা এবং উৎপাদন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে। শ্রেণীগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গতিবিধিকে উদ্‌ঘাটন করে।

তিন

'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্র'তে এঙ্গেলস যে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাকে উপস্থিত করেছেন, তাতে দুটো স্বর আছে। এক, রাষ্ট্র শ্রেণীশাসনের যন্ত্র এবং, দুই, রাষ্ট্র শ্রেণী বিরোধের এক প্রতিফলন ও নিজস্ব সত্তাবিশিষ্ট এক প্রতিষ্ঠান। এই দুটো কথা কি এক? এই দুটি দিকের মাঝে সম্পর্ক থাকলেও তা অবশ্যই এক নয়। রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বান্দ্বিকদৃষ্টির অপূর্ব নিদর্শন। নীতির সূত্রে রাষ্ট্রকে বিচার করা ও প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, সামাজিক শক্তিগুলির দ্বন্দ্ব, ঘাতপ্রতিঘাত ও টানাপোড়েনের মাঝে রাষ্ট্রকে দেখা—এই দুটোই পাওয়া যাবে মার্কসের লেখায়। রাষ্ট্র নির্জীব, নিছক যন্ত্র মাত্র না সজীব, স্বীয় শক্তিসম্পন্ন? একমাত্র দ্বান্দ্বিকতা দিয়ে এই প্রশ্নের বিচার সম্ভব! যদি শ্রেণীশাসনের তাগিদ আধুনিক রাষ্ট্রকে জন্ম দিয়ে থাকে, সামাজিক শ্রেণীগুলির দুর্বলতাও কোনো এক নির্দিষ্ট সময় একটি ভারসাম্যরক্ষাকারী রাষ্ট্রীয় শক্তির জন্ম দিতে পারে। 'জার্মান আইডিওলজি'তে মার্কস এই রকমই এক মন্তব্য করেছিলেন যে, ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝে উপরোক্ত দুর্বলতা রাষ্ট্রকে জন্ম দিল। ফ্রান্সে কারণ ছিল, ক্ষুদ্র কৃষকশ্রেণীর দুর্বলতা।

কৃষকদের সামাজিক অবস্থানের দুর্বলতা যে রাষ্ট্রশক্তিকে শক্তিশালী করেছে, মার্কস তা বিভিন্ন স্থানে বারংবার উল্লেখ করেছেন। এশীয় উৎপাদন প্রথায়, যেখানে কৃষক ও হস্তশিল্পীরা গ্রামের সংঘজীবনে সন্তুষ্ট থেকেছে, কী ভাবে স্বৈরতন্ত্র সেখানে স্বাভাবিক রাজব্যবস্থারূপে দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করেছিল, তা মার্কসের ভারতসংক্রান্ত প্রবন্ধগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে। এবং এশীয় উৎপাদন-প্রথা সংক্রান্ত যাই বিতর্ক থাকুক না কেন, কৃষকের সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষা-

পটে মার্কস যেভাবে শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রের অভ্যুত্থান দেখেছেন, তা চমকপ্রদ। অসাধারণ সেই সব মন্তব্যগুলি, যেখানে সামন্ততন্ত্রের ভাঙন ও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুদয় যুক্ত হয়েছে এক দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণে। বুর্জোয়ারা যেমন এই রাষ্ট্রশক্তিকে পরবর্তীকালে এক সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর দক্ষতার পর্যায়ে নিয়ে গেছে, তেমন এই রাষ্ট্রশক্তির আদিকেন্দ্রিকতা বুর্জোয়াদের অভ্যুত্থানকে সাহায্য করেছে। প্রকৃত কথা, রাজনীতি শুধু অর্থনীতির ফসল নয়, সমাজে এক সক্রিয় শক্তিও, যা অর্থনীতির ভবিষ্যৎকে প্রভাবান্বিত করে। রাষ্ট্র ও উৎপাদন ব্যবস্থার এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের দিকে মার্কস যে লক্ষ্যপাত করেছিলেন, তা নিয়ে চর্চার অনেক সুযোগ আছে। আধুনিক অর্থে শ্রেণী গড়ে ওঠার আগে, অর্থাৎ শুধু সামাজিক অবস্থান দিয়ে নয়, চেতনা দিয়ে শ্রেণীরূপ গ্রহণ করার আগে, যখন সমাজে অংশগুলি estate রূপে ছিল, তখন estate গুলির আংশিকতার সুযোগে ও আংশিকতাগুলিকে ঢেকে দিয়ে উঠে এসেছে রাষ্ট্রশক্তি। সার্বিক প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পাদন করেছে রাষ্ট্রশক্তি।

তীব্র বিদ্রূপ দিয়ে মার্কস লিখেছেন অষ্টাদশ ব্রুমেয়ারে, ক্ষুদ্র কৃষকরা অর্থনৈতিক অবস্থানে শ্রেণী হলেও, তাদের মাঝে বন্ধন হল আঞ্চলিক। ফলে, তারা বহির্সাহায্যভিন্ন নিজস্বার্থরক্ষায় অপারগ। 'তারা নিজেদের প্রতিনিধি হতে পারে না, তাদের প্রতিনিধিত্ব করতেই হবে। তাদের প্রতিনিধিকে একই সঙ্গে আবির্ভূত হতে হবে তাদের প্রভুরূপে, তাদের ওপর এক কর্তৃত্ব, এক অসীম সরকারি ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিরূপে'। আধুনিক কৃষকইতিহাস-চর্চায় স্বৈরতান্ত্রিক রাজশক্তির বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের সীমাকে যতই তুলে ধরা হোক না কেন, ইতিহাসের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যার দিকে মার্কস দিকনির্দেশ করেছিলেন, অনস্বীকার্য থেকে যাবে। সামাজিক শ্রমবিভাগ, প্রযুক্তিগত বিভাগ, শ্রেণীগুলির সামাজিক অবস্থা, প্রশাসনিক ক্ষেত্রের শূন্যতা, আঞ্চলিকতা, আপেক্ষিক অভাব, শাসন প্রতিষ্ঠানের জন্মের পর তার ক্রমবর্ধমান পরজীবী চরিত্র - এই সবই মার্কস আলোচনায় এনেছেন রাষ্ট্রকাঠামো বিশ্লেষণকালে। সমাজের 'কাঠামোগত' বিশ্লেষণ, অর্থাৎ শ্রেণীগুলির বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক ঘটনাবলির বিশ্লেষণ - এই দুদিক দিয়েই মার্কস রাষ্ট্রযন্ত্রের উৎপত্তি, শক্তিবৃদ্ধি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ করেছেন।

সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো যত জটিল ও দুর্বোধ্য আকার ধারণ করেছে, তত সম্পত্তিপ্রথা জটিলতর হয়েছে এবং তাকে বিধিসম্মত (codification)

করে তুলতে হয়েছে ঐ দুর্বোধ্যতাকে প্রশ্নাতীত করে তোলার জন্য—যেন ঐ দুর্বোধ্যতা স্বাভাবিক। শ্রমশক্তি কেনাবেচার স্বাধীন ভিত্তি, বাজারের স্বাধীনতা, পুঁজির সম্প্রসারণের প্রয়োজনের সামনে অন্যান্য সকল সামাজিক দাবিগুলির অবান্তর ঘোষণা করা—এইসবই বুর্জোয়া আইনশাস্ত্রের জন্মের কারণ। আইনের চোখে সকলে সমান এবং চুক্তির মর্যাদাই সর্বোচ্চ—এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে আধুনিক সার্বভৌম ক্ষমতা। Codification, সম্পত্তি অধিকার ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব—তাই একসঙ্গে বাঁধা। খণ্ডিত বিভিন্ন সত্তাকে অতিক্রম করে আছে যে সামাজিক সার্বিক প্রয়োজন, আমলাতন্ত্র যেমন তাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়, সেই রকম আইন ও দণ্ডবিধি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় অসাম্য দ্বারা চিহ্নিত সামাজিক কাঠামোকে। এবং এই আইন সংহিতা, দণ্ডবিধি সমূহ ও সর্বোপরি সংবিধান শুধু সামাজিক কাঠামোরই আনুষ্ঠানিক পরিচয় নয়, সেগুলি অভ্যাসের শক্তি ধারণ করে, প্রথা থেকে শক্তি আহরণ করে, মানুষের আন্তঃ বিনিময়ের সবচেয়ে বড় মাধ্যম, অর্থাৎ ভাষা, তাকে প্রভাবান্বিত করে এবং মানবীয় চিন্তার পদ্ধতিটিকেই করে তোলে আনুষ্ঠানিক—রূপভাবনাকেন্দ্রিক। রাষ্ট্র তাই শুধু বাধ্যতার অস্ত্র নয়, অভ্যাসেরও মর্ম। সে শুধু ঘাতক নয়, যাজকও। আইন তাই শুধু চাবুক নয়, একটা কালচারও। রাষ্ট্র তা প্রতিনিয়ত তার নাগরিকদের কানে, মনে ঢুকিয়ে বদ্ধমূল করে তুলেছে। বাধ্যতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে মানুষের সহজাত গুণ। রাষ্ট্র সরাসরি মতাদর্শগত যন্ত্রগুলি ব্যবহার করে কিনা, (ideological state apparatuses) সে প্রশ্ন না তুলেও এটা স্বীকার করা যায় যে, আনুগত্যকে রুলিং আইডিওলজি করে তোলার ক্ষেত্রে, ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও রাষ্ট্রকে মেনে নিতে হবে—এই ধারণাকে প্রচার করার ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর যে মতাদর্শগত অভিযান, তাতে রাষ্ট্রের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পলিটিক্যাল কালচারকে প্রভাবান্বিত করছে রাষ্ট্র ও তার লিগ্যাল কালচার। রোমান ল অথবা নেপোলিয়নের কোডকে মার্কস গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করেছিলেন তা লক্ষণীয়।

শুধু আমলাতন্ত্র বা আইন নয়, রাষ্ট্রের তিনটি বড় শাখার চমকপ্রদ সামাজিক বিশ্লেষণ করেছেন মার্কস—বিমূর্তভাবে নয়, এক-একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার যার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত। কীভাবে সামাজিক শক্তিগুলির পারস্পরিক টানাপোড়েনে কার্যকরী বিভাগ ও আইনবিভাগের মাঝে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটছে, রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ এক-একটি

সংকটময় মুহূর্তে কী রকম ভূমিকা গ্রহণ করেছে, অষ্টাদশ ব্রুমেয়ারের মতো এত তীক্ষ্ণ, সংক্ষিপ্ত এবং তির্যক বিবরণ আধুনিক ইতিহাসরচনায় বিরল। আঞ্চলিক শক্তি ও কেন্দ্রীয় শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ককেও মার্কস দেখিয়েছেন সামাজিক বিচারে। বিসমার্কীয় জার্মানি বা তৃতীয় নেপোলিয়নের ফ্রান্সে রাষ্ট্রশক্তির বিচারে মার্কস যেভাবে আমলাতন্ত্র, রাজনৈতিক দল, সামরিক বাহিনী, সরকারি বিভাগ বা organ গুলিকে ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন, আজও তার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। বিশেষত মিলিটারি, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী, অথবা বিভিন্ন দেশের এলিট ও পার্টি কাঠামোর বিশ্লেষণ ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্রকে বোঝা যাবে না। যে-মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণে রাষ্ট্রবাদী দর্শন আজ প্রতিনিয়ত শক্তিশালী হচ্ছে, তাকে ভেদ না করলে রাষ্ট্রবাদী দর্শনের স্বর্ণযুগ অব্যাহত থেকে যাবে।

চার

কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের এত ব্যাখ্যা নিরর্থক হত, মার্কস যদি এখানে থেমে থাকতেন। মার্কসবাদ ব্যাখ্যামূলক দর্শন নয়, শ্রমিকশ্রেণীও রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করে ক্ষান্ত থাকতে পারে না। রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা র‍্যাডিকাল সমালোচনা শ্রমিকশ্রেণী করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব সাধন করে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে। 'অতীতের সকল বিপ্লবগুলিতে ক্ষমতাদখলকারী শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রটি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। অতীতসূত্রে পাওয়া যন্ত্রটিকে ব্যবহার করেছে। সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লব হল প্রথম বিপ্লব, যাতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ করে নতুন সমাজবিপ্লব সাধিত হবে।' অতীত সমাজপরিবর্তনগুলির চরিত্র এমন ছিল, যে সমাজের সার্বিক দিকগুলিকে দেখার এক বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন থেকেই যেত, যে যন্ত্র আত্মসাৎ করত সমাজের সার্বিকতাকে ও তার নিজস্ব স্বার্থের legitimacy অর্থাৎ সামাজিক গ্রহণ-যোগ্যতাকে অর্জন করত সার্বিক প্রয়োজনের নামে। সর্বহারাশ্রেণীর সমাজ-পরিবর্তনের মৌলিক উদ্দেশ্য মজুরি-শ্রম প্রথা ও তৎসহ শোষণমূলক সর্ববিধ সামাজিক সম্পর্কের অবসান—এক কথায় রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কারণের অবসান।

রাষ্ট্রের উত্থান, যৌবন ও পতনের মধ্যে যে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আছে, তা মৌলিক কিন্তু যান্ত্রিক অর্থে অবশ্যম্ভাবী নয়। রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করে নির্মূল করা যায় না, তার অবলুপ্তি ঘটে। এই যে প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় শুকিয়ে যাওয়া—এর মধ্যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমাজের সক্রিয়তাও রয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংসকারী বিপ্লব ও তৎপরবর্তীকালে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম রয়েছে

—যার ক্ষেত্র ছড়িয়ে আছে অর্থনীতি পরিচালনা, স্বায়ত্তপ্রশাসন, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, সব কিছু জুড়ে। যেমন রাষ্ট্রের ভিত্তি শুধু বলপ্রয়োগ নয়, মতাদর্শগত স্বীকৃতি ও তার অঙ্গ, যা ভিন্ন কোনো রাষ্ট্রই টিঁকতে পারে না, সেই রকম শুধু বলপ্রয়োগে তার অবসান আসে না, ঐ মতাদর্শগত স্বীকৃতির অবসান চাই। কাজেই, রাষ্ট্রের অবলুপ্তির মধ্যে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হল সমাজের সক্রিয়তা। লাসালের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় মার্কস এই দৃষ্টিভঙ্গিই বারংবার এনেছেন এবং 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা'য় মার্কস রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শগত সচেতনতাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। লাসাল মারা গেলেও তার ছায়া জার্মানিতে বিদ্যমান ছিল এবং আজও বহুস্থানে টিঁকে আছে।

আমি এখানে দুটি প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব, যে দুটি প্রশ্ন মার্কসের শেষ জীবনের রচনাগুলিতে বারংবার প্রাধান্য পেয়েছিল: সর্বহারা একনায়কত্বমূলক রাষ্ট্র ও জাতি এবং জাতিরাষ্ট্রের সমস্যা। এই দুটি প্রশ্নই রাষ্ট্রের অবসানের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা'য় মার্কস ফিরে গেছেন তিরিশ বছর পেছনের সেই উদ্দীপ্ত বক্তব্যে, ম্যানিফেস্টোর সেই আলোড়নকারী ঘোষণাগুলিতে, যেখানে শ্রমিকদের বিপ্লবী স্বার্থ উপস্থাপিত হয়েছিল সকল সংস্কারবাদী বক্তব্যের বিরুদ্ধে। 'ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম'-এ মার্কস বলেছিলেন:

> সর্বহারাশ্রেণী বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের চারপাশে, সাম্যবাদের চারপাশে ক্রমেই অধিককে সমাবিষ্ট করে, বুর্জোয়ারা যার বিরুদ্ধে ব্লাঙ্কির নাম সর্বত্র খুঁজে পাচ্ছে। এই সমাজতন্ত্র হল বিপ্লবের স্থায়িত্বের ঘোষণা, সাধারণভাবে শ্রেণীবৈষম্যসমূহ অবলুপ্তি ও সেই বৈষম্যগুলি দাঁড়িয়ে আছে যে উৎপাদন সম্পর্কের উপর, তার অবলুপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় এক মধ্যস্তর রূপে (transit point) সর্বহারার শ্রেণী-একনায়কত্বের ঘোষণা।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র যত আমলাতান্ত্রিক-সামরিক শক্তি সংবলিত হয়ে উঠেছে, তত এগিয়ে এসেছে শক্তি বা বলপ্রয়োগের প্রশ্ন। রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চূর্ণ করার জন্যই সর্বহারা বিপ্লব ও সর্বহারা একনায়কত্ব। বুর্জোয়া নিপীড়ক ও পরজীবী একটি ব্যবস্থাকে অপর অনুরূপ একটি ব্যবস্থা দিয়ে স্থানান্তরিত করা তার উদ্দেশ্য নয়। ফলে সর্বহারা একনায়কত্ব একটি রাষ্ট্ররূপ পেলেও প্রকৃত অর্থে তা রাষ্ট্র নয়। সে জনসাধারণের উপর নিপীড়ন চালায় না, শুধু এই অর্থে নয়; বিভিন্ন সামাজিক অংশ: যথা, শ্রেণী, স্তর, গোষ্ঠী ইত্যাদির মাঝে ভারসাম্য রক্ষা

করার কাজটিও সর্বহারা একনায়কত্বের মুখ্য কর্মধারা নয়। এবং যে পরিমাণে রাষ্ট্র বুর্জোয়া অধিকারের মাঝে সমতা রক্ষা করতে ব্যস্ত, সেই পরিমাণে সমাজের শ্রমজীবী মানুষের সাধারণ স্বার্থ তার বিরুদ্ধে।

গোথা কর্মসূচি চেয়েছিল শ্রমোৎপাদিত ফসলের সমান বণ্টন। গোথা কর্মসূচি দাবি করেছিল, জার্মান শ্রমিক পার্টির লক্ষ্য হল 'মুক্ত রাষ্ট্র।' এই দুটি ধারণাকেই মার্কস তীব্রভাবে খণ্ডন করেছিলেন। মার্কস দেখিয়েছিলেন প্রকৃতপক্ষে গোথা কর্মসূচি যা চাইছে, তা হল বুর্জোয়া সাম্য রক্ষাকারী এক আদর্শ রাষ্ট্র।

শ্রমোৎপাদিত ফসলের সমবণ্টন, কথাটির অর্থ কী? প্রতিটি সমাজেই উদ্বৃত্ত উৎপাদিত সম্পদ বিনিয়োগ করতে হবে পুনরুৎপাদনের জন্য ও ক্ষয়প্রাপ্ত উৎপাদন উপকরণসমূহকে পরিবর্তিত করার জন্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংরক্ষিত তহবিলও প্রয়োজন। বুর্জোয়ারা ইতিমধ্যেই জাতীয় সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে এইসব বিচার গণ্য করে। সর্বাহারাশ্রেণীর সমাজে এই সম্পদ বণ্টনকে নিশ্চিত করতে হবে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে, বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থে নয়। মোট কথা, জাতীয় সম্পদের বণ্টনের বিষয়টি বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এক এক সমাজে এক এক বিধি। সমবণ্টন দাবিটি পেটি বুর্জোয়া চরিত্রসম্পন্ন, যা সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনগুলিকে উপেক্ষা করে। সর্বহারা একনায়কত্বের পর্যায়ে তাই 'সমবণ্টন' অসম্ভব।

বস্তুত, এই যে transit point, তা তুলে ধরছে বুর্জোয়া অধিকারের সমস্যাকে শ্রমশক্তি ব্যয়ের পরিমাপে যে মূল্যনিয়ন্ত্রিত সমাজ, সেখানে মূলত এক অসম পরিস্থিতিতে সমানাধিকার দাবি করার অর্থ বুর্জোয়া অধিকার-দর্শনকে নিখুঁত করে তোলা, উন্নত করা বুর্জোয়া অধিকার ব্যবস্থাকে। লেনিন পরবর্তীকালে এই সমস্যাটি ধরেছিলেন, যখন বলেছিলেন 'কাজ অনুযায়ী পাওনা' আসলে বুর্জোয়া অধিকারেরই ত্রুটিমুক্ত রূপ। তার পারফেক্শন্। সর্বহারা একনায়কত্ব তাই দ্বন্দ্বপূর্ণ। তার ভারসাম্যকারী ভূমিকা বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ভূমিকার অবচিহ্ন।

ফলে 'মুক্ত রাষ্ট্র' বলে কিছু নেই। সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত রাষ্ট্রকে সমাজের সম্পূর্ণ অধীন এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক কার্যক্রম। 'রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে যতটুকু তা খর্ব করে, রাষ্ট্রের রূপগুলি ততটুকুই স্বাধীন।' 'মুক্ত রাষ্ট্র' দাবি করাব অর্থ, কিছু জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় কাজকে গুরুত্ব দিয়ে শ্রমবিভাগোদ্ভূত রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রকৃত চরিত্রকে উপেক্ষা করা। '"জনগণ" এবং

"রাষ্ট্র", এই শব্দদুটি যত রকম ভাবেই যুক্ত করা হোক্ না কেন, সমস্যার তাতে এতটুকু সমাধান হবেনা।'

পরের প্রশ্নটি হল: শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র কি জাতীয়-রাষ্ট্র? মার্কস এঙ্গেলস ইশ্‌তেহারে বলেছিলেন পুঁজির অগ্রগতি সকল আঞ্চলিকতাকে ভাঙছে, কূপমণ্ডুকতার অবসান আনছে এবং ধর্ম বা বিশ্বাসগত কোন বন্ধনের চেয়েও দৃঢ় হল মজুরিশ্রমের অধীনতার বন্ধন। শ্রমিকশ্রেণী নিজেই এক জাতি।

> শ্রমিকদের কোন দেশ নেই। তাদের যা নেই, আমরা তাদের থেকে তা কেড়ে নিতে পারি না। যেহেতু সর্বহারাকে প্রথমে রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জন করতে হবে, জাতির নেতৃস্থানীয় শ্রেণী হয়ে উঠতে হবে, নিজেকেই জাতি হয়ে উঠতে হবে, শ্রমিকশ্রেণী নিজেই হল জাতীয়—যদিও শব্দটির বুর্জোয়া অর্থে নয়।

জাতির অভ্যন্তরে শ্রেণীবৈষম্য লুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে জাতি-বৈরিতারও অবসান ঘটবে। কিন্তু, যতক্ষণ না বাস্তবের দিক দিয়ে জাতি অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে, শ্রমিকদের শ্রেণীগত সংগ্রাম জাতিরূপ ধারণ করবে। এটাই হল গোথা কর্মসূচির ভাসা ভাসা বক্তব্যের বিরুদ্ধে মার্কসের কথা। তার কারণ, সংগ্রামের মর্মবস্তু সামাজিক হলেও, ঐতিহাসিকভাবে প্রদত্ত রূপটি হল জাতি। এবং প্রতিটি রূপই যেমন সত্যতারই শুধু প্রতিফলন নয়, তা নিজেও কিছুটা সত্য বা বাস্তব, জাতি-রূপটিও হল বাস্তব, যাকে উপেক্ষা করতে পারে শুধু অবাস্তব "বামপন্থীরা"। শ্রমিকশ্রেণীকে নিজেকে সংগঠিত করতে হচ্ছে একটি দেশের অভ্যন্তরে, ও সেই দেশকে করে তুলছে সংগ্রামের রঙ্গমঞ্চ! 'সেই পরিমাণে তার শ্রেণীসংগ্রাম হল সম্পূর্ণ (purely) জাতীয়—মর্মে নয়, রূপে'। কিন্তু, তার অর্থ কি এই যে, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য নেই, বা তার সংগ্রাম মূলত জাতীয়? গোথা কর্মসূচি ভেবেছিল, বর্তমান জাতি-রাষ্ট্রের কাঠামোর অভ্যন্তরে শ্রমিকদের নিজস্ব মুক্তির জন্য সচেষ্ট হতে হবে। মার্কস সমালোচনায় বলেছেন, জার্মানিকে দেখতে হবে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে। জার্মান বুর্জোয়া আন্তর্জাতিক নীতি অনুসরণ করছে। জার্মান শ্রমিকশ্রেণীরও আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠা ভিন্ন উপায় নেই।

একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মার্কসের এই বক্তব্য থেকে আরও অনুধাবনের দাবি করে: জাতি-রূপটি কখন রূপ হিসাবে পরিত্যক্ত হবে বা পরিত্যাজ্য? বুর্জোয়া উৎপাদন প্রথা ও সম্পর্ক যে-রূপ ধারণ করে, পুঁজিবাদী-উত্তর যুগের উৎপাদন প্রথা ও সম্পর্ক কি অতীতের সেই রূপের সাথে সাযুজ্য রাখতে পারে

বা সঙ্গতিপূর্ণ? মার্কস কি শুধু সর্বহারা বিপ্লবের জাতিরূপের কথা বলেছেন, না সর্বহারা একনায়কত্বাধীন সমাজতন্ত্রেরও? না কি, এটাই সত্য যে নতুন উৎপাদন প্রথা ও সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিকশিত হয়নি বলেই আজও জাতি-রূপটিই অবশ্যম্ভাবী? বিংশ শতাব্দীর বিজয়ী মতাদর্শ মার্কসবাদ না জাতীয়তাবাদ—আজ বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দাঁড়িয়ে গোটা শতাব্দীকে যখন পেছনে রেখে বিচার করি, এই সব প্রশ্নই বিশদ চিন্তা দাবি করে।

আমরা জানি, মার্কস মনে করতেন রুশ স্বৈরতন্ত্র ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের প্রতিক্রিয়ার মূল স্তম্ভ। রুশ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয় অভ্যুত্থানগুলিকে মার্কস ও এঙ্গেলস স্বাগত জানিয়েছিলেন। আবার ফরাসি বা জার্মাণ জাতীয়তাবাদকে নিন্দা করেছিলেন সর্বহারার স্বার্থলংঘনকারী রূপে। তাহলে মূল প্রশ্ন ছিল: সর্বহারাশ্রেণীর ও বিপ্লবের স্বার্থ। আমরা লেনিনের সাথে রোজা লুক্সেমবুর্গের বিতর্ক যদি লক্ষ্য করি, তবে দেখব রোজা লুক্সেমবুর্গ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের আন্তর্জাতিক রূপটিকে ধরেছিলেন বিমূর্তভাবে। অন্যদিকে লেনিন মার্কসের দ্বন্দ্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত রেখেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করে ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করে।

কিন্তু আজ লেনিন ও রোজা লুক্সেমবুর্গের বিতর্ক ইতিহাসের বিষয় হয়ে গেছে। নির্ণায়ক নীতি, অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণীর ও বিপ্লবের স্বার্থ সামনে ঠেলে নিয়ে এসেছে বস্তু ও রূপের দ্বন্দ্বের সমস্যাকে। জাতি রূপ বাধা দিচ্ছে সামাজিক সংগ্রামকে। মার্কস বা লেনিনের দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে অস্ত্র হয়ে উঠেছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ও উক্তিগুলি।

পাঁচ

একশত বছর পরে:

গোথা কর্মসূচির সমালোচনান্তে জীবনের শেষ পাদে উপনীত মার্কস চিৎকার করে উঠেছিলেন—আমার যা বলার, তা আমি বলেছি; আমি আমার আত্মাকে বাঁচিয়েছি! I have spoken and saved my soul!

রাষ্ট্রবাদী দর্শনের স্বর্ণযুগে মার্কসের এই কশাঘাত তীব্রভাবে স্মরণ করার সময় এসেছে। মার্কসের জীবদ্দশাতেই সমাজতান্ত্রিক চেতনার অপরিপক্কতা বা অবনতি তাঁকে স্তম্ভিত করেছিল। আজ বিপ্লবী মতবাদ ও বাস্তব অবস্থার ব্যবধান সমুদ্রসমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুর্জোয়া অধিকার ও রাষ্ট্র আজও

সমান জীবন্ত, তার সবচেয়ে বড় কারণ যে, শ্রমিক সমাজের উন্নতির মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া অধিকার অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়াবে, সেই উন্নত সাম্যবাদ আসতে পারে বিশ্বমাত্রায়, শুধু একটি জাতি রাষ্ট্রে নয়। একমাত্র

"তখনই এবং শুধু তখনই, বুর্জোয়া অধিকারসমূহের সংকীর্ণ প্রেক্ষাপট থেকে বেরিয়ে আসা যাবে এবং অবশেষে সমাজে তার কেতনে এই কথা চিহ্নিত করতে পারবে: 'প্রত্যেকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী দেবে, নেবে প্রয়োজন অনুসারে'।"

তার আগে পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যখন নিকৃষ্টতম পুঁজিবাদী শোষণে জর্জরিত, রাষ্ট্রের অবসান এক সুদূর লক্ষ্য। কিন্তু ইতিমধ্যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমাজের নিরন্তর সংগ্রাম চলছে, বিপ্লবোত্তর ও বিপ্লবের জন্য অপেক্ষারত উভয় দেশগুলিতেই। নানাবিধ পথে সেই সংগ্রাম চলছে, যার তত্ত্বকরণ এখনো বাকি। সাংস্কৃতিক বিপ্লব, পোলিশ বসন্ত, অনুরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনা সামাজিক আলোড়নের স্বাক্ষর। যে কোনো প্রক্রিয়ারই প্রথম পদক্ষেপের মত এ-সব অনিশ্চিত, আঁকা বাঁকা, বহু ভুলে ভরা। কিন্তু, এটা নিশ্চিত যে সর্বহারা একনায়কত্বেও রাষ্ট্রের বিপক্ষে সমাজের শ্রমজীবী জনসাধারণের একাধিপত্য স্থাপনের সংগ্রাম চলবে। রাষ্ট্র, পার্টি, শ্রেণী, সমাজ—এর মাঝে দ্বন্দ্ব থাকবে। তাকে নিয়ন্ত্রণ করার পথ নিয়ে তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু এই সব দ্বন্দ্ব অস্বীকারের উপায় নেই।

'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র'—এইরকমই এক দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি। একদিকে উৎপাদন উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার কোনো আইনগত অস্তিত্ব নেই, অন্যদিকে শ্রমজীবীরাই শ্রমের উপকরণ ও উৎপাদিত ফলের মালিক—কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নয়, একটি মাধ্যমেরই মধ্য দিয়ে। তা হল রাষ্ট্র। বাজার মাধ্যম হবার পরিবর্তে রাষ্ট্র এখন মাধ্যম। ফলে সর্বহারা শ্রমজীবীদের সার্বিক স্বার্থ ও রাষ্ট্রের যুগপৎ অস্তিত্ব প্রয়োজনভিত্তিক হলেও দ্বন্দ্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের এই মাধ্যমরূপী ভূমিকা শুধু বুর্জোয়া অধিকার সমূহকেই দীর্ঘায়িত করছে না, যা প্রকাশিত হয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির precssure groups এর মধ্য দিয়ে; তা এমন এক প্রশাসনশাস্ত্রের জন্ম দিচ্ছে, যা স্বায়ত্ত প্রশাসন নয়, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন। সমাজতান্ত্রিক প্রশাসননীতিতেও মানুষই থেকে যায় বিষয়, কর্তার বদলে the receipient end. সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আইন বিভিন্ন গণপ্রতিবাদ, বিক্ষোভ এইরকম প্রশাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক সরব স্বাক্ষর। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব যেমন রয়েছে, সেইরকমই আছে আরেকটি পরিস্থিতিগত দ্বন্দ্ব। সমাজতান্ত্রিক

অর্থনীতিকে যুক্ত হতে হচ্ছে শত সহস্র বন্ধনে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে। সমাজতন্ত্রের জাতি রূপ, অর্থাৎ রাষ্ট্ররূপ তাতে ক্ষয়ে যাচ্ছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্ররূপের ক্ষয়ের মতই—কিন্তু মৌলিকভাবে, অত্যন্ত ধীরে। ইতিমধ্যে, আশু বিচারে এই আন্তর্জাতিক অর্থনীতি রাষ্ট্ররূপকে শক্তিশালী করছে। ঠিক যেমন, বহুজাতিক পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে ওপরে উঠলেও এবং ধনবাদী রাষ্ট্রের মৌলিক ক্ষয় বা elemental erosion আনলেও, আপাততঃ ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আমলাতান্ত্রিক-সামরিক যন্ত্রটি শক্তিশালী হচ্ছে। সংক্ষেপে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্রের আশু রূপ হিসাবে হাজির হলেও, ইতিমধ্যেই জীবনের প্রতিবাদ উঠেছে। সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি দাবি করছে।

পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যে সব নতুন চিন্তা, যা 'ইউরো কমিউনিজম' নামে খ্যাত, এসেছে, সেইগুলি এই সব পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিরই, বিশেষত ইউরোপীয় পরিস্থিতির নজির। পশ্চিম ইউরোপে রাষ্ট্র পার্থক্য কমে আসছে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবাদ আসছে। এক সাধারণ অর্থনীতি জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু, এই নতুন প্রবণতাগুলির মতাদর্শগত প্রতিফলন ইউরো কমিউনিজমে ঘটেছে বিকৃতভাবে। ফলে, রাষ্ট্রকে অস্বীকার করতে গিয়ে তারা স্বীকার করেছে রাষ্ট্রের বুর্জোয়া ভিত্তিকে। যেন, বহুদলীয় গণতন্ত্র, বিভিন্ন সামাজিক চুক্তি (যেমন ইতালীর historic compromise) সমাজতন্ত্রকে উন্নত করতে পারে, মুক্ত করতে পারে সর্বহারা একনায়কত্বরূপী রাষ্ট্রীয় রূপ থেকে।

আর সামগ্রিকভাবে বিচার করলে, আজ মার্কসবাদের বিপ্লবী সত্তার পুনরুজ্জীবন আরও প্রয়োজনীয়। তার কারণ, হব্‌স্ বা হেগেলের যুগে ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক দর্শনে রাষ্ট্রের স্থান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু আজ, বিংশ শতাব্দীতে কেইন্‌স্-এর পর থেকে ও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতার কল্যাণে অর্থনৈতিক দর্শনেও রাষ্ট্র সেই ভূমিকা নিয়েছে এবং এক অভূতপূর্ব প্রাধান্য লাভ করেছে। আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির স্বরূপ উন্মোচন করা তাই আজ এত প্রয়োজনীয়। প্রয়োজনীয়, এই রাষ্ট্রীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির পুঁজিবাদী ধারণাগুলি থেকে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রকে মুক্ত করা।

ধনতন্ত্র রূপান্তরিত একচেটিয়া ধনতন্ত্রে এবং একচেটিয়া ধনতন্ত্র রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রে। অনুন্নত দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রকে হাতিয়ার করে দ্রুত বিনিয়োগের পথ ধরেছে, যা আবার নির্ভর করে উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণের হার ও

মাত্রার ওপর। এবং উদ্‌বৃত্ত মূল্য শোষণ, যা নির্ভর করে সেই দেশের গড়পড়তা জীবনযাত্রার মানের ওপর, তাকে মসৃণ করে তুলছে রাষ্ট্রযন্ত্র জীবনমানকে তুলে ধরার অর্থনৈতিক সংগ্রামকে দাবিয়ে রেখে, প্রয়োজনীয় শ্রমকে উদ্‌বৃত্ত শ্রমের অনুপাতে কমিয়ে। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনযন্ত্র উৎপাদনের শিল্প আজ প্রায় সকল অনুন্নত দেশেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মসূচি। মতাদর্শের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এই ভূমিকা রাষ্ট্র সম্পর্কে মোহ জাগাচ্ছে, কারণ অনুন্নত দেশের মতাদর্শ-বিদ্‌রা প্রায় অধিকাংশই পেটি বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে আগত, যারা ঐ সব দেশের নব্যবাবুর দল বা এলিট সম্প্রদায়। রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখায় এরা চাকরি করে, আইন প্রণয়ন, ওকালতি, বিচার ইত্যাদিরও মূল শক্তি এরাই। সামরিক বাহিনী হল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব অনুন্নত দেশের একমাত্র সামাজিক সংগঠিত শক্তি এবং বাহিনীর সাধারণ সদস্যরা কৃষক হলেও নেতৃবৃন্দ এই নব্যবাবু স্তর থেকে আগত। ফলে রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র আজ তৃতীয় বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রচলিত মতাদর্শ। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাতেও তার প্রভাব পড়েছে। সংশোধনবাদীরা এই রাষ্ট্রীয় ভূমিকাকে সমাজতন্ত্রের লক্ষণ ও আগমনবার্তা রূপে দেখাতে চায়, কেননা সংশোধনবাদী অর্থনৈতিক দর্শনে জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং উৎপাদনব্যবস্থার সমাজ-তন্ত্রীকরণ সমার্থক।

উন্নত দেশে, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভূমিকা আরও লক্ষণীয়। উদ্‌বৃত্ত মূল্য এতদিন বণ্টন হত বিভিন্ন পুঁজিবাদীর মধ্যে ও পুঁজিবাদী এবং অন্যান্য শোষক গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। কিন্তু 'একচেটিয়া' বিকশিত হবার পর থেকে ক্রমাগতই রাষ্ট্র সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণীর হয়ে সেই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছে, অর্থাৎ উদ্‌বৃত্ত মূল্য বণ্টন করার কাজ। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতায় জাতীয় পুঁজির অভিভাবক হল রাষ্ট্র এবং ডলার ভিত্তিক বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থায় ভাঙনের পর থেকে বিশ্ববিনিময়ের বাজারে জাতীয় অর্থনীতি ও মুদ্রার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখন রাষ্ট্রের। একচেটিয়া মুনাফার হারকে প্রয়োজন হলে কমিয়ে এনে, অর্থনৈতিক সংকট থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে উদ্ধার করার দায়িত্ব এখন রাষ্ট্রের হাতে—যাতে একচেটিয়া মুনাফার হার গড়পড়তা হারে রূপান্তরিত হয়ে নতুন বিনিয়োগের রাস্তা খুলে দিতে পারে ও ধনতান্ত্রিক পুনরুৎপাদনকে সম্ভব করে তোলে। যে মুনাফা এখন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় লাভ করা সম্ভব নয়, রাষ্ট্রের সাহায্যে পুঁজিবাদ এখন সেই মুনাফা লাভ করছে আবর্তন বা বিনিময় প্রক্রিয়ায়। মুদ্রাস্ফীতি এরই প্রধানতম

হাতিয়ার। মুদ্রাস্ফীতি হল অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বের স্বরূপ—ঘাটতি বাজেট, ও ক্রমাগত অনুৎপাদক (অর্থাৎ উদ্‌বৃত্ত মূল্য অনুৎপাদক) রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিণতি। রাষ্ট্র যে শুধু সামগ্রিক সামাজিক উদ্‌বৃত্ত মূল্যের একাংশ নিয়ে নিচ্ছে তাই নয়, রাষ্ট্র উদ্‌বৃত্ত মূল্য উৎপাদনও করছে বহু দেশে, বহু মাত্রায়। রাষ্ট্রীয় মালিকানার দরুণ শ্রম প্রক্রিয়ার চরিত্র কিন্তু এতটুকু পালটায়নি অর্থাৎ পুঁজি-শ্রম সম্পর্ক অপরিবর্তিত থেকে গেছে।

অমার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে সমগ্র ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করে ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ যে পুঁজিবাদই—এই তর্কাতীত সত্যকে কীভাবে ধামাচাপা দিতে চায়—তার দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত, একচেটিয়া মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা সামাজিক নৈর্ব্যক্তিকরণের দ্যোতক—এই বক্তব্য রূপান্তরিত হয়—সমাজতন্ত্রেরই দ্যোতক, এই বক্তব্যে। "উদ্যত বিপর্যয় ও তার প্রতিকারের পথ" রচনায় লেনিন রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া মালিকানাকে বস্তুগতভাবে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে একটি অগ্রগতিরূপে মত প্রকাশ করেছিলেন, বিষয়ীগতভাবে নয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় দর্শনের আজ্ঞাবাহকরা এই অগ্রগতিকে প্রকাশ করে বিষয়ীগত ভাবে। অবধারিত ভাবে, সামগ্রিক পুঁজির বদলে তাদের চোখে পড়ে পুঁজির এক একটি ভাগ ও তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব। "জাতীয়করণ" হয়ে দাঁড়ায় সমাজতন্ত্রের মূল শ্লোগান। রুশ বিপ্লবের মত সর্বহারার সামাজিক অভ্যুত্থানের পরিবর্তে উপস্থাপিত হয় রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া মালিকানাকে অব্যাহত, অপরিবর্তিত রেখে রাষ্ট্রের মালিকানার হস্তান্তরের দাবী।

দ্বিতীয়ত, এই ধারণার শিকড় থাকে আরো গভীরে ; এই চিন্তাধারায় যে, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া মালিকানা থাকলে পরিকল্পনা সম্ভব, বাজারের নৈরাজ্যকে দূর করে মূল্যবিধির কার্যাকারিতাকে সমাপ্ত করা যায়। অর্থাৎ মূল প্রশ্ন যে পুঁজি-শ্রম সম্পর্কের মধ্যে, সেইস্থান থেকে তা সরে আসে রাষ্ট্রীয় না অরাষ্ট্রীয় মালিকানা—সেই প্রশ্নে। যেন নৈরাজ্য শুধু সামগ্রিক বাজারের ক্ষেত্রে, প্রতিটি ব্যক্তি-শিল্পের ক্ষেত্রে নয়। যেন শুধু সামগ্রিক মালিকানা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এলে নৈরাজ্য দূর করা যাবে, ব্যক্তি শিল্পে পুঁজির চরিত্র লুপ্ত হবে। বাস্তবে কিন্তু সামাজিক পুঁজি ও ব্যক্তি-পুঁজি উভয়েই এই নৈরাজ্যের দাস। উভয়েই নির্ভর করে পুনরুৎপাদনের উপর। এবং উভয় পুনরুৎপাদনই নির্ভরশীল উদ্‌বৃত্ত মূল্যের উপর—নৈরাজ্যের জন্ম সূত্রটি পুঁজির গঠনাত্মক চরিত্রের যে জায়গাটিতে বাঁধা। এ কথা ঠিক যে, মার্কস বলেছিলেন সমাজতন্ত্র আকাশ থেকে নেমে আসা উপাদান দিয়ে তৈরী হয় না। পুরাতন সমাজের উৎপাদন শক্তির সামাজিকীকরণ

হল সমাজতন্ত্রের ভিত্তি, কিন্তু, নিশ্চয়ই মার্কস্‌বাদ এই অপব্যাখ্যার শিকার হতে পারে না যে, ঐ সামাজিকীকরণ সমাজতান্ত্রিক চরিত্র সম্পন্ন। তার পুঁজিবাদী চরিত্র শেষ, এখন শুধু প্রয়োজন একক রাষ্ট্রীয় মালিকানা। যা সত্য তা হ'ল ; "এ (একচেটিয়া মালিকানা) হচ্ছে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সীমানার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে পুঁজির উচ্ছেদ" একচেটিয়াকরণ সম্পর্কে মার্কসের এই দ্বান্দ্বিক দৃষ্টি আজও প্রযোজ্য।

পরিশেষে, এটা পুনরুল্লেখের প্রয়োজন যে, আধুনিক কালে রাষ্ট্র যে শুধু রাজনৈতিক শাসনসংক্রান্ত কার্যাবলি পালন করে তাই নয়, বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার সাধারণ শর্ত ও পরিবেশ বজায় রাখাও তার কর্তব্য, তাই প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক নিপীড়ন করার চাপ সাময়িকভাবে যেখানেই কম, সেখানেই রাষ্ট্রকে মনে হয় সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ পরিচালক। বুর্জোয়া শ্রেণীর ও রাষ্ট্রের নিজস্ব প্রচারও অহরহ চলতে থাকে লোককে সেইমত বোঝানোর দিকে। জল্লাদ ও যাজকের এই যে দ্বৈত ভূমিকা—আজ রাষ্ট্র দ্বিতীয় ভূমিকাটিকে ক্রমাগত পালিশ করে চাকচিক্যময় করে তুলেছে গণ চেতনাকে বিপথগামী করতে। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সভা-সমিতি, ভোট, স্কুল কলেজের শিক্ষা, ধর্ম—সবরকমভাবে রাষ্ট্রের এই নিরপেক্ষতা আজ প্রতিভাত হচ্ছে, সমগ্রজাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী এক কড়া জবরদস্ত শাসন—এইভাবেও রাষ্ট্রের আজ অভিব্যক্তি। সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে আধুনিক রাজনীতির সূচনা ও দ্রুত উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর একটানা অর্থনৈতিক প্রসার ও পার্লামেণ্টারী শাসনের অব্যাহত যুগ, বিপ্লবোত্তর দেশগুলিতে অর্থনৈতিক নির্মাণকল্পে রাষ্ট্রের আধিপত্যময় ভূমিকা—সবমিলিয়ে সমস্ত পৃথিবীজুড়ে রাষ্ট্রবাদী দর্শনের আজ সত্যই স্বর্ণযুগ।

এইরকম সার্বিক প্রাধান্যের যুগে, মার্কসের কমিউনিষ্ট দর্শনের মূল কথাগুলি আবার মনে করা হোক। রাষ্ট্রের চরিত্রকে বোঝার জন্য নয়, তাকে পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে, তার অবসানের মৌলিক লক্ষ্যকে অনুসরণ করতে। মার্কসের ভাষায়, "প্রয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন চিন্তার বাস্তবতা বা অবাস্তবতা নিয়ে বিতর্ক হল নেহাতই পুঁথিগত প্রশ্ন।"

মার্কসীয় পদ্ধতি

প্রমীলা মেহতা

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে যে-সব তথ্য আমরা পাই সেই সব তথ্যের সাহায্যে বিভিন্ন 'ধারণা'-র (কনসেপ্ট) সমালোচনাও আমরা মনে-মনে করে যাই। তার সঙ্গেই চলে ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার বিচার—এই সব ধ্যান-ধারণা জ্ঞানচর্চার দীর্ঘ ধারাবাহিকতাতেই আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়, তথ্যের বা অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ নতুন তাত্ত্বিক ধারণা (তার মানে ক্যাটিগরির নতুন বিন্যাস) সরাসরি সেই তথ্য বা অভিজ্ঞতা থেকে আসতে পারে না। পজিটিভিস্টরা অবশ্য মনে করেন তথ্যই সব ধারণার উৎস। এর বিপরীতে বলা যায়, আমাদের হাতের কাছে যতগুলি ক্যাটিগরি এসে পৌঁছেছে সেগুলির কঠিন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মধ্য দিয়েই তত্ত্ব তৈরি হতে পারে—অন্য কোনো পথে নয়।

যখনই আমরা বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক প্রগতির ভিতরকার সম্পর্কের কথা বুঝতে চাই তখনই তত্ত্বের সৃষ্টিশীল ধারাবাহিকতা, অর্থাৎ বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক প্রগতির সমস্যার সামনে আমাদের পড়ে যেতে হয়। সমস্যাটা এ-রকম—বিজ্ঞান বা তত্ত্ব কি ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যেতে থাকে, নাকি, তত্ত্বের প্রগতির সঙ্গে কালানুক্রমিক ইতিহাসের কোনো সম্পর্কই নেই।

মার্ক্স-এর 'কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অব দি পলিটিক্যাল ইকনমি'তে এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন—যে-তত্ত্বের উত্তরাধিকার আমাদের কাছে এসে

পৌঁছেছে তা বিচার করা হবে কোন পথে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হলেই বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির অন্তর্সম্পর্কের প্রশ্নটি জরুরি হয়ে ওঠে—কোন পদ্ধতিতে বিচার করা হবে তা স্থির করার পরও অর্থনীতির আলোচনা দু ভাবে সাজানো যায়—ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বা যুক্তিশাস্ত্রের পরম্পরায়।

যাই হোক, তত্ত্বের যে উত্তরাধিকার আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে তার বিচার-বিবেচনা থেকেই তথ্যকে সম্পূর্ণ নতুন তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সাজানো যায় এ-কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য—তথ্যের প্রতি আমাদের মনোভাব কী। তার ওপর আবার নির্ভর করে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তত্ত্বকে আমরা কী ভাবে বিচার করব। এখানে তত্ত্ব ও তথ্যের বিশ্লেষণে যুক্তিশাস্ত্রের পদ্ধতি আর ইতিহাসের ধারাবাহিকতার ভিতর কোনো বিরোধ নেই।

বিরোধটা অন্য জায়গায়। পূর্ববর্তী তত্ত্বের তথাকথিত সমালোচনায় যখন ঐ তত্ত্ব তৈরি হয়েছে তখনকার তথ্যের ভিত্তিতেই ঐ তত্ত্বকে বিচার করতে হয়। যেমন, মার্ক্স যদি রিকার্ডোর তত্ত্বকে ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সমালোচনা করতেন তা হলে তাঁকে রিকার্ডোর সময় যে তথ্য পাওয়া গিয়েছিল সেই তথ্য দিয়ে ঐ তত্ত্বকে বিচার করতে হত—তার মানে, ১৮ শতকের শেষ থেকে ১৯ শতকে ধনতান্ত্রিক বিকাশের তথ্য।

তা হলে, রিকার্ডোর তত্ত্ব, সেই তত্ত্বের ক্যাটিগরি ও নিয়মকানুনগুলোকে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করতে হত অতীতের তথ্য দিয়ে ও ধনতান্ত্রিক বাস্তবতার তখনো অপরিণত এক স্তরের অভিজ্ঞতা দিয়ে। তৎসত্ত্বেও, এই ধরণের পরীক্ষায় ধরেই নেয়া হয়—তথ্যগুলো ঠিকভাবে দেখা দরকার কিন্তু এই ক্ষেত্রে ঠিকভাবে দেখা হয় নি। এ-রকম আলোচনায় মূল নতুন তত্ত্বে পৌঁছুনোর কাজে অনেক ঘুরপথে এগতে হত।

সে কারণেই মার্ক্স বেছে নিয়েছিলেন যুক্তিশাস্ত্রের পদ্ধতি আর এই যুক্তিশাস্ত্রের প্রক্রিয়াগুলো দিয়েই বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করছিলেন।

এই পদ্ধতিতে পূর্বতন কোনো তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক গ্রাহ্যতা বিচারের জন্যে যে সময় ঐ তত্ত্বটি তৈরি হয়েছিল তখনকার তথ্য ব্যবহৃত হয় না, বরং যে সময় ঐ বিচারটি করা হচ্ছে তখনকার তথ্য ব্যবহৃত হয়। মার্ক্স তাই করেছিলেন।

এই পদ্ধতির দুটো সুবিধে আছে। প্রথমত, মার্ক্স যে সময় এই বিচার করছেন সেই সময়ের তথ্য মার্ক্সের অনেক বেশি জানা, দরকার হলে তিনি আরো তথ্য জেনে নিতে পারতেন। দ্বিতীয়ত. মার্ক্স-এর সমকালীন

অভিজ্ঞতাতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রবণতা আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিল।

এই পদ্ধতির নাম যাই দেয়া হোক—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা যুক্তিশাস্ত্রের পদ্ধতি—এর সাহায্যেই আমরা অর্থনীতির একটি ঘটনাকে তার বিকাশের চরম বিন্দুতে ধরতে পারি।

ধনতান্ত্রিক বিকাশের তথ্য দিয়েই তাই মার্ক্স দেখাতে পারলেন রিকার্ডোর তাত্ত্বিক ভুল কোথায়, আর, তাতে মার্ক্স-এর সমকালের বাস্তবতাও আরো ভাল বোঝা গেল। ঐতিহাসিক পদ্ধতির তুলনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধারণা ও তথ্যবিচারের এই দুটো নগদ লাভ।

কিন্তু দর্শন শাস্ত্রের দিক থেকে এই 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' গ্রাহ্য হবে না যদি এটা প্রমাণ করা না হয় যে অতীতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ছাড়াও কোনো একটি ঘটনার ঐতিহাসিক বিকাশের বিবরণ দেয়া সম্ভব সেই ঘটনাটির পরবর্তী উন্নততর কোনো স্তরকে বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়েই।

অন্য ভাষায়, 'বর্তমান'-এর তাত্ত্বিক (বা বৈজ্ঞানিক, বা যুক্তিশাস্ত্রীয়) ব্যাখ্যাই অতীতের রহস্য দূর করতে পারে—যে ইতিহাসের কার্যকারণে বর্তমান স্তর তৈরি হয়েছে তাকেও স্পষ্ট করতে পারে।

এটা কী করে সম্ভব হয়?

প্রথমে বিজ্ঞানের বিকাশ ও এর বিষয়ের ইতিহাসের ভিতরের দুটো সম্পর্কের কথা ধরা যাক।

প্রথমত, যে সময়সীমার মধ্যে একটি তত্ত্ব তৈরি হয়ে ওঠে, সেই সময়সীমার পরিসরে বিষয়ের বা ঘটনার, অর্থাৎ যা নিয়ে তত্ত্বটি তৈরি হচ্ছে, তার কোনো পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। জ্যোতির্বিদ্যা; পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যায় তত্ত্ব আর বিষয়ের ভিতরে এই সম্পর্ক সব সময় কাজ করে।

তাই এই ধরণের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় ধারণা ও তথ্য-বিশ্লেষণে যুক্তিশাস্ত্রের পদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি। সেইজন্যেই অঙ্কের ওপর এত নির্ভর করতে হয়। অঙ্ক ত যুক্তিশাস্ত্রেরই বিমূর্ত চেহারা। বিজ্ঞানের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিষযের ঐতিহাসিক বিকাশের একটি মাত্র স্তর নিয়েই পরীক্ষা চলতে থাকে একই বিষয় নিয়ে ও বিকাশের একই স্তর নিয়ে। নিউটন, লাপ্লেস, কাণ্ট ও অটো স্মিডট—সৌরজগতের বিকাশের একটিমাত্র স্তর নিয়েই কাজ করেছেন।

এই ক্ষেত্রে তথ্যপরীক্ষায় ও তত্ত্ববিচারে যুক্তিশাস্ত্রের পদ্ধতির প্রয়োগ ছাড়া কোনো উপায় নেই। পুরোন তত্ত্ব ও তার ক্যাটিগরিগুলোকে অসম্পূর্ণ

ও একপেশে প্রমাণ না করে নতুন তত্ত্ব তৈরি হতে পারে না। একই ঘটনা ও একই তথ্যের ভিত্তিতে নতুন তত্ত্ব সম্পূর্ণ ও সত্য হয়ে উঠতে চায়। পুরোন তত্ত্বের যেটা তথ্যভিত্তি সেটাও নতুন তত্ত্বে গৃহীত হয়ে যায় কিন্তু তত্ত্বভিত্তিটা পরিত্যক্ত হয়। এই প্রক্রিয়ায় পুরোন তত্ত্ব নতুন তত্ত্বেরও একটি অংশ হয়ে যায়।

তত্ত্ববিজ্ঞানী এখানে তাঁর চোখে-দেখা তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন তত্ত্বের সামনে খাড়া করান। কয়েক শ বছর আগে তৈরি তত্ত্ব আর আজকের তথ্য মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে।

এই গেল এক ধরনের সম্পর্ক—বিষয়টি যেখানে প্রায় অপরিচিত কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য যেখানে বদলে যাচ্ছে।

বিষয়টিও যেখানে বদলাতে-বদলাতে যাচ্ছে অবস্থা সেখানে খুবই জটিল। সেখানে বিজ্ঞানের ইতিহাস যেন ঐ ঘটনার ইতিহাসেরই আয়না হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের কোনো পরিবর্তন ঘটনাটিকেও বদলে দেয়। ঘটনাও অত্যন্ত দ্রুত বদলাতে থাকে। তার সেই বিকাশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্তর, বিজ্ঞানের বিকাশের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গতিপূর্ণ।

সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে এটা সবসময়ই ঘটছে। অর্থনীতির কথাই ধরা যাক। শব্দতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, এ-সবের অবস্থাও একই রকম।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, এতক্ষণ যাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা হচ্ছিল সেই পদ্ধতির ব্যবহার এ-সব ক্ষেত্রে কত দূর যুক্তিযুক্ত।

আজকের তথ্যের ভিত্তিতে কী করে কয়েক শতক, বা এমন-কি কয়েক দশক, আগের কোনো তত্ত্বকে বিচার করা যাবে? এর ভিতর ত বিষয়টিই বদলে গেছে। তা হলে ক্যাটিগরিগুলোকে পরীক্ষা করা হবে কোন নিরিখে? অথবা, ও-সব জায়গায় এই পদ্ধতির প্রয়োগে ভুল বোঝাবুঝিই বাড়বে, একই ক্যাটিগরিতে অন্য কথা হবে, নিরর্থক তাত্ত্বিক ঝগড়া হবে?

এই প্রশ্নের মীমাংসাতেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মার্ক্সবাদী প্রয়োগ। মনে রাখা দরকার, সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়েও যখন এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তখন বিষয়কে একটি সমগ্রতাতেই ধরা হয়। বিষয়টি হয়ত ঐতিহাসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন চেহারা নেয় কিন্তু সেই বিকাশের মধ্যে যে-উপাদান সর্বজনীন ও সেই বিষয়ের যেটা মূল প্রবণতা—তা অপরিবর্তিতই থাকে। আঠার শতকের শেষ থেকে এই বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত ধনতন্ত্র ধনতন্ত্রই আছে, যদিও গত দু শ বছরের বিকাশে তার চেহারা বদলে গেছে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এই সর্বজনীনটাকেই খুঁজে বের করে। আর, যাঁরা দ্বান্দ্বিক

বস্তুবাদের বিরোধী, তাঁরা চেহারার এই বদলকেই দেখান মৌলিক পরিবর্তন হিসেবে। এমন-কি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সমর্থকও এই মারাত্মক ভুল করে ফেলেন যেন বাষ্পীয়-ধনতন্ত্র (যখন বাষ্পশক্তিকে প্রথম উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হল) আর বর্তমান সাইবারনেটিকস-ধনতন্ত্র এক নয়।

তার আগে অর্থনীতির যে-সব তত্ত্ব ও ক্যাটিগরি প্রতিষ্ঠিত ছিল—শুধু অ্যাডাম স্মিথ বা ডেভিড রিকার্ডোর নয়, স্বয়ং এরিস্টটলেরও—মার্ক্স এই বৈজ্ঞানিক যুক্তিশাস্ত্রীর পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন—ঐতিহাসিক পদ্ধতির সাহায্য কখনো-কখনো নিয়েছেন।

এই পদ্ধতির সাহাযোই কোনো একটি বিষয়ের 'সাধারণ তত্ত্ব' (জেনারেল থিয়োরি) তৈরি করা সম্ভব।' শুধু ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে এমন নানা ব্যাপারকে ছেঁটে ফেলে বিষয়টির বিকাশের মূল প্রবণতাটিকে যদি ধরা যায় তা হলেই এই 'সাধারণ তত্ত্বে' পৌঁছুনো সম্ভব। যেখানে অনেক সময়ই কালানুক্রমিক ইতিহাস হয়ে ওঠে একটা বোঝার মত, কারণ বিষয়ের কালানুক্রমিক ইতিহাসে এমন অনেক কিছুই ত অনেক সময় ঘটে, বিষয়ের মূলের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্কই নেই কিন্তু কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে যা প্রাসঙ্গিক ছিল। মার্ক্স তাই ধনতন্ত্রের ভিতরের সংগঠনটিকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর ত ধনতন্ত্রের বিকাশে ধনতন্ত্রই পেরিয়ে এসেছে। সেই সব স্তরের সঙ্গে ধনতন্ত্রের অনেক 'স্থানীয়' চেহারা নানা সময় দেখা গেছে—পরে সেটা ধ্বংস হয়ে গেছে। মার্ক্স এ-সব আপাতলক্ষণকে গ্রাহ্য করেন নি, তিনি পৌঁছেছিলেন একেবারে শিকড়ে।

মার্ক্সের পদ্ধতির এই 'সর্বজনীন'কে বুঝতে না-পেরেই বা ইচ্ছে করে ভুল বুঝে এখনো গবেষণা চলে যে দেশান্তরে বা কালান্তরে ধনতন্ত্রের চেহারা একই থাকে কি না। এক থাকে না বলেই 'জেনারেল থিয়োরির' প্রয়োজন—সেই 'জেনারেল' বেরিয়ে আসে সমস্ত নির্দিষ্টতা ভেদ করে। সৌরজগতে গ্রহ-নক্ষত্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণের সাধারণ নিয়ম যেমন কোন দিন আকাশে গ্রহ-সন্নিবেশ কী রকম তাতে বাতিল হয় না, বরং প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি কোন সময়ে বা কোন দেশে ধনতন্ত্রের চেহারা কী রকম তা দিয়ে ধনতন্ত্রের সাধারণ নিয়মের কোনো বদল ঘটে না। বরং, যারা সৌরজগতের 'সাধারণ নিয়ম' জানে না, তারা জ্যোতির্বিদ্যার বদলে জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যবসা খুলে বসে। তেমনি, যারা ধনতন্ত্রের 'সাধারণ নিয়ম' ভুলিয়ে দিতে চায়, তারা এক-এক সরকারের জনসেবামূলক ব্যবস্থা প্রচারের বিজ্ঞাপন-এজেন্সি খুলে বসে।

যাকে বলা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা যুক্তিশাস্ত্রীয় পদ্ধতি তাতে পূর্ববর্তী তত্ত্বের সমালোচনার আরো একটি স্থবিধে আছে। বিষয়টির পরবর্তী পরিণত বিকাশের স্তরের সঙ্গে এই পূর্ববর্তী তত্ত্বের তুলনাটা খুব সরাসরি করা যায়। ফলে, এই পরিণত স্তর বিষয়টির আভ্যন্তরীণ গড়নটিকে আরো শুদ্ধভাবে উপস্থিত করতে পারে। মার্ক্স-এর 'কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি'র সমালোচনায় এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'প্রত্যেকটি উপাদানকে তার বিকাশের পরিণততম আকৃতিতে, তার ক্লাসিক্যাল ফর্মে, পরীক্ষা করা সম্ভব।'

এই একই কারণে, এই পদ্ধতিতে আমরা হেগেল-এর লজিককে যখন বিচার করব তখন আমাদের পরিপ্রেক্ষিত হিশেবে আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ ও পরিণতি সক্রিয় থাকবে, হেগেলের সময় দিয়ে হেগেলকে বিচার করার সীমাবদ্ধতা আমাদের মেনে নিতে হবে না। সঙ্গে-সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ ও পরিণতিকে যেমন তার দ্বান্দ্বিকতায় দেখা সম্ভব হবে, তেমনি হেগেলের ডায়ালেকটিকসের ঐতিহ্য আমাদের যুক্তিবিজ্ঞানের কাজে লাগানো যাবে।

প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান উভয়ক্ষেত্রেই সামাজিক মানুষের ইন্দ্রিয়গত ও বাস্তব অভিজ্ঞতাই তত্ত্ববিদের চিন্তা ও বিষয়ের ভিতর সেতুবন্ধের কাজ করে। এই কারণে, প্রকৃতি ও সমাজবিজ্ঞানের ভিতরকার সম্পর্ক ব্যাখ্যায় 'প্র্যাকটিশ', শ্রম বা কাজের অভিজ্ঞতাই পরম যুক্তি। নব্য-কান্টীয় ধারণায় প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতির মধ্যে যে-বিরাট ফারাকের জলপনা করা হয়—'শ্রম' বা 'প্র্যাকটিস'ই তার নিরসন করে।

এ-প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা দরকার যে ঐতিহাসিক কালানুক্রমিক পদ্ধতিকে মার্ক্স কোনো সময়ই সম্পূর্ণ বাতিল করেন নি। বরং তিনি বারবার এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। বারবার দেখিয়েছেন, যে-তত্ত্বের তিনি সমালোচনা করেছেন তা কোন বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তৈরি হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, ঐতিহাসিক কালানুক্রমিক পদ্ধতি তাঁর কাছে কখনোই প্রধান পদ্ধতি নয়—তাঁর প্রধান পদ্ধতি ডায়ালেকটিকস যুক্তিবিন্তার।

বুর্জোয়া অর্থনীতির নিয়ম আবিষ্কার করার জন্যে উৎপাদন সম্পর্কের আস্ত ইতিহাস লেখার কোনো দরকার নেই। কিন্তু সেই ইতিহাসকে দেখতে হবে সম্পর্কের গড়ে ওঠার ইতিহাস হিশেবে। তাতে কতকগুলি সন্ধিস্থল স্পষ্ট হয়ে ওঠে—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সংখ্যাতত্ত্বের মত—সেই সন্ধিস্থল থেকে এই ব্যবস্থার নেপথ্য অতীতকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। 'বর্তমান সম্পর্কে সঠিক ধারণার সঙ্গে

এই সঙ্কেতগুলিকে যদি মেলানো যায়—তা হলে অতীতকে বোঝার চাবিকাঠি হাতে আসে—মার্ক্স ১৮৫৮তে লিখেছিলেন।

'ক্যাপিটাল'-এর যুক্তিগত সংগঠনকে (লজিক্যাল স্ট্রাকচার) যদি রিকার্ডোর চিন্তা-ভাবনা ও প্রাক্-মার্ক্স তত্ত্ববিদ্‌দের তত্ত্বচিন্তার সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায় তা হলে তথ্যের প্রয়োগ ও বিশ্লেষণে মার্ক্স-এর যুক্তিবিদ্যার বাস্তব ব্যবহারের উদাহরণ পাওয়া যাবে।

আমাদের দেখতে হবে—অর্থনীতির উপাদানগুলির ভিতর থেকে মার্ক্স কী ভাবে সর্বজনীন যুক্তি (ইউনিভার্সাল) নিষ্কাশন করছেন আর সেই সার্বজনীনতার জোরে সেই যুক্তিগুলি অন্য নানা বিষয় সম্পর্কে কী ভাবে ব্যবহায হয়ে উঠছে।

সকলেই জানেন 'ক্যাপিটাল' শুরুই হয় 'ভ্যালু' সম্পর্কে ব্যাপক ও বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে। তার মানে, মার্ক্স প্রথমেই পুঁজির সবচেয়ে সর্বজনীন ও প্রাথমিক উপাদানকে ধরেছেন, সেই উপাদান থেকেই অর্থনৈতিক সম্পর্কের কাঠামো তৈরি হয়েছে। এই বিশ্লেষণে মার্ক্স পরিণত ধনতন্ত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের নিয়ামক একটি বিরল ঘটনাকে বেছে নিয়েছেন—একটি পণ্যের সঙ্গে আর-একটি পণ্যের বিনিময়। অনুসন্ধানের এই স্তরে মার্ক্স আর সব উপাদান বাদ দিয়েছেন—টাকা বা লাভ বা মজুরি। এই সব যেন নেই—এমনটাই ধরে নেয়া হয়েছে।

তৎসত্ত্বেও, এই একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের মধ্য থেকেই পরিণত ধনতন্ত্রের সমস্ত বিষয় ও ক্যাটিগরিই উদ্ঘাটিত হয়েছে, অত্যন্ত নির্দিষ্ট (কংক্রিট) রূপ পেয়েছে, 'ভ্যালু'র সার্বজনীন মাত্রা স্পষ্ট হয়েছে।

'ভ্যালু'র প্রাথমিক অস্তিত্ব 'ভ্যালু'র সার্বজনীন অস্তিত্বের পূর্বশর্ত হিশেবে কাজ করেছে। 'ভ্যালু'র ধরনের বিবর্তন ও পরিণতিতে অন্য নানা চেহারায় রূপান্তরের এই অনুসন্ধানই 'ক্যাপিটাল'-এর ক্যাটিগরিগুলির আধার।

বিজ্ঞানের সমস্ত ক্যাটিগরির মধ্যেই নিহিত যে সার্বজনীন ধারণাকে এখানে মার্ক্স ব্যবহার করেছেন তা শুধু অর্থনীতির নির্দিষ্টতা দিয়ে বোঝা যায় না। এই সর্বজনীন ধারণা দিয়েই প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত বাস্তব অবস্থারই বিশ্লেষণ সম্ভব। এটাই দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যার প্রধান নীতি।

যে কোনো আধুনিক বিকাশের পক্ষে এই ধারণার তাৎপর্য গভীর। মার্ক্স যে-ভাবে 'ভ্যালু'র বিশ্লেষণ করেছেন, সেই পদ্ধতিতেই একজন বৈজ্ঞানিককে উত্তর খুঁজতে হয় জীবতত্ত্বের ক্যাটিগরি হিশেবে জীবনের সংজ্ঞা

কী, সাধারণভাবে জীবন বলতে কী বোঝা যায়, ইত্যাদি। তার মানে যে-প্রাথমিক প্রোটিনে জীবনের প্রমাণ সেখান থেকেই একজন বৈজ্ঞানিককে জীবনের বিকাশ খুঁজতে হবে।

জীবনের সমস্ত রকমের প্রকাশ থেকে জীবনের সাধারণ লক্ষণগুলি টুকরো করে নিয়ে জীবনের সামান্য লক্ষণ বের করা যায় না। অথচ ন্যায়শাস্ত্রের আরোহণ ও অবরোহণের পদ্ধতিতে এই গড়-লক্ষণই খুঁজে বের করায় চেষ্টা হয়।

রসায়নশাস্ত্রেও দেখা যাবে হিলিয়ামের সঙ্গে ইউরেনিয়ামের বা সিলিকোনের সঙ্গে নাইট্রোজেনের বা পিরিয়ডিক টেবলের সব উপাদানের ভিতর কোথায়-কোথায় মিল তার একটি তালিকা তৈরি করে রাসায়নিক উপাদনের চরিত্র নির্ণয় করা যায় না। এই ব্যবস্থায় সহজতম উপাদান হাইড্রোজেনের বিশদ ও ব্যাপক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই রাসায়নিক উপাদানের চরিত্র খানিকটা বোঝা যেতে পারে। হাইড্রোজেনই এখানে সেই প্রাথমিক উপাদান, যা নষ্ট হয়ে গেলে, বস্তুর রাসায়নিক গড়নও নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং হাইড্রোজেন এখানে রসায়নের নির্দিষ্ট সর্বজনীন উপাদান। হাইড্রোজেনের সঙ্গে-সঙ্গে যে-সর্বজনীন নিয়মগুলি তৈরি হয় সেগুলোই রসায়নশাস্ত্রের প্রাথমিক সর্বজনীন্ নিয়ম। প্রাথমিক ও সর্বজনীন এই উপাদান দেখা যাবে, সোনায়, সিলিকনে, এবং আরো সব কিছুতে। এবং জটিল মিশ্র উপাদানগুলি থেকে আবার হাইড্রোজেন নিষ্কাশন করে নেয়া যায়। প্রকৃতিতে সে-রকম হয়, আবার আণবিক গবেষণার ল্যাবরেটরিতেও সে-রকম ঘটানো যায়।

এখানেও সর্বজনীন আর নির্দিষ্টের মধ্যে, প্রাথমিক ও যৌগিকের মধ্যে প্রাণবান এক লেনদেন চলে। তেমনি চলে পুঁজির বিভিন্ন ক্যাটিগরির মধ্যে। সেখানের 'ভ্যালু'র পরিণতিতে মুনাফা আসে, পণ্যের বিকাশে মুনাফা আসে। পরিণততর পণ্য হিশেবে এই মুনাফার দিকেই সমস্ত অর্থনৈতিক সক্রিয়তা চালিত হয়। সেই সক্রিয়তা যে-চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করে তাও এই মুনাফার দিকেই ছুটে চলে। এখানে, কোনো বিমূর্ততার প্রশ্রয় নেই। বরং সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাকে তার নিম্নতম উপাদানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে—অত্যন্ত বাস্তব একটি নিম্নতম উপাদান।

সাধারণভাবে 'ভ্যালু', 'জীবন', 'রাসায়নিক উপাদান'—এগুলি খুব নির্দিষ্ট বস্তু—কোনো বিমূর্তন নয়। তার মানে—এই ধারণাগুলির মধ্যে যে-বাস্তবতা আছে তা বর্তমানে গ্রাহ্য একটি বাস্তবতা, অথবা অতীতের কোনো একটি সময়ে গ্রাহ্য একটি বাস্তবতা। এটা এত নির্দিষ্ট যে তাকে টুকরো করে আর

ভাঙা যায় না। সেইজন্যেই এই উপাদানটিকে আলাদা করে বেছে নেয়া যায়, বিশ্লেষণ করা যায়, পরীক্ষা করা যায় ও বারবার নানা দিক থেকে দেখা যায়।

রিকার্ডোর এই ধারণা ছিল না যে 'ভ্যালু'কে এই প্রাথমিক উপাদান হিশেবে নির্দিষ্ট করা যায়। রিকার্ডোর যুক্তিতে এটা ধরেই নেওয়া হয়েছে মুনাফা, সুদ পুঁজি ও প্রতিযোগিতা—এই সব ধারণা থেকে 'ভ্যালু'কে অলোদা করা যায় না। সেই জন্যে 'ভ্যালু'কে তিনি বিমূর্ততায় নিয়ে যান। 'একদিকে তাকে দোষ দিতে হয় তিনি যতদূর যাওয়া উচিত ততদূর গেলেন না, যে-বিমূর্তন শুরু করলেন তা শেষ করলেন না,······অন্যদিকে তাঁকে দোষ দিতে হয় যে তিনি বাইরের আকারটাকে ধরে নিলেন মূল প্রকৃতি হিশেবে।···একদিকে তাঁর বিমূর্তন অসম্পূর্ণ, আর-একদিকে তাঁর বিমূর্তন শুধু আকারগত বিমূর্তন' (মার্ক্স)।

আমরা আগেই দেখেছি—প্রকৃত বিমূর্তনের অর্থ মোটেই এই নয় যে, যে-বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করা হচ্ছে তার ভিতর কতকগুলি সাধারণ সত্য আবিষ্কার করতে হবে। রাম মরে, শ্যাম মরে, যদু মরে, মধু মরে—সুতরাং মানুষ মরণশীল এটা কোনো বিমূর্তন নয়। বা যুক্তিও নয়। তেমনি, মানুষ মরণশীল, সুতরাং রাম মরে, যদু মরে, মধু মরে—এটাও কোনো যুক্তি নয়। বিমূর্তনের প্রকৃত অর্থ, যে-বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করা হচ্ছে তার প্রাথমিকতম অবিভাজ্য মৌলিক উপাদানের কাছে পৌছতে হবে। 'মানুষ মরণশীল' এর যুক্তি রাম-শ্যামের সাক্ষ্যে নেই, আছে প্রাণের প্রাথমিক প্রোটিনের ক্ষয়ের মধ্যে।

মানুষের বাস্তব সামাজিক জীবন তৈরি হয় সামাজিক উৎপাদনের সাহায্যে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যখন সেই উৎপাদন চলে তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রাথমিকতম উপাদান হল—পণ্য। তাই পণ্যের নিয়মেই মানুষের সেই সমাজ চলবে, যেমন, জীবতত্ত্বে জীবন চলে প্রাথমিকতম প্রোটিন-সেলের নিয়মেই।

ক্ল্যাসিক্যাল বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের পদ্ধতি থেকে মার্ক্স-এর বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। তখনকার যান্ত্রিক প্রকৃতিবিকাশের পদ্ধতি থেকে ১৭ ও ১৮ শতকের অর্থনীতিবিদ্‌রা তাঁদের বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। তাতে বহির্বাস্তবকে ধরা হত অপরিবর্তনীয় কিছু উপাদানের সমষ্টি—সে-সব উপাদান যেন সব বস্তুতেই বর্তমান। এই ধারণা অনুযায়ী কোনো বস্তুর পরিচয় মানেই এই অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলিকে বের করা ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন ঠিক করা।

স্মিথ ও রিকার্ডোর তত্ত্বে 'শ্রম', 'প্রয়োজন', 'মুনাফা'—এই ধারণাগুলিতে বস্তুর ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতা ধ্বংস করে ফেলে তাকে একটা দেশকালহীন চিরকালীন পদার্থে পরিণত করা হয়। কার্টেসীয় পদার্থবিদ্যায় 'পার্টিকল', নিউটনের 'অ্যাটম', এবং সে-সময়ের বৈজ্ঞানিক অন্যান্য ক্যাটিগরিতেও এই দর্শনই কাজ করেছে। স্মিথ ও রিকার্ডো ব্যবস্থা বলতে বুঝেছেন—শ্রম, শ্রমের উপাদান, প্রয়োজন, উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন—এই সব 'সনাতন' ও 'চিরকালীন' বিষয়ের এক অত্যন্ত জটিল সমাবেশ হিশেবে। যেন, এই সব বিষয় দেশকালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

একটা জ্যান্ত ইঁদুরকে মেরে টুকরো-টুকরো করে রাসায়নিক উপাদান, পার্টিকল ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করা যায়। কিন্তু এ-রকম টুকরো-টুকরো বিশ্লেষণের শেষে আমরা উল্টো পদ্ধতিতে এগুলোকে আর জোড়া লাগাতে পারব না। এই উপাদানগুলি তন্নতন্ন বিশ্লেষণ করেও আমরা বুঝতে পারব না—এই কাটাকুটির আগে এই উপাদানগুলি মিলিতভাবে একটা জ্যান্ত ইঁদুরের চেহারায় ছিল কেন?

এই উদাহরণে দেখা যায়—যে জিনিশটিকে বুঝবার জন্যে বিশ্লেষণ—বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে সেটাকেই টুকরো-টুকরো করে ফেলা হয়েছে, মেরে ফেলা হয়েছে, উপাদানগুলিতে পারস্পরিক সম্পর্কের সংশ্লেষকে অসম্ভব করে দিয়েছে। বিশ্লেষণের ফলেই সংশ্লেষ অবান্তর হয়ে গেল।

শ্রম, পুঁজি, মুনাফা—এই সব উপাদানগুলির ভিতরের অন্তর্সম্পর্ক ও তাদের সংশ্লেষ বোঝাটা যে স্মিথ-রিকার্ডোর পক্ষে সম্ভব হল না তার কারণ তাঁরা বিশ্লেষণের নামে ঐ উপাদানগুলির ভিতর দিয়ে ইতিহাসের যে-নির্দিষ্টতা যোগসূত্রের কাজ করেছে তাকেই ধ্বংস করেছেন।

অ্যারিস্টটলও বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে একপেশে বিশ্লেষণে বস্তুর স্বরূপ জানা যায় না। তাঁর 'মেটাফিজিক্স'-এ তিনি বলেন যে যে-কোনো বস্তুর পরিচয় পেতে হবে দুই উপায়ে—এটাও বুঝতে হবে এই বিশেষ উপাদানগুলি বিশেষ এই ভাবেই কেন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যে তাদের মিশ্রনে ঐ বস্তুটিই তৈরি হয়েছে, অন্য বস্তু হয় নি।

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষের এই জটিলতা বহুগুণ বেড়ে যায় যখন আমরা তাত্ত্বিক কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে চাই। আমরা একটি বস্তুকে বর্ণনা করতে গিয়ে যখন বলি, 'সব হাঁসেরই রং শাদা', বা 'সব কাকের রং কালো', তখন আমরা

মনে-মনে একসঙ্গে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষের কাজ করি। কিন্তু তার ফলে বস্তু-পরিচয়ের কোনো হেরফের হয় না। কালো হাঁস বা শাদা কাক দেখা গেলে আমাদের সিদ্ধান্তটাই শুধু বদলে যাবে—হাঁস বা কাকের কিছু এসে যাবে না। আমাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলল না বলে হাঁসের হাঁসত্ব বা কাকের কাকত্ব বিন্দুমাত্র বদলাবে না। কিন্তু তত্ত্বের ক্ষেত্রে আমরা যখন একটা নিয়ম তৈরি করে চলি—'প্রকৃতির সব বস্তুই সম্প্রসারণশীল', তখন আমরা দুটো সংক্ষেপে সংশ্লেষ করছি—'অসম্প্রসারণশীল কোনো বস্তু প্রকৃতিতে নেই', 'এমন কোনো সম্প্রসারণ ঘটতেই পারে না যা প্রাকৃতিক বস্তুর একটি আবশ্যিক উপাদান নয়।' এ-রকম তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে এমন কতকগুলি বিমূর্তনকে আমরা জোড়া লাগাই যা ছাড়া বস্তুটির অস্তিত্বই থাকে না। হাঁস বা কাক যথাক্রমে কালো বা শাদা হতেও পারে—কিন্তু একটি বস্তুকে ধ্বংস না করে তার ভিতরের সম্প্রসারণশীলতা বন্ধ করা যাবে না।

সেই কারণেই একটি নির্দিষ্ট বস্তুর সেই উপাদানগুলিকেই আমরা তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের সংশ্লেষে চাই—যে উপাদানগুলি ছাড়া বস্তুটির কোনো অস্তিত্বই নেই।

কিন্তু তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে সেটাই করা যাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? একটি বস্তুর এই অপরিহার্য মৌলিক উপাদানগুলির সংশ্লেষ-পদ্ধতি আমাদের বুঝতে হয় বাস্তব পরীক্ষা করে ও ইতিহাসের সমগ্রতায় মানুষের সামাজিক ব্যবহারবিধি দিয়ে।

সামাজিক মানুষের ব্যবহার, অর্থাৎ, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তর্সম্পর্কের ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত নানা ধরনের সমগ্রতাই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষের ভুল-ঠিক পরীক্ষার যথার্থ নিরিখ।

অর্থনীতিতে এটা কীভাবে হয়েছে?

'শ্রম' ও তার সঙ্গে যুক্ত 'ভ্যালু' দিয়ে আমরা এখানে পৌঁছতে পারি। 'ভ্যালু' দিয়ে আমরা তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের যথার্থ পরীক্ষা করতে পারি, তেমনি 'শ্রম' কে 'ভ্যালু'-র সার ধরে নিয়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্য বিষয়গুলোকে বুঝতে পারি।

কিন্তু এই কথাটি কি সত্য—'ভ্যালুর সার হচ্ছে 'শ্রম'? না, এটা সত্য নয়। তত্ত্বের দিক থেকে এ-কথার অর্থ, 'মানুষ স্বভাবগতভাবেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক'। এর অর্থ প্রকৃতির বস্তুতে যেমন সম্প্রসারণশীলতা, মানুষের স্বভাবে তেমনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা একটি অপরিহার্য উপাদান।

অন্য ভাষায়, বাস্তবে একটি নির্দিষ্ট ঘটনায় যে-উপাদান দেখা যাচ্ছে সেগুলো 'শ্রম' ও 'ভ্যালু'র স্বভাবে নিহিত নয়।

মার্ক্স এর একটা খুব পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেন।

ভ্যালুর সার শ্রম নয়। সব শ্রম 'ভ্যালু' তৈরি করে না। ইতিহাসের দ্বারা 'নির্দিষ্ট' একটি বিশেষ শ্রম 'ভ্যালু' তৈরি করে। তেমনি মানুষ হলেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হয় না। কিন্তু ইতিহাসের দ্বারা নির্দিষ্ট একটি মানুষ, একজন সামাজিক মানুষ, সম্পত্তির মালিক হতে পারে।

কিন্তু কী করে এই পার্থক্য বোঝা যাবে—মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে সেই নির্দিষ্ট উপাদানের অবস্থান বা ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সেই নির্দিষ্ট উপাদানের অবস্থান ?

এটা একমাত্র সম্ভব মানবজাতির সামগ্রিক অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে আলোচ্য বাস্তব অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। বস্তুর অন্তর্নিহিত চরিত্রের অপরিহার্য উপাদান এই ঐতিহাসিক নির্দিষ্টতাতেই একমাত্র উদ্ঘাটিত হতে পারে।

স্মিথ-রিকার্ডোর সময় ও মার্ক্স-এর সময় ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হিশেবেই ছিল মানুষের প্রধান পরিচয়। শ্রম শুধু উৎপন্নদ্রব্যই তৈরি করে না—তৈরি করে পণ্য ও 'ভ্যালু'—একথাও তখন থেকেই জানা।

তখনকার অর্থনীতিবিদ্‌রা এই জানা কথাকে একটা প্রতিজ্ঞার চেহারা দিলেন—' 'ভ্যালু'র সার শ্রম'। কিন্তু এটা যেন একটা সার্বজনীন সত্য'। তাঁরা এই নির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব দিলেন না—একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পর্বে শ্রম কেন উৎপন্নদ্রব্যই তৈরি করে না—তৈরি করে পণ্য, শুধু ব্যবহারযোগ্য-ভ্যালুই তৈরি করে না—তৈরি করে বিমূর্ত 'ভ্যালু'।

একপেশে বিশ্লেষণের জন্যেই এই ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌রা বুঝতে পারলেন না—শ্রমকে কখনো পুঁজি, কখনো মজুরি, কখনো ভাড়া বলে মনে হয় কেন।

১৭ ও ১৮ শতকের প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও অর্থবিজ্ঞানীরা নিজেদের ওপর যে-কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তা সমাধানের শক্তি তাঁদের ছিল না। প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের সামনে প্রশ্ন ছিল—অ্যাটম,পার্টিকল, মোনাড মিলে কখনো সৌরজগতের কোনো উপাদান তৈরি হচ্ছে কেন, কখনো তৈরি হচ্ছে কেন একটা ছোট্ট প্রাণী। অর্থবিজ্ঞানীদের সামনে প্রশ্ন ছিল—শ্রম কখনো পুঁজি, কখনো ভাড়া, কখনো মজুরি হচ্ছে কেন।

এঁদের বিশ্লেষণে এঁরা সমস্যাকে নির্দিষ্টভাবে নেন নি বরং বিষয়কে দেশকালনিরপেক্ষ কতকগুলি ভাগে ভাগ করে দেখেছেন।

সাধারণভাবে—শ্রমের অস্তিত্ব আছে বলেই রেণ্ট, পুঁজি, মজুরি এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অন্যান্য নানা উপাদানও আছে। কিন্তু, আবার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রমই আবার এই ক্যাটিগরিগুলির ধ্বংসের কারণ। সাধারণভাবে শ্রম থেকে পুঁজির জন্মও হতে পারে, ধ্বংসও হতে পারে। পুঁজির আবির্ভাবের জন্যে শ্রম হচ্ছে সার্বজনীন পূর্বশর্ত কিন্তু শ্রম পুঁজির আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের পূর্বশর্ত নয়, সেই শর্ত নয় যা পুঁজি থেকেই জন্মায়। পুঁজির ভিতরে শ্রমের সঙ্গে পারস্পরিক এই সাপেক্ষতা নেই।

এ-কথাই মার্ক্স বলেছেন, 'শ্রম থেকে সরাসরি পুঁজিতে যাওয়া ততটাই অসম্ভব, মানবজাতির বিভিন্ন ধারা থেকে একজন ব্যাঙ্কারের কাছে পৌছুনো, বা প্রকৃতি থেকে বাষ্পীয় ইঞ্জিনে পৌছুনো যতটা অসম্ভব।'

মার্ক্স-এর এই কথায় ফয়েরবাখের সেই বিখ্যাত কৌতুকেরই প্রতিধ্বনি—'প্রকৃতি থেকে এমন-কি একজন অফিসার বানানোও সরাসরি সম্ভব নয়।' মার্ক্স যুক্তিশাস্ত্রের সমস্যার সমাধান করেছিলেন এইভাবে—নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক, সাপেক্ষ কার্যকারণে বাঁধা ঘটনাও বিষয়ের পারস্পরিকতার শর্ত—এই দুটোকে ধরলেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষের সমাধান সম্ভব।

কথাটাকে অন্যভাবেও বলা যায়। যে-কোনো ঐতিহাসিক বাস্তবতাই একাধিক ঘটনার সংঘাতে বিকশিত হয়। এইভাবে দেখলেই বস্তুর বাস্তবতা উদ্‌ঘাটিত হয়। আর তা হলেই বিশ্লেষণ-সংশ্লেষ, আরোহণ-অবরোহণ এগুলির পারস্পরিক বৈপরীত্য ঘুচে যায়। তখন আর এগুলো যুক্তিবিদ্যার নিষ্প্রাণ উপাদানমাত্র থাকে না—পরিবর্তমান ইতিহাসের উপাদান হয়ে ওঠে।

এই পদ্ধতিকেই মার্ক্স তাঁর বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষে ব্যবহার করেছেন।

স্মিথ ও রিকার্ডো, এমন-কি হেগেলেও, আপাত-সংশ্লেষকেই চরম সংশ্লেষ হিশেবে উপস্থিত করা হয়েছে। তাঁরা সব সময়ই ইতিহাসের পরিবর্তমান উপাদানকে দেখিয়েছেন ইতিহাসের স্থায়ী উপাদান হিশেবে। তাঁদের চোখের সামনে যে-ঘটনা ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করার কাজেই তাঁরা আরোহণ-অবরোহণ ইত্যাদি সব পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

আর, মার্ক্স করেছেন ঠিক এর উল্টো—যাতে, এ-রকম হাতের কাছে যা-পাওয়া গেল তাকেই যুক্তিশাস্ত্রের কাঠামোয় ফেলে একটা তত্ত্ব খাড়া করে ফেলা না হয়।

মার্ক্স-এর পদ্ধতিতে সমগ্র থেকে আরোহণ শুরু বলে তাত্ত্বিক সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি থেকে 'ডিডাকশন' সম্ভব হয়। আর তা থেকেই আসে, একটি ঘটনা থেকে আর-একটি ঘটনার 'অবরোহণ'। যেমন, পণ্যবাজারের গতি থেকে টাকা>শ্রমশক্তিযুক্ত পণ্য-টাকা>চক্রের গতি থেকে পুঁজি। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টির জন্যেই মার্ক্স এত নির্দিষ্টভাবে শ্রমের উৎপাদনের প্রকৃত 'ভ্যালু' কী, তা এমন আঙ্কিক যাথার্থে নিরূপণ করেন, এবং অর্থনীতির আরো সব নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ক্যাটিগরিগুলির ভিতর নিহিত সার্বজনীনতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

এর আগে ধরে নেওয়া হত—'ভ্যালুর সার শ্রম'। মার্ক্স দেখালেন, এই শ্রমটি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক 'ফর্ম'। 'ভ্যালু'র গড়ন নিয়েও নতুন কথা এলো। 'ভ্যালু'ও একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ক্যাটিগরি। সেখান থেকেই আমরা নিষ্কাসিত করতে পারি, কোথায় কোন বাস্তব ঐতিহাসিক প্রয়োজনে 'ভ্যালু' বদলে যাচ্ছে 'উদ্‌বৃত্ত মূল্যে'—সারপ্লাশ ভ্যালুতে—সেখান থেকে পুঁজিতে, মজুরিতে।

এই প্রথম, আমরা হাতে এমন একটা পদ্ধতি পেলাম, যেখানে উৎস থেকে বিশ্লেষণ করতে-করতে বস্তু, ব্যবস্থা ও তার অন্তর্সম্পর্ক নিয়ে আমরা সম্পূর্ণ ধারণায় পৌছতে পারি।

একটি বস্তুর স্বরূপ ও সংজ্ঞা নির্ণয়ে পারস্পরিক বৈপরীত্যকে—কনট্রাডিক-শনকে হিশেবে আনতে হবে। একমাত্র মার্ক্সের পদ্ধতিতেই তা সম্ভব। কনট্রাডিকশন মানে বিপরীতের ঐক্য ও সহাবস্থান—এখান থেকে মার্ক্স 'কংক্রিট'কে নির্দিষ্টকে ধরতে পারলেন ও সেখান থেকে ধারণায়, কনসেপ্টে, এই কংক্রিটকে প্রকাশ করতে পারলেন।

যুক্তিশাস্ত্রে, দর্শনে, এই প্রশ্নটিই বারবার উঠেছে—বস্তুর স্বরূপে এই বৈপরীত্যের সমাবেশ কি সঙ্গত না অসঙ্গত? এটা কি কেবল যে-জানছে তার মনের ব্যাপার, জানার পদ্ধতির ব্যাপার, নাকি, বস্তুর মধ্যেই এই বৈপরীত্য নিহিত।

ডায়ালেকটিস আর মেটাফিজিকস—দ্বান্দ্বিকতা ও পরাবিদ্যা—এখানেই এ দুইয়ের সীমান্ত।

পরাবিদ্যায় ওই বৈপরীত্য কেবল এক অস্থায়ী মানসিক ব্যাপার। 'সনাতন', 'চিরন্তন' 'স্থায়ী' সব বিষয় আছে—তারা এই বৈপরীত্য ঘুচিয়ে দেয়। ডায়ালেকটিকস এই বৈপরীত্যকে বস্তুর অন্তর্সত্তার অপরিহার্য উপাদান বলে মনে

করে—এ-ছাড়া কোনো বস্তুকে জানাই সম্ভব নয়, কোনো বস্তুকে জানা মানেই তার বিপরীত উপাদানগুলিকে জানা।

দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসে মার্ক্সই প্রথম 'বিপরীত'কে জ্ঞানের 'মেথড' বা 'পদ্ধতি' হিশেবে ব্যবহার করলেন। তাতে জ্ঞানের কোনো নতুন জগৎ উন্মোচিত হল কি না সেটা প্রধান বিষয় নয়, জ্ঞানের নতুন-নতুন জগৎ সভ্যতার ইতিহাসে তো ইতিপূর্বেও আবিষ্কৃত হয়েছে, নির্মিত হয়েছে। মার্ক্স প্রথম আমাদের সেই পথের সামনে এনে দাঁড়া করালেন—যে-পথে, একমাত্র যে-পথে, বস্তুর স্বরূপে পৌছুনো যায়।

মার্ক্স-এর 'এইটিনথ ব্রুমেয়ার'

জিতেন্দ্রনাথ প্রামাণিক

এক

ইতিহাসে এর-একটি সময়ের তাৎপর্য সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়তে থাকে। সমকালীনে যাকে মনে হয় সামান্য একটি ঘটনা, সময়ের দূরত্বে তাকেই মনে হয় ইতিহাসের একটি সন্ধি। 'যুগান্তর', 'কালান্তর' বা 'পর্যান্তর' বলতে পরের সময়ের মানুষ যে-অতীত সময়কে নিঃসন্দিগ্ধ বেছে নেয়, সেই যুগান্তরের সমকালীনরা তা পারেন না।

১৮৪৮-এর ইয়োরোপ তেমনই একটি সময়।

বিশেষত ফ্রান্সে ও জার্মানিতে সেদিন যে-স্বল্পস্থায়ী ঘটনা ঘটেছিল, তাকে সমাজ-রূপান্তরের মহড়া বলে কেউই প্রায় মনে করতে চান নি। এই ব্যর্থ বিপ্লবী ঘটনামালার মধ্য দিয়ে ইয়োরোপীয় প্রলেতারিয়েত তার নতুন শক্তির প্রমাণ নিজের কাছে যাচাই করে নিচ্ছে আর সেই সুবাদেই ইয়োরোপীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের সম্পর্কের ধরনটা সাব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে—এমনটি সকলের মনে হয় নি। যাঁদের হয়েছিল তাঁদের কথা শুনবার লোক খুব বেশি ছিল না, শোনাবার ব্যবস্থাও খুব বিশদ ছিল না।

কিন্তু ১৮৪৮-এর পর বছর পঁচিশ না-পেরতেই প্যারি কমিউন, আর, তার পঞ্চাশ বছর না-পেরতেই সোভিয়েত বিপ্লব, আর তার চল্লিশ পেরতে না-পেরতেই বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বীকৃতি—ইতিহাসের এক অন্য কার্য-

কারণকে সত্য করে তুলল। যদি বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রমাণিত না হত তাহলে সোভিয়েত এখনো হয়ে থাকত এক ব্যতিক্রম, এক সন্দেহজনক ব্যতিক্রম। যদি সোভিয়েত বিপ্লব না ঘটত, তা হলে প্যারি কমিউন হয়ে থাকত ইতিহাসের একটি সম্ভাবনাময় ঘটনা—নতুন কার্যকারণের উৎস নয়। যদি প্যারি কমিউন না ঘটত তা হলে ১৮৪৮ হয়ে থাকত বুর্জোয়া বিকাশেরই অন্তর্গত একটি ঘটনা—তার বিপরীত শক্তির জন্মক্ষণ নয়।

পরবর্তী ইতিহাস এইভাবেই পূর্ববর্তী ইতিহাসের অর্থ বদলে দেয়।

সেই পরিবর্তিত অর্থে আজ ১৮৪৮ হয়ে দাঁড়ায় বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অ্যান্টিথিসিসের ঐতিহাসিক কার্যকারিতার জন্মক্ষণ। আর, উনিশ শতকের শেষার্ধ আর বিশ শতকের প্রথম কয়েক বছর জোড়া টয়েনবি কথিত শান্তি বা সমৃদ্ধি পর্ব আজকের ইতিহাসের বিচারে হয়ে ওঠে প্রস্তুতিপর্ব—মানুষের মহাকাব্যে এই পর্বকেই অজ্ঞাতবাসের বা বনবাসের বা নির্বাসনের কাল বলা হয়ে থাকে।

ত্রিশ বছর বয়সের মার্ক্স সেদিনই এই জায়মান এপিককে চিনতে পেরেছিলেন। দর্শনের আভ্যন্তরীণ পথ দিয়ে তিনি সবে তখন হেগেল থেকে, তরুণ-হেগেলপন্থা থেকেও, বেরিয়ে এসেছেন কিন্তু তখনো তাঁর কাছে পরিষ্কার হয় নি হেগেলোত্তর ডায়ালেকটিকসের ক্যাটিগরিগুলি। তখনো ডায়লেকটিকসকে তিনি দু পায়ের ওপর পুরোপুরি দাঁড় করান নি। কিন্তু তত্ত্বের সেই অসম্পূর্ণতা তুচ্ছ হয়ে গেছে বাস্তব ঘটনার তুমুল আক্রমণে। 'সারা ইয়োরোপ এক ভূতের তাড়ায় ছুটছে, কমিউনিজমের ভূত'-এ কথা আজ ইয়োরোপ-আমেরিকার দুনিয়া সম্পর্কে যত সত্য, ১৮৪৮-এ তার কণামাত্রাও ছিল না। সেদিন মার্ক্স ইতিহাসের ঘটনা বলে যা উল্লেখ করেছিলেন—তা আসলে ছিল ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সত্য, বাইরের সত্য নয়। কিন্তু সেই সত্যের জোর এত বেশি ছিল যে 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'-তে ভূতের তাড়াগ্রস্ত ইয়োরোপের আত্মরক্ষার পাগলামি তিনি দেখতে পান, তার দু বছরের মধ্যে তাঁকে জানাতে হয় ক্ষমতাবান, ঐক্যবদ্ধ প্রতিবিপ্লব তৈরি করাটা বিপ্লবের প্রগতিরই প্রমাণ ('ক্লাশ স্ট্রাগলস ইন ফ্রান্স')। তার দু বছরের মধ্যে সেই প্রতিবিপ্লবের প্রহসনের চিত্রনাট্য তিনি লেখেন 'এইটিনথ ব্রুমেয়ার'-এ।

শুধু যখন মার্ক্স-এর জীবন ও কর্মের দিক থেকে এই লেখা কটির দিকে তাকানো যায়, তখন, আমরা প্রায় আনন্দিত বিস্ময়ে দেখি এক ভবিষ্যতের কমিউনিষ্ট মানুষকে—আজ থেকে একশ বছরেরও সেই অতীতে। ১৮৪৪-এর

ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল ম্যানাসক্রিপ্ট' আর 'হোলি ফ্যামিলি', ১৮৪৬-এর 'জার্মান ইডিওলজি' ও পরের বছর 'দি পভার্টি অব ফিলজফি'র মধ্য দিয়ে এই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের তরুণ, হেগেল থেকে, তরুণ হেগেলিয়ানদের দর্শন থেকে, দর্শনের যুক্তিতে-যুক্তিতে সরে আসছেন। এই সব লেখার অনেকগুলো তখন প্রকাশিতই হয় নি কিন্তু মার্ক্স-এর ভাষায়, তাতে কিছু এসে যায় নি, কারণ বইগুলো লিখতে-লিখতে তাঁদের জিজ্ঞাসা স্পষ্ট হয়েছে। দর্শনের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নতুন ন্যায়-প্রতিষ্ঠার সেই মনন-দায় মেটাতে হয় তৎকালীন বাস্তবতার এক ধারাবিবরণ রচনায়। আপাত বিচারের এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য—প্রুদোঁ-হেগেলের সঙ্গে তাত্ত্বিক বিতর্ক আর সমকালীন ঘটনার তথ্য-বিশ্লেষণ। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৫১-এর ডিসেম্বরে লুই বোনাপার্টির ক্ষমতাদখল পর্যন্ত ঘটনাকে এই দুটো ছোট বইয়ে ব্যাখ্যা করে তরুণ মার্ক্স এক অদ্ভুত দায়িত্ব মেনে নিয়েছিলেন—সে-দায়িত্বের কথা তখনও অপ্রকাশিত 'জার্মান ইডিওলজি'র পাণ্ডুলিপিতে গোপন ছিল—'দার্শনিকেরা দুনিয়ার ব্যাখ্যা বহু করেছেন—এখন দরকার সেটা বদলানো'। তরুণ মার্ক্স দর্শনের ইতিহাস থেকে ডায়ালেকটিকসকে মুক্ত করে এনে ব্যবহার করলেন ইতিহাসকে বদলানোর কাজে।

এই দুটো বইয়ের ঔজ্জ্বল্য ও অন্তর্দৃষ্টি এমন-কি মার্ক্সেও বিরল। তীক্ষ্ণ রসবোধ, শ্লেষ, সাহিত্যক্ষমতা - দুটো বইয়ের প্রতিটি লাইন রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। এই দুটি বই—লেখা হচ্ছিল সমকালীন ঘটনার ব্যাখ্যায়। অথচ লেখার ভঙ্গিতে প্রতিটি লাইন হয়ে উঠছিল সেই ঘটনা সম্পর্কে এমন এক মন্তব্য যা থেকে পরবর্তী লাইনটি বেরিয়ে আসছিল নীরন্ধ্র যুক্তির টানে, অথচ মন্তব্যের স্বয়ংভরতায় আবার হয়ে উঠছিল স্বতন্ত্র।

মার্ক্সকে এখানে অনিবার্যতই দেখতে হয় বিশ্বসাহিত্যের ক্লাসিকসের পাশে—যে গ্রিক নাটক, দান্তে ও শেকস্পিয়ার তাঁর এত প্রিয় সেই সব রচনার তুলনায়। কবিত্বের মহৎ উচ্চারণে এই শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিতে অত্যন্ত নির্দিষ্ট একটি ঘটনা সম্পর্কে অত্যন্ত নির্দিষ্ট একটি চরিত্রের উক্তি যেমন সেই নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে সত্য হয়ে ওঠে, তেমনি সত্য হয়ে ওঠে এক সর্বজনীন সত্য হিশেবে।

সমকালীন ঘটনা নিয়ে লেখা এই ঐতিহাসিক বিবরণ তাই একদিকে হয়ে উঠেছে—ইতিহাসে তাঁর নিজস্ব দর্শনের প্রতিফলন, ও সমকালীন ইতিহাসের বিচারপদ্ধতির প্রমাণ, তেমনি অপরদিকে হয়ে উঠেছে তৎকালীন শিল্প-

সাহিত্যেরই সহযোগী, যে-শিল্প সাহিত্যে সমকালীন বাস্তবতাকে ধরার চেষ্টা চলছিল। যে-ফ্রান্স নিয়ে মার্ক্স তাঁর এই বই লিখছিলেন ও আমাদের সামনে সাজিয়ে দিতে চাইছিলেন ফ্রান্সের সামাজিক বাস্তবতার এক অন্তর্চিত্র, সেই ফ্রান্স নিয়ে তখন বালজাক তাঁর উপন্যাসমালা শেষ করেছেন, ফ্লবেয়ার ও স্তাঁদাল তখনো সক্রিয়। 'ব্রুমায়ার'-এর রচনাকালে বালজাক জীবিত নেই। জুলাই-রাজত্বের ঔপন্যাসিক স্তাঁদাল মারা গেছেন 'ব্রুমেয়ার'-এর বছর দশেক আগে। আর ফ্লবেয়ার ব্রুমেয়ারের দিনগুলো থেকে প্যারি কমিউনের দিকে চলেছেন।

মার্ক্স-এর 'ক্লাশ-স্ট্রাগলস', 'এইটিনথ ব্রুমেয়ার' আর 'সিভিল ওয়ার'কে এই সৃষ্টিশীল গদ্যের পাশাপাশি রাখলে এক প্রতিতুলনা জাগে—কী ভাবে উপন্যাসে সমকালীন-তথ্য হয়ে উঠছে মানবসম্পর্কের কাহিনী আর মার্ক্সের রচনায় মানবসম্পর্ক তার ভিত্তি খুঁজে ফিরছে।

তাই, মার্ক্সের রচনাবলির মধ্যে এই তিনটি বই সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়—রাজনীতির তত্ত্বের দিক থেকে, ইতিহাসের রচনা-পদ্ধতির দিক থেকে।

এই রকমই এক আলোচনার সমাবেশ ঘটেছিল এসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৭-এ। সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল "সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব: ১৮৪৮।" আর 'ব্রুমেয়ার'-এর ওপরই উপস্থাপিত হয়েছিল দুটি মত—একটি ইতিহাসের দিক থেকে, আর একটি শিল্পকর্মের দিক থেকে। প্রথম মতটি উত্থাপন করেছিলেন লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের লরেন্স ওয়াইল্ড, দ্বিতীয় মতটি এসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জন কুমবেস। এখানে আমরা সেই দুইটি মত তাঁদের ভাষাতেই একটু সংক্ষেপে উপস্থিত করে—একেবারে শেষাংশে আমাদের মত বলব।

দুই

প্রথম মত: লরেন্স ওয়াইল্ড

ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যায় শ্রেণীর ভূমিকাই প্রধান। ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮ থেকে ডিসেম্বর ১৮৫১ এই সময়ের বিভিন্ন ঘটনা থেকে ফ্রান্সের অর্থনীতি, রাজনীতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে মার্কস কী বুঝেছেন তা 'এইটিনথ ব্রুমেয়ার' থেকে কতটা জানা যায়—এই নিবন্ধে আমরা সেটা দেখবার চেষ্টা করি। অর্থনীতির দিক থেকে শ্রেণী আর রাজনীতির দিক থেকে বিভিন্ন পার্টির ভিতরকার সম্পর্ক কতটা কার্যকারণ ঘটিত সেটাও এই বইটি থেকে দেখার

চেষ্টা করব। আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করব যে প্রথমে 'মেনিফেস্টো'তে পরে 'ক্যাপিটাল' ও 'দি সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স'-এ মার্কস-এর ভবিষ্যদ্বাণী একটু বেশি আশাব্যঞ্জক। বিশেষত 'বুর্জোয়াভবন', 'সোস্যাল ডিমোক্রেসি', 'প্রলেতারিয়েত' ও কৃষক আর লুম্পেন প্রলেতারিয়েতের প্রভাব—এই বিষয়গুলিকে একটু গভীরে বিচার করা হবে।

আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে 'ক্রমেয়ায়' ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার একটি চমৎকার উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক হিসেবে মার্ক্সের অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর। কিন্তু শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্ক নির্ণয়ের বেলায় তিনি প্রলেতারিয়েতকে দেখেছেন একটু ভাসা-ভাসা আর বোনাপার্টির ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে তার আন্দাজ ঠিক ছিল না।

১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে লুই ফিলিপের রাজত্ব গেল আর ডিসেম্বর ১৯৫১ তে লুই নেপোলিয়ান কুদেতা করে রাজত্ব পেলেন। ১৭৯৯-এর ৯ নভেম্বর নেপোলিয়ান বোনাপার্টি বিদ্রোহ করে শাসন ক্ষমতা দখল করেছিলেন, বিপ্লবী পাঁজি অনুযায়ী অষ্টম বর্ষের অষ্টাদশ ক্রমেয়ার। সেই ইতিহাসের এক হাস্যকর পুনরাভিনয়ই লুই নেপোলিয়ান করলেন ১৮৫১-তে। মার্ক্স বইটির নামকরণ থেকেই সেই প্রতিতুলনায় আক্রমণ শুরু করেন। ১৮৬৯-এর সংস্করণের ভূমিকায় মার্কস স্পষ্ট বলেছিলেন, "ফ্রান্সের শ্রেণীসংগ্রাম এমন অবস্থা ও পরিস্থিতি কী করে তৈরি করেছিল যাতে এরকম একটা উদ্ভট গড়-পড়তা লোক একেবারে হিরো হয়ে উঠল—সেটাই আমি দেখিয়েছি ”

বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতরকার এই সংঘর্ষকে ব্যাখ্যা করেই মার্ক্স তাঁর মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন। এর আগে 'ক্লাশ স্ট্রাগলস ইন ফ্রান্স'-এও তিনি এই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখনো পরিস্থিতি পেকে ওঠে নি, ঘটনাগুলো দানা বাঁধে নি। এই দুটো বইয়েই শ্রেণীগুলির পরস্পরের সম্পর্কের এক জটিল জালকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। মার্ক্সের মতে, অর্থনৈতিক ভূমিকা দিয়েই শ্রেণীর গড়ন সাব্যস্ত হয়। ফ্রান্সের সামাজিক সংগঠনের শ্রেণীচরিত্র মার্ক্স ভেঙে-ভেঙে দেখান নি—ধরেই নেয়া হয়েছে সেই সমাজে শ্রেণীবৈষম্য আছে। যে-সব শ্রেণীকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন, সেগুলো হল, জমিদারি ও জোতদারি —তিনি অনুমান করেছেন এই শ্রেণী বুর্জোয়াসির মধ্যে চলে এসেছে; বুর্জোয়াসির দুই ভাগ—শিল্পোৎপাদনের বুর্জোয়া আর ব্যবসায়ী বুর্জোয়া। মধ্যবিত্ত বলতে বোঝায় 'দোকানদার' তো বটেই, তা ছাড়াও ছোট কারিগর ও কেরানিরাও। 'প্রলেতারিয়েত'-এর প্রায় শৈশব বলে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি

কৃষকসমাজ। আর লুম্পেন-প্রলেতারিয়েতের একটি তালিকাই মার্ক্স দিয়েছেন—গণিকালয়ের মালিক, দালাল, ভিখারি, মাস্তান, পকেটমার, গুণ্ডা ইত্যাদি।

'ব্রুমেয়ার'-এ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রমাণ কী ও মার্ক্স শ্রেণীর সঙ্গে রাজনৈতিক পার্টিগুলির কার্যকারণের কী সম্পর্ক প্রমাণ করেছেন।

ম্যানিফেস্টোতেই মার্ক্স বলেছিলেন তিনি মনে করেন ইতিহাস মানেই শ্রেণীসংগ্রামের ধারাবাহিকতা—উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদনের মালিকানার সম্পর্কের ভিতর অসমতা থেকেই তার প্রকাশ। 'ব্রুমেয়ার'-এ দেখানো হল—মুখে ভাল-ভাল যত কথাই বলা হোক না কেন তার আসল উদ্দেশ্য একটি শ্রেণীর অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য গোপন করা। 'এ কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমির' ভূমিকায় ১৮৫৯-এ মার্ক্স সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মূলসূত্রটি বলেছিলেন। সেখানে বলা হয়েছে যে, উৎপাদন সম্পর্কগুলি "একটি সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করে, এই বস্তুভিত্তির ওপরই আইনি ও রাজনৈতিক ওপরতলা তৈরি হয় ও সামাজিক চৈতন্যের নির্দিষ্ট রূপও সাব্যস্ত হয় এই বস্তুভিত্তির দ্বারাই।" 'ব্রুমেয়ার'-এ যে রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জ ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলিও উৎপাদন-সম্পর্কের ও উৎপাদনের মালিকানার ভিতরকার অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ওপরতলায় কেমন ঘটছে তার উদাহরণ। জুলাই-রাজতন্ত্রের ফলে শিল্পায়ন ব্যাহত হয়েছে, মার্ক্স তাই ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবকে দেখেন বুর্জোয়াদের নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ হিশেবে—"ফেব্রুয়ারির প্রথম লক্ষ ছিল নির্বাচনসংস্কার, মালিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতার সীমা বাড়ানো, আর আর্থিকব্যবস্থা যার হাতে, সেই অভিজাতশ্রেণীর ক্ষমতা হ্রাস।"

এই 'ব্যাঙ্কোক্রেসি'র চরিত্ররচনার পক্ষে স্তাঁদালের একটি উক্তি উদ্ধৃত হয়ে থাকে, "ব্যাঙ্কাররাই ত জাতির প্রাণ।...বুর্জোয়াশ্রেণীর ভিতর অভিজাত হচ্ছে ব্যাঙ্কাররা।"

অষ্টাদশ লুই ও দশম চার্লসের রাজত্বে ভূস্বামীরা দেশের অর্থনীতিতে যে-প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল, ১৮৩০-এর বিপ্লবে সেই ভূমিকা নেয় এই নতুন ব্যাঙ্কাররা। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারির পর এই দুই শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিল বুর্বন ও অর্লিনিস্টরা। এই দুই দলের মধ্যে রাজসিংহাসনে আইনসঙ্গত দখল কার, ঐতিহাসিক দখল কার ইত্যাদি নিয়ে খুব আদর্শের তর্ক হত। কিন্তু তারা যে-কিছুতেই এক হতে পারছিল না তার প্রধান কারণ পুঁজির সঙ্গে

ভূসম্পত্তির চিরকালীন বিরোধ। তারা যে অর্থহীন কথার আড়ালে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে যাচ্ছে তা নয়, তারা খুব-সৎ আত্মপ্রবঞ্চনাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছিল।

কিন্তু মার্ক্স যে-ভাবে 'শুদ্ধ' গণতন্ত্রবাদীদের রাজনৈতিক কর্মসূচির ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে রাজনৈতিক পার্টির অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি হয়। এই গণতন্ত্রবাদীরা মোটেই রাজতন্ত্রী ছিলেন না। "কোনো সাধারণ স্বার্থে ও উৎপাদন সম্পর্কের একটি বিশেষ পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে, এই গণতন্ত্রবাদীরা অন্য সবার থেকে আলাদা ছিলেন না। এঁরা ছিলেন বুর্জোয়াসির অন্তর্গত একটা ছোট অংশ—লেখক, উকিল, অফিসার, কেরানি। লুই ফিলিপের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ব্যাপক অসন্তোষের জন্যেই এই গণতন্ত্রীদের পার্টির প্রভাব বেড়েছে। পুরনো গণতন্ত্রের স্মৃতিতে, কারো-কারো গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের জন্যে ও সর্বোপরি ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদের ফলে—এই প্রভাব আরো বেড়েছে। কারণ এই গণতন্ত্রীরা বরাবর ভিয়েনাচুক্তির ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে চুক্তির বিরোধিতা করেছে।

ব্যাঙ্কাররা ও শিল্পপতিরা ব্যক্তিগত উৎপাদন-সম্পদের মালিকানা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, আর, এই উকিল-অফিসার-লেখকরা ব্যস্ত ছিলেন মনের ফসল নিয়ে। কিন্তু মার্ক্স তাদেরও বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্তর্গত করেছেন। ব্যক্তিগত উৎপাদন-ব্যবস্থাতেই এঁদের সক্রিয়তা সম্ভব। ব্যাঙ্কার ও শিল্পপতিরাও সেই ব্যবস্থাতেই সক্রিয়। লুই ফিলিপের বিরুদ্ধে এই গণতন্ত্রীদের রাজনৈতিক বিরোধিতা শিল্পপতি-বুর্জোয়ার বিরোধিতার সঙ্গে মিলে গেছে বটে কিন্তু ঐ শ্রেণীদ্বারা পরিচালিত হয় নি। কোনো-একটিমাত্র শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকে এই গণতন্ত্রীদের রাজনৈতিক কর্মসূচি রচিত হয় নি। এখানে, রাজনৈতিক সক্রিয়তার একটি স্বনির্ভরতা আছে বলে মনে হয়।

এ থেকে কি মনে হয়, ভিত্তি ও উপরতলার যে-পার্থক্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল কথা তা অনেকটা অর্থহীন? মার্ক্স বলেছেন, জুলাই-রাজতন্ত্রে প্রধান বিরোধী দল হিশেবে এই গণতন্ত্রীদের প্রভাব-প্রতিপত্তির ভিত্তি ছিল সারা দেশে ব্যাপ্ত গণতান্ত্রিক আদর্শে, রাজনীতিতে, স্মৃতিতে, আবেগে। এ-বিষয়ে মার্ক্সের বক্তব্যে কোনো অসঙ্গতি নেই যে এই ধরনের নীতি বা আদর্শ মরীচিকা মাত্র আর প্রয়োজন হলেই নগদ লাভের জন্যে এগুলো বিসর্জন দেয়া হবে। 'শুদ্ধ' গণতন্ত্রবাদীদের নগদ লাভ বলতে বোঝাত রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন 'এলিট'-এর সীমাবৃদ্ধি, দেশের শাসনক্ষমতায় তাদের আরো

অধিকার। বিপ্লবের আগেই তারা তাদের মূলনীতি, গণতন্ত্রবাদ, ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল। মার্ক্স জানান, "বিপ্লব যখন শুরু হয় তখনই তারা ডাচেস অব অরলিনসকে রাজপ্রতিনিধির স্বীকৃতি দিয়ে অস্থায়ী সরকারে তাদের নেতাদের জন্যে জায়গা দখল করতে" প্রস্তুত ছিল। প্যারিসের প্রলেতারিয়েতরা যখন জুনে বিদ্রোহ করল তখন এই গণতন্ত্রবাদীরা বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে বুর্বন ও অরলিনিস্টদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে থাকল। উদারপন্থী বিরোধীপক্ষ থেকে বিদ্রোহদমনের এই ভূমিকাবদলের কথা মার্ক্স লেখেন, "রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে উদারপন্থী কোনো বুর্জোয়া-বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এরা ক্ষমতা পায় নি ; এরা ক্ষমতা পেয়েছে পুঁজির বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের বিদ্রোহ দমনের জন্যে ব্যবহৃত ছররাগুলির মধ্য দিয়ে। এরা যেটাকে ভেবেছিল চরম বিপ্লবী ঘটনা, কার্যত সেটা হয়ে দাঁড়াল চরম প্রতিবিপ্লবী ঘটনা।"

"শুদ্ধ" গণতন্ত্রীরা কয়েক মাস ক্ষমতায় ছিল। তারই মধ্যে তারা সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রচার বন্ধ করার জন্যে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, মিটিং মিছিলের অধিকার কেড়ে নিল। এই সময়ে যে-সংবিধান তৈরি হয়েছিল, মার্ক্স তার স্ববিরোধিতা দেখিয়েছেন—সব সময়ই গণতন্ত্রের পক্ষে পুরনো বড় বড় কথা বলা হয়েছে কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে শাসানো হয়েছে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হলে সে-অধিকার খারিজ করা হবে। তাদের 'নীতি' যে একেবারেই ফালতু ব্যাপার, এটা প্রমাণিত হওয়ার পর ১৮৪৯-এর মে-নির্বাচনে 'শুদ্ধ' গণতন্ত্রীরা হেরে যায়। এই নির্বাচনের পর সেকেণ্ড রিপাবলিকের আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় দুই রাজতন্ত্রী দলের এক অস্বস্তিকর মোর্চা। এই মোর্চা—পার্টি অব অর্ডার—টিঁকে ছিল সমাজতন্ত্রের আতঙ্কে। এ তো ছিল এক ভয়ের ঐক্য—ভূস্বামীদের স্বার্থ ও পুঁজিপতিদের স্বার্থের বিরোধ তাতে মিটতে পারে না। সেই বিরোধ লুই নেপোলিয়ন কাজে লাগালেন ও ১৮৪৮-এর ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। তাঁর বিরোধীদের ভিতরের গোলমালকে কাজে লাগিয়ে তিনি তাঁর নিজের ক্ষমতা বাড়ালেন।

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলেরা কী রকম ভাবে একত্রিত হয়েছিল সে-কথা বোঝাতে মার্ক্স "বুর্জোয়া ভবন"-এর ধারণাটি ব্যবহার করেছেন। "তার সামন্ততান্ত্রিক জাঁকজমক আর জাতিগর্ব সত্ত্বেও আধুনিক সমাজের বিকাশের আঘাতে বড়-বড় ভূ-সম্পত্তিগুলি বুর্জোয়া সম্পত্তিতে বদলে গিয়েছিল।"

মার্ক্স এখানে দেখান, যে-শ্রেণী ক্ষমতায় এসেছে তারা, যে-শ্রেণীর কাছ থেকে তারা ক্ষমতা নিল সেই শ্রেণীকে, নিজের আদর্শে ও স্বার্থে বদলে নিতে

পারে, যেমন, সম্পদ তৈরি করা, দখল করা ও সব রকম ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে রক্ষা করা।

যে-শ্রেণী ক্ষমতায় আসছে, তারা, যে-শ্রেণীর কাছ থেকে তারা ক্ষমতা নিচ্ছে সেই শ্রেণীকে, নিজের স্বার্থের পক্ষে টেনে আনতে পারে—এই ধারণাটি বুর্জোয়াসি ও প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কেও প্রযোজ্য। 'ম্যানিফেস্টো'তেও মার্ক্স এই কথার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে চরম মুহূর্তে বুর্জোয়াসির একটি অংশ বিপ্লবী শ্রেণীর সঙ্গে যোগ দেবে। 'ব্রুমেয়ার'-এ মার্ক্স এ-রকম কোনো সম্ভাবনার কথা বলেন নি যে, অন্য শ্রেণীগুলোর ওপর বুর্জোয়াসি তার নেতৃত্ব দীর্ঘ সময় ধরে রক্ষা করতে পারবে। ১৮৬৩-তে এঙ্গেলসকে লেখা একটি চিঠিতে মার্ক্স বলছেন—"বুর্জোয়া সংক্রমণ থেকে সরে আসতে ইংরেজ শ্রমিকদের আর কতদিন লাগবে?" তখনকার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন লিবারাল পার্টিই চালাত। এই হাল্কা মন্তব্যেও বোঝা যায় মার্ক্স জানেন যে এই সংক্রমণ একদিন সরে যাবে কিন্তু এই 'সংক্রমণ' কেন ঘটবেই বা এই 'সংক্রমণ' থেকে বাঁচার উপায় কী, সে-সব তিনি কিছুই বলেন না।

১৮৪৩ সালেই, 'এ কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অব হেগেলস ফিলজফি অব রাইট'-এ মার্ক্স শ্রমিক শ্রেণীকে হেগেলের 'ইউনিভার্সাল ক্লাস'-এর সমতুল্য শ্রেণীর সম্মান দিয়েছিলেন। শোষিত শেষ শ্রেণী হিশেবে বুর্জোয়াসির ওপর তাদের বিজয়েই শোষণের অবসান হবে ও শ্রেণী-বৈষম্য লোপ পাবে। 'ব্রুমেয়ার'-এ এ-কথা বলা হয়েছে, ফ্রান্সে প্রলেতারীয় বিপ্লব সফল হওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না। ১৮৪৮-এর জুনে প্রলেতারিয়েতের বিদ্রোহকে মার্ক্স দেখেছিলেন—পুঁজি ও প্রলেতারিয়েতের প্রধান সংগ্রামের ভূমিকা হিশেবে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে শ্রমিকরা সফল করে দিল, কিন্তু বিনিময়ে কিছুই পেল না। ন্যাশন্যাল ওয়ার্কশপগুলো বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে—এ-কথা ঘোষণা মাত্রেই বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহে শ্রমিকদের বীরত্বের প্রশংসা করেছেন মার্ক্স, কিন্তু তিনি কখনোই সংগঠন, কর্মসূচি ও আশু দাবির আলোচনায় ঢোকেন নি। সে-সময় কাগজে এ-সব খবর বেরত ও বিদ্রোহ সম্পর্কে যে-কমিশন বসেছিল তার সামনে এ-বিষয়ে বহু সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছিল। মিলিটারি ও পুলিশ রিপোর্টও তখন মার্ক্স দেখতে পান নি। বিপ্লবী সংবাদপত্র, ক্লাব, ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ে বিপ্লবী চৈতন্যকে কীভাবে জাগিয়েছিল—সেগুলোর কথাও মার্ক্স বলেন নি। বার্বেস, ব্লাঙ্কি—এইসব

নেতাদের ভূমিকাও তিনি আলোচনা করেন নি। এই ফাঁকগুলিতে বোঝা যায় বিপ্লবী আন্দোলনের সংগঠক হিশেবে মার্ক্সের সীমাবদ্ধতা ছিল।

মার্কস তাঁর 'দি ক্লাস স্ট্রাগল ইন ফ্রান্স' গ্রন্থে বলেছেন যে, "ব্যক্তিগত সম্পত্তির মুক্তি এবং ক্রেডিট ব্যবস্থা পুনঃ প্রচলনের জন্য, কাফে ও রেঁস্তোরা মালিক, ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার, হস্তশিল্পী প্রভৃতি প্যারিসীয় পেটিবুর্জোয়াদের তুলনায় আর কেউ এত বেশি উন্মাদনার সঙ্গে" লড়াই করে নি। শ্রেণীর সংজ্ঞাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলির সঙ্গে সম্পর্কিত করার এটাই হল মার্কসের সবচেয়ে তন্নিষ্ঠ প্রচেষ্টা। এর লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল যে, তারা অন্যের কাছে নিজেদের শ্রম বিক্রয় করে না। অথচ একই সঙ্গে এমনই এক দুর্দশাময় অর্থনৈতিক অবস্থানে থাকে যা যে কোন মুহূর্তে তাদের শ্রমজীবী শ্রেণীতে ঠেলে দিতে পারে। জুন সংঘর্ষে অর্থনীতিগত ভাবে লাভবান হতে না পেরে, এবং বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রী ও পার্টি অফ অর্ডারের প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতির উত্তরোত্তর প্রকাশ দেখে, পেটি-বুর্জোয়ারা ১৮৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, মার্কসের কথায় 'তথাকথিত সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' (যে নাম মার্কসের মোটেই পছন্দ ছিল না) গঠনের জন্য শ্রমিকদের সঙ্গে জোট বাঁধে। তিনি দেখিয়েছেন যে এই জোট বাঁধায় প্রলেতারীয় শক্তি সমূহ তাদের বিপ্লবী প্রকৃতি হারায়, কিন্তু যা তিনি দূরদৃষ্টিতে ধরতে পারেন নি যে, এই ধরনের সোস্যাল ডেমোক্রেসি বিপ্লবী সক্রিয়তার বিরুদ্ধে বামপন্থী রাজনীতিতে একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠতে পারে।

সোস্যাল ডেমোক্রেসির সাফল্যের সম্ভাবনা অস্বীকার করতে গিয়ে মার্কস আবার শ্রেণীস্বার্থ এবং রাজনৈতিক সক্রিয়তার মধ্যে কার্যকারণগত সম্পর্কে মুখোমুখি হয়েছেন:

"পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীগুলি স্পষ্টতই যে তাদের আত্মকেন্দ্রিক শ্রেণীস্বার্থ সমূহ জাহির করতে চেষ্টা করে সেটি কারো সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। ...তারা বরং বিশ্বাস করে যে তাদের মুক্তির বিশেষ পরিস্থিতিই হল একমাত্র সাধারণ পরিস্থিতি যার মধ্যে আধুনিক সমাজকে রক্ষা করা যেতে পারে এবং শ্রেণীসংগ্রাম এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।"

মার্কস রাজনৈতিক মতাদর্শকে অর্থনৈতিক শ্রেণীস্বার্থ এবং উদ্ভব ও শিক্ষার দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বলে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে তত্ত্বগতভাবে রাজনীতিকরা সেইসমস্ত বাধার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা শ্রেণী বাস্তবজীবনে অতিক্রম করতে পারে

না। তিনি অবশ্য এই 'বাধাগুলি' বর্ণনা করার প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছেন, কিন্তু মনে হয় তিনি এক্ষেত্রে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর 'সংগঠন প্রবণতার' কথা বলতে চেয়েছিলেন।

প্রলেতারিয়েত তার বৈপ্লবিক উৎসাহ বজায় রাখতে পারবে এই আস্থা ক্রুমেয়ার-এ অন্তর্নিহিত ছিল, এবং এটাই সম্ভবত বোনাপার্ট যে শ্রমিকদের সমর্থন পেতে পারেন সেই প্রসঙ্গ উপেক্ষা করতে মার্কসকে চালিত করেছিল। তিনি অবশ্য লুই নেপোলিয়নের একটি পরিকল্পনার কথা বলেছেন, রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় সোনার বার নিয়ে লটারির কথা, যা শ্রমিকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে। প্রতিষ্ঠানগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার শান্তি স্থাপনকারী পরিণতির ইঙ্গিত মার্কস দিয়েছেন, যখন তিনি বলেন যে, "এটা ছিল সোনার স্বপ্ন দেখিয়ে প্রলেতারিয়েতের সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন, মস্ত লাভের প্রলোভন সৃষ্টিকারী সম্ভাবনা দিয়ে কর্মের অধিকারের তাত্ত্বিক দাবি সরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা মাত্র"।

লুই নেপোলিয়ন, যাকে মার্কস বলেছেন একজন "রাজকীয় লুম্পেন প্রলেতারিয়েত" তিনি যে লুম্পেন প্রলেতারিয়েত ও কৃষক সম্প্রদায় প্রভৃতি শ্রেণীর কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছেন, সেটাই ছিল মার্কসের ধারণা। লুই নেপোলিয়ন সংগঠনে লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের অনেককে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা ছিল এমন একটি সংস্থা যাকে বিশশতকের আধা সামরিক সংগঠনের পূর্বসূরী বলা যায়। মার্কস আরো মনে করতেন যে, যে সংগঠন জুন অভ্যুত্থানকে দমন করতে সাহায্য করেছিল, সেই গার্দেস মোবিলস'র মধ্যে লুম্পেন প্রলেতারিয়েতরা ছিল রীতিমতো সক্রিয়, যদিও রজার প্রাইস কাসপার্ডের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে তাঁর মতে, গার্দেস মোবিলস'র শতকরা ৭৪ জন ছিল আসলে শ্রমিক, যারা অধিকাংশই বয়সে তরুণ এবং অবিবাহিত। অ্যালেক্সিস্ দ্য টক্‌ভিল তাঁর 'রিকালেকশন্‌স' গ্রন্থে বলেছেন যে এদের নিয়ে তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন, তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে সংঘর্ষে যে কোনো পক্ষেই তারা যোগদান করতে পারে এবং তারা সম্ভবতঃ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে নিছক লড়াই করাতে বেশি আগ্রহী ছিল। বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতদের সাহায্য করার চেয়ে লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের পক্ষে 'প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের টাকায় বশ হাতিয়ারে' পরিণত হওয়া অধিকতর সম্ভব, ম্যানিফেস্টোর এই ধারণায় মার্কস অবিচল ছিলেন। লুম্পেন প্রলেতারিয়েতের যে বৈপ্লবিক সম্ভবনাকে মার্কসের বিপ্লবী সহযোগী মিখাইল বাকুনিন নির্দ্বিধায় সমর্থন করেছেন, যে মতের সাম্প্রতিক প্রবক্তাদের অন্যতম

হলেন ফ্রানজ্ হ্যানন ও হারবার্ট মারকিউজ্, এই মত ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোয় কেবল মাত্র প্রান্তিক ভূমিকার জন্য অপরাপর শ্রেণীগুলি থেকে লুম্পেন প্রলেতারিয়েত স্বতন্ত্র ছিল, কেবল তাই নয়, তার আরো কারণ ছিল তাদের খণ্ডবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব এবং রাজনীতিগতভাবে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করার অক্ষমতা। কৃষক সমাজ সম্পর্কে যে একই কথা প্রযোজ্য মার্কস তার কারণ দেখিয়ে বলেছেন:

'একবস্তা আলুতে যেমন প্রতিটি আলু স্বতন্ত্র থেকেও একটা বিশেষ আকার পায়, ফরাসি জাতটাও তেমনি বিপুল সংখ্যক স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত মানুষের যোগফলে গঠিত হয়েছে।'

এই খণ্ড বিচ্ছিন্নতাকে তিনি তাদের উৎপাদনশীল জীবনের বৈশিষ্ট্যজাত বলে মন্তব্য করেছেন। ফরাসি জাতি গড়ে ওঠে ছোটখাট জোতজমির মালিকানার ভিত্তিতে যাদের মধ্যে শ্রম বিভাজন ছিল কম এবং সামাজিক সম্পর্ক আরো নগণ্য। পরিস্থিতির তীব্রতা আরো বেড়ে যায় অপরিসীম দারিদ্র্য এবং রাস্তাঘাট, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রভৃতি সুগঠিত অন্তর্কাঠামোর অভাবে। তিনি স্বীকার করেছেন যে কৃষকদের কোন কোন অংশ বিপ্লবী হতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে অধিকাংশ কৃষকের চাহিদা ছিল বেশি জমি। কৃষকরা বোনাপার্টিস্ট ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, কারণ এই ছোট জোতজমির মালিকানা ব্যবস্থা সংহত করে তুলেছিলেন প্রথম নেপোলিয়ন, যে ব্যবস্থার 'দিন ফুরিয়ে গেছে' বলে মার্ক্স মনে করতেন। তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে লুই নেপোলিয়ন কৃষি সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হবেন, গ্রামীণ জনগণের উদ্বৃত্ত অংশকে তিনি বড়জোর সম্প্রসারিত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে টেনে নিতে পারেন, যে বাহিনী যদি কখনো ব্যবহার করা হয়, তাহলে 'নিদারুণভাবে ব্যর্থ হবে'।

ফরাসি সমাজ ও কৃষকদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণা হল সাধারণভাবে ব্রুমেয়ার-এর সবচেয়ে প্রকট সমালোচনামূলক সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের কালপর্বে দেখা গেছে বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে যেখানে শিল্প ও ফিন্যান্স পুঁজির মধ্যে অ্যান্টি-থিসিস দূর করার জন্য ক্রেডিটের সুযোগ সুবিধা বিস্তারে রাষ্ট্র সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছে। শিল্পের প্রসার উদ্বৃত্ত গ্রামীণ জনগণের স্বার্থরক্ষা করেছে, এবং এই সময়ে কৃষি উৎপাদন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সৈন্যবাহিনী সম্প্রসারিত এবং ব্যবহৃত হয়েছে, এবং যদিও ক্রিমিয়া যুদ্ধ ও

মেক্সিকো অভিযানে তার কাজ ততটা গৌরবোজ্জ্বল ছিল না, তবু ১৮৭০ সালের আগে তাকে কোন 'নিদারুণ ব্যর্থতার' মুখোমুখি হতে হয় নি। লুই নেপোলিয়ন সাফল্যের সঙ্গে 'সমস্ত শ্রেণীর উপকারী' হতে পারেন মার্কস সেই সম্ভাবনা অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এখানেও তিনি সেই সম্ভাবনার তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, একটি সম্প্রসারণশীল পুঁজিবাদী অর্থনীতি সমাজের তীব্র শ্রেণীদ্বন্দ্বগুলিকে প্রশমিত রাখার জন্য ব্যবহার করা যায়। এই শ্রেণী-দ্বন্দ্বগুলি যে বর্তমান ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল ১৮৭১ সালের প্যারি কমিউন।

মার্কসের ঐতিহাসিক পদ্ধতি হল মর্মভেদী যা তাঁকে শ্রেণী সংগ্রাম কীভাবে বোনাপার্টকে ক্ষমতা বেদখল করতে সাহায্য করেছে সাফল্যের সঙ্গে সেটি দৃশ্যমান করে তুলতে কাজে লাগে। এঙ্গেলস সঠিকভাবেই 'ব্রুমেয়ার'-কে ইতিহাসে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রয়োগের 'একটি সর্বোত্তম উদাহরণ' বলেছেন। কিন্তু এইসব শ্রেণী সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণে মার্কস প্রলেতারিয়েতকে একান্তভাবে ভাসা ভাসা স্তরে ব্যবহার করেছেন। এর আগে, 'দি ক্লাস স্ট্রাগল ইন ফ্রান্স' গ্রন্থে, তিনি ঘোষণা করেছেন তার সেই আস্থা যে; প্রলেতারিয়েত সর্বদা কমিউনিজমের পক্ষে সমবেত হবে, কিন্তু নেহাতই হঠাৎ তিনি সেই আলোচনায় ছেদ টেনেছেন এই কথা বলে যে, 'বর্তমান আলোচনার পরিসরে এই বিষয়ে আর কিছু বলার সুযোগ নেই' কেন এই শ্রেণী এমনভাবে আচরণ করবে। ব্রুমেয়ার-এ এরকম একটি সুস্পষ্ট আশাব্যঞ্জক বিবৃতির পর আর-কিছু বলা হয় নি, এবং 'দি সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স' (১৮৭১) ও তারপর 'ক্রিটিক অফ দি গোথা প্রোগ্রাম' (১৮৭৫) গ্রন্থদ্বয়ে বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে প্রলেতারিয়েতের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের প্রসঙ্গটি আর কোথাও বিশ্লেষণ করেন নি। বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্রেসির সম্ভাব্য দীর্ঘ মেয়াদি পক্ষাঘাত সৃষ্টিকারী প্রতিক্রিয়া, প্রতিষ্ঠানগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নিপীড়নের জবরদস্তি—'ব্রুমেয়ার'-এ এইসব প্রসঙ্গ উল্লিখিত কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয় নি। প্রলেতারীয় রাজনীতির বিশ্লেষক হিসাবে এই বলার আপেক্ষিক অপূর্ণতা। মার্কসের বিশ্ব দৃষ্টিতে এই শ্রেণীর কেন্দ্রীয় গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও এই অসম্পূর্ণতা ব্রুমেয়ারের বিশ্লেষণকে খণ্ডিত করেছে।

দ্বিতীয় মত : জন কুন্বিস

১৮৪৮ সংক্রান্ত মার্কস-এর রচনাবলি, বিশেষত 'দি এইটিনথ ব্রুমেয়ার অব

লুই বোনাপার্টি' আর এক রকম ভাবেও পড়া যায়। একটি ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ হিসেবেও মার্কসের রচনাবলির সমগ্রতায় একটি সম্পূর্ণ রচনা হিসেবেও এগুলিকে পড়া হয়েই থাকে। কিন্তু সে-সব বাদ দিয়ে শুধু দেখা যেতে পারে এ বইয়ে তথ্য কী ভাবে জানানো হয়, সাজানো হয়, এবং সেই জানানো-সাজানোর ফলে বইটির পাঠ কী ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, আবার সেই পাঠ থেকে কী করে বাস্তব পরিস্থিতিতে ফিরে আসা যায়—সামাজিক সংঘাতের যে-বাস্তব পরিস্থিতিকে বইটিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

রাজনীতির ও অবস্থার কতকগুলি সন্ধিক্ষণে কী ভাবে শ্রেণীসম্পর্ক স্থির হয়েছে—মার্কসের 'দি ক্লাস স্ট্রাগলস ইন ফ্রান্স' ও 'দি এইটিনথ ব্রুমেয়ার অব লুই বোনাপার্টি'তে তার অসামান্য বিবরণ আছে। সেই শ্রেণীসম্পর্কগুলি শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সংগ্রামে মিশে গেছে। মার্কস দেখিয়েছেন যে এই প্রক্রিয়ায় বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে কোনো সঙ্গতিপূর্ণ কর্মসূচি তৈরি করা সম্ভব হয় নি। ফলে, রাজনীতিই বাতিল হয়ে গেছে। সেখানে লুই বোনাপার্টির ব্যক্তিগত ডিকটেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ঘটনা ঘটেছে আপাত এক বিশৃঙ্খলায়, ইতিহাসের পৌবাপুর্য ভেঙে। 'দি ক্লাস স্ট্রাগলস ইন ফ্রান্স'-এ ১৮৪৯-এর প্রথম দিনের ঘটনা বর্ণনায় মার্কস বলছেন ঃ

> ···ঘটনার এই ঘনঘটায়, ইতিহাসের এই অস্থিরতায়, বিপ্লবী আবেগের আশা ও হতাশার এমন নাটকীয় জোয়ার-ভাঁটায়, ফরাসি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে তাদের বিকাশের পর্ব মাপতে হয়েছে সপ্তাহে-সপ্তাহে, যেমন আগে মাপত পঞ্চাশ বছরে একবার।

এখন এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে 'দি ক্লাস স্ট্রাগলস ইন ফ্রান্স'-এ যে-রকম এক অত্যন্ত জটিল অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে তা কোনো তথ্যভিত্তিক ইতিহাস-চর্চায় সম্ভব নয়। 'অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার'-এর ১৮৬৯ সংস্করণের ভূমিকায় মার্কস প্রুঁদোকে এই দোষেই অভিযুক্ত করেছিলেন। আবার, উল্টোদিকে, ভিত্তি ও সৌধ—বেস ও সুপারস্ট্রাকচার—এই নিয়মের যান্ত্রিক প্রয়োগেও এই ইতিহাসের সত্যের কাছে পৌছনো যাবে না। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে সোস্যাল রিপাবলিক কায়েম হয়। তার পরেই বিভিন্ন শ্রেণীর সমঝোতা ভাঙতে শুরু করল। ১৮৪৮-এর জুনে প্রলেতারিয়েতকে দাবানো হল, ১৮৪৯-এর মার্চে রিপাবলিকান বুর্জোয়াকে দাবানো হল, ১৮৪৯-এর জুনে পেটি বুর্জোয়াকে দাবানো হল, এবং তারপরই 'পার্টি অব অর্ডার'-এর অভ্যুদয় সেই জটিল

ইতিহাসের এই কয়েকটি মাত্র চিহ্ন ভেসে উঠেছিল শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও একই শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের গভীর আবর্ত থেকে।

বেস ও সুপারস্ট্রাকচার—ভিত্তি ও সৌধের সূত্র মার্কস প্রথম ব্যবহার করেছিলেন 'এইটিনথ ব্রুমেয়ার'-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে। কিন্তু 'দি ক্লাশ স্ট্রাগলস ইন ফ্রান্স'-এই এই সম্পর্কের জটিলতার প্রতি মার্কস প্রথম দৃষ্টি দেন। 'ক্লাশ স্ট্রাগল'-এর ভূমিকাতে মার্কস বিপ্লবী আন্দোলনের ওপর বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সক্রিয় ও ঐতিহাসিক অথচ ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বলেছিলেন, 'বিপ্লবের আগের পরম্পরাসূত্রে বাহিত বোঝা' আর 'মোহ' থেকেই 'ট্রাজি-কমিক' সব কাণ্ড ঘটে। তার নাটুকে অন্তঃসারশূন্যতা 'বিপ্লবের প্রকৃত পার্টি'র অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে যায়। তাই বুর্জোয়া রাজনীতি শেষ পর্যন্ত কী করে এক নিরুপায় অন্ধ গলিতে গিয়ে আটকা পড়ে তার বিবর্তনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায় প্রলেতারিয়েতের প্রয়োজন—সে প্রলেতারিয়েত তখনো মঞ্চে অনুপস্থিত। এইখানে যা লেখা হয়েছে তার অর্থ বুঝতে আমাদের যেতে হবে যা লেখা হতে পারল না সেই অঘটিত ইতিহাসে।

১৮৪৮-এর বিপ্লবের জগাখিচুড়ি চরিত্র বোঝাতে বারবার ভাঁড়ামি, সং ও তামাশার কথা বলা হয়েছে। প্রথমে ছিল সব শ্রেণীরই এক মশাল, তাতে কার সঙ্গে কার কী সম্বন্ধ সবই ছিল অস্পষ্ট। বাস্তবের ধাক্কায় এই বানানো সাজানো মঞ্চ বারবারই ভেঙে পড়ছিল।

> ফ্রান্সের এখন শুধু এক মর্তানই নেই, তদুপরি আছে এক নেপোলিয়ন। এই দুই নাম এক সময় যে-রকম সত্য ছিল তার নিষ্প্রাণ সং এরা। …বিপ্লব কেবল তখনই সত্য হতে পারে, যখন, তার নিজের নাম নিজে অর্জন করে নিতে পারে। আর, একমাত্র তখনই তা করা সম্ভব যখন আধুনিক বিপ্লবী শ্রেণী, শিল্পশ্রমিক, প্রধান ভূমিকায় আসে।

বুর্জোয়া, কিন্তু র‍্যাডিক্যাল ও আদর্শবাদী, এমন এক অংশের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের আংশিক ঐক্যকে দেখানো হয়েছে দরকারি অথচ অস্থায়ী এক পর্যায় হিসেবে।

> ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ছিল 'সুন্দর' বিপ্লব—যে সামাজিক সংঘাতের পটভূমিতে এই বিপ্লব ঘটছিল তার অস্তিত্ব ছিল বায়বীয়, ছিল শুধু শব্দে, শুধু কথায়।
>
> জুন বিপ্লব 'কুৎসিত' বিপ্লব…কারণ কথার জায়গায় এসেছে বাস্তব ঘটনা।

এগুলি নিশ্চয়ই ঘটনার তথ্যবর্ণনার জন্যে লেখা হয় নি। মার্কস-এর লেখা নন্দনতত্ত্বের শব্দে, কলাকুশলতার প্রতিমায়, পোশাক-আশাকের বিবরণে এমন হয়ে উঠেছে যেন এই সব ব্যবহার করেই মার্কস তাঁর বলবার কথা বলতে চান। এই শব্দচিত্র ব্যবহারের ধরনটাই এ-রকম যে মনে হয়—ভাঁড়, সং, তামাশায় যেমন পোশাক-আশাকের সাহায্যে একটা বাস্তবতা আরোপ করা হয়—ফ্রান্সেও তখন একটি বাস্তবতা আরোপিত হচ্ছিল। যেমন,

> মুহূর্তে সরকারি দৃশ্য বদলে গেল—দৃশ্যপট, পোশাক-আশাক, ভাষা, অভিনেতা, নায়ক-নায়িকা, জনতা, প্রম্পটার, দাঁড়ানোর জায়গা, নাটকীয় উদ্দেশ্য, নাটকীয় সংঘাতের ধরন,—এই সমস্ত পরিস্থিতি বদলে গেল।

থিয়েটারের এই শব্দচিত্রগুলি ব্যবহার করা হয়েছে এক-একটা তত্ত্বাদর্শের বদলে। আর এই ব্যবহারের ফলে আমরা সেই তত্ত্বাদর্শ থেকেই সরে আসি। ১৮৪৯-এর জুনে পেটি বুর্জোয়া মঁতেন হেরে গেল। '১৮৪৮-এর জুনের সঙের মতই হাস্যকর ও অপমানজনক'—মার্কস লিখেছেন। পেটি বুর্জোয়া ইতিহাসে এ ভাবেই খারিজ হয়—এই কথায় পৌঁছুবার আগে 'ক্লাশ স্ট্রাগল'-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটা বিরোধাভাস তৈরি করা হয়েছে। সেখানে শ্রমিকদের 'অবর্ণনীয় সংগ্রাম' ও 'রক্তাক্ত ট্রাজেডি'র পাশে বলা হয়েছে 'এক অসহ্য কমেডি' ও 'মহাজন ও পাওনাদারের মধ্যে জেল ভরার খেলা।' বিপদের সময় বুর্জোয়ারা নিজের একটা কাল্পনিক চেহারা কী রকম খাড়া রাখার চেষ্টা করে—তার বর্ণনা।

'ক্লাশ স্ট্রাগল'-এর চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'এইটিনথ ব্রুমেয়ার'-এর ভূমিকার মত। ১৮৪৯-এর পর থেকে পার্টি অব পাওয়ারের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ার পক্ষে কোনো সঙ্গতিপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা সম্ভব নয়—'ব্রুমেয়ার'-এ এই কথাই বলা হয়েছে। 'ক্লাশ স্ট্রাগল'-এ যে-সময়ের কথা বলা হয়েছে তার একটা দ্রুত পূর্ণ বিবরণের পরই 'ব্রুমেয়ার'-এ বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্কট ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিপ্লবের পর প্রাথমিক অস্পষ্টতা কেটে গেলে বুর্জোয়া শ্রেণীই প্রধান শ্রেণী হিসেবে বেরিয়ে এসেছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর এই সংকটের বিবরণের সঙ্গে-সঙ্গে 'ব্রুমেয়ারে' বেস ও সুপারস্ট্রাকচার, রাজনীতি ও নন্দনতত্ত্ব এই সবের সম্পর্ক নিয়ে কিছু কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে। 'ক্লাশ স্ট্রাগল'-এ এগুলোর আভাসমাত্র ছিল।

'ক্লাস স্ট্রাগল'-এ 'বুর্জোয়া উদারনীতির প্রতিভূ ব্যারট'-এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায়

বর্ণনায় মার্কস কোনো নাটক বা সং বা ভাঁড়ামোর শব্দচিত্র ব্যবহার করেন না। পরিবর্তে, তিনি এখানে সরাসরি মন্তব্য করেন,

> কখনো কখনো অতীতের ফুলমালা আর এখনকার কাঁটার মালার তুলনায় ব্যারট ও চমকে উঠছিল। কিন্তু আয়নায় তাকানো মাত্রই তার মন্ত্রীসুলভ শান্তি আর মনুষ্যতুল্য আত্মতুষ্টি ফিরে-ফিরে আসছিল।

অর্থাৎ আয়নায় বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটছিল না, ঘটছিল বুর্জোয়াদের মিথ্যে সঙ্গতির প্রতিফলন।

'এইটিনথ ব্রুমেয়ার'-এ মার্কস পার্লামেণ্টারি রিপাবলিকের কাঠামোতে লেজিটিমিস্ট ও অরলিনিস্টদের যুক্ত সরকারের স্ববিরোধিতার আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ নিদর্শন দিয়েছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতে একটি বেশ দীর্ঘ বিবৃতিতে তিনি বেস ও সুপারস্ট্রাকচার-এর কথা বলেন। সুপারস্ট্রাকচারের সঙ্গে বেসের অন্তর্সম্পর্কের ভিতর যে বৈপরীত্য নিহিত আছে, তত্ত্বাদর্শের সঙ্গে সমাজ-অর্থনীতির অন্তর্সম্পর্কের ভিতর যে বৈপরীত্য নিহিত আছে মার্কস তার কথা বলছেন

> তারা ভিতরে-ভিতরে বুঝতে পেরেছিল, রিপাবলিক যদিও তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল সম্পূর্ণ করছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক ভিত্তিকে শিথিল করে দিচ্ছে

একটি শ্রেণীর সম্পূর্ণ ক্ষমতার অর্থ তার সব ঢাকা খুলে যাওয়া, তাকে প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হচ্ছে—এই কথা বোঝাতে গিয়ে মার্কস বলছেন, বেসে, ভিত্তিতে, সুপারস্ট্রাকচারের প্রক্ষেপ ঘটছে।

সমাজের নানা রকম সাত-সতের জিনিসের মিশেল হচ্ছে পার্টি অব অর্ডার।

> সংশোধনের প্রশ্নে (সংবিধান সংশোধন) রাজনীতির তাপ এত বেড়ে গেল যে সেই মিশেল পচে গিয়ে আবার তার আলাদা-আলাদা উপাদানে ভাগ হয়ে গেল।

বেস-সুপারস্ট্রাকচারের এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে, বৈপরীত্যকে কাজে লাগিয়ে, লুই বোনাপার্টি সুপারস্ট্রাকচারের প্রধান উপাদান হিসেবে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে তার নিজের ব্যক্তিগত ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—মার্কস এটাই দেখাচ্ছেন।

মার্কস এখানে একটি অতিনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের কথা বলছেন। পার্টি অব অর্ডারে রাজতন্ত্রবাদী বুর্জোয়ারা একত্রিত হয়েছে—লেজিটিমিস্ট ও

অরলিনিস্টরা। এরাই এতদিন লুই ফিলিপের আমলে ভূস্বামী আর ফাইনান্স ক্যাপিটালের লোক হিসেবে পরস্পর মারামারি করে এসেছে। এখানেই মার্কস খুব জটিল এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন সুপারস্ট্রাকচারই কখনো-কখনো কেমন স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে।

> নানা ধরনের সম্পত্তির ওপর, নানা ধরনের সামাজিক অস্তিত্বের ওপর ভিত্তি করে নানা ধরনের কিন্তু নির্দিষ্ট আকারের আবেগ, মোহ, ভাবনাচিন্তা, জীবনচিন্তার কাঠামো [সুপারস্ট্রাকচার] গড়ে উঠতে পারে। তার বাস্তব ভিত্তি ও প্রাসঙ্গিক সামাজিক সম্পর্কগুলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে পুরো শ্রেণীই এই কাঠামো তৈরি করে। একজন ব্যক্তি পরম্পরাক্রমে যখন এই কাঠামোর উত্তরাধিকার পায় তখন সে স্বচ্ছন্দেই ভেবে নিতে পারে এগুলোই বুঝি তার জীবনের প্রধান নিয়ন্ত্রণ ও তাকে এখান থেকেই শুরু করতে হবে।

সুপারস্ট্রাকচারের প্রসঙ্গে এই 'মোহ'-এর ধারণার সঙ্গে একজন ব্যক্তির সামাজিক মনস্তত্ত্বের উপমা এসেছে। ব্যক্তি ও সমাজের ভিতরের এই সম্পর্কের উপমার মধ্যে বিরোধাভাস আছে—যা মার্কসের পরবর্তী রচনায় পাওয়া যায় না।

> ব্যক্তিগত জীবনে একটা লোক নিজের সম্পর্কে যা বলে ও যা করে তার ভিতর পার্থক্য করা হয়। ঐতিহাসিক সংগ্রামে এই অবস্থা আরো তীক্ষ্ণ হওয়া উচিত। পার্টিগুলির বক্তৃতা ও কল্পনার সঙ্গে তাদের বাস্তব সংগঠনের ও উদ্দেশ্যের, নিজেদের সম্পর্কে তারা কী ভাবে ও আসলে তারা কী করে—এর মধ্যে তুলনা করে দেখা উচিত।

এই একই ধরনের বিরোধাভাস কাজ করেছে আর-এক জায়গায়। মার্কস তাঁর বিখ্যাত মন্তব্য, 'উনিশ শতকের সামাজিক বিপ্লব তার কাব্য রচনা করতে পারে ভবিষ্যৎ দিয়ে, অতীত দিয়ে নয়'—এর সঙ্গে যোগ করেছেন—'নিজের বিপ্লবের সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্যে উনিশ শতককে প্রথমে দেখতে হবে মৃতরা যেন মৃতদের কবর দেয়।' এখানে ইতিহাস আর সংস্কৃতিকে দেখা হয়েছে স্তর-পরম্পরায়, যেন একটি স্তরের 'কবরের' ওপরে আর-একটি স্তর তৈরি হয়েছে—শ্রেণীসম্পর্কের ধারাবাহিকতায় নয়।

'ব্রুমেয়ার'-এ মার্কস মুখোসের উপমা অনেকবার ব্যবহার করেছেন। এই উপমাতেও তিনি কিন্তু এই রকম ধারণার সুযোগ দেন যে, পূর্ব ব্যবস্থার কিছু

শেষ উপাদান যেন অবশিষ্ট থাকে। মার্কস-এর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেও এ-রকম অবশিষ্ট থাকতে পারে না—সেটা ত পরবর্তী স্তরে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাবে।

'মুখোস'-এর উপমাতে এক অপরিবর্তনীয়, ইতিহাসনিরপেক্ষ পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে। তার বিপরীতে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে থিয়েটারের উপমা—থিয়েটার নিজের গতি নিজেই তৈরি করে এক কাল্পনিক কাহিনীকে ভিত্তি করে, সেখানে প্রতিটি ভঙ্গিই সত্যকে অনুকরণ করে কিন্তু কোনো ভঙ্গিই সত্য নয়। শুরুতে এই মুখোসের উপমা দিয়ে লুই বোনাপার্টিকে বর্ণনা করা হচ্ছে—'নেপোলিয়ানের ইস্পাতে তৈরি মৃত্যুমুখোস পরে এই অ্যাডভাঞ্চারার তার বিকৃত মুখ ঢেকে রেখেছে'। বেস ও সুপারস্ট্রাকচারের উপমা ব্যাখ্যার সঙ্গে-সঙ্গে মার্কস তাঁর রচনার মধ্যে 'মোহ' ও 'বাস্তবতা'র দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্ক ব্যাখ্যা করছেন।

> [ফরাসিরা] শুধু পুরনো নেপোলিয়ানের একটা ক্যারিকেচারই জোগাড় করে নি, তারা আসলে পুরনো নেপোলিয়ানকেই পেয়েছে—উনিশ শতকের মাঝামাঝি তাকে যে ক্যারিকেচারের চেহারা নিতে হবে সেই চেহারায়।

প্রথমে 'মুখোস'-এর যে শব্দচিত্র বা উপমা এত সহজে আমাদের কাছে বাস্তবতাকে ধরিয়ে দিয়েছে, চতুর্থ পরিচ্ছেদের শুরুতে তা এমন জটিল হয়ে গেছে যে প্রায় বোঝাই যায় না।

> লোকটা [লুই বোনাপার্টি] তার মন্ত্রীসভার আড়ালে নিজেকে যেন মুছে দিয়েছে মনে হচ্ছে, সরকারের ক্ষমতা তুলে দিচ্ছে পার্টি অব অর্ডারের হাতে, আর খড়ের একটা মুখোস পড়ছে, খুব নিপাট সরল মানুষের মুখোস। এ-রকম মুখোস লুই ফিলিপের আমলে কাগজের সম্পাদকরা পরত। তারপর সে এখন সেই মুখোস ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, কারণ মুখোসটা আর এখন এমন পাতলা খোলশ না যার পেছনে সে নিজের মুখটা আড়াল করতে পারে, বরং লোহার মুখোস, এমন, যে সে তার চেহারার কিছুই দেখাতে পারছে না।

এই জায়গাতে যদি আমরা ক্লাস স্ট্রাগল-এ লুই বোনাপার্টির চরিত্রবর্ণনায় মার্কসের তীব্র শ্লেষের আক্রমণ মনে রাখি, 'সভ্যসমাজের দুর্বোধ্য এক লিপিতে রচিত…' তা হলে আমরা বুঝতে পারব, ক্লাস স্ট্রাগল ও ব্রুমেয়ারের লুই বোনাপার্টির ক্ষমতাভিত্তি বলে বর্ণিত উদ্ভট অনির্দিষ্ট এক প্রতিক্রিয়াশীল জনতুষ্টির রাজত্বই ব্রুমেয়ারে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে। এই লেখা ক্রমেই

প্যারডির প্যারডি হয়ে ওঠে—লুই বোনাপার্ট সেই প্যারডির অপনায়ক— ‘তাকে ম্যাজিসিয়ানের মত দর্শকের দৃষ্টি সবসময় নিজের ওপর টেনে রাখতে হয়।’

ব্রুমেয়ারে মার্কস যা লিখছেন তার বাইরের কথা বলছেন, বুর্জোয়া সঙ্কটের কথা বলে লিখছেন অনাগত প্রলেতারিয়েতের ভূমিকার কথা—এই রকম সিদ্ধান্ত অতিসরলীকরণে দুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, এখানে মার্কস পরিস্থিতি দ্বারা এত বেশি নিয়ন্ত্রিত যে লেখাটি প্রায় নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়ছে।

যেমন ‘মুখোস’-এর উপমায়, তেমনি ‘থিয়েটার’-এর উপমাতেও প্রথমে শিল্প ও জীবনের বৈপরীত্যের কথা বলা হয়ে থাকলেও ক্রমেই সমাজ-রাজনীতির সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাকে জটিল করে দেয়।

> নেপথ্যে তারা আবার তাদের পুরনো লেজিটিমিস্ট ও অরলিনিস্ট পোশাকে সাজল এবং আবার তাদের পুরনো খেলা শুরু করল। কিন্তু মঞ্চে, তাদের মহান পার্লামেন্টারি পার্টির মহান জাতীয় অভিনয়ে তারা নিজ নিজ রাজবংশকে একটু সেলাম ঠুকেই সামাল দিয়ে রাখল।

পরিণতিতে এই প্রক্রিয়ায় এক সময় ‘মুখোস’ আর ‘নাটক’ মিলে মিশে গেল। তার ফলে এই দুই উপমা ক্রমেই এক দুর্বোধ্য, জটিল, অলঙ্কৃত বাক্য হয়ে ওঠে—উপমার কৌশলে সত্য চাপা পড়ে যায়।

> তার দলই ডিসেম্বরের সমাবেশে যে দশহাজার মাস্তান জোগাড় করল—ওদের কথা ছিল জনতার প্রতিনিধি হওয়ার··। বুর্জোয়ারা যখন সবচেয়ে গম্ভীরমুখে ফরাসি নাট্যশাস্ত্রের কোনো বিধি লঙ্ঘন না করে একটা সম্পূর্ণ কমেডি নামাচ্ছে আর নিজেদের রাষ্ট্র-পরিচালনায় নিজেরাই কখনো বেকুব হচ্ছে কখনো নিজেরাই নিজেদের তারিফ করছে—এই অ্যাডভাঞ্চারারকে জিততেই হবে—কারণ সে কমেডিকে কমেডি বলেই ধরে নিয়েছে। এখন সে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীকে হঠিয়েছে, সম্রাটের ভূমিকায় তার নিজের অভিনয়ে সে মুগ্ধও হচ্ছে আর ভাবছে নেপোলিয়নের মুখোস পরলেই আসল নেপোলিয়ন হওয়া যায়,—সে তার নিজের কল্পনার শিকার নিজেই হয়ে পড়েছে। এ হল সেই গম্ভীর ভাঁড় যে বিশ্ব ইতিহাসকে কমেডি হিশেবে দেখে না, নিজের কমিক-নাটককেই বিশ্বইতিহাস হিশেবে দেখে।

ব্রুমেয়ারের ভাষা শেষ পর্যন্ত যেন নিজের অলঙ্কারের ভার, ভঙ্গির ভার বইতে

পারে না। যে-বুর্জোয়া সমাজের কালপঞ্জি ব্রুমেয়ার রচনা করছে, সেই সমাজের সঙ্কট ও ব্যর্থতা যেন তাকেও স্পর্শ করে। 'ভাইপো' আর 'কাকা'র 'দ্বিতীয় সংস্করণ' যে-পরিমাণে, প্রায় সেই পরিমাণেই মার্কস-এর এই রচনা ঘটনার দ্বিতীয় সংস্করণ। শেষ পর্যন্ত এ লেখা সুপারস্ট্রাকচারেরই অংশ। এমনকি ব্রুমেয়ারেও আমাদের এই অভিজ্ঞতাই হয়—বুর্জোয়াসমাজে সাহিত্য কথার খেলামাত্র, সব লেখারই উদ্দেশ্য প্রশ্ন দাবিয়ে দেয়া।

রাজনীতিকেই শিল্প করে তোলার এই বিকারের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামই একমাত্র শিল্প যেখানে কলাকৌশলের কোনো জায়গা নেই।

তিন

উপসংহার

'ব্রুমেয়ার' নিয়ে এই বিতর্ক থেকে একটি জিনিস অন্তত বোঝা যায়, মার্কসকে বহুভাবে পড়া সম্ভব।

এ হয়ত মার্কসের মনীষার প্রতিই এক ধরনের আস্থা বা তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতার প্রবলতা ও বৈচিত্র্যেরই প্রমাণ।

কিন্তু সেখানেই হয়ত বিপদও ঘনিয়ে আসে। তাঁর সারা জীবনের কাজ, সারা জীবন ধরে তাঁর চিন্তার বিকাশ, সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে-সঙ্গে তত্ত্বচিন্তায় নতুন নতুন প্রদেশ আবিষ্কারের দুঃসাহস, ও কাজ ও চিন্তার মধ্যে এক মহা-কাব্যিক সাযুজ্য নির্মাণ—এই সামগ্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে মার্কসকে পড়তে গেলে কখনো মনে হতে পারে তিনি শব্দচিত্র-চিত্রকলা-উপমার সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেন নি, কখনো মনে হতে পারে ইতিহাসের গতি সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মেলে নি।

মার্কস ত সাহিত্য-রচনার জন্যে ব্রুমেয়ার বা ক্লাশ স্ট্রাগ্‌লস লেখেন নি। এমন কি এই দুটো রচনায় ইতিহাসের গতি নির্দেশও তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল না। তিনি সমকালীন ঘটনার এক 'সাংবাদিক' বিবরণ দিয়েছেন। সেই বিবরণের ভিতর ইতিহাসের সক্রিয়তার ধরণটি তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন বলেই তা কখনো হয়ে উঠেছে—বেস-সুপারস্ট্রাকচারের তত্ত্ব, কখনো হয়ে উঠেছে উপমা-চিত্রকল্পের ব্যবহারে সৃষ্টিশীল গদ্য, আবার কখনো হয়ে উঠেছে তথ্যদর্শী ঐতিহাসিকের হাতে তথ্যের নতুন বিন্যাস।

তাই মার্কস যখন 'কাব্য', 'গদ্য', 'ট্র্যাজেডি', 'ফার্স', 'প্যারডি', ইত্যাদি শব্দ

ব্যবহার করেন তখন তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি। সাহিত্যের ও সংস্কৃতির দীর্ঘ ইতিহাসে আমরা এই শব্দগুলির সঙ্গে এক রকম ভাবে পরিচিত হয়েছি। সেই পরিচয়ের সঙ্গে ধনতন্ত্রের ইতিহাসে মননের শ্রমবিভাগও জড়িত। অনেক সময়ই আমরা এই সব শব্দ ব্যবহার করি ঐ শ্রমবিভাগ মেনে নিয়ে। ফলে যখনই এমন কোনো সৃষ্টিশীলতার মুখোমুখি আমরা হয়ে পড়ি, যেখানে এই মননবিভাগ মেনে নেওয়া হয় না, তখন আমরা অনেক সময় লেখকের ওপর তার দায় চাপাই। ব্রেখটের বহু নাটক, বিশেষত ধরা যাক 'মাদার কারেজ'ই, ট্র্যাজেডি কি না এ নিয়ে এ কারণেই প্রথাগত সমালোচকরা কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না কারণ ব্রেখট বেঁচে থাকার গভীরতর স্তরে আমাদের নিয়ে যান—যেখানে জীবন ট্র্যাজেডি-কমেডি-ফার্সের নিয়ম মেনে চলে না।

লরেন্স ওয়াইল্ড ও জন কুমবেস তাঁদের বিশ্লেষণে মার্কসকে তাঁদের খণ্ডচিন্তার কাঠামোতে মিলিয়ে নিতে চেয়েছেন। এই ধরনের বিশেষজ্ঞ প্রধান তত্ত্ববিলাস—থিয়োরিটিসিজম—মার্কসবাদের আধুনিক পশ্চিমি চর্চায় প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। সেখানে মার্কস কী বলেছেন সেটা বোঝায় চাইতেও ব্যগ্রতা বেশি থাকে মার্কস কী বলেন নি সেটা বোঝানোর দিকে।

মার্কস যখন সাহিত্যের কাছ থেকে তাঁর রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন, তখন তিনি কথাটাকে সাজানোর নেশায় তা করেন না, কোনো আলঙ্কারিকতার ইচ্ছা থেকেও তা করেন না—তিনি ইতিহাসের গতিটাকে মূর্ত করতে চান। 'থিয়েটার' বা 'মুখোস'-এর শব্দচিত্রে তিনি এক সমাজতত্ত্বকে জীবন্ত করে তোলেন, সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের প্রয়োগে করে তোলেন বাস্তব। শেকস্পিয়ার, দান্তে, ইস্কাইলাস, সার্ভেন্তেস, ডিকেন্স, বালজাক—তাঁকে দেন চরিত্রমালা, ইতিহাসের কতকগুলি নির্দিষ্ট সন্ধিতে সংগৃহীত এক চরিত্রমালা, শত-শত বছরের পরিচয় থেকে সমৃদ্ধ ঘনিষ্ঠ এক চরিত্রমালা। এখানে মার্কসকে প্রবন্ধকার হিসেবে বিচার করা চলে না। ট্র্যাজেডি-ফার্সের যে-কথা বলে মার্কস তাঁর লেখা শুরু করেন তাকে ইতিহাসের ছন্দ সম্পর্কে তাঁর সূত্র বলে গ্রহণ করা চলে না, পড়তে হয়—ঐ বিশেষ বিষয়ে তাঁর লাগসই আক্রমণ হিসেবে। সে-রকম ত মার্কসের আগেও করেছেন অনেকে। বস্তুত, ভিকোর কাছ থেকেই মার্কস গদ্য-কাব্যের উপমাটি নিয়েছিলেন। মার্কস তাঁর আগের এনসাইক্লোপিডিস্টদের কাছ থেকেই প্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ডায়ালেকটিকসের ব্যবহারে এনসাইক্লোপিডিস্টদের বিষাদকে বদলে দিয়েছিলেন ইতিহাসের পরম আশায়।

তিনি ধনতন্ত্রের অবসান দেখতে পাচ্ছিলেন। আর সে কারণেই ধনতন্ত্রকে তিনি ইতিহাসের অবসান হিসেবে দেখেন নি, দেখেছেন প্রাক্-ইতিহাসের অবসান হিসেবে, সাম্যবাদের ভূমিকা হিসেবে।

মার্কস তাঁর রচনায় বারবার কবিতা আর গদ্যের কথা বলেছেন। 'গ্রুণ্ডরিস্স', 'জার্মান ইডিওলজি' এবং 'ইকমিক অ্যাণ্ড ফিলজফিক্যাল ম্যানাসক্রিপ্টস'-এ কবিতা আর গদ্যের কথা প্রায়ই এনেছেন। গ্রিক সভ্যতার পরেও গ্রিক শিল্প কেন একই রকম সক্রিয় থাকে—এই জিজ্ঞাসাতেও এই উপমা নিহিত। মার্কসের কোনো অতীত বিলাস নেই। তিনি তত্ত্ব দিয়ে বুঝে নেন—ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে চরম লাভ আর স্টাণ্ডার্ড পণ্যের কাছে ব্যক্তিত্ব আর বৈশিষ্ট্য হেরে যায়। ধনতান্ত্রিক পণ্যের কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে না তাকে শুধু একটা বিশেষ খদ্দেরের জন্যে একটা নিম্নতম মান অর্জন করে যেতে হয়। কিন্তু এই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিচ্ছিন্নতা ও বিভাজনের মধ্যেই তৈরি হয় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তি। সেখানে আবার ফিরে আসবে পণ্যের ব্যবহারিক মূল্য ও বৈশিষ্ট্য।

ব্রুমেয়ারে এই সামাজিক মনস্তত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে। লোকে যা করছে বলে ভাবছে আর লোকে যা সত্যিই করছে তার ভিতরের পার্থক্য মার্কস দেখালেন। তিনি আন্দোলনকে তার উদ্দেশ্য বা সচেতনতা দিয়ে বিচার করেন নি, বিচার করেছেন সমাজের সেই সব উপাদান দিয়ে যা উদ্দেশ্য ও আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে বিষয়ে হয়ত আন্দোলনের কোনো সতর্কতাও থাকে না। এটাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তি। মার্কস 'প্যারডি'র উপমায় এই তত্ত্বকেই ব্রুমেয়ারে প্রাণ দিয়েছেন।

মার্ক্স, এঙ্গেলস ও কৃষক

আলুর বস্তা? বিপ্লবে সহযোদ্ধা?

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

এক

বুর্জোয়া মার্ক্সোলজিস্টদের অন্যতম প্রধান আষাঢ়ে গল্পের বিষয়বস্তু হল: মার্ক্স ও এঙ্গেলস কৃষকদের সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা করেন নি। তাঁরা একবাক্যে কৃষকদের প্রতিবিপ্লবী, মূর্খ, ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন।[১] ওলম্যানের মতে শ্রেণী হিসেবে কৃষকদের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মার্ক্স দেখেছিলেন তা হল বর্বরতা।[২] এই ধরনের তাত্ত্বিকদের অনেকের মতে, প্রথমে লেনিন এবং তারপর মাও সে তুং তথাকথিত ধ্রুপদী মার্ক্সবাদের সংশোধন করে তবেই কৃষক সমস্যা বুঝতে পেরেছিলেন।

বর্তমান প্রবন্ধে লেনিন, মাও, বা মার্ক্সোত্তর কোনো মার্ক্সবাদীর চিন্তা নিয়ে আলোচনা করা হয় নি। একথা অনস্বীকার্য, যে কেবলমাত্র যুগোপযোগী করার জন্য নয়, দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের ফলেও পরবর্তীকালে যাঁরা কমিউনিস্ট আন্দোলন করেছেন তাঁরা অনেকে কৃষক প্রশ্নে মার্ক্সের থেকে ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গে না গিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব মার্ক্স ও এঙ্গেলসের মতে কৃষক সমস্যার বিভিন্ন দিক কী ছিল, তাই।

১. Charles H. Anderson, *The Political Economy of Social Class* New Jersey, 1974, p 59.

২. Bertell Ollman ; 'Marx's 'Use of Class', *American Journal of Sociology*, vol 73 (1968), p 574.

প্রথমেই মনে রাখা দরকার, মার্ক্স ও এঙ্গেলস কৃষকদের পেটি বুর্জোয়াদের একটি অংশ মনে করতেন।[৩] সুতরাং সাধারণভাবে পেটিবুর্জোয়াদের সম্পর্কে তাঁরা যা বলেছেন, তাও দেখা দরকার। জার্মান ভাষায় যাদের তাঁরা Kleinlowgerschaft বলছেন, তার সঙ্গে Kleine Bourgeoisie-র পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয় দল হল ছোট মাপের ধনিক। প্রথম দল ধনিক শ্রেণীতে পড়ছে না, অন্য একটি অন্তর্বর্তী শ্রেণী হিসেবে তাদের দেখা হচ্ছে। এরা সম্পত্তির মালিক, কিন্তু ধনিক নয়—অর্থাৎ এরা প্রধানত বা সম্পূর্ণভাবে বেতনভুক শ্রমিকদের উদ্‌বৃত্ত শ্রম থেকে মুনাফা করে,খায় না। স্বাভাবিকভাবেই, এই শ্রেণীকে পাঁচিল তুলে অন্য দুই শ্রেণী থেকে ভাগ করা যায় না। কৃষক নিজে জমিতে শ্রম করলেও, সে ক্ষেতমজুর লাগাতেও পারে। অন্য দিকে একজন দরিদ্র কৃষক অভাবের তাড়নায় অন্যের জমিতে কাজ করতে পারে।

এই শ্রেণী অবস্থান থেকে কৃষকদের দ্বিমুখী চরিত্র জন্ম নেয়। 'ক্যাপিটাল'-এর চতুর্থ খণ্ডের পাণ্ডুলিপিতে মার্ক্স পেটিবুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করে লেখেন: 'যে স্বাধীন কারিগর বা কৃষক, যারা কোনো শ্রমিক খাটায় না,... অতএব ধনিক হিসেবে উৎপাদন করে না, তাদের অবস্থানটা কি?' তার প্রথম উত্তর হল, সংক্ষেপে: 'তারা পণ্য উৎপাদক। কিন্তু এই উৎপাদন ধনবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় পড়ে না।' এরপর তিনি বলেন, যে এই অধনবাদী উৎপাদকরা ধনবাদী সম্পর্কের প্রাধান্যের কাঠামোতে কাজ করছে। একটা সমাজ ব্যবস্থা স্বকীয় নয় এমন অনেক কিছুকে আত্মসাৎ করতে পারে। ধনবাদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়: 'স্বাধীন কৃষক বা কারিগর খণ্ডিত হয়ে দুজন ব্যক্তি রূপে দেখা দেয়। উৎপাদনের উপাদানের মালিক হিসেবে সে ধনিক; শ্রমজীবী হিসেবে সে নিজেরই মজুরী-শ্রমিক। ধনিক হিসেবে সে নিজেকে বেতন দেয় এবং মূলধনের উপর মুনাফা কামায়; অর্থাৎ সে নিজেকে শ্রমিক হিসেবে শোষণ করে, এবং শ্রম মূলধনকে যে ভেট দেয়, সেই উদ্‌বৃত্ত মূল্য সে নিজেকে দেয়। হয়ত সে একইভাবে নিজেকে ভূস্বামী হিসেবে তৃতীয় একটা ভাগ দেয় (খাজনা)... ।'[৪]

এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী পেটিবুর্জোয়া একটি শ্রেণী মিশ্রণ, যে শ্রেণী সংগ্রামের

৩. ভাষাগতভাবে bourgeoisie কেবল burg বা শহরেই হতে পারে। ফলে অনেক সময়ে মার্ক্স ও এঙ্গেলস একত্রে "পেটিবুর্জোয়া এবং কৃষক শ্রেণী"র কথা বলেছেন। তবে শ্রেণী সংজ্ঞার দিক্ থেকে এরা একই।

৪. Marx, K—Theories of Surplus Value, vol I, pp 395f.

আভ্যন্তরীকরণ (internalization) ঘটিয়েছে নিজের মধ্যেই। যদি সম্পত্তির মালিক ও সম্পত্তিহীন—এদের মধ্যে দিয়ে লাইন টানা হয়, তবে তারা প্রথম দলে পড়ে এবং সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত মন্ত্র তাদেরও মনঃপূত হয়। অন্যদিকে যদি বিভাজনটা হয় কারা নিজের শ্রমে খেয়ে-পরে বাঁচে আর কারা অন্যের শ্রম আত্মসাৎ করে তা অনুযায়ী, তাহলে এরা শ্রমিক, এবং শ্রমজীবীদের, এমন কি প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর, সমস্যাও তাদের বোধগম্য হয়।

পেটিবুর্জোয়ারা তাদের এই চরিত্রের ফলে সাধারণভাবে নির্দিষ্ট অবস্থান নিতে অক্ষম। স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতার অভাব তাদের সাধারণ গুণ।[৫]

মার্ক্স ও এঙ্গেলস ছিলেন সর্বোপরি বিপ্লবী। তাঁদের রচনা, বিশেষত রাজনৈতিক বিষয়ে কখনোই বিমূর্ত হত না। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতেই সেগুলি লেখা হত। সুতরাং পেটিবুর্জোয়াদের সম্পর্কে তাঁরা বিভিন্ন সময়ে যা লিখেছেন, তা বুঝতে হলে সমসাময়িক পরিস্থিতিও বুঝতে হয়। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বিখ্যাত দুটি উক্তি। ১৮৪৮-৫০-এর ফ্রান্সের ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্ক্স বলেছিলেন যে কৃষকরা আলুর বস্তার মত। আর জার্মান সমাজতন্ত্রীদের গোথা কর্মসূচির সমালোচনা করে তাঁরা বলেছিলেন, শ্রমিক শ্রেণী ছাড়া অন্য সকলে "একটি প্রতিক্রিয়াশীল জোট" মাত্র, এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

মার্ক্স, এবং বিশেষত এঙ্গেলস, এই ধারণার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সোচ্চার ছিলেন। কৃষকদের প্রতি সমাজতন্ত্রীদের নীতি কী হবে, তা নিয়ে তাঁরা অন্যরকম কথা বলেছিলেন।

দুই

অন্যান্য অন্তর্বর্তী শ্রেণীদের সঙ্গে কৃষকদের পার্থক্য দুটিঃ ১. সংখ্যার দিক থেকে তাদের বিশালত্ব, ২. তাদের জীবনযাপনের চরিত্র, যা গ্রাম্য; এবং যা যে কোনো শহুরে শ্রেণীর তুলনায় অনেক বেশি এক ধরনের।

কৃষক সমস্যা প্রসঙ্গে মার্ক্সের রাজনৈতিক বক্তব্যের ভিত্তি ছিল কৃষিক্ষেত্রে ধনবাদী বিকাশের প্রভাবের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা

৫. Marx K—The 18th Brumaire of Louis Bonaparte, (SW, vol I, p 426) ; Marx K—Class Struggles in France, (SW, vol I, p 221) Engels, F—Revolution and Counter-Revolution in Germany (SW, vol I, p 304 f) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

কেবল সংক্ষেপে ঐ বিশ্লেষণ লব্ধ সিদ্ধান্তগুলিই দেখব, বিশ্লেষণের খুব গভীরে যাব না।

> এই উৎপাদন ব্যবস্থার পূর্বধারণা হল জমি খণ্ড খণ্ড করা এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান ছড়িয়ে দেওয়া। এই ব্যবস্থা এই উৎপাদনের উপাদানগুলির কেন্দ্রীকরণ যেমন নাকচ করে দেয়, তেমনি, সহযোগিতা, প্রত্যেক স্বতন্ত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রম বিভাজন, প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও তাদের উৎপাদনশীল ব্যবহার, এবং সামাজিক উৎপাদিকা শক্তির অবাধ বিকাশও নাকচ করে দেয়। যে সমাজ ও উৎপাদন পদ্ধতি সংকীর্ণ ও কমবেশি আদিম সীমার মধ্যে ঘোরাফেরা করে, এটা কেবল সেখানেই সম্ভব। বিকাশের এক নির্দিষ্ট স্তরে এটা নিজের বিলুপ্তির বস্তুগত শক্তির জন্ম দেয়।[৬]

এই উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে 'ধনবাদী সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক প্রবণতা' শীর্ষক অধ্যায় থেকে। এখানে ধনবাদী বিকাশের ফল কী হয়েছে, তা খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

'Class Struggles in France'-এ মার্কস কৃষকদের দেনার দায় ব্যাখ্যা করে বলেন, জমি ভাগ করার ফলে শ্রম বিভাজন, বড় বড় উন্নতি প্রকল্প ইত্যাদি অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তদুপরি ছোট কৃষকের হাতে অন্য মূলধন না থাকায় অন্যান্য ভাবেও কৃষির উন্নতি অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।[৭]

এখানে মার্কস একটি নির্দিষ্ট দেশের নির্দিষ্ট অবস্থার কথা বলছেন। বহু মার্কসবাদী, এবং কৃষক প্রশ্নে মার্কস বিরোধীদের প্রায় সকলেই[৮] একথা ভুলে গিয়ে মনে করেন, মার্কস মনে করতেন : ১. ছোট খামারের চেয়ে বড় খামার সর্বদাই দক্ষ, এবং ২. এই দক্ষতা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

'ছোট' ও 'বড়' ব্যক্তি মালিকানা সম্পর্কে মার্ক্সের বক্তব্য ক্যাপিটালেই যথেষ্ট স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। জমিতে ব্যক্তি-মালিকানার ভিত্তিতে চাষ হলে উৎপাদনের সংকট হবেই, এবং জমির আকৃতি কেবল সংকটের ধরনটা নির্ণয় করে দেয়, এই তাঁর মত।[৯] অর্থাৎ মার্ক্সের উদ্দেশ্য ছোট কৃষকের বিরুদ্ধে

---

৬. Marx, K—Capital, vol 1,

৭. Marx, K—Class Struggles in France (Sw, vol 1, p 275)

৮. উদাহরণ স্বরূপ D. Mitrany—Marx Against the Peasant, North Carolina, 1951,

৯. Marx, K—Capital, vol 1, p 792.

বড় জোতের স্বপক্ষে লড়াই করা নয়, জমিতে ব্যক্তি মালিকানা ও সামাজিকৃত কৃষিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে তুলে ধরা।[১০]

সুতরাং বিষয়টা এই নয়, যে মার্ক্স 'against the peasant' না 'for the peasant'। ধনবাদী অর্থনীতির বিকাশে কৃষকের অবস্থা কী দাঁড়াল, সেটাই দেখার বিষয়। কারণ, মার্ক্স ও এঙ্গেলসের রাজনৈতিক ও কর্মসূচিগত দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার ভিত্তি এই বিবর্তন সম্পর্কে তাঁদের বিশ্লেষণ। অর্থনৈতিক তত্ত্ব থেকে রাজনীতির ক্ষেত্রে আসার সময়ে প্রবণতা কথাটাকে তিনভাবে দেখতে হবে: পরিবর্তনের দিক নির্ণয়; গতি, এবং তার মধ্যে ছেদ, পশ্চাদপসরণ, ইত্যাদির সমস্যা, ও পরিবর্তনের দৃশ্যমান রূপ।

অর্থনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণীর সাধারণ ভবিতব্য, জটিলতা সর্বদাই আশাতীত হয়। গতি কী হবে, তাও একদম ঠিকভাবে বলা কঠিন।

মার্ক্স ধনবাদের যে-বিশ্লেষণ করেছিলেন তাতে অন্যতম মূল প্রবণতা বেরোয় ঘনীভবন ও কেন্দ্রীকরণ। কৃষি ও শিল্প, উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রবণতা কাজ করে, কিন্তু দেশ ও কালের বৈশিষ্ট্য এর গতি ও রূপের পৃথকীকরণ করে দেয়।

স্বাধীন ছোট কৃষক, মার্ক্সের মতে, এক যুগে যথেষ্ট প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। 'স্ব-শাসিত কৃষকের স্বাধীন মালিকানা দৃশ্যমান ভাবেই ছোট স্তরে কাজের ক্ষেত্রে জমির মালিকানার সবচেয়ে স্বাভাবিক রূপ···এই উৎপাদন ব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশের জন্য জমির মালিকানা ততটাই আবশ্যক, যতটা আবশ্যক হস্তশিল্পের স্বাধীন বিকাশের জন্য যন্ত্রের মালিকানা। এখানেই পাওয়া যায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিকাশের ভিত্তি। কৃষির বিকাশের জন্যই এটা একটা আবশ্যক উত্তরণশীল স্তর।'[১১]

উল্লেখযোগ্য, এখানে বলা হচ্ছে, শুধু অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য নয়,

---

১০. মার্ক্সবাদীরা অনেকেই এই বিষয়টা বোঝেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'অনীক' পত্রিকায় বামফ্রন্টের সাত বছরের শাসন নিয়ে আলোচনাকালে তরুণ রায় লিখেছেন, ছোট জমির মালিক কম উৎপাদনশীল, মার্ক্সবাদীরা নাকি এটা প্রমাণ করে দিয়েছেন, এবং বামফ্রন্ট তার উল্টো কথা বলে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অংশীদার হচ্ছে। 'অনীক', ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪।

১১, Marx, K—Capital, vol 13, p786f

আধুনিক মানবতার বিকাশের ক্ষেত্রে এই উৎপাদন ব্যবস্থার গুরুত্ব আছে। ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডেও মার্ক্স এই কথাই বলছেন।[১২]

কিন্তু এই ব্যবস্থা উত্তরণের একটি নির্দিষ্ট স্তরেই প্রগতিশীল। ছোট জোতের ভিত্তিতে উৎপাদন কেন, কী ভাবে সংকটে পড়ল, এবং কৃষকের উপর তার প্রভাব কী হল, সেটা দেখতে হবে।

স্বাধীন কৃষক অর্থনীতির অবনতির সহজতম রূপ হল জমির মালিকানার ঘনীভবন ও কেন্দ্রীকরণ। কিন্তু কেবল এই দিকে তাকালে স্বাধীন কৃষক অর্থনীতির অবনতির প্রমাণ খুব বেশি পাওয়া যাবে না। কেবলমাত্র ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই পথেই ধনবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা কৃষিক্ষেত্রকে পুরোপুরি কব্জা করেছে। পৃথিবীর অন্য বহু দেশের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বিতর্কের সমাধান এখনও হয় নি।

কিন্তু মার্ক্স বা এঙ্গেলসের কাছে এই রূপ নিজে থেকে কৃষির বিকাশের কোনো প্রমাণ নয়।[১৩] মার্ক্স নিজে তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্মের গোড়া থেকেই আপাত রূপ এবং অন্তর্নিহিত বাস্তবতার মধ্যে বিচার করায় সচেষ্ট ছিলেন। শিল্পক্ষেত্রে, স্পেয়ার পার্টস সরবরাহকারী ছোট সংস্থা ইত্যাদির তাঁবেদার ও প্রকৃতপক্ষে পরাধীন অবস্থা সুবিদিত। এই একই কথা বলা যায় কৃষকদের প্রসঙ্গেও। ব্যাঙ্ক, মহাজন, ইত্যাদির হাতের মুঠোয় রয়েছে যে কৃষক মালিকানার পাট্টা তার কাছে থাকলেও সে কতটা স্বাধীন?

আইনি সম্পর্ক ও বাস্তব উৎপাদন সম্পর্কের এই ফারাকের সম্ভাবনার কথা মার্ক্স ক্যাপিটালে প্রথম বলেন নি। The German Ideology গ্রন্থেই স্টির্নারের সমালোচনা করে তিনি এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। দরিদ্র কৃষক যখন নিজের জমিতে চাষের আয়ের পরিপূরক হিসেবে দিনমজুরের কাজ করতে শুরু করে, তখন স্বাধীন কৃষক অর্থনীতি বৃহত্তর ধনবাদী অর্থনীতির লেজুড়ে পরিণত হয়।

১৮৪৮-এর বিপ্লবের সময় থেকে মার্ক্স দেখাতে শুরু করেন, স্বাধীন কৃষক-অর্থনীতি কীভাবে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। মর্টগেজ, সুদের চাপ, সরকারি কর, ইত্যাদির মাধ্যমে ধনবাদ কৃষককে শোষণ করছে, এই ছিল তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়। জার্মানি সম্পর্কে একই কথা লেখেন ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস। স্বাধীন

---

১২. Marx, K—Capital, vol 1, p 761

১৩ Mandel, E.—Marxist Economic Theory, Capter 9.

ফ্রিহোল্ডার [এক ধরনের কৃষক] 'নামই একটি স্বাধীন ভূস্বামী শ্রেণী' কারণ মর্টগেজ ও অন্যান্য দেনার চাপ এত ভারী যে, "কৃষক নয়, বরং যে মহাজন টাকা দিয়েছে সেই ছিল প্রকৃত ভূস্বামী।'[১৪]

এই বিশ্লেষণ আরো টেনে নিয়ে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, শেষ বিচারে স্টক এক্সচেঞ্জ ঐ জমির মালিক।

এ থেকে যে রাজনৈতিক শিক্ষা তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, তা হল: [যদিও ফরাসী কৃষক] 'তার উৎপন্ন দ্রব্যের বৃহত্তর অংশ রাষ্ট্রকে কর হিসেবে, উকিলদের কাছে মোকদ্দমার খরচ হিসেবে এবং মহাজনের কাছে সুদ হিসেবে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়…তবু সে উৎকণ্ঠ ভালবাসার সঙ্গে তার ভূখণ্ড এবং সেটার প্রতি তার নেহাৎই নামকাওয়াস্তে মালিকানা আঁকড়ে থাকে', এবং এই ব্যবস্থার একমাত্র প্রতিকার হতে পারে জমির রাষ্ট্রীয়করণ হলে।[১৫]

কিন্তু এ ছাড়াও, অন্যভাবেও স্বাধীন কৃষক অর্থনীতির পতন ১৯শ শতক থেকেই ঘটছে। সমাজ ও অর্থনীতিতে কৃষক ও তার কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচার করার মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অবশ্যই, এই অবনতির ফলে কৃষকের রাজনৈতিক চেতনায় প্রগতিশীল প্রবণতা বাড়বে, এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। গ্রামাঞ্চলে জীবনের সামাজিক শর্ত এমনই, যে শহরের তুলনায় সচেতনতা বৃদ্ধি অনেক ধীর লয়ে হওয়া স্বাভাবিক। এর সবচেয়ে সহজ প্রমাণ পাওয়া যাবে যে কৃষক জমি খুইয়ে শহরে এসে শ্রমিকে পরিণত হয়, আর যে গ্রামে ক্ষেতমজুরের কাজ করে, তাদের চেতনার বিকাশের তুলনামূলক বিচার করলে। দু-তিন পুরুষ ক্ষেতমজুর থাকার পরও, জমির লড়াই তাদের কাছে প্রধান লড়াই থাকতে পারে। ইতিমধ্যে গ্রামাঞ্চলে ধনবাদী অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি হলেও, এবং কৃষকের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ কাল্পনিক হয়ে পড়লেও ঐ দাবিতে তাদের সংগঠিত করা সহজ। এর সঙ্গে, গ্রামীণ সমাজের চাপ এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ফলে তারা কৃষকের সমস্যার সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারে, ব্যক্তিগত অবস্থা যাই

---

১৪. Engels, F—Revolution & Counter-Revolution in Germany, (S W, vol 1, p 306)

১৫. Draper, H—Karl Marx's Theory of Revolution, vol 2, p 329-এ উদ্ধৃত।

হোক না কেন। অন্যদিকে, দু-তিন পুরুষ শহুরে শ্রমিক থাকার পর গ্রামের বিষয়ে চিন্তার ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন আসে।[১৬]

এ পর্যন্ত আমরা কৃষকদের বিচার করেছি সামগ্রিকভাবে। কিন্তু তাদের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ বিভাজন রয়েছে, তা তাদের রাজনৈতিক ভূমিকার উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

কৃষক সম্পর্কে আলোচনা যাঁরা করেন, তাঁরা সকলেই ছোট কৃষক ও বড় কৃষকের কথা বলেন। কিন্তু 'কৃষক অর্থনীতি' বা 'কৃষক সমাজ' তত্ত্বের প্রবক্তারা (চায়ানভ, শ্যানিন, ইত্যাদি) মূলত এই কথার মাধ্যমে শুধু সংখ্যাগত বা মাত্রাগত ফারাক নির্দেশ করেন। কৃষকদের এই স্তরভেদের যে কোনো গুণগত তাৎপর্য আছে, তা তাঁরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। ছোট চাষী ও বড় চাষী সম্পর্কে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের বিশ্লেষণ এরকম ছিল না। ছোট কৃষক বলতে মার্ক্স বুঝতেন তাকে, যে এমন এক খণ্ড জমির মালিক, যা চাষ করে সে ও তার পরিবার, এবং যা থেকে তার পরিবারের খাদ্যের চাহিদা মেটানো যায়। আধুনিক প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে এদের তফাৎ—এরা উৎপাদনের উপাদানের মালিক, এবং এই অর্থে অতীত উৎপাদন ব্যবস্থার একাংশ, যা টিঁকে রয়েছে।[১৭] নেতিবাচকভাবে বলতে হলে, ছোট কৃষক সে, যে স্থায়ী বা নিয়মিতভাবে অন্যের শ্রম শক্তি কেনে না, সুতরাং যাকে মূলত "employer" বলা যায় না।

অন্যদিকে, বড় কৃষক 'মজুরি-শ্রমিক ছাড়া কাজ চালাতে পারে না।'[১৮] মার্কস এ প্রসঙ্গে বলেছেন 'এইভাবে, তারা ধীরে ধীরে কিছুটা পরিমাণে ধন সঞ্চয় করার সুযোগ পায় এবং নিজেরাই ভবিষ্যত ধনিকে রূপান্তরিত হয়।'[১৯]

---

১৬. এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বম্বের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা। টেক্সটাইলের ধর্মঘটী শ্রমিকরা যাঁরা গ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন, তাঁরা বিশেষভাবে ক্ষেতমজুরের সমস্যা ও দাবি নিয়েই আন্দোলন সংগঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ভারত পাটাঙ্কার ও অমর জেসানির বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ।

১৭. Engels, F—The Peasant Question in France and Germany (SW, vol 3, p 459).

১৮. ঐ, p 473.

১৯. Marx, K—Capita ,vol 3, p 779.

ছোট এবং বড় কৃষকের যে সংজ্ঞা এখানে দেওয়া হল, তার মধ্যে একাধিক স্তর থাকতে পারে। মাঝের সকলকে একত্রে মধ্য কৃষক বলা সম্ভব। এদের শ্রেণীগত অবস্থান বহুলাংশে অন্য দুটি স্তর দ্বারা নির্দেশিত।

'যেখানে মধ্য চাষীরা ছোট চাষীদের সঙ্গেই থাকে সেখানে উভয়ের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির খুব বড় ফারাক হয় না; কারণ তারা জানে তাদের কতজন ইতিমধ্যেই ছোট চাষীর স্তরে নেমে গেছে। কিন্তু যেখানে মধ্য ও বড় কৃষকদের আধিপত্য এবং খামারের কাজ চালানোর জন্য সাধারণভাবে পুরুষ ও নারী কর্মচারীর সাহায্য দরকার সেখানে ব্যাপারটা অন্যরকম।'[২০]

সুতরাং, গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের এলাকা ভিত্তিক পারস্পরিক সম্পর্কের উপর রাজনৈতিক কৌশল বহুলাংশে নির্ভর করবে, এই সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসে।

কৃষকদের 'রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা,' 'প্রগতির পথে বাধা' হয়ে দাঁড়াল, ইত্যাদি প্রসঙ্গে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের মত কী ছিল, তাও ঠিকভাবে দেখা দরকার। এই প্রসঙ্গে অনুবাদ সমস্যার উল্লেখ করা আবশ্যক।[২১] কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্ক্সের একটি মন্তব্য, ইংরেজিতে সাধারণত লেখা হয় 'the idiocy of rural life'—অর্থাৎ গ্রামীণ জীবনের মুর্খতা। মূল জার্মানে বাক্যাংশটি ছিল 'dem idiotismus des Landlebens'। ১৯শ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত জার্মান ভাষায় Idiotismus কথাটি প্রধানত প্রাচীন গ্রিক idiotes অর্থে ব্যবহৃত হত। যে বা যারা সমাজ ও রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সাধারণ স্বার্থ বিষয়ক কাজ থেকে দূরে থাকত, তাদের সম্বন্ধে এই কথাটি প্রযোজ্য। উল্লেখযোগ্য, রিয়াজানভ সম্পাদিত সংস্করণে, (যার ইংরেজি অনুবাদ করেন ইডেন ও সিডার পলি) ঐ জায়গায় যে কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তা হল : 'the seclusion and ignorance of rural life'.[২২]

এখানে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের আসল বক্তব্য ছিল : কৃষকরা বিকশিত বুর্জোয়া সভ্যতার বাইরে পড়ে। পরবর্তী লাইনগুলিতে যখন পাশ্চাত্যের সঙ্গে

২০. Engels, F—The Peasant Question…(SW, vol 3, p 473).
২১. নীচের আলোচনা মূলতঃ Draper-এর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের ভিত্তিতে করা হয়েছে।
২২. Ryazanoff, D (Ed.)—The Communist Manifesto of K. Marx & F. Engels—Calcutta, 1972, p 31.

প্রাচ্যের বর্তমান সম্পর্কের উল্লেখ করা হয়, তখন এই বক্তব্য আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

কৃষকের এই বিচ্ছিন্নতা, এই 'atomisation' প্রসঙ্গেই পাওয়া যায় সেই 'কুখ্যাত' আলুর বস্তা সংক্রান্ত মন্তব্য? The Eighteenth Brumaire-এ ফরাসি কৃষকদের পরস্পর সংযোগ বিহীন, আত্মকেন্দ্রিক, আদিম, আধুনিকতার নামগন্ধহীন পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্কস লিখেছিলেন, 'প্রতিটি কৃষক পরিবার প্রায় স্ব-নির্ভর···একটি ছোট জোত, একজন কৃষক ও তার পরিবার; তাদের পাশে আর একটি···এই রকম কয়েক কুড়ি মিলিয়ে হয় একটি গ্রাম; আর কয়েক কুড়ি গ্রামে হয় একটি ডিপার্টমেণ্ট। এইভাবে, ফরাসি জাতির বিরাট জনসমষ্টি সৃষ্ট হয়। [এদের] যোগফলের মাধ্যমে, খানিকটা যেমন একটা বস্তায় অনেক আলু মিলে হয় আলুর বস্তা।'[২৩]

একটা আলুর বস্তা নিজে থেকে কোথাও যায় না। কৃষকরা অর্থনৈতিক সংজ্ঞায় শ্রেণী হলেও, তাদের পক্ষে নিজেদের শ্রেণী হিসেবে দেখে রাজনৈতিক কাজ চালানো, বা বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা এই জন্যই সম্ভব নয়। 'তারা নিজেদের প্রতিনিধি হতে পারে না, তাদের প্রতিনিধিত্ব করে দিতে হয়।'[২৪]

এই শ্রেণী অবশ্যই নির্দিষ্ট অবস্থায় বিপ্লবী জোটের অংশীদার হতে পারে; কিন্তু ইতিহাস দেখায় যে এদের বিপ্লবী ক্রিয়া-কলাপ বড়জোর সহায়ক হতে পারে। অনেক বেশি সময়ে তারা নিষ্ক্রিয় থাকে। কৃষক সমাজের 'বিকেন্দ্রীকরণ', নিষ্ক্রিয়তা ও বিচ্ছিন্নতা রাষ্ট্রের অতিকেন্দ্রীকরণের বা স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করে।[২৫]

সুতরাং, ঐতিহাসিকভাবে যে প্রশ্নটা উঠে এসেছে, তা হল, কৃষকের শক্তির উপর নির্ভর করে কে ক্ষমতা দখল করবে? এবং কার স্বার্থে? বাকুনিনের কৃষি বিপ্লব তত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে মার্কস, এঙ্গেলস ও লাফার্জ দেখিয়ে-

---

২৩. Marx, K—The 18th Brumaire, (SW, vol 1, p 479).

২৪. ঐ।

২৫. ঐ। এখানে কৃষকরা কীভাবে বোনাপার্টবাদী স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় তা দেখানো হয়েছে। এছাড়া, 'এশীয় স্বৈরতন্ত্র' প্রসঙ্গে, রুশ জারতন্ত্র প্রসঙ্গে, ও অন্যান্য স্বৈরতান্ত্রিক, কেন্দ্রীয় শাসন ও তার সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। Marx, K—British Rule in India; Marx, K—letter to Zasulich 8 March 1881, ইত্যাদি।

ছিলেন, বাকুনিন কৃষকের চরিত্রের পশ্চাদপদ দিকগুলির উপর নির্ভর করে ক্ষমতা দখলের কথা বলতেন, এবং তার অর্থ হত কৃষকের ঘাড়ে চেপে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা, সমাজবিপ্লব নয়।[২৬] এতে কৃষকেরও আসলে কোনো উন্নতি হত না। এর বিরুদ্ধে মার্কস ও এঙ্গেলসের উদ্দেশ্য ছিল কৃষকরা কোন অবস্থায় বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে আঁতাত করবে ও তার ফলে উভয়ের স্বার্থ কীভাবে রক্ষা করা যায়, তা ব্যাখ্যা করা।

তিন

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি যে মার্কস এবং এঙ্গেলসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, কৃষিক্ষেত্রে মোটা দাগে পাঁচটি সামাজিক স্তর দেখা যায়।[২৭] এরা হল: ভূস্বামী, বড় কৃষক, মধ্য কৃষক ও ছোট কৃষক, এবং ক্ষেতমজুর। এখানে কার সঙ্গে, এবং কী শর্তে ঐক্য সম্ভব, তা নিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। ১৮৯৪ সালে এঙ্গেলস লিখেছিলেন: 'গ্রামীণ জনসমষ্টির এই ভাগগুলির মধ্যে কোনগুলিকে সোশ্যাল—ডেমোক্রেটিক পার্টি নিজের দিকে আনতে পারে?'[২৮] তার উত্তর ছিল: সর্বপ্রথম ও সর্বোপরি, গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন: 'অবশ্যই একটি শ্রমিক দলকে প্রথমে লড়াই করতে হবে মজুরি-শ্রমিকদের জন্য, অর্থাৎ পুরুষ ও নারী চাকর ও দিনমজুরদের জন্য। যে ধরনের প্রতিশ্রুতি দিলে শ্রমিকদের মজুরি-দাসত্ব বর্তমান থাকবে, কৃষকদের সেরকম কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া প্রশ্নাতীত ভাবে নিষিদ্ধ।'[২৯]

গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতকে সংগঠিত করা, তাদের তীব্র লড়াই শুরু হওয়া, শহরের চেয়ে অনেক কঠিন। এ বিষয়ে আমরা আগেই কিছুটা আলোচনা করেছি। ক্ষেতমজুরদের যে কোনো ধর্মঘটকেই তাই মার্কস ও এঙ্গেলস বিশেষ গুরুত্বসহকারে দেখতেন।[৩০] এবং কেবল এঙ্গেলসের শেষ জীবনে নয়,

---

২৬. Draper, H—i bid p 356 f.

২৭. এখানে শ্রেণী কথাটি ইচ্ছাকৃতভাবেই ব্যবহার করা হয় নি। 'ভূস্বামী' বলতে সামন্ততান্ত্রিক ও ধনবাদী rentier উভয়ের কথাই বলা হয়েছে। বড়, মধ্য ও ছোট কৃষকও তিনটি স্বতন্ত্র শ্রেণী নয়—অন্তত মার্কসের বিশ্লেষণে। লেনিন অবশ্য এদের স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবেই দেখেছিলেন।

২৮. Engels, F—The Peasant Question (Sw, vol 3, p 459).

২৯. ঐ, p 473

৩০. এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, Engels, F—Condition of the working class of England, আয়ার্ল্যাণ্ড প্রসঙ্গে মার্কসের বিভিন্ন প্রবন্ধ, ইত্যাদি।

১৮৪৮-এর আগেই, অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার আগে থেকেই, তাঁরা এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন।[৩১]

কৃষকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই, সমাজতন্ত্রীদের মূল আশা-ভরসা ছিল ছোট কৃষকদের কেন্দ্র করে। 'একবার আমাদের মনে ছোট কৃষক সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ হয়ে গেলে গ্রামীণ জনসমষ্টির অন্য সব অংশ সম্পর্কে আমাদের অবস্থান নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের হাতে এসে যায়।'[৩২]

আবার দেখানো যায়, একথা শুধু এঙ্গেলসের শেষ জীবনের নয়। ড্রেপার তাঁর বইয়ে দেখাচ্ছেন, প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনারাল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এঙ্গেলস জনৈক ইতালীয় প্রশ্নকর্তাকে ঠিক এই মর্মেই উত্তর দিয়েছিলেন।[৩৩]

কৃষক সমস্যা প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলস এই সাধারণীকরণ ছাড়া আর যা লিখেছেন, তা সবই বিভিন্ন দেশের নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো এবং শ্রেণী সংগ্রামের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি মাথায় রেখে লেখা। বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে ঐ বিপুল রচনাসম্ভারের যথাযথ পরিক্রমা অসম্ভব। খুব সংক্ষেপে তাঁদের কর্মসূচি সংক্রান্ত চিন্তার বিকাশের রূপরেখা নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বিশেষ একটি কৃষক সমস্যার সেভাবে উল্লেখই নেই। তার দশ দফা দাবিও প্রধানত শ্রমিকদের সরকারের লক্ষ্য ও চাহিদা ভিত্তিক।

১৮৪৮-এর বিপ্লবের মধ্যেই মার্কস ও এঙ্গেলস প্রথম শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর চেষ্টা করেন। মার্চ মাসে তাঁরা যখন "জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির দাবিসমূহ" রচনা করেন, তখন কৃষকদের জন্য চার দফা দাবি করা হয়। এগুলি ছিল সামন্তবাদ বিরোধী দাবি। কৃষকের উপর সামন্তবাদী বোঝা সরানোর দাবি করা হয়, সমস্ত সামন্ত সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা কায়েম করার দাবি

---

৩১. সময়ের উপর এই জোর দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক নয়। এদেশে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা বিপ্লবের স্তর গণতান্ত্রিক, এই অজুহাতে ক্ষেতমজুরদের শ্রেণীগত স্বীকৃতি না দিয়ে 'ভূমিহীন কৃষক', এই অর্থহীন ও হাস্যকর লেবেল ব্যবহার করেন। শুধু মার্ক্স নয় লেনিন ও মাওসে তুংয়ের রচনাতেও 'ক্ষেতমজুর' যথেষ্ট উপস্থিত। বিশেষত মাও-য়ের 'চীনা সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ' দ্রষ্টব্য।

৩২. Engels, F—The Peasant Question (sw, vol 3, p 459).

৩৩. Draper, H—i bid, p 362.

তোলা হয়, এবং খাজনাকে রাষ্ট্রকে প্রদত্ত করে পরিণত করতে বলা হয়। উল্লেখযোগ্য, রাজা ও অন্যান্য সামন্তদের জমি বণ্টন নয়, রাষ্ট্রীয়করণের দাবি তোলা হয়েছিল।[৩৪]

জুন মাসে মার্কস 'নয়ে রাইনিশ জাইটুং' পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। প্রথম থেকেই এই পত্রিকা সংগ্রামরত কৃষকদের পক্ষ নিয়ে প্রচার চালায়। ১০ই জুন প্রাশিয়ার মন্ত্রী প্যাটো সামন্ততান্ত্রিক অধিকার বিলোপ করার একটি প্রস্তাব প্রকাশ করেন। ঐ প্রস্তাবে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হয়। 'নয়ে রাইনিশ জাইটুং' দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ক্ষতিপূরণের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। জুলাইয়ের শেষে এক দীর্ঘ প্রবন্ধে মার্কস দেখান, ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক অধিকার কীভাবে বুর্জোয়া অধিকারে রূপান্তরিত হয়। প্যাটো, কৃষিমন্ত্রী গিয়ের্ক, এবং সাধারণভাবে ধনিক শ্রেণী সম্পর্কে তিনি লেখেন: 'এবং কেবল এই জন্যই তিনি ক্ষতিপূরণের চুক্তি শোধরাবেন না, কারণ এই চুক্তির মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি সম্পর্ক বুর্জোয়া সম্পত্তি সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়েছে; কারণ তার ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে বুর্জোয়া সম্পত্তি লঙ্ঘন না করে এগুলি শোধরানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।'[৩৫]

আগস্টের গোড়ায় এই একই প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে এঙ্গেলস বলেন: 'সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তির বুর্জোয়া সম্পত্তিতে রূপান্তর এবং সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার ধনবাদে [-র ক্ষমতায়] রূপান্তর সর্বদাই সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের স্বার্থে বাঁধা গোলামকে নতুন করে ঠকানো···বুর্জোয়া রাষ্ট্রের নীতি হল: মৃত্যু ছাড়া কোনো কিছুই তুমি নিখরচায় পাবে না।'[৩৬]

শুধু তাই নয়, এই ক্ষতিপূরণের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেবলমাত্র বড় চাষীরা, তাদের জমির একাংশ বেচে, নিজেদের স্বাধীনতা কিনে নিতে পারবে। যে ছোট কৃষক তা পারবে না, তাকে ধার করতে হবে। 'কৃষকদের কাছ থেকে এই বিপুল অর্থ উৎপাটনের অবশ্যম্ভাবী ফল হবে তারা মহাজনদের হাতে পড়বে। ফ্রান্স, প্যালাটিনেট এবং রাইনল্যাণ্ড দেখায় যে স্বাধীন ছোট কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে অনিবার্যভাবেই থাকে মহাজনী।[৩৭] প্রাশিয়ার

৩৪. Draper, H—i bid, p 365 f কর্তৃক উদ্ধৃত।
৩৫. cw, vol 7, p 294
৩৬. i bid, p 329-330
৩৭. ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের যে ব্যাপক অংশ মহাজনী শোষণকে সামন্তবাদী শোষণের অঙ্গ মনে করেন, এঙ্গেলসের এই বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে তাঁদের

ক্ষতিপূরণের বিজ্ঞানের কৃতিত্ব এই, যে [প্রাশিয়ার] পুরোনো প্রদেশের ছোট কৃষকরা মুক্ত হওয়ার আগে থেকেই মহাজনী ব্যবস্থার বোঝা উপভোগ করতে পারবে। প্রুশীয় সরকার সাধারণভাবে অনেককাল আগেই বুঝে গেছে, কী ভাবে শোষিত শ্রেণীদের পিঠে একযোগে সামন্ততান্ত্রিক এবং আধুনিক বুর্জোয়া পরিস্থিতির বোঝা চাপাতে হয় এবং তাদের উপর ভার দ্বিগুণ করতে হয়।'[৩৮]

'নয়ে রাইনিশ্‌ জাইটুং' পত্রিকাকে ঘিরে ছিল যে গোষ্ঠী, তার সদস্যরা কেবল বিপ্লবের তাত্ত্বিক ছিলেন না। যখনই সম্ভব, তাঁরা বিপ্লবী সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। কার্ল শ্যাপার, কার্ল মার্ক্স প্রমুখ ছিলেন তার নেতৃস্থানীয় কর্মী।

১৮৪৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে 'নয়ে রাইনিশ জাইটুং' গোষ্ঠীর (বা, তার শত্রুদের ভাষায় মার্কসের পার্টির) উদ্যোগে কলোনে এক জনসভায় গঠিত হয় 'জন নিরাপত্তা কমিটি'। এই সময় থেকে গ্রামাঞ্চলে সংগঠন গড়ে তোলার সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া হয়। এজন্য তাঁরা ব্যবহার করেন ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনকে।[৩৯] ২১শে আগস্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে কাজের দিকে প্রথম পদক্ষেপ নেয়। তারা প্রশ্ন করে, 'যে শ্রমিক জমিতে খাটে তাকে কিভাবে সাহায্য করা যাবে ?'

২৭শে আগস্ট কলোনের অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদল নিকটবর্তী ছোট শহর হ্বোরিঙ্গেনে যান। সেখানকার কৃষকদের সঙ্গে আলোচনার পর একটি স্থানীয় সমিতি তৈরি করা হয়। তার সদস্য ছিলেন ৪০ জন। এর পর ১০ই সেপ্টেম্বর, হ্বেসলিঙ্গেন গ্রামেও একটি সমিতি গঠিত হয়।

এই সমিতিগুলির সদস্যদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হত পূর্বোল্লিখিত দাবিগুলির ভিত্তিতে। অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকা মারফৎ শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী ঐক্য গড়ার আহ্বান করা হয়। একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা, 'নয়ে কোল্‌নিশ জাইটুং' ঘোষণা করে যে, তার লক্ষ্য 'সামাজিক

কাছে "অমার্ক্সীয়" ঠেকবে। মহাজনী পুঁজি আজকের যুগে ধনবাদী ব্যবস্থারই অংশ, যদিও তা দিয়ে সরাসরি উৎপাদনশীল বিনিয়োগ হয় না। ধনবাদী ব্যবস্থা মানেই "অগ্রসর", বা "আদিম" মানেই "সামন্ততান্ত্রিক", এই সরল হিসেবের সঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের তত্ত্বের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

৩৮. CW, vol 7, p 330.

৩৯. এই ঘটনাবলি বর্ণিত আছে Draper-এর পূর্বোল্লিখিত বইয়ে।

ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র', এবং পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে মেহনতি মানুষের সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থে।

১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার, হেবারিঙ্গেনে একটি জনসভা আহুত হয়। পুলিশ, সেনাবাহিনী ইত্যাদির বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ৮ থেকে ১০ হাজার শ্রমিক ও কৃষক সভায় অংশ গ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্যাপার। এঙ্গেলস, ডুসেলডর্ফের প্রতিনিধি ফার্ডিনাণ্ড লাসাল, প্রমুখ বক্তৃতা দেন। বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে প্রায় সম্পূর্ণ ঐকমত্য দেখা যায়।

ঐ একই দিনে, স্বতন্ত্রভাবে, ফ্রাঙ্কফুর্টের শ্রমিক ও নিকটবর্তী এলাকার কৃষকরা জাতীয় সভার নরমপন্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানান। এই ঘটনার ফলে সরকার 'মার্কসের দলের' কাজকর্মকে অত্যন্ত বিদ্বেষের সঙ্গে দেখতে থাকে। তাদের ভয় ছিল; শ্রমিক ও কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্যকে 'নয়ে রাইনিশ জাইটুং' পন্থীরা সচেতনভাবে বিপ্লবের পথে নিয়ে যাবেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর সংগঠনের নেতাদের বৃহদংশকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এর পরও ১লা অক্টোবর হেবসলিঙ্গেনে এবং ১৫ই হেবারিঙ্গেনে বড় বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু উদারনৈতিক ধনিক শ্রেণী পুরোদমে প্রতিবিপ্লবে ভিড়ে যাওয়ার ফলে এর পর থেকে আন্দোলন পিছু হটে।

'নয়ে রাইনিশ জাইটুং'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হিবলহেলস ভোলফ এই সময়ে কৃষক প্রসঙ্গে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন।[৪০] কৃষকের সন্তান ও প্রাক্তন ভূমিদাস হিসেবে জার্মান সামন্ততন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর যতটা জ্ঞান ছিল তা মার্কস বা এঙ্গেলসের ছিল না। তাঁর রচনার মাধ্যমে তিনি একদিকে কৃষকদের কাছে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন, আর অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণীর কাছে কৃষকের সমস্যা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

১৮৪৮-৪৯-এর অভিজ্ঞতার সার সংকলন করে মার্কস ও এঙ্গেলস লেখেন তাঁদের বিখ্যাত "Address of the Central Committee to the Communist League" (মার্চ ১৮৫০)। ঐ সময়ে তাঁরা মনে করেছিলেন, বিপ্লবী পরিস্থিতি বিদ্যমান। আসন্ন বিপ্লবী যুগকে দুটি পরস্পর যুক্ত পর্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে বিপ্লবী প্রলেতারীয় দল পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সঙ্গে শাসক শ্রেণীদের বিরুদ্ধে লড়বে। কিন্তু যৌথ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পেটি

৪০. ভোলফের প্রবন্ধগুলি এত জনপ্রিয় হয় যে সেগুলির ১০,০০০ কপি পুনর্মুদ্রণ করা হয়। তিন-চার দশক পরও, জার্মান কৃষকদের মধ্যে এই প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা আন্দোলনের লক্ষ্যের ও তাদের শ্রমিক মিত্রদের প্রতি বেইমানি করবে। তখন শুরু হবে দ্বিতীয় পর্যায়, যখন বিপ্লবীরা দোদুল্যমান গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবেন। বিপ্লব বিরতি ছাড়াই সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবে। এই লড়াইয়ে সফল হতে হলে গ্রামীণ বিপ্লবী শক্তিগুলির সঙ্গে ঐক্যের প্রশ্ন দেখতে হবে। প্রথম পর্যায়ে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের পিছনে থাকবে কৃষকরা, আর শ্রমিকদের পেছনে থাকবে গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত।

মার্ক্স ও এঙ্গেলস দৃঢ়ভাবে মনে করতেন, কৃষকদের দলে টানার জন্য ক্ষেত-মজুরের স্বার্থের ক্ষতি করা যাবে না। তাই তাঁরা সামন্তশ্রেণীর যে জমি বাজেয়াপ্ত করা হবে, তা কৃষকদের মধ্যে বিলি করার বিরুদ্ধে ছিলেন।

'প্রথম ফরাসি বিপ্লবের মতই [একবার ক্ষমতা হাতে পেলে] পেটি বুর্জোয়ারা কৃষকদের হাতে সামন্ততান্ত্রিক জমি তুলে দেবে। অর্থাৎ, একটি পেটি বুর্জোয়া কৃষক শ্রেণী সৃষ্ট হবে, যারা আজকের ফরাসি কৃষকের মতই দারিদ্র ও দেনার চক্রে পড়বে। আর গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত থেকে যাবে আগের মতই।'

'গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতের স্বার্থে, এবং নিজেদের স্বার্থেও, শ্রমিকদের এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করতে হবেই। তাঁদের দাবি করতে হবে, যেন বাজেয়াপ্ত সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি থাকে এবং সম্মিলিত গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত কর্তৃক কর্ষিত শ্রমিক কলোনীতে [সমবায়] পরিণত হয়…। গণতন্ত্রীরা যেমন কৃষকদের সঙ্গে হাত মেলায়, শ্রমিকদের তেমনি গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে।'[৪১]

তবে, কৃষকদের, বিশেষ করে ছোট চাষীদের দলে টানার জন্যও কিছু দাবি রাখা হয়। মার্ক্স ও এঙ্গেলসের মতে, কেবলমাত্র কমিউনিস্টরাই বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহী, তাই তাঁদের সঙ্গে ঐক্য গড়লে তবেই ছোট কৃষক ক্ষতিপূরণ দেওয়া এড়াতে পারে। কিন্তু তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন যে বড় কৃষকের বৃহত্তর অংশ শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যাবে। ফলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়ী হবে কি না, তা নির্ভর করবে শ্রমিক শ্রেণী গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত এবং ছোট চাষী, উভয়কে দৃঢ়ভাবে নিজের সঙ্গে রাখতে পারে কি না তার উপর।

১৬শ শতকের জার্মানির কৃষক বিদ্রোহের উপর এঙ্গেলস যে বই লেখেন ('The Peasant War in Germany') তাতেও বর্তমান কাল সম্পর্কে

৪১. Marx, K, & Engels, F—Selected Works in 3 volumes, vol 1, P 177 f.

একই সিদ্ধান্ত টানা হয়। ১৮৫৬ সালে এঙ্গেলসকে লেখা একটি চিঠিতে মার্কস খুব স্পষ্টভাবেই লেখেন, 'জার্মানিতে ব্যাপারটা নির্ভর করবে প্রলেতারীয় বিপ্লবের পিছনে কৃষক যুদ্ধের দ্বিতীয় সংস্করণ থাকার সম্ভাবনার উপর। তা হলে ব্যাপারটা হবে চমৎকার।'[৪২]

ফ্রান্স সম্পর্কে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের রচনাতেও আমরা সাধারণভাবে এই একই বক্তব্য দেখি। বোনাপার্টতন্ত্রের পুনরুত্থানে কৃষকদের ভূমিকা কী ছিল, তা আমরা কিছুটা আগেই দেখেছি। তবে এখানে জোর দিয়ে বলা দরকার, মার্কস ঐ ক্ষেত্রেও কৃষকদের সরাসরি প্রতিবিপ্লবী মনে করেন নি। বরং, তিনি মনে করেছিলেন যে কৃষকরা এক অসহনীয় পরিস্থিতিকে পাল্টানোর আশাতেই বোনাপার্টকে সমর্থন করেছিলেন। '১০ই ডিসেম্বর, ১৮৪৮ [যেদিন কৃষকদের ভোটে লুই বোনাপার্ট ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়] ছিল কৃষক অভ্যুত্থানের দিন। এই দিন থেকেই শুরু হল ফরাসি কৃষকদের ফেব্রুয়ারি [অর্থাৎ বিপ্লব]। বিপ্লবী আন্দোলন তাদের অনুপ্রবেশের প্রতীক [ছিল বোনাপার্ট]···কৃষকদের কাছে নেপোলিয়ন একজন ব্যক্তি ছিল না, সে ছিল একটি কর্মসূচি। ঝাণ্ডা উড়িয়ে, ঢাক বাজিয়ে, ট্রাম্পেটের শব্দে, তারা ভোটকেন্দ্র অভিমুখে যাত্রা করে এবং চেঁচিয়ে বলে···আর কোনো ট্যাক্স নয়, ধনীরা নিপাত যাক, প্রজাতন্ত্র নিপাত যাক, সম্রাট দীর্ঘজীবী হ'ন। সম্রাটের আড়ালে লুকিয়ে ছিল কৃষক যুদ্ধ। তারা ভোট দিয়ে যে প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটায় তা ছিল ধনীদের প্রজাতন্ত্র।'[৪৩]

এ কথা বলা বাহুল্য, যে কৃষকের ভ্রান্ত ধারণার ফলে লুই বোনাপার্ট বিপ্লবী হয়ে পড়ে নি। কৃষকরা আর একবার ঠকলেন, একথাই একমাত্র বলা যায়। অল্পদিনের মধ্যেই, নতুন সরকার কৃষকদের পক্ষে ক্ষতিকর বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। The Eighteenth Brumaire-এ মার্কস দেখান, 'কৃষকদের সম্রাট' ইতিমধ্যেই কৃষক অসন্তোষ দমনে কী রকম কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। এই জটিল পরিস্থিতিতে তিনি কৃষকের দ্বৈত চরিত্র সম্পর্কে লেখেন : 'কিন্তু এ নিয়ে যেন কোন ভুল বোঝাবুঝি না হয়। বোনাপার্ট বংশ বিপ্লবী কৃষকের না, বরং রক্ষণশীল কৃষকের প্রতিনিধি···তার ভবিষ্যত নয়, তার অতীতকে··· ।'[৪৪]

৪২. Marx-Engels, Selected Correspondence, Mascow, 1965, P 92,

৪৩. Marx, K—class Struggles in France (sw, vol 1, p 236 f).

৪৪. Marx,k—Tne 18th Brumaire...(Sw, vol 1, p 479f).

এরপর, 'কৃষকের শত্রু' মার্ক্স লেখেন, 'যখন সে নেপোলিয়নের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় হতাশ হয়ে পড়বে, ফরাসি কৃষক তখন তার ছোটো জোতের উপর বিশ্বাসেরও সঙ্গ কাটাবে, এই ছোট জোতের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙে পড়বে এবং প্রলেতারীয় বিপ্লব সেই কোরাস লাভ করবে, যা না থাকলে সমস্ত কৃষক প্রধান দেশে তার একক সঙ্গীত তার অন্তিম সঙ্গীতে পরিণত হয়।'[৪৫]

শেষ অংশের জোর মার্ক্সের নিজের। কৃষক প্রধান দেশে (এমন কি ফ্রান্সের মত উন্নত দেশেও) কৃষক সমর্থন ছাড়া প্রলেতারীয় বিপ্লব কেন অসম্ভব, তা এর চেয়ে স্পষ্টভাবে প্রায় কেউই লেখেন নি। ১৮৬৯ সালে বইটি পুনর্মুদ্রণের সময়ে এই অংশটি মার্ক্স বাদ দিয়ে দেন, কারণ তাৎক্ষণিক আশা হিসেবে এর কোনো মূল্য ছিল না। কিন্তু শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের যুক্তি হিসেবে এর গুরুত্ব তাতে কিছুমাত্র কমে না।

এর সঙ্গে মার্ক্স আরো একটি কথা বলেন। যেহেতু কৃষকদের স্বার্থ এখানে ধনিক বিরোধী, 'সুতরাং কৃষকরা তাদের স্বাভাবিক মিত্র ও নেতা খুঁজে পাবে শহরে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে, যাদের কাজ হল বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে উৎখাত করা।'[৪৬]

এই একই চিন্তার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাব আয়ার্ল্যাণ্ড, ইতালি, স্পেন, ও অন্যান্য দেশের বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখা পড়লে। আর রুশ কৃষকদের বিপ্লবী ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা তো সুবিদিত। বস্তুত, প্রথম রুশ মার্ক্সবাদীরা, বিশেষত প্লেখানভ, মার্ক্স ও এঙ্গেলসের আশাকে মাত্রাধিক ও ভ্রান্ত বলে মনে করেছিলেন।[৪৭] তবে একথাও বলা দরকার, যে এঙ্গেলস শেষ জীবনে মনে করতেন যে আগে তাঁরা যা-ই বলে থাকুন না কেন, রাশিয়ায় ধনবাদী বিকাশের ফলে যে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্ট

---

৪৫. ibid, p 484-5, foot note.

৪৬. ibid, p 482.

৪৭. Plekhanov, G. V.—Selected Philosophical writings, vol 1; Baron, S—Plekhanov: The Father of Russian Marxism; এবং Kingston-Mann, E—Lenin and the Problem of Marxist Peasant Revolution.

হয়েছিল, তাতে রাশিয়ার সমাজ-তান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য প্রলেতারিয়েতের বিজয় আবশ্যক হয়ে পড়েছিল।[৪৮]

এ পর্যন্ত আলোচনার ফলে আমরা একটি মৌলিক কর্মসূচিগত প্রসঙ্গের মুখোমুখি এসেছি। তা হল, প্রলেতারীয় বিপ্লবের পর কী হবে? তার সঙ্গে যুক্ত আছে আর একটি প্রশ্ন—তাৎক্ষনিক ও দীর্ঘমেয়াদী নীতির সম্পর্ক কী হবে? এছাড়া কর্মসূচির কিছু দিক পর্যালোচনা করা দরকার, কারণ বহু আধুনিক বিতর্কের উপরও তা আলোকপাত করতে পারে।

চার

কৃষি বিপ্লবের অন্তিম লক্ষ্য কী, এ বিষয়ে মার্ক্সের মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। জমির উপর সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে কৃষির সামাজিকীকরণ—এই ছিল তাঁর শ্লোগান। ১৮৪৪ সালের 'Economic and Philosophical Manuscripts' বা 'Paris Manuscripts'—এই মার্কস এই লক্ষ্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন।[৪৯]

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর দশদফা দাবির প্রথম দফাই ছিল 'ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ এবং ভূমিকর ব্যবহার করে রাষ্ট্রের খরচ মেটানো।'[৫০]

জমি জাতীয়করণ কেন প্রয়োজনীয়, তা মার্কস বিভিন্ন সময়ে ব্যাখ্যা করেছেন। ইংল্যাণ্ডের সম্পর্কে আলোচনা করার সময়ে তিনি বলেন যে জমির জাতীয়করণ সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয়, কারণ তা হলেই উৎপাদন বৃদ্ধি করে জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো যাবে। কেবলমাত্র বড় মাপের চাষেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সদ্ব্যবহার সম্ভব, কিন্তু কয়েকজন ব্যক্তির খামখেয়ালের উপর নির্ভর না করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আনলে তবেই সেটা হতে পারে। ধনবাদী কর্ষণে কৃষিপণ্যের দাম ক্রমেই বাড়ে, অথচ যে নিজে চাষ করছে সে

৪৮. Engels, F.—On Social Relations in Russia—Afterword (SW, vol 2. pp 408—10).

৪৯. Marx, K—Economic and Philosophical Manuscripts, CW, vol 3, p 268.

৫০. Ryaganov, D (Ed)—op. cit—p 55.
১৮৮৮-র মুর-এঙ্গেলস-এর অনুবাদের ভাষা কিছুটা অন্যরকম। তবে রিয়াজানভ টীকাকারে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তা থেকে মার্কস ও এঙ্গেলসের বক্তব্য ও তার পটভূমি সম্পর্কে দ্বিমত থাকে না। এই আলোচনা আছে বইয়ের ১৮৩-৪ পৃষ্ঠায়।

পরিণত হয় চিনির বলদে।[৫১] ১৮৫১ সালে এঙ্গেলসকে প্রেরিত একটি চিঠিতে তিনি লেখেন যে এই পথে কৃষির সংস্কার না হলে 'ম্যালথাস সঠিক প্রমানিত হবেন।'[৫২]

কিন্তু এই প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। অনেকগুলি পেটি-বুর্জোয়া প্রবণতা এর বিরোধী ছিল, যেমন চার্টিস্ট আন্দালনের ও-কনরপন্থী অংশ, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের প্রুধঁপন্থী, ইত্যাদি। ১৮৬৮ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের ব্রাসেলস কংগ্রেসে জমির সামাজিকীকরণের প্রস্তাব খুব অল্প ভোটে পাশ হয়। ১৮৬৯ সালে ব্যাসেল কংগ্রেসে এই প্রস্তাব অনেক বেশি ভোট পায়, কিন্তু প্রুধঁপন্থীরা এর বিরোধিতা করতে থাকেন। জার্মান সমাজতন্ত্রীদের মিত্র দল, সাউথ জার্মান পিপলস পার্টি, এই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করে। হ্বিলহেলম লিবক্লেশট ঐ মৈত্রীরক্ষার্থে আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পার্টির কার্যনির্বাহক সমিতিতে তাঁর পরাজয় ঘটে।

ব্যাসেল প্রস্তাবের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিকের ইংল্যাণ্ডস্থিত কর্মীরা ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড লেবার লিগ প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রথম দাবি ছিল জমির জাতীয়করণ। মার্ক্স এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানান, এবং বলেন যে এর ফলে 'শ্রমিকদের দল ধনিক শ্রেণী থেকে পুরোপুরি স্বতন্ত্র হয়েছে…।'[৫৩]

কিন্তু এই নীতি গ্রহণ করার ফলে প্রয়োগক্ষেত্রে কর্মসূচিগত প্রশ্নের অবসান ঘটেনি। মালিকানা থাকবে শ্রমিক রাষ্ট্রের কাছে—এ নিয়ে তর্ক মিটে যায়। কিন্তু কে চাষ করবে এবং কীভাবে চাষ করা হবে, তা নিয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। ব্যাসেল কংগ্রেসে অনেকেরই মত ছিল যে ছোট কৃষকরা অন্তত তাদের জীবৎকালে, কর না দিয়ে নিজের জমি চাষ করতে পারবে। সমবায় গঠনের প্রশ্নও ফের জোরদার হয়ে ওঠে।

তা ছাড়া, এই নীতি গ্রহণ করলেই যে সব দেশে শ্রমিক রাষ্ট্রকে রাতারাতি জমির জাতীয়করণ করতে হবে, একথা বলা হয় নি। বাকুনিনের একটি সমালোচনা পড়ে মার্ক্স যে মন্তব্য লিখে রেখেছিলেন, তার কিছুটা অংশ তুলে ধরা যায়। 'কিন্তু উত্তরাধিকারের বিলোপ, বা সম্পত্তির বিলোপ ঘোষণা করে

৫১. Marx, K—The Nationalization of Land. Labour Monthly, Sept, 1952, p 415, cited in Draper, op. cit., p 406.

৫২. Cited in Draper, i bid, p 407.

৫৩. Marx Engels Selected Correspondence, p 223.

কৃষককে শত্রুভাবাপন্ন করে তোলা উচিত নয়। দ্বিতীয়টি সম্ভব কেবল তখনই, যখন ধনবাদী কৃষক [capitalist tenant-farmer] কৃষককে [peasant] হটিয়ে দেয়, এবং যে চাষের কাজটা নিজে হাতে করে সে শহুরে শ্রমিকের মতই একজন প্রলেতারীয়, একজন মজুরি শ্রমিক, সুতরাং তাদের দুজনের স্বার্থ পরোক্ষভাবে নয়, প্রত্যক্ষভাবেই এক।'[৫৪]

অন্যদিকে, বড় খামারের জমি খণ্ড খণ্ড করে বিলিয়ে দেওয়ার যে যুক্তি, মার্ক্স তাকেও পেটি বুর্জোয়া কল্পনাবিলাস মনে করতেন। বিপ্লবী সরকার সাবধানে পদক্ষেপ নেবে, এ কথা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু তার গতিমুখ থাকবে জাতীয়করণের দিকে। বেলজিয়ান সমাজতন্ত্রী সীজার দ্য পোপের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে তিনি লেখেন, 'ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত নেবে যে জমির মালিকানা কেবল জাতীয় স্তরেই হতে পারে। জমি শুধু সংঘবদ্ধ গ্রামীণ শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ সমাজকে একটি মাত্র উৎপাদক শ্রেণীর হাতে সমর্পণ করা।'[৫৫] এখানে মার্ক্স শহুরে সিণ্ডিকালবাদের সঙ্গে গ্রামীণ সিণ্ডিকাল-বাদেরও বিরোধিতা করছেন।

মার্ক্স ও এঙ্গেলসের প্রস্তাব ছিল, প্রথমত, আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও ধনবাদী বড় খামার জাতীয়করণের পর সেখানে রাষ্ট্রীয় খামার চালু করা অথবা সমবায় ব্যবস্থা চালু করা। এক্ষেত্রে কারখানা জাতীয়করণ আর খামার জাতীয়করণে কোনো পার্থক্য থাকবে না।[৫৬]

এঙ্গেলসের মতে, ধনবাদী রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট প্রচারে বড় খামারকে গ্রামীণ সমবায়ে পরিণত করার দাবি তোলা উচিত, যদিও বিদ্যমান অবস্থায় ঐ দাবি বাস্তবায়িত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। বেবেলকে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন :

'তুমি যখন রাইখস্ট্যাগে প্রস্তাব আনবে, একটা প্রস্তাবের কথা ভুলে যেও না। রাষ্ট্রীয় জমি প্রধানত বড় ফার্মারদের[৫৭] কাছে লিজ দেওয়া হয়েছে…দাবি

৫৪. C. W. vol 6. p 505.

৫৫. Cited in Draper, op. cit, p 411.

৫৬. Engels, F—The Peasant Question (S W, vol 3, p 474), এবং The Peasant War in Germany, Preface 1870 edition, S W, vol 2, p 164.

৫৭. Peasant-এর বাংলা করা হয়েছে কৃষক। Farmer বলতে সাধারণত কৃষিতে মূলধন বিনিয়োগকারী ধনিকের কথা বলা হয়। আমি তাদের 'ফার্মার' বলেই অভিহিত করেছি।

যেটা তুলতে হবে তা হল : অবিভক্ত বড় জোত ক্ষেতমজুরদের সমবায় সমিতির কাছে লিজ দিতে হবে, যাতে যৌথ চাষ হয়···আমি বিশ্বাস করি, এই দাবি কৃষিতে নিযুক্ত দিনমজুরদের মধ্যে ছুঁড়ে দিতে হবে···কেবল এভাবেই তাদের দলে টেনে আনা যাবে।"[৫৮]

এখানে এঙ্গেলসের উদ্দেশ্য স্বচ্ছ। আশু বা নিম্নতম দাবি এবং পূর্ণ কর্মসূচির মধ্যে সংযোগরক্ষার জন্য, উত্তরণশীল দাবি (transitional demands) হিসেবেই এই দাবিকে তিনি দেখছেন।

কিন্তু ছোট চাষীদের ক্ষেত্রে কোনো অনমনীয় অবস্থান গ্রহণ করা অসম্ভব। তা করলে তারা প্রতিবিপ্লবের দিকে চলে যেতে বাধ্য। পোল্যাণ্ড সম্পর্কে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের রচনা এ বিষয়ে আলোকপাত করে। ১৮৪৬-এর ক্র্যাকাও অভ্যুত্থানের স্মরণে ১৮৪৮ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এক সভায় মার্ক্স বলেন, পোল্যাণ্ডের বিপ্লব কেবল রাজনৈতিক বা জাতীয় বিপ্লব ছিল না, তা ছিল সামাজিক বিপ্লব। এই বিপ্লব কমিউনিস্ট বিপ্লব নয়। কিন্তু ক্র্যাকাওয়ের বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের গভীর বিশ্বাস ছিল যে কেবল একটি গণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ডই স্বাধীন হতে পারে, এবং সামন্তবাদী অধিকারের বিলোপ ছাড়া, খাজনা-প্রদানকারী কৃষককে স্বাধীন সম্পত্তির মালিকে পরিণত করবে এমন এক কৃষি আন্দোলন ছাড়া, পোল্যাণ্ডে গণতন্ত্র অসম্ভব ছিল।[৫৯] আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে তিনি দেখান, এই বিপ্লব 'তার নীতির সঠিকতার প্রমাণ পায় আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে, যেখানে সংকীর্ণভাবে জাতীয় দলটি ও'কনেলের সঙ্গেই কবরস্থ হয়েছে, এবং নতুন জাতীয় দল সর্বাগ্রে সংস্কারপন্থী ও গণতান্ত্রিক।'[৬০]

ঐ সভায় মার্ক্সের এবং এঙ্গেলসের বক্তৃতা থেকে যা বেরিয়ে আসে, তা হল পূর্ব ইউরোপের কৃষিসংগ্রাম একনায়কতন্ত্রকে[৬১] উৎখাত করার আন্তর্জাতিক সংগ্রামের এক অপরিহার্য অঙ্গ। জাতীয় মুক্তি, কৃষি বিপ্লব, এবং

---

৫৮. Draper, op. cit., p 414.

৫৯. C W, vol 6, p 549.

৬০. ibid. ইংরেজীতে আছে "reformatory and democratic". স্পষ্টতই, মার্ক্স এখানে প্রশংসাসূচক অর্থে কথা বলছেন। "সংস্কারপন্থী" কথাটিতে তাই আধুনিক তাৎপর্য খোঁজা ভুল হবে।

৬১. Autocracy.

আন্তর্জাতিক বিপ্লবের এই আন্তঃসম্পর্কের কথা এঙ্গেলস আবার বলেন ১৮৭৪ সালে।[৬২]

বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনবাদী দেশেও কৌশলগত নমনীয়তার কথা মার্ক্স ও এঙ্গেলসের লেখায় পাওয়া যায়। চার্টিস্ট নেতা ও'কনরের 'ল্যাণ্ড প্ল্যান' সম্পর্কে বামপন্থী চার্টিস্ট নেতারা (আর্নেস্ট জোনস, জর্জ জুলিয়ান জার্নি প্রমুখ) ও তাঁদের বন্ধুরা, যেমন মার্ক্স এবং এঙ্গেলস খুবই সন্দিহান ছিলেন। এই 'ল্যাণ্ড প্ল্যান'-এর মর্মবস্তু ছিল প্রচুর জমি কিনে শ্রমিকদের মধ্যে বিলি করা, যাতে শ্রমের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমে যায়। মার্ক্স ও এঙ্গেলস চার্টিস্ট আন্দোলনে ভাঙন ধরে, এমন কিছু করতে চান নি। তাঁরা এই পরিকল্পনা সম্পর্কে লিখেছিলেন যে চার্টিস্ট ল্যাণ্ড সোসাইটি অভিজাতবর্গের কাছে ভীতিপ্রদ, কিন্তু এর সাফল্য হতে পারে কেবল বর্তমান দাবিকে উত্তরণশীল দাবি হিসেবে দেখে শেষ পর্যন্ত জমির জাতীয়করণের দিকে অগ্রসর হলে। কিন্তু ইতিমধ্যে এই আন্দোলন শ্রেণী সংগ্রামে আংশিকভাবে ইতিবাচক, কারণ এর মাধ্যমে শ্রমিকরা বুর্জোয়া উদারপন্থীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেদের মুক্ত করছেন।[৬৩] সুতরাং আন্দোলনের মধ্যে শ্রেণীগত অবস্থান নেওয়া, এবং আন্দোলনকে কমিউনিস্টদের চূড়ান্ত লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করা, এর জন্য যথেষ্ট নমনীয়তা দেখাতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন।

এবারে তাকানো যাক ফ্রান্স ও জার্মানির দিকে। এঙ্গেলস তাঁর শেষ জীবনে এই দুটি দেশের সমাজতন্ত্রী আন্দোলন ও কৃষক সমস্যার আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে মূল প্রশ্নটা ছিল: সমাজতন্ত্রীরা কীভাবে এখন, এই মুহূর্তে কৃষকদের সমর্থন পাবে? ১৮৪৮ সালে 'The Civil War in France' গ্রন্থে মার্ক্স আবার বিপ্লবী পরিস্থিতিতে কৃষকদের জন্য দাবি তুলেছিলেন। মার্ক্স ঐ বইয়ের প্রথম যে খসড়া লেখেন, তাতে কৃষকের স্বার্থে কমিউন কী করবে ও করতে পারে তার ব্যাখ্যা করেছিলেন। এর মধ্যে বলা ছিল:

যুদ্ধের খরচ ও প্রাশিয়াকে দেয় ক্ষতিপূরণ কমিউনের বিজয় হলে কৃষকের উপর না পড়ে ধনিকদের ঘাড়ে পড়বে।

* বাধ্যতামূলক সামরিক ডিউটি বন্ধ হবে।

---

৬২. Draper, op. cit, p 432.

৬৩. C W, vol 6, p 358.

* করের বোঝা কমবে।

* আমলাতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে দেওয়ার ফলে কৃষকের স্বার্থও রক্ষা করা হবে।

* ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকের উপর চার্চের ছড়ি ঘোরানো বন্ধ করা হবে ইত্যাদি।[৬৪]

কিন্তু এখানে যে প্রশ্নের উত্তর মেলে না, তা হল, অ-বিপ্লবী পরিস্থিতিতে কৃষককে কীভাবে সাহায্য করা হবে, এবং একই সঙ্গে পার্টি কর্মসূচির প্রতি কী করে বিশ্বস্ত থাকা যায়?

১৮৮০র দশকের শেষ দিক থেকে, ও বিশেষ করে ১৮৯০-এর দশকের গোড়ায়, জার্মান ও ফরাসি সমাজতন্ত্রী দলে একটি সুবিধাবাদী ঝোঁকের বিকাশে এঙ্গেলস বিচলিত বোধ করছিলেন। ফ্রান্সে ঐ সময়ে ৭টি সমাজতন্ত্রী দল ছিল। মার্ক্সপন্থীদের নাম ছিল ফরাসি শ্রমিক দল। এর নেতা ছিলেন জুল গেসদে ও পল লাফার্গ। ১৮৯১ সালে লিল অঞ্চল থেকে লাফার্গ সংসদের নিম্নকক্ষে নির্বাচিত হন। ঐ এলাকায় ব্যাপক কৃষক থাকায় গ্রামাঞ্চলে পার্টির প্রচার আবশ্যক হয়ে পড়ে। ১৮৯২ সালে মার্সাই কংগ্রেসে পার্টির প্রথম কৃষি কর্মসূচি গৃহীত হয়। এরপর আসে পার্টির নান্তে কংগ্রেস; যার মূল বিষয়বস্তু ছিল কৃষি কর্মসূচির নির্দিষ্টকরণ।

১৮৯৩-এর নির্বাচনে লাফার্গ পরাস্ত হন। এঙ্গেলসকে তিনি একটি চিঠিতে লেখেন: 'লিল শহরে আমার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট ছিল। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ষোলটি গ্রামীণ এলাকা থেকে।'[৬৫] অক্টোবরে তিনি এঙ্গেলসকে লেখেন: 'গ্রামাঞ্চল জয় করা সমাজতন্ত্রীদের মুখ্য উদ্দেশ্য, যদিও শহরগুলিতে বিজয়ও এখনও দূরের কথা', এবং উল্লেখ করেন যে আসন্ন (নান্তে) কংগ্রেসে কৃষি কর্মসূচিতে নতুন কথাবার্তা ঢোকানো হবে। তিনি লেখেন: 'নান্তের সমাজতন্ত্রীরা যাঁদের নেতৃত্বে আছেন ক্রনেলিয়ার নামে এক ধনী জাহাজ-মালিক, তাঁরা এখন কৃষকদের ইউনিয়নে সংগঠিত করেছেন। এই

৬৪. Marx, K & Engels, F—Writings on the Paris Commune, p 155 f. New York, 1971.

৬৫. Correspondence: Frederick Engels/Paul and Laura Lafargue, vol. 3, p 290.

ইউনিয়নগুলি তাঁদের প্রয়াসের কেন্দ্রীকরণ ও সমন্বয়সাধন ঘটায়; এখন পর্যন্ত তাঁরা কৃষকদের উচ্ছেদ পিছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন।'[৬৬]

বড় ভূস্বামীদের প্রচেষ্টা ছিল ছোট কৃষকদের জমি থেকে তুলে দিতে। কৃষক ইউনিয়নগুলি ছিল ঐ ছোট কৃষকদের সংগঠন।

১৮৯৪-এর সেপ্টেম্বরে পার্টি কংগ্রেসে যে নতুন কৃষি কর্মসূচি গৃহীত হয় তার ঝোঁক ছিল ছোট কৃষক, এমন কি ক্ষেতমজুর ভাড়া করে এমন কৃষককেও কী ভাবে দলে টানা যায় সেদিকে নজর দেওয়া।

এঙ্গেলস বিনা দ্বিধায় এই প্রবণতাকে নির্বাচনমুখী সুবিধাবাদ বলে অভিহিত করেছিলেন। পার্টির এক নেতৃস্থানীয় তাত্ত্বিকের সঙ্গে আলোচনার পর লরা মার্ক্স লাফার্গকে একটি চিঠিতে তিনি মন্তব্য করেন: 'তিনি [উল্লিখিত তাত্ত্বিক] সত্যিই মনে করেছিলেন যে এখন থেকে শুরু করে আগামী সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে ফরাসি কৃষকদের ব্যাপক অংশকে দলে টেনে নেওয়া শুধু সম্ভব নয়, আবশ্যকও।'[৬৭]

জার্মানিতেও একটি সমান্তরাল বিকাশ ঘটছিল। তবে ফ্রান্সে সমগ্র পার্টি নেতৃত্বই, সাবধানে হলেও ঐ দিকে ঝুঁকছিলেন। আর জার্মানিতে, দক্ষিণ জার্মানির, বিশেষত ব্যাভেরিয়ার নেতৃত্ব একক ভাবে, কিন্তু অনেক খোলাখুলি, সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করছিলেন। এই গোষ্ঠীর নেতা গেওর্গ ফন ফলমার ছিলেন জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেসিতে সংশোধনবাদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৪-এর অক্টোবরে জার্মান পার্টির ফ্রাঙ্কফুর্ট কংগ্রেসে ফলমার খোলা তলোয়ারে কৃষিক্ষেত্রে সংস্কারবাদী নীতি প্রবর্তনের দাবি করেন, এবং এই দাবির সমর্থনে প্রকাশ্যে সাক্ষী খাড়া করেন স্বয়ং এঙ্গেলসকে। এঙ্গেলস তৎক্ষণাৎ ফলমারের মিথ্যা বক্তব্যের প্রতিবাদ করে পার্টির মুখপত্রে একটি চিঠি পাঠান। এর কিছুদিন পরেই তিনি লেখেন কৃষি কর্মসূচি প্রসঙ্গে তাঁর শেষ রচনা, 'The Peasant Question in France and Germany.'[৬৮]

---

৬৬. "The Nantes Socialists, who have a rich ship-owner, Brunelliere, at their head, have organized the peasants in unions which centralize and coordinate their efforts; so far they have succeeded in deferring the expropriation of the peasants." ibid, p 295 f.

৬৭. ibid, p 349.

৬৮. SW, vol 3, p 457.

এঙ্গেলস স্বীকার করেন, কৃষি সমস্যা সুদূর ভবিষ্যতের, বা ক্ষমতা দখলের পরের বিষয় নয়। তিনি একথাও স্বীকার করেন যে ছোট কৃষকের প্রলেতারীয়করণের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। শেষ কৃষক, শেষ কারিগর, কবে ধনবাদী উৎপাদনের চাপে শ্রমিকে রূপান্তরিত হবে, সেই আশায় থাকা হবে নিষ্ক্রিয়তা।[৬৯] বরং, আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষকদের অবস্থার উন্নতিসাধনে সক্ষম হলে তাদের আস্থা অর্জন করা যাবে এবং ভবিষ্যতে সমাজ পুনর্গঠনের কাজ সহজতর হবে।

এইভাবে, অতিবাম, সংকীর্ণতাবাদী, বা 'শ্রমিকপন্থী'[৭০] দৃষ্টিভঙ্গীকে এঙ্গেলস এক কথায় বর্জন করেন। কিন্তু মূল প্রশ্নটা 'বাম' সংকীর্ণতাবাদকে নিয়ে ছিল না। কোন কৃষককে দলে টানা হবে? কেন, কীজন্য? এবং সেজন্য শ্রেণী অবস্থানের পরিণতি কী হবে?—এই ছিল মূল প্রশ্ন।

"The Peasant Question"-এ এঙ্গেলস এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যথেষ্ট বিশদভাবে। কৃষি সমস্যা এবং সমাজতন্ত্রীদের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তিনি অনেকগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয় তুলে ধরেন। প্রথমেই যে দিকে চোখ ফেরানো উচিত, তা হল একজন কৃষককে ঠিক কী করতে অনুপ্রেরণা দেওয়া উচিত? তাকে সমাজতান্ত্রিক প্রচারকরা পার্টিতে যোগ দিতে, পার্টি প্রার্থীদের ভোট দিতে, সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গি লড়াই লড়তে, সমাজতন্ত্র বিরোধী ধারণা বর্জন করতে, অথবা সমাজতন্ত্রীদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করতে (যার ফলে বিপ্লবী পরিস্থিতিতে সে দৃঢ়ভাবে বিপ্লবের পক্ষে যাবে) বলতে পারেন, এবং এই বক্তব্য যেন ফলপ্রসূ হয় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে পারেন। ১৮৯৩-৯৪ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত, সংস্কারবাদীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ প্রথম দুটি কাজের দিকে। মাঝে মধ্যে আন্দোলন করাটা ঐ ভোট পাওয়ার জন্যই দরকার। আর এঙ্গেলসের কাছে মৌলিক ছিল শেষ দুটি কাজ। আন্দোলন করার প্রশ্ন ওঠে এই মৌলিক দিশার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই। বিশেষ করে পার্টিতে কৃষক সদস্য নেওয়ার ক্ষেত্রে এঙ্গেলস অত্যন্ত সাবধান হওয়ার পক্ষে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হবে।

দ্বিতীয়ত কোন কৃষককে দলে টানতে হবে? এ বিষয়ে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের মত আমরা আগেই দেখেছি। প্রথমেই সংগঠিত করতে হবে

৬৯. ibid, p 472.
৭০. Ouvrieriste

গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতকে—কৃষকদের যে কোনো স্তরের আগেই। কিন্তু মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে, বা অন্য যে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীগত দাবিতে[৭১] ক্ষেতমজুররা লড়াই করলে তাঁদের প্রত্যক্ষ মালিক যে কৃষক, তার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবেই। ক্ষেতমজুরের শ্রমশক্তি কিনে, তাঁকে শোষণ করেই ধনী কৃষক ধনী কৃষক থাকে। ধনী কৃষক পার্টিতে এলে শ্রেণী সংগ্রামের এই বাস্তবতা শূন্যে মিলিয়ে যায় না। দার্শনিক ব্যাখ্যা সহযোগে ঐ কৃষককে 'ডিক্লাস' করে দিলেও না।

এঙ্গেলস তাঁর প্রবন্ধে স্মরণ করিয়ে দেন যে ১৮৯২-এর মার্সাই কংগ্রেসে ফরাসি পার্টির কৃষি কর্মসূচি ছোট কৃষক এবং 'সম্পত্তিহীন গ্রামীণ শ্রমিকদের' জন্য রচিত হয়েছিল। ঐ কর্মসূচিতে প্রথম দাবি ছিল 'ট্রেড ইউনিয়ন ও কমিউনিটি কাউন্সিল কর্তৃক নির্দিষ্ট ন্যূনতম মজুরি'র দাবি।[৭২] বড় ধনবাদী ফার্মারের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই দাবি আদায় করা অপেক্ষাকৃত সহজ। স্বল্পবিত্ত কৃষকের সঙ্গে লড়াই হলে সমস্যা বাড়ে। এখানে নমনীয়তা যতই দেখানো হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন থেকেই যায়, পার্টি কার পক্ষ নেবে?[৭৩]

নান্তে কর্মসূচির মুখবন্ধে বলা হয়, টেনান্ট-ফার্মারদেরও রক্ষা করতে হবে কারণ 'যদি তারা দিনমজুরদের শোষণ করে; তবে কিছুটা পরিমাণে তা করতে বাধ্য হয়, কারণ তারা নিজেরাও শোষিত হয়।'[৭৪] এটা একেবারে পেটি-বুর্জোয়া উৎপাদকের দৃষ্টিভঙ্গি: 'আমি তোমাকে একটু শোষণ করলে কিছু

---

৭১. নির্দিষ্ট শ্রেণীগত দাবি বলতে এমন দাবি, যা কেবল ক্ষেতমজুরেরই দাবি, বা শ্রমিক শ্রেণীর দাবি। এ ছাড়াও ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করে, তাঁদের স্বার্থে এমন দাবি নিয়ে লড়াই হতেই পারে, যাতে অন্যান্যদেরও লাভ হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গ্রামের স্কুলের মান উন্নয়নের দাবি, অবৈতনিক শিক্ষা চালু করার দাবি বা পাকা রাস্তা করার দাবি ধনী কৃষকেরও পক্ষে যাবে।

৭২. SW, vol 3, p 460

৭৩. এক রকম সমাধান, যা এদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে ঘটেছে বলে প্রকাশ, তা হল মধ্য চাষীর জমিতে কাজ করে যে ক্ষেতমজুর তাকে কম মজুরি নিতে বলা। কিন্তু সেক্ষেত্রে দুই ক্ষেতমজুরের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। ক্ষেতমজুরের শ্রেণীঐক্যে ফাটল ধরবে। তার ফলে সংগঠনের ভিতও নড়বড়ে হয়ে পড়বে। এর সমাধান হতে পারে যদি সংগঠন স্থির করে দেয় প্রত্যেকে পালাক্রমে বড় ও মধ্য চাষীর জোতে কাজ করবে।

৭৪. The Peasant Question-এ উদ্ধৃত। SW, vol 3. p 464.

মনে করো না। দেখো না, আমারনিজেরই কত ঝামেলা।' ছোট কারখানার মালিক বড় প্রতিযোগীর সঙ্গে পেরে উঠছে না, তাই তার সঙ্গে বেশি লড়াই করা ভাল নয়। করলে শ্রমিকরা 'বাস্তব-বুদ্ধির' অভাবেরই পরিচয় দেবেন। এই বাস্তব-বুদ্ধির আরো ভাল পরিচয় শেষ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছিল, যখন ফ্রান্স ও জার্মানির 'বিপ্লবী', 'মার্ক্সবাদী' ও 'শ্রমিক' দলদুটি নিজের নিজের দেশের ধনিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়।[৭৫]

নান্তে কর্মসূচির মুখবন্ধে আরো বিপজ্জনক একটা কথা বলা হয়। ঘোষিত হল, পার্টির লক্ষ্য [একটি সমাজতান্ত্রিক পার্টির লক্ষ্য] 'গ্রামীণ উৎপাদনের সমস্ত মৌলকে একসঙ্গে আনা,...সাধারণ শত্রুর জমির মালিকানার সামন্ত-তান্ত্রিক প্রথার; বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।'[৭৬] এই নীতিকে ঠিকমতো প্রয়োগ করলে পার্টিতে শুধু কৃষক নয়, প্রচুর ধনিক সদস্যও পাওয়া সম্ভব হয়ে পড়ে। তবে তখন অবধি দাবির ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের খুব একটা বহিঃপ্রকাশ ঘটে নি। একটিমাত্র দাবির প্রসঙ্গে সমালোচনা করা যায়। তা হল করমকুবের দাবি। এটা কেবল 'যে-সমস্ত কৃষক নিজের শ্রমে জীবন ধারণ করে' তাদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং মর্টগেজের ভার আছে এমন সকলের জন্যই তোলা হয়।[৭৭] অর্থাৎ যে ধনী কৃষক আরো মূলধন বিনিয়োগ করার জন্য জমি মর্টগেজ করে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে তারও কর মকুব করতে হবে।

দক্ষিণ জার্মানির অবস্থাটা ছিল আরো খারাপ। সেখানে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ক্ষেতমজুর বা নিজচাষী নয়, বরং বড় কৃষকদের দলে টানার কাজকেই প্রাধান্য দিতে শুরু করেছিলেন। এই কর্মনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এঙ্গেলস এক মুহূর্তও দ্বিধাবোধ করেন নি।[৭৮]

---

৭৫. পেটি বুর্জোয়া মানসিকতা কী ভাবে এই পরিণতি ঘটিয়েছিল, তার দীর্ঘ ও তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য 6. Zinoviev—The Social Roots of Opportunism (New International, Vol 1, No 2, New York 1983-4).

৭৬. এঙ্গেলস কর্তৃক উদ্ধৃত। SW, vol 3. p 465

৭৭. এঙ্গেলস কর্তৃক উদ্ধৃত। ibid. p 467,

৭৮. এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Engels, Letter to Sorgo, (Marx. K & Engels. F—Selected Correspondence. p 476); Correspondence: Engels/Paul & Laura Lafargue vol 3, p 343f.

এঙ্গেলসের প্রতিপাদ্য তৃতীয় বিষয় ছিল, নান্তে কর্মসূচি ছোট কৃষককে ধোঁকা দিচ্ছে। ধনবাদী ব্যবস্থায় যে তার অবস্থার কোনো মৌলিক উন্নতি হবে না, এবং তাদের অর্থনৈতিক জীবনকে যেন তেন প্রকারেণ টিঁকিয়ে রাখতে সমাজতন্ত্রীরা যে দায়বদ্ধ নন, এ কথা না বলে নান্তে কর্মসূচি বরং উল্টো প্রতিশ্রুতি দেয়।[৭৯] হয় এটা একটা কৃষক-ঠকানো ছল, আর তা না হলে এটা সুবিধাবাদী ও শ্রেণী সমন্বয়পন্থী রাজনৈতিক প্রয়োগের সূত্রপাত। এঙ্গেলস স্পষ্টভাষায় বলেন, যা বর্তমানে নামমাত্র ছোট কৃষকের সম্পত্তি, তাকে প্রকৃতই তার সম্পত্তিতে পরিণত করা সমাজতন্ত্রীদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব নয়। এভাবে কৃষকের 'প্রকৃত মুক্তি' আসবে না। এই দাবি নির্বাচনে কিছু ভোট যোগাড় করে দিতে পারে, বা সাময়িকভাবে কৃষকদের সমর্থন পাইয়ে দিতে পারে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে এর মূল্য নেই, এবং প্রতিশ্রুতি রাখতে না পারায় কৃষকরা আবার পার্টিকে ছেড়ে যাবে। আর, ছোট কৃষকের ক্ষেত্রে যেখানে এটা বাজে কাজ, 'বড় ও মধ্য কৃষককে এই প্রতিশ্রুতি করা প্রায় বেইমানির পর্যায়ে গিয়ে ঠেকবে।'[৮০]

এর পর এঙ্গেলস আলোচনা করেছেন আশু দাবিগুলির মধ্যেও কোনটার মূল্য কতটা। এখানে তিনি প্রথমে দেখিয়েছেন, কোন দাবি বিশেষভাবে কৃষকের দাবি, আর কোনটা সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রী দাবি যা অনেকের মধ্যে কৃষকেরও স্বার্থে প্রযোজ্য। আমরা আগেই দেখেছি, ১৮৪৮ থেকেই মার্ক্স ও এঙ্গেলস দ্বিতীয় ধরনের দাবি তুলেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কর-ব্যবস্থার সংস্কার, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, ইত্যাদি সংক্রান্ত দাবির কথা।[৮১]

দ্বিতীয়ত, কোন দাবি ধনবাদী ব্যবস্থায় বাস্তবে অর্জন করা সম্ভব, আর কোনটা তা নয়, সেটাও লক্ষণীয় সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি কৃষককে রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভাল দাবি। কিন্তু ধনবাদী ব্যবস্থায় এই দাবি যে কখনোই অর্জিত হবে না, কারণ উপায় না থাকলে কৃষককে মহাজনের কাছে যেতে হবেই,[৮২] পার্টিকে এ কথা অবশ্যই

---

৭৯. SW, d 3, p 462, p 464.

৮০. ibid, p 463, 464, 469, 473.

৮১. ibid, p 466-8.

৮২. ibid, p 467.

মনে রাখতে হবে। আর কৃষকদের মধ্যেও এ প্রশ্নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা অমার্জনীয়।

কিছু দাবি, এমন কি সাময়িক সুবিধার নিরিখেও অর্থহীন। এই দাবি তোলার সময়ে সেটাকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে কৃষক মুক্তির দিকে বিরাট পদক্ষেপ বলে দাবি করার তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন।[৮৩]

এরপর আসে কৃষকের স্তর বাছাই করে দাবির প্রশ্ন। ছোট চাষীরও লাভ হবে, এই অজুহাতে মূলত বড় কৃষক বা ফার্মারদের স্বার্থরক্ষা করে এমন দাবি সমাজতন্ত্রীদের তোলা অন্যায়। এঙ্গেলস নান্তে কর্মসূচির যে দাবিগুলিকে এই রকম দাবি মনে করেছিলেন, তার একটি হল কৃষিপণ্যের পরিবহণ ভাড়া কমানো। যে কৃষক সামান্য এক খণ্ড জমিতে চাষ করে, এই দাবি যতটা না তার কাজে লাগবে, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজে লাগবে বড় ভূস্বামীদের।[৮৪]

সবশেষে: কোন দাবি সমাজতান্ত্রিক মূলনীতির হানি করে তবেই কৃষকদের সাহায্য করে? লাফার্গের সঙ্গে পত্রবিনিময়ে, এবং 'The Peasant Question' প্রবন্ধেও, এঙ্গেলস বিশেষ ভাবে আক্রমণ করেন জাঁ জরেসের একটি প্রস্তাবকে। ঐ প্রস্তাব হল খাদ্যশস্য আমদানিতে রাষ্ট্রের একচেটিয়া ব্যবসা চালু করা এবং দাম বাড়িয়ে রাখা। এঙ্গেলস দেখান, অন্য সমস্ত যুক্তি ছাড়াও, শেষ বিচারে ঐ পদক্ষেপের ফলে ক্ষতি হবে শহরের শ্রমিক শ্রেণীর, কারণ রাষ্ট্র ধনিকের উপর কর চাপিয়ে সাবসিডি দেবে না। তা ছাড়া ছোট কৃষকের যেহেতু উদ্বৃত্ত ফসল অল্প, তাই এতে লাভ হবে প্রধানত ধনী কৃষক বা ফার্মারদের। সবশেষে, এই দাবি, যা সমাজতন্ত্রের কর্মসূচির অংশ, তা ধনবাদী ব্যবস্থায় চলে যাবে সেই সমস্ত ঠগ-জোচ্চোরদের হাতেই, যাদের ঠেকানোর নামে এই পদক্ষেপ নেওয়া হল।[৮৫]

এই সমস্ত সমালোচনা ও ব্যাখ্যার পর বেশ কিছু দাবি থেকে যায়, যা ছোট কৃষক ও গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতের স্বার্থে তোলা সম্ভব, এবং যার সঙ্গে পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচিকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। এর মধ্যে পড়ে মার্সাই কর্মসূচির আটটি দাবি। এগুলি সম্পর্কে এঙ্গেলসের মন্তব্য একটাই, 'আমরা

৮৩. ibid.
৮৪. ibid, p 468.
৮৫. ibid, p 465. Correspondence: Engels/Paul & Laura Lafargue, vol 3, p 324, ইত্যাদি।

দেখতে পাচ্ছি যে কৃষকের স্বার্থে যে দাবি তোলা হয়েছে…তা খুব একটা বিরাট কিছু নয়। এদের কিয়দংশ ইতিমধ্যেই অন্যত্র আদায় হয়েছে…অন্যগুলিও বিদ্যমান ধনবাদী ব্যবস্থার খুব একটা ক্ষতি না করে ও কার্যকর করা যায়।'[৮৬] অন্য কিছু দাবি উঠে আসে প্রবন্ধটি থেকেই।

মার্সাই কর্মসূচির এই দাবিগুলি ছিল, এঙ্গেলসের বর্ণনা অনুযায়ী, নিম্নরূপ :

গ্রামীণ শ্রমিকদের জন্য : 'ট্রেড ইউনিয়ন' এবং 'কমিউনিস্ট কাউন্সিল' কর্তৃক বেঁধে দেওয়া ন্যূনতম মজুরি ; গ্রামীণ বাণিজ্য আদালতের অর্ধেক শ্রমিক হতে হবে ; সাধারণের জমি [common land] বিক্রয় নিষেধ ; রাষ্ট্রীয় জমি কমিউনিটির কাছে লিজ দেওয়া, যে কমিউনিটি তাদের মালিকানাধীন বা ভাড়া নেওয়া জমি সম্পত্তিহীন কৃষি শ্রমিক পরিবারদের সংঘের কাছে যৌথ চাষের জন্য ভাড়া দেবে এই শর্তে যে মজুরি শ্রমিক খাটানো নিষিদ্ধ থাকবে এবং কমিউনিটির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে ; বার্ধক্য ও অক্ষমতা ভাতা, যার টাকা আসবে বড় এস্টেটগুলির উপর বিশেষ করের মাধ্যমে।

'ছোট কৃষকদের জন্য, এবং টেনাণ্ট ফার্মার ও ভাগচাষীদের (metayers) প্রতি বিশেষভাবে নজর দিয়ে, কমিউনিটি কর্তৃক যন্ত্র ক্রয় করা, যা ক্রয়মূল্যের হারে কৃষকদের লিজ দেওয়া হবে ; সার, জল নিষ্কাশন পাইপ, বীজ ইত্যাদি কেনার জন্য এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রির জন্য কৃষকদের সমবায় গঠন ; সম্পত্তির মূল্য ৫০০০ ফ্রাঁর বেশি না হলে ভূসম্পত্তি হস্তান্তর ট্যাক্স অবসান ; আয়ার্ল্যাণ্ডের ধাঁচে অত্যধিক খাজনা কমানো এবং টেনাণ্ট ফার্মার ও ভাগচাষীর জমি ছাড়ার সময়ে তাদের কাজের ফলে জমির যে মূল্য বেড়েছে, সেই অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া নির্ধারণের জন্য শালিশি কমিশন গঠন ; সিভিল কোডের ২১০২ সংখ্যক ধারা, যার ফলে ভূস্বামী কৃষকের ফসল কেড়ে নিতে পারে, তা রদ করা এবং যে ফসল মাঠে আছে তা পাওনাদারের কেড়ে নিতে পারা সংক্রান্ত আইন রদ করা ; এক নির্দিষ্ট পরিমাণ কৃষি উপাদান এবং ফসল, বীজ, সার, চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পশু লেভি ও ডিস্ট্রেণ্টের হাত থেকে রেহাই পাওয়া… এবং সর্বশেষ, বিনামূল্যে কৃষিকৌশল শিক্ষা এবং কৃষি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।'[৮৬ক]

---

৮৬. The Peasant Question. S W, vol 3, p 461.
৮৬ক. SW, vol 3, p 460f.

এই একই প্রবন্ধে এঙ্গেলস আরো বলেন যে কৃষক সম্পত্তির সম্পর্ক পরিবর্তনে বলপ্রয়োগ করা যাবে না।[৮৭]

এঙ্গেলস নির্দেশিত সীমারেখার মধ্যে একটি কৃষি কর্মসূচি রচনা করা খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু এঙ্গেলসের কাছে আর একটি বড় সমস্যা ছিল পার্টিতে কৃষক প্রভাব বৃদ্ধি, বা পার্টির "কৃষকীকরণ"।[৮৮]

সমস্যাটা এক-আধজন সদস্যকে নিয়ে ছিল না। একজন ক্ষেতমজুর, এমন কি একজন কৃষক ব্যক্তিগতভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি গ্রহণ করে পার্টির সদস্য হলে কিছু বলার থাকত না। বরং তাঁকে পার্টিতে সাদর আহ্বান করাই উচিত হত। কিন্তু তাৎক্ষণিক লাভের আশায় কৃষকদের কৃষক মানসিকতা অপরিবর্তিত রেখে গ্রামাঞ্চলে পার্টি শাখায় সভ্য হিসেবে গ্রহণ করলে পার্টির মূলনীতির প্রতি সন্দিহান একটি সামাজিক স্তরকে পার্টিতে আশ্রয় দেওয়া হয়। দক্ষিণ জার্মানিতে এই প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল। বিচলিত এঙ্গেলস দেখেন যে বড় ও প্রভাবশালী কৃষকদের দলে টানার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে, কারণ তাদের প্রভাবে পার্টির ভোট বাড়বে অনেক বেশি। এঙ্গেলস এ প্রসঙ্গে বলেন : 'আমি সরাসরি অস্বীকার করি যে কোনো দেশের সমাজতন্ত্রী শ্রমিক দলের কাজ, গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত ও ছোট কৃষক ছাড়া, মধ্য ও বড় কৃষক, এবং হয়ত এমন কি…জমির ধনবাদী শোষকদেরও দলে টেনে নেওয়া।…নির্দিষ্ট কোনো প্রশ্নে আমরা তাদের সঙ্গে এক দিকে থাকতে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়তে পারি। আমাদের পার্টিতে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণী থেকেই কোনো ব্যক্তি থাকতে পারেন, কিন্তু ধনবাদী, মধ্য-বুর্জোয়া বা মধ্য-কৃষক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী কোনো গোষ্ঠীকে পার্টিতে রাখার কোনো উপযোগিতা নেই।'[৮৯]

৮৭. ibid, p 471.

৮৮. Peasantisation অর্থাৎ প্রলেতারীয়করণের বিপরীতে পেটিবুর্জোয়া শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার, এমন কি শ্রেণীগতভাবে পার্টিতে পেটি-বুর্জোয়াদের ভার বৃদ্ধি।

৮৯. The Peasant Question, S W, vol 3, p 465f.
এঙ্গেলসের এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও, দক্ষিণ জার্মান নেতৃত্ব ঐ কাজই করে যান। কৃষক ও অন্যান্য পেটিবুর্জোয়া স্তরের প্রতিনিধিত্বমূলক সদস্য সংখ্যা পার্টিতে ক্রমেই বাড়তে থাকে। জার্মানির নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এর একটি কারণ ছিল, কোনো দৃঢ় গণতন্ত্রী দলের অভাব। ফ্রান্সের র‍্যাডিকালদের অনুরূপ কোনো দল জার্মানিতে

উপসংহার

মার্ক্স ও এঙ্গেলসের কৃষি কর্মসূচি বিষয়ক চিন্তার এই দীর্ঘ পরিক্রমা থেকে যা বেরিয়ে আসে, তা হল, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য কৃষকের মৌলিক গুরুত্ব। তাঁরা এই গুরুত্বকে নির্বাচনী চশমা এঁটে দেখেন নি, তাই মাথা গুনে বা হাত তুলে কৃষক সমর্থন নিরূপণের চেষ্টাও করেন নি। ছোট কৃষকদের কীভাবে বিপ্লবী পরিস্থিতিতে সঙ্গে পাওয়া যাবে, সেটাই ছিল তাঁদের চিন্তার মূল বিষয়। 'নয়ে রাইনিশ জাইটুং'-এর যুগ থেকে ১৮৯৪ পর্যন্ত এই মূল নীতির প্রতি অবিচল থেকেই তাঁরা বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন দাবি তুলেছিলেন। এই নিরীখে কৃষিক্ষেত্রে লেনিনের চিন্তাও রাশিয়ার বাস্তব অবস্থায় মার্ক্স-এঙ্গেলসের চিন্তার প্রয়োগ।

ছিল না, যারা পেটিবুর্জোয়াদের স্বার্থে, বা "জনগণের পার্টি" হিসেবে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করত। ফলে সমাজের সব স্তরের মানুষ, যাঁদের বিদ্যমান অবস্থার প্রতি ক্ষোভ ছিল, তাঁরা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলের পিছনে জড়ো হন। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা তাঁদের সমাজতন্ত্রমুখী করার চেষ্টার বদলে তাঁদের দেখে শুধু ভোটের হিসেবে। তদুপরি, পার্টিতে এই অপ্রলেতারীয় স্তরগুলির জন্য যথেষ্ট জায়গা করে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়া ও তার ফলাফলের পূর্ণতম বিশ্লেষণের জন্য জিনোভিয়েভের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সৌন্দর্যের স্বারূপ্য

শিল্পের আলো, অন্ধকারের শিল্প

অরুণ সেন

দুর্ভাগ্যের কথা হলেও সত্য যে, প্রায় আদিকাল থেকেই শিল্পসাহিত্যের মার্কসবাদী দৃষ্টি ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির মধ্যে যতটা প্রকাশ্য, তার সঠিক ও নির্ভুল ব্যবহারে ততটা নয়। আমরা ভিত ও ওপরতলার উপমাসূত্রে বস্তুজীবন ও শিল্পসাহিত্যমনের পরোক্ষ, জটিল ও দূরান্বয়ী সম্পর্কের কথা বলাবলি করেছি অনেক—কিন্তু কার্যত শিল্পসাহিত্যের বিচারে সেই ভারসাম্যের প্রমাণ রেখেছি সামান্যই। শুধু স্তালিন যুগের ঝ্‌দানভীয় অন্ধতাকে দোষ দিলে কী হবে, স্বয়ং মার্কস বা এঙ্গেলসকেও তো অনেক সাবধানবাণী উচ্চারণ করে যেতে হয়েছে, নিজেদেরই আবিষ্কৃত তত্ত্বের ভ্রান্ত প্রয়োগের জন্য খেদ করতে হয়েছে। আর এখনও পর্যন্ত, অনেক ঠেকে অনেক জেনেও, মার্কসীয় শিল্পতত্ত্বের প্রথম ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি দেশে দেশে।

আমাদের দেশের অভিজ্ঞতাতেই আসা যাক। এখনও, এমন কী ১৯৮৪-তে প্রকাশিত রাজ্য পুস্তক পর্ষদ-এর মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের বইতেই লেখা হতে পারে, 'কবিতার ইতিহাসে মোড় ফেরার লগ্নের প্রস্তুতি সরাসরি কবির হাতে থাকে না, থাকে পারিপার্শ্বিক জগতে', জানা যেতে পারে এরকম তথ্য, এলিয়টের 'মতে দুরূহতাই হল আধুনিক মনের প্রতিবিম্ব', কিংবা উঠতে পারে এই বিস্ময়সূচক প্রশ্ন, 'তাই বলে [এলিয়ট-অনুপ্রাণিত] কবি কি তাঁর অভিজাত-সুলভ উন্নাসিকতার স্ফটিকহর্ম্যে সযত্নলালিত বিষণ্ণ নেতিবাদী জীবনদর্শন ছেড়ে নেমে আসতে পারেন সাধারণ পাঠকের আসরে?' বোধভাষ্যের এই ধরন,

যেখানে লেখককে সবসময়ই মাথা নিচু করে থাকতে হয় সামাজিক পরিবেশের কাছে কিংবা লেখার দুরূহতা, লেখকের আভিজাত্য বা বিষাদ বা নেতিবাদ খুব সোজা সরল হিসেবে নিন্দনীয় বলে মনে হয়, এসবই এখনও চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের নামে। আর তার শুরু যে প্রায় গোড়া থেকেই তা মার্কস-বাদী সাহিত্য-বিতর্কের যে-কোনো সংকলনের পাতা নাড়লেই টের পাওয়া যায়। লেখার পর লেখায় সহজ সমীকরণের দৃষ্টান্ত। শুধু ১৯৪৯-৫০-এর অন্ধযুগের কথাই নয়, তার আগে-পরেও নন্দনবিচারের মার্কসবাদী বিচ্যুতির ইতিহাসই প্রায় আমাদের ঐতিহ্য। তার ভেতর থেকে কোনো কোনো লেখকের, কোনো কোনো লেখককর্মীর অন্তর্দৃষ্টি ও ভারসাম্য উদ্ভাসিত হয় নি, এমন নয়—কিন্তু তার সংখ্যা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খুবই সামান্য। আর সেসব মার্কসবাদী বিতর্কের সংকলনের সম্পাদকেরা তাঁদের মূল্যায়ন করেন এইভাবে : 'আধুনিক নাগরিক সভ্যতায় লালিত-পালিত মনের বিকাশ, শিক্ষাদীক্ষা, একদিকে ইয়োরোপ-মনস্কতা অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি টান—…মনকে এমন এক মার্জিত বৈদগ্ধ্য দান করে যা শিল্পসাহিত্যের "শুদ্ধতা" এবং জটিল প্রকরণকলার প্রতিই তাঁদের অধিকতর বিশ্বস্ত করে।' তথ্যের অসম্পূর্ণতা যেটুকু তা যদি বাদও দিই, এই ছদ্ম-নিরপেক্ষ বিবরণীর পেছনে যে ভাবনা কাজ করে, তা হল মার্কসবাদী শিল্পবিচার তাঁদেরই ব্যাপার, যাঁরা 'কর্ম ও ঘর্মের সঙ্গে যুক্ত, অধিকমাত্রায় পার্টিজান'—শিল্পসাহিত্যের প্রকরণচর্চা বা শুদ্ধতা মার্কসবাদীর ব্যাপারই নয়। মার্কসবাদী নন্দনের মৌলিক ভ্রান্তির ঐ ভূত এখনও এইভাবে চেপে বসে আছে মাথায়।

সেকেলে যান্ত্রিক মার্কসবাদী বিচারের বিপত্তিটা শুরু হয়েছিল আমাদের দেশে ইংরেজ কবি টি. এস. এলিয়টকে কেন্দ্র করে। এলিয়ট রাজতন্ত্রে ও খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী, মনেপ্রাণে সাম্যবাদবিরোধী। কোনো মার্কসবাদীর পক্ষে কি তাঁর অনুরাগী হওয়া সম্ভব? ১৯৩৭-এ 'প্রগতি' নামে যে সংকলনগ্রন্থ বেরয়, তাতে ছিল বিষ্ণু দে-র করা অনুবাদ : এলিয়টের 'ফাঁপা মানুষ'। এর আগেও অবশ্য তিনি এলিয়টের বেশ কটি কবিতার অনুবাদ করেছেন, অনুকূল সমালোচনা লিখেছেন। সমর সেন এ ব্যাপারে ছিলেন তাঁর অনুজ সহমর্মী। তিনি 'অবক্ষয়ীদের সপক্ষে' নামের ইংরেজি প্রবন্ধে জানালেন, এই অবক্ষয়িত সমাজে তথাকথিত অবক্ষয়ের সাহিত্যই স্বাভাবিক এবং তার মধ্যেই আছে বৈপ্লবিক শক্তি। তাঁরও দৃষ্টান্ত এলিয়টের কবিতা। এই বক্তব্যের মধ্যে কতটা ভাবনার বিষয় আছে, তার আলোচনার বদলে শুরু হল তীব্র আক্রমণ। কারণ

যান্ত্রিক মার্কসবাদের কাছে এই যুক্তিবিন্যাস অভাবনীয় আঘাতের মতো। সরোজ দত্ত আক্রমণ করলেন এই মতকে 'অবক্ষয়ী, আঙ্গিকসর্বস্ব, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া মতবাদ' বলে। প্রায় একই সময় বিনয় ঘোষ 'নতুন সাহিত্য ও সমালোচনা' বইতে বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন প্রমুখ কবিদের আরো কঠোর ভাষায় গালি দিলেন এলিয়ট-পাউণ্ডের প্রতি তাঁদের আনুকূল্যের জন্য।

১৯৪৪-এই বোধহয় প্রথম 'টি এস এলিঅটের মহাপ্রস্থান' প্রবন্ধে বিষ্ণু দে এলিয়ট-সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হাজির করলেন। এলিয়টের মধ্যে অখণ্ড চৈতন্যের অভাব রয়েছে এবং বহুবিধ জাগতিক ও মানবিক বিশৃঙ্খলার কারণ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অচেতন, অথচ খণ্ডচৈতন্যের একাগ্র উপলব্ধিকে নির্ভর করে এমন কবিতা তিনি লিখেছেন, যেখানে সমাজের 'বিচ্ছিন্নতা কাব্যরূপ পেয়েছে', তাঁর কবিতার 'যন্ত্রণাবিদ্ধ চিত্রকল্পগুলি' প্রতীক হয়ে উঠেছে। কী করে সম্ভব হল? বিষ্ণু দে একেই বলেছেন 'এলিয়টের স্বকীয় প্রতিভার রসায়ন'। এই রসায়নের ফলেই তিনি হতে পেরেছেন 'আত্মসচেতনতারই মহাকবি'। যদিও তাঁর রাজনীতি করুণ, বিজ্ঞানে অবিশ্বাস, 'মানবচৈতন্যের সমগ্রতা তাঁর কল্পনায় নেই', সাহিত্যেতর সব কিছু বিষয়েই প্রগতি-বিরোধী, তবু শিল্পপ্রকরণের কর্তৃত্বে ও সাহিত্যবোধের সচেতনতায় তিনি প্রগতিবাদীদের কাছেও প্রেরণাস্থল। বিষ্ণু দে মনে করিয়ে দিয়েছেন, যে আত্মসচেতনতার গদ্যরূপ দেখা গেছে প্রুস্তে, জয়সে, কাফকায়, তারই কাব্যরূপ এলিয়টে। তাঁদের বা তাঁর 'কাব্যযাত্রার অমাবস্যা' এবং 'চৈতন্যের আত্মনির্ভরতা'ই প্রগতির সাক্ষ্য।

আমাদের দেশে যান্ত্রিক বিচারের বাইরে পরিণত, আধুনিক ও জটিল মার্কসবাদী নন্দনবিচারের সূত্রপাত এখানেই বলে মনে করা যেতে পারে। এ বিচার অবশ্য তখন তেমন মর্যাদা পায় নি মার্কসীয় মহলে—বরং ভর্ৎসনাই জুটেছে। পরবর্তী স্তালিন-ঝ্দানভ যুগে তো এলিয়ট 'ফ্যাশিস্ট' কবি হিসেবেও আখ্যা পেয়েছিলেন। গারোদি-র 'গোরস্থানের সাহিত্য' বা হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর 'সাহিত্য ও বাস্তবতা' বই দুটো থেকে ঐ জাতীয় বুলি সেকালে অনেকেই উচ্চারণ করতেন আমাদের দেশে। এক সময়ে প্রচারের গুণে মনে হয়েছিল, এলিয়টের এই মূল্যায়নে মার্কসবাদী বিশ্বেও বিষ্ণু দে কি তবে একক? আশ্বস্ত বোধ করা গিয়েছিল, স্কটিশ জাগরণের কবি কমিউনিস্ট হিউ ম্যাকডিয়রমিডের রচনা এবং আরেকজন গৌণ ইংরেজ লেখক এ এল মর্টনের স্বীকারোক্তি পাঠ করে। ১৯৬৬ সালে মার্কসবাদী মর্টন ১৯২৩ সালের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'ওয়েস্টল্যাণ্ড

আমাদের প্রজন্মের কাছে মুক্তির অভিজ্ঞতা নিয়ে এল।' আশা করি, অনেক আগে লেখা বিষ্ণু দে-র বিখ্যাত বাক্যটি কারো কারো মনে পড়ে যাবে।

কিন্তু বিস্ময়কর লাগে, এলিয়টের এই দ্বৈততার বিষয়ে যিনি এত সচেতন, এমনকী সেই বিষ্ণু দে-ও অন্য কোনো কোনো ব্যাপারে, বিশেষ করে আমাদের দেশের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ধৈর্য কেন দেখাতে চান নি? ধরা যাক জীবনানন্দ দাশের প্রসঙ্গেই। এটা ঠিক যে, চল্লিশের দশকে শিল্পসাহিত্যের মার্কসীয় বিচারে সামান্য মুক্তদৃষ্টিও প্রায় কঠিন হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া জীবনানন্দের কবিতার জগৎ তখন স্পষ্টও ছিল না, বহু কিছুই ছিল অজানা। শেষজীবনের কবিতা, মরণোত্তর কালে প্রকাশিত কবিতা—এ সবের আলোয় তাঁর প্রথম ও মধ্য যুগের কবিতার পুনরাবিষ্কার তখনও শুরু হয় নি। তবু অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়ের জগতের যে বিপর্যয় জীবনানন্দের কবিতায় এর মধ্যেই স্পষ্ট ভাষা পেয়েছিল, তার প্রতীক রূপ, আমাদের বিপর্যস্ত পরিবেশে তার প্রতিনিধিত্ব, সে সময়ের প্রায় কোনো মার্কসবাদী লেখক বা সমালোচকরাই বুঝতে পারেন নি, বরং যেন কিছুটা আভাস ছিল দু-একজন অ-মার্কসবাদী লেখকের রচনায়।

এর মানে এই নয় যে, জীবনানন্দ সম্পর্কে শেষোক্তদের মূল্যায়ন সর্বাংশে গ্রাহ্য। জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনা বা ইতিহাসচেতনা বা তাঁর বিশিষ্ট কতক-গুলি বোধ ও প্রতিমায় যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আরোপ করা হয়, তাতে মার্কসবাদীর উৎসাহ সংগতকারণেই সীমিত। তবু এটা তো ঠিক, তাঁর মধ্যজীবনের নৈরাশ্য ও তিক্ততাকে স্বকালের ও স্বদেশের মানুষেরই বিচ্ছিন্নতা ও দুঃখের রূপক হিসেবে বুঝে নেওয়ার ইশারা আছে তাঁর কবিতার মধ্যেই। এইখানেই তিনি গ্রাহ্য হন মার্কসবাদীর নন্দনদৃষ্টিতেও।

দুর্ভাগ্যবশত জীবনানন্দের কবিতার সেকালের মার্কসবাদী বিচারে আলো-অন্ধকারের সরলীকরণের হাওয়া ছিল খুব জোরালো। তাই জীবনানন্দকে নিজের পক্ষে নিজেকেই বলতে হয়েছে, 'ঢের বড় নিরাশাবাদ' কখনো কখনো 'এতই উজ্জ্বল ও আন্তরিক যে তাকে আশাবাদ ছাড়া কী আর বলতে পারা যায়।' কিংবা : ' "আত্মঘাতী ক্লান্তি" আমার কবিতার প্রধান আবহাওয়া নয়, কোনোদিনই ছিল বলে মনে পড়ে না।…কবিতাটি subjective নয়, একটা dramatic representation মাত্র। ..কবিতাটিতে subjective note শেষের দিকে ফুটেছে ; কিন্তু সে তো লাশকাটা ঘরের ক্লান্তির বাইরে—অনেক দূরে—প্রকৃতির প্রাচুর্য ও ইতিহাসের প্রাণশক্তির সঙ্গে একাত্ম করে আনন্দিত করে

রেখেছে কবিকে।' এই সব উক্তি আজ যতটা পরিণত মার্কসীয় নন্দনদৃষ্টির কাছাকাছি মনে হয়, জীবনানন্দের তৎকালীন 'মার্কসবাদী' বিচার কিন্তু তা ছিল না। জীবনানন্দ অবশ্যই মার্কসবাদী ছিলেন না। তবে, লেনিনই তো বলেছেন, 'সচেতন বস্তুবাদের কাছাকাছি বরং সচেতন ভাববাদ, অচেতন বস্তুবাদ কিছুতেই নয়।'

দুই

ভুলের মিছিলের কি আর শেষ আছে? ভুল পরস্পরকে নিয়ে, পরস্পরের বিরুদ্ধে। শিল্পসাহিত্যে একেশ্বরবাদকে এড়িয়ে এক-এক লেখকের অবস্থান সম্পর্কে জটিল ভাবনার বিনিময়ের সুযোগ মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বেই তো ছিল— নির্বিচার ভালো এবং নির্বিচার খারাপ এই সিদ্ধান্তে না পৌঁছে। অথচ আমরা কী দেখি? তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' পড়ে বিষ্ণু দে-র মনে হয়, 'ভূগোলের একটি স্থান মুখ্যপাত্র হয়ে ফুটেছে এই উপন্যাসে সেই স্থানমাহাত্ম্যে, যা প্রাণ পায় বিশেষ প্রাকৃতিক স্বরূপে রূপায়িত মানুষের প্রাকৃতিক জীবনে এবং মানুষের জীবনযাত্রায় প্রকৃতির বিশেষ রূপে। জায়গাটার চেহারা যেমন তারাশঙ্করের চোখ ও আমাদেরও চোখ জুড়ে বসেছে, তেমনি মশগুল করেছে তাঁকে কাহারদের জীবন এবং তাই পাঠকের মনও অবলীলায় পার হয়ে যায় এত বড় উপন্যাস—বরং শেষ করে একটু হতাশই হয় —এই কি শেষ? হয়তো শেষটা খুব স্বচ্ছ নয়, বিহ্বল শেষ। কিন্তু সে বিহ্বলতা তো আমাদের জীবনেরই, যুগেরই।' অথচ সেই উপন্যাস পড়েই হিরণকুমার সান্যাল 'মার্কসবাদী' অভিমানে লিখতে পারেন, 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা একেবারে ভানুমতীর ভেলকি। এর ঘরবাড়ি যেন চলচ্চিত্রের ক্ষণস্থায়ী তোড়জোড়।...সবই অলীক—অবাস্তব।...যে আদিম অন্ধকার থেকে কাহার-পল্লীর উদ্ভব, সেই অন্ধকারেই হল তার বিলুপ্তি। তারাশঙ্করবাবু মাটির মানুষের ছবি আঁকলেন জমিদারি প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ থেকে। কিন্তু এ মাটিই যে দেশের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন।'

অন্যদিকে আবার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র গল্প পড়ে বিষ্ণু দে-র মনে হতে পারে, 'দুর্গত সমাজ-ভাঙা বাংলার, অত্যাচার অনাচারে জর্জর বাংলার বহু মানুষ তাঁর চোখে অস্তিত্ব পেয়েছে করুণায় অবজ্ঞায় ঘৃণায়, ক্রোধে রুদ্ধ প্রায় শাণিত ভাষায়। দেশজ শব্দ তাই বাস্তবের তীক্ষ্ণ মর্যাদা পেয়েছে তাঁর গল্পে।

মর্মান্তিক তাঁর হিন্দু ও মুসলমান চাষীর দুর্বহ জীবনচিত্র, মর্মান্তিক তাঁর কথার মোচড়ে মোচড়ে প্রাকৃতজনের কথ্যভাষার আবেদন।' তাঁর সম্পর্কেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'সমাজ-ভাঙা জর্জর বাংলার চাষীজীবনের আসল বাস্তবতা কোথায় তাঁর সাহিত্যে? কোথায় বাঁচার সংগ্রাম, যা তাঁদের হাসিকান্না আনন্দবেদনা প্রেমবিরহ নীতিদুর্নীতি কলহবিবাদ একতা প্রতিরোধ —জীবনের সমস্ত অভিব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করছে?' মনে হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তর্কের ঝোঁকে সাহিত্যের মূল্যায়নের প্রশ্নের সঙ্গে বাস্তবতার বিভিন্ন প্রকাশকে মিশিয়ে ফেলেছেন।

এই ভ্রান্তিবিচার মার্কসবাদের বাইরেও ঘটে। তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই প্রথম পর্বের উপন্যাস সম্পর্কে সংগত উচ্ছ্বাসের পর অ-মার্কসবাদী সমালোচক তাঁর শেষজীবনের লেখাকে মনে করেন অকিঞ্চিৎকর, কারণ হিসেবে দেখান তাঁর রাজনীতি-প্রবণতা। বুদ্ধদেব বসু তো তাঁর এই 'পতন'-কে বলেছেন 'দুর্ঘটনা'। অবশ্য বুদ্ধদেব বসু কেন, কোনো মার্কসবাদী সমালোচকও মনে করতে পারেন, 'তৃতীয় পর্যায়ের উপন্যাসেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন রচনা-শৈলীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।' দেবেশ রায় তাঁর নতুন বইতে সে-কথা ভেবেই কি লেখেন নি, 'বিভূতিভূষণ তাঁর স্বভাব চিনতে পারেন নি, বা পাঠক-সমালোচকরা তাঁকে ও-রকম বুঝিয়েছিলেন—এমন একটা হাতে নগদ ব্যাখ্যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলায় কি খাটবে তাঁর প্রাক্‌-কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট পর্বের রহস্য বুঝতে? এই দুই পর্বের ভিতর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর স্বভাবের কি কোনো বদল ঘটেছিল যা তাঁকে বিষয়ের এমন আবিষ্কারে পাঠায় টেকনিকেরও ঘটে যাতে এক অনন্বয়ের সমস্যা? এখানেও "পুতুলনাচের ইতিকথা"র নিয়তি তাড়না, আর তার পরের ফ্রয়েডতত্ত্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ঐ সময়ের লেখাকে একাকার দেখার অভ্যেস থেকে কমিউনিস্ট পর্বের সমাজক্রিয়া, আর তার পরের মার্কসতত্ত্বকে কি বিপরীত তুলনায় দেখার পাল্টা অভ্যেস তৈরি হয় নি?' একই পড়ার অভ্যাসে ও তত্ত্বে সব লেখককে বা একই লেখকের ভিন্ন ভিন্ন লেখাকে ছকে ফেলে দেওয়া এবং অন্যদিকে সব লেখার নিহিত সংহতি ও বিকাশকে ভুলে যাওয়া—দু রকমের ভুলই আমাদের নান্দনিক বিচারে ঘটেছে।

দেবেশ রায়-ই কমলকুমার মজুমদারের লেখা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পড়ার ভিন্ন অভ্যাস বা ভিন্ন পাঠের কথা বলতে চেয়েছেন। কমলকুমার ঘোর ধর্মসংস্কারবিশ্বাসী, মতামতের দিক থেকে রক্ষণশীল, তাঁর ভাষা মানুষের

চলতি বুলি থেকে বহুদূরে, প্রাক-আধুনিক গদ্যকে তিনি ব্যবহার করেন নিজের মতো করে। এহেন কমলকুমার সম্পর্কে দেবেশ লেখেন, 'অনুভূতির ও অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ, ভাষার বহন ও ধারণক্ষমতাবৃদ্ধি, বিষয়ের পরিধিপ্রসার —তাঁর রচনামাধ্যমে এই কাজগুলি বা এর কোনো একটিও করে ওঠা একজন কথাশিল্পীর সার্থকতার অনস্বীকার্য চিহ্ন। কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্যিক জীবন দীর্ঘ, রচনাসংখ্যা অতি অল্প, কিন্তু তিনটি কাজই করতে পেরেছেন।' এই মূল্যায়ন অনেককেই হতচকিত করেছে। অ-মার্কসবাদী নবনীতা দেবসেন বা মার্কসবাদী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁদের আপত্তি জানিয়েছেনও। মার্কসবাদী হয়ে দেবেশ রায় কীভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন? কমলকুমারের প্রকরণের উল্টোযাত্রার কথা বলতে গিয়ে দেবেশ লিখেছেন, 'একজন ভাষাশিল্পী তাঁর শিল্পের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে নিজের জন্য এমন একটা প্রকরণ বেছে নিতে পারেন, যে প্রকরণের সঙ্গে ঐ ভিড়ের ভাষা বা ভাষার ভিড়ের একটা শারীরিক বিচ্ছিন্নতা থেকে যায়। কমলকুমার মজুমদার সেই কাজটি করেছেন।' অতঃপর ওঁদের ঐ প্রশ্নটিই নিজে তুলেছেন: 'প্রকরণ নির্বাচনের এমন পদ্ধতিকে কি বিচ্ছিন্নবাদিতা বলা যাবে না? এতে কি সাহিত্যকে মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় না? এটা কি কলাকৈবল্যের বা ফর্মকৈবল্যের ব্যাপার হয়ে যায় না? কোনো কোনো শুদ্ধশিল্পরসিক এই বিচ্ছিন্নতার জন্যই যেমন কমলকুমার মজুমদারকে স্বীকার করেন ও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের চাইতে তাঁর সাহিত্যচর্চাপদ্ধতিকে নিয়ে নানা কথাকাহিনী রটান, তেমনি কোনো-কোনো গোঁড়া মার্কসবাদী সমালোচকও তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ফর্মকৈবল্যের লেখক মনে করেন।' উত্তরও দিয়েছেন তার: 'ভাষার বিচ্ছিন্নতার সাধনা কখনো-কখনো, ভাষাসাহিত্যের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন বৈপ্লবিক উপাদানের জন্ম দেয়, জন্ম দিতে পারে। কমলকুমার মজুমদারের ভাষা বাংলা গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেই নতুন বৈপ্লবিক উপাদানের জন্ম দিয়েছে।'

এই ভাষার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে অভিজ্ঞতা, কমলকুমারের দার্শনিক বিশ্বাস নিরপেক্ষভাবে সেই অভিজ্ঞতায় আছে এমন এক বাস্তবতা, যাকে দেবেশ রায় বলেছেন 'বাস্তবতার অনড় পিঞ্জরতুল্য অপরিবর্তনীয়তা', 'বাস্তবতা যেন একটা কাদার তাল'। সেজন্যই 'তাঁর উপন্যাস কোনো ধারাবাহিক রচনা নয়, উপন্যাসের ভিতরও ঘটনার ধারাবাহিকতা থাকে না, সবটুকুই এককালীন-নির্মাণ।' দেবেশ মানেন, কমলকুমারের ভাষার নির্মাণে ম্যানা-রিজমের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন:

কমলকুমার উপন্যাসের বিন্যাসের আপাতশৃঙ্খলা ভেঙে দিয়েছিলেন 'কোনো আত্মবিনাশী প্রতিভার খেলার নেশায় নয়, তাঁর বিষয়ের প্রয়োজনে ও বাংলা উপন্যাসের টেকনিকের আত্মসচেতন অন্বেষণে—এ দুইয়ের ভেতর বিরোধিতা-বৈপরীত্য নেই।'

কমলকুমার মজুমদার সম্পর্কে দেবেশ রায়ের এই মতামত সর্বাংশে গ্রাহ্য কিনা, বিতর্কের উর্ধ্বে কিনা, সে প্রসঙ্গ আপাতত জরুরি নয়। জরুরি, মার্কসবাদীর সহজ অভ্যস্ত ও ভুল সমীকরণের চিন্তাজাল ছিঁড়ে তিনি যে পদ্ধতিতে একজন দুরূহ শিল্পীর জটিল অভিজ্ঞতাকে ও প্রকরণকে চিনতে চাইলেন পরম ধৈর্যে, সেটাই। নন্দনবিচারের সৃজনশীলতার দিক থেকে চেনার এই অভিযানটাই একটা বড় পদক্ষেপ।

তিন

মার্কসবাদী নন্দনভাবনার বিপুল ভ্রান্তি এবং কষ্টার্জিত ও বিরল সাফল্যের এই ছবি বাংলা দেশেরই ঘটনা এমন নয়। ইওরোপীয় সাহিত্যের বিস্তৃত ও বহুকর্ষিত জমিতেও ভ্রান্তি ও পুনর্বিচারের পালা এভাবেই চলেছে।

গিওর্গ লুকাচের মতো মার্কসবাদী নন্দনচিন্তার একজন প্রধান পুরুষের কথাই ধরা যাক। তাঁর সম্পর্কে এখন বলা হচ্ছে, তিনি আর যাই হোক, কবিতাটা বুঝতেন না। অনেকেই বলেছেন। যেমন থিওডর অ্যাডর্নো-র কথা: 'তাঁর (অর্থাৎ লুকাচের) গীতিকবিতা আস্বাদন করার ক্ষমতা কতটা তা বেশ সন্দেহজনক।' উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে, জার্মান কবি গটফ্রিড বেন-এর একটি কবিতা পড়ে লুকাচ বলেছিলেন, এখানে মানুষের সামাজিক সত্তাকে অস্বীকার করে অমানবিক ও অস্বাভাবিক দিকটিরই জয় ঘোষণা করা হয়েছে। ওপর-ওপর ধরলে হয়তো তা-ই। কিন্তু অ্যাডর্নো অন্যকথা বলেছেন—ব্যক্তিগতের শেষসীমায় পৌঁছনোর যন্ত্রণাই এখানে। আদিম যুগের জন্য যে কাতরতা কবিতায়, তা আসলে বর্তমানের অসহনীয় ভারকে ব্যক্ত করছে। অর্থাৎ, অ্যাডর্নো বলতে চান, আক্ষরিক অর্থ দিয়ে কবির লক্ষ্যকে বোঝা যায় না। ওঁর ভাষায়, 'যেন এখানে যেন বিষাদ নিয়ে খেলা করছেন। যে অবস্থায় ফেরার জন্য কবি ভান করছেন এবং সত্যিসত্যিই যেখানে ফেরা যায় না, তার বিকর্ষণই প্রতিষ্ঠা করছে ঐতিহাসিক যন্ত্রণার বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদ। বেন বিজ্ঞানের কিছু শব্দ ও মোটিফ ব্যবহার করেছেন, মন্তাজের মতো তা এনে

দেয় বিচ্ছিন্নতা বা দূরত্ব, কবিতাটি বুঝতে গেলে সেই সব ফলাফলকে বুঝতে হবে।' .

তলস্তয় থেকে টমাস মান পর্যন্ত ইওরোপীয় বাস্তববাদী উপন্যাসের বিচারে লুকাচ যে সাফল্য দেখিয়েছেন, তা মোটামুটি স্বীকৃত। কিন্তু তিনি যখন সেই অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তী কিংবা অন্য ধরনের আধুনিক উপন্যাসকে যাচাই করতে গেছেন, তখন আবার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। কাফকা, প্রুস্ত, জয়েস বা বেকেটের উপন্যাস সম্পর্কে লুকাচ বিরূপতা প্রকাশ করেছেন—হয়তো বিরূপতার মাত্রা ও ব্যাখ্যা একেকজনের ক্ষেত্রে একেক রকম, এইটুকু। তাঁদের অনুসৃত 'আভ্যন্তর এক ক-উক্তি' বা ইনটেরিঅর মনোলগকে তিনি বাস্তববাদের বিরোধী বলে মনে করেছেন। শেষোক্ত দুজনকে তো সম্পূর্ণ খারিজ করেছেন আঙ্গিকসর্বস্ব বলে। ব্রেখট বলেছেন, 'তলস্তয় অন্যভাবে লিখতেন বলেই জয়েসের পদ্ধতিকে বাতিল করতে হবে এটা কোনো যুক্তিই নয়।' শিল্পসাহিত্যে প্রকরণের মূল্য, তার পরীক্ষানিরীক্ষার মূল্য, তার বিকাশ ও আবিষ্কারের মূল্য লুকাচ দিতে অপারগ, এটাই মনে হয়েছে ব্রেখটের। অ্যাডর্নো আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, লুকাচ যে 'আধুনিকতা' ও 'অবক্ষয়' দুটোকেই সমার্থক মনে করেন এবং তার উদাহরণ হিসেবে প্রুস্ত, কাফকা, জয়েস ও বেকেটের রচনাকে ধরেছেন, তাতে বোঝা যায়, মার্কসবাদী সমালোচনার বাতিল হয়ে যাওয়া পুরনো পদ্ধতি—শিল্পসাহিত্যের সমাজতত্ত্ব দিয়ে শিল্প সাহিত্যের মূল্যায়ন করার থেকে বেশি এগোতে পারেন নি তিনি।

কিন্তু আধুনিক নন্দনের বিচারে সব ছবি তো পালটে গেছে। অ্যাডর্নো-র মতে, প্রুস্ত ব্যক্তিমনকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ভেঙে ফেলেছেন, সেই মনের অন্তিম রূপান্তরে বাস্তবই প্রত্যক্ষ হয়েছে। ফলে, লুকাচ যা ভাবছেন, তার ঠিক উল্টো ঘটছে, তাঁর ব্যক্তিমুখী রচনাই হয়ে উঠছে ব্যক্তিসর্বস্বতার বিরোধী। আর কাফকা ও বেকেট তো সেই ভয়কেই জাগিয়ে তুলতে চান যার কথা অস্তিবাদে বলা হয়েছে। সমস্ত দৃশ্য ও গ্রাহ্য বস্তুকে ভেঙে ফেলে তাঁদের লেখাগুলো শিল্পের ভেতর থেকে বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ছে। কিন্তু তা থেকে পালানোর উপায় নেই। 'দুনিয়ার হালচাল খুব খারাপ—এই সান্ত্বনা পাবার কোনো উপায় তার (অর্থাৎ পাঠকের) নেই। অন্যায়ের আধিপত্যকে স্বীকার করার ভেতর যে অনুমোদন থেকে যায় তার সম্ভাবনাটুকুও এতে পুড়িয়ে খাক করে দেওয়া হয়েছে।' কিংবা 'আভ্যন্তর একক-উক্তি' —আধুনিক শিল্পের সেই বহির্জগৎ থেকে আপাত বিচ্ছিন্নতা—যার বিরুদ্ধে লুকাচ এত খাপ্পা, সেও

তো স্বাধীন ও ভাসমান আত্মতারই বাইরের রূপ ও ভেতরের সত্য নিয়ে টানা-টানি। এইসব পদ্ধতি তো আত্মতার এই বহিরঙ্গতাকেই ছিঁড়ে ফেলে পলকা দুর্বল ব্যক্তিকে দাঁড় করায় তার পটভূমিতে। আমরা পটভূমিটাকেই তখন ধরতে পারি তার মধ্যে। ব্যক্তি তো সেখানে একটা বুদ্বুদ মাত্র। অ্যাডর্নো-র ভাষায়, 'এইসব লেখকদের একক-উক্তির মধ্য দিয়েই যুগের কণ্ঠস্বর : বর্ণনাপ্রধান আঙ্গিকে বাস্তবের সরল রূপায়ণের চেয়ে এটাই আমাদের বেশি প্রবুদ্ধ করে।'

লুকাচ সম্পর্কে ব্রেখট বা অ্যাডর্নো-র সমালোচনার প্রতিটি মন্তব্যের সারবত্তার প্রশ্ন এখানে গৌণ। অ্যাডর্নো সম্পর্কেও তো শুনি কথা উঠেছে, ইওরোপীয় সংগীতের আলোচনা, যেটা তাঁর মূল বিষয়, সেখানে আধুনিক জ্যাজের বিচারে তিনি লুকাচের মতোই সামাজিক প্রতিফলন-এর তত্ত্ব প্রয়োগ করে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন। হতে পারে। নন্দনের প্রয়োগে দৃষ্টির সার্বিক বিস্তার না ঘটতেও পারে। কিন্তু এই সমালোচনায় বা বাদপ্রতিবাদে একটা সত্য প্রকাশ হয় যে, শিল্পসাহিত্য যতই প্রাচীন স্তর থেকে আধুনিক স্তরে যাচ্ছে, ততই মার্কসবাদী শিল্পদৃষ্টিকেও বদলে নিতে হচ্ছে নিজেকে। প্রাক-আধুনিক সাহিত্য, বিশেষত ক্লাসিকাল ঐতিহ্যের উপন্যাস বিচারে লুকাচের নৈপুণ্য এবং আধুনিকতর সাহিত্যের বিচারে তাঁর ব্যর্থতা এই কথাটাই হয়তো প্রমাণ করে।

শুধু লুকাচ কেন, মার্কসীয় সমালোচনার একটা পর্ব পর্যন্ত এইপথেই সার্থকতা খোঁজা হয়েছে। মার্কস, এঙ্গেলস বা লেনিনের সাহিত্য-বিষয়ক মতামতকে যদি ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের প্রক্ষেপ বলেই শুধু না ধরি, তবে সেখানেও দেখি, তাঁদের দৃষ্টিপাত প্রধানত উপন্যাস বা কাহিনীপ্রধান রচনায়। মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্য বা রেনেসাঁস যুগের নাটকও তো উপন্যাসের মতোই মানুষ ও সমাজের সম্বন্ধপাতের সেই একই মাত্রা অবলম্বন করত। যতই প্রত্যক্ষতায় বা বিচিত্র পরোক্ষতায় রূপ পাক না কেন, সমাজের ছবি প্রকাশ করাটাই ছিল শিল্পসাহিত্যের প্রধান দায়। মার্কসবাদী নন্দনবিচারে সামাজিক প্রতিফলনের নানা ক্ষুদ্রতা ও সমগ্রতা, সাফল্য ও বিকার-ই ছিল মূল আলোচনার বিষয়।

আধুনিক শিল্পসাহিত্য ক্রমশই সামাজিক প্রতিফলনের এই অপেক্ষাকৃত সাদাসিধে পথ ছেড়ে গেল। এই ছেড়ে-যাওয়ার পেছনে এক-একটি ঘটনার চাপ নিশ্চয়ই আছে, আছে এক-এক বড় শিল্পীর অবদান—কিন্তু সব মিলিয়ে এটা এক ধারাবাহিকতারই পরিণতি। সমাজসংসারের জটিলতা, মানুষের

জটিলতা, শিল্পী ও ভোক্তা উভয় মানুষেরই জটিলতা, এসব তো আছেই, মজার কথা এই যে, নিছক নতুনত্বের তাগিদও এই পরিবর্তনকে নিশ্চিত করেছে। আধুনিক শিল্পীর অভিজ্ঞতার মূলে তাই সামাজিক জটিলতার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া যেমন, তেমনি শিল্পের প্রকরণে নতুন আবিষ্কারের আগ্রহ। সব মিলিয়ে এই বিকাশটাই সত্য। যাঁরা তার পরিমাপ করতে আগ্রহী, তাঁরা বলেন, এরকম রূপান্তর আগে কখনোই ঘটে নি—এই বৈপ্লবিক রূপান্তর শিল্পসাহিত্যের অভিজ্ঞতার রূপে ও স্বরূপে। সেই বিকাশের ও অর্জনের মধ্য দিয়ে শিল্প-সাহিত্যকে দেখাও আধুনিক নন্দনবিচারের লক্ষ্য।

দেখা যাচ্ছে, শিল্প ক্রমশই সামাজিক প্রতিফলনের দায়কেই অন্যভাবে বুঝে নিতে চাইছে। একসময়ে উচ্চারণ করা হত, দেশকালের অবিকল ও নিপুণ প্রতিফলনই শিল্পের কাছ থেকে পরম প্রাপ্তি। আজ সে সংজ্ঞার সমস্তটাই পালটে গেছে এমন হয়তো নয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, শুধু প্রতিফলনেই দেশকালকে পাওয়াটা শিল্পের নিজস্ব কাজ বা বড় কাজ কিনা। দেশকালের জ্ঞানের প্রত্যক্ষ উৎস হিসেবে শিল্পের চেয়েও ভালোভাবে কাজ সম্পন্ন করতে পারে ইতিহাস-ভূগোল-অর্থনীতির নানা আধুনিক বিস্তার—এখন আর তা শুধু তথ্যসার নয়, অনুভূতিসংবেদ্য তার নানা রূপ। শিল্প কখনোই তাদের প্রতিযোগী হিসেবে দাঁড়াতে পারে না। শিল্পের একান্তভাবে যেটুকু নিজের করার তা হল, শিল্পের রূপাবয়বের বৈশিষ্ট্যেই শুধু দেশকালকে সত্য করে তোলা। প্রকরণের চর্চা ও পরিশীলন ও আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সেই অবয়বকে শাণিত, শুদ্ধ ও অমোঘ করে তোলা—রূপাবয়বের নিবিষ্টতাতেই শুধু অভিজ্ঞতাকে চেনা। রূপাবয়বের মর্যাদা আগেও ছিল না এমন নয়। কিন্তু তাকে শুধু প্রসাধনে কিংবা এমনকী প্রসঙ্গের অঙ্গাঙ্গিতায় চেনা নয়, তার স্বাধিকারের আলোতেই প্রসঙ্গে পৌঁছনো—জ্ঞানবিজ্ঞানের আর কোনো শাখারই সীমার মধ্যে এটা পড়ে না। এই অনন্যতার যাথার্থ্য নিয়েই আধুনিক শিল্পসাহিত্যের এই ইতিহাস ও রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মার্কসীয় নন্দনভাবনারও ইতিহাস ও রূপান্তর।

চার

বাস্তবজীবনের ভিত্তি ও শিল্পসাহিত্যের ওপরতলার সম্পর্ক নিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা আজও যে উচ্চারণ করতে হয়, তার কারণ বিশ্বব্যাপী সামাজিক

স্তরের বৈষম্যের মতোই শিল্পসাহিত্যচিন্তার স্তরেরও বৈষম্য অন্তহীন। তা ছাড়া তত্ত্বগতভাবে একটা জিনিস মেনে নেওয়া এবং তাকে নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করা, এ দুয়ের মধ্যে তো ফাঁক থাকতেই পারে।

এই বিচ্যুতির কারণটা হয়তো শিল্পসাহিত্যের প্রকৃতির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে। হয়তো মার্কসবাদের প্রকৃতির মধ্যেও। মার্কসবাদী ইতিহাসবোধ বা সমাজবোধের মধ্যে নির্দেশ্যতার ভয় তো সব সময়। সেই বিপদের কথা যদি বাদও দিই, সমাজসম্পর্ক বা ব্যক্তিসম্পর্কের একটা নির্দিষ্টতা ও নিশ্চয়তা মানুষ খুঁজে পায় মার্কসবাদে। সেই নির্দিষ্টতা ও নিশ্চয়তার চেতনা মানুষকে সমাজপরিবর্তনের লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করে। এখানে সে যে অর্থে সক্রিয় মানুষ, সে অর্থে সক্রিয়তা তো শিল্পসাহিত্যে কখনোই নেই। শিল্পসাহিত্যের সৌন্দর্য-চেতনায় অনেকটাই অনিশ্চয়তা বা অনির্দিষ্টতার ঘেরটোপ থাকে—তাকে ভাববাদ বলে শেষপর্যন্ত উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শুধু দেহসর্বস্ব মানুষ ভাবা যায় না, ঐ জটিল স্বার্থ ছাড়া শিল্পসাহিত্যেরও প্রকৃত অস্তিত্ব নেই।

ফলে মার্কসবাদ ও শিল্পসাহিত্যের সাক্ষাৎকার প্রায়শই বড় বিপজ্জনক। ইতিহাসের নির্দেশ্যতার ভুল, রাজনীতি-সমাজনীতির নিজস্ব যান্ত্রিক ব্যাখ্যার ভুল, এ সব তো সব সময়ই ঘটতে পারে—তার জন্য নিশ্চয়ই মার্কসবাদকে দায়ী করা চলে না। কিন্তু এমন মানুষ, যিনি সেই দোষ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম, এমনকী তাঁর ক্ষেত্রেও শিল্পসাহিত্যে রুচির অর্জন কখনই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার নয়। হয়তো বিপর্যয় ঘটাটাই বরং স্বাভাবিক, কারণ রাজনীতির অভিজ্ঞতা থেকে শিল্পের অভিজ্ঞতাকে ছোঁয়ার সহজ প্রবণতা তো তাঁর হতেই পারে। যিনি জীবনের বা জীবিকার লড়াইয়ে দ্বিধাহীন স্পষ্টতায় অভ্যস্ত, তিনি তো শিল্পসাহিত্যে তা-ই খুঁজবেন।

অথচ জীবনের প্রত্যক্ষতার লড়াইয়ের সক্রিয়তার পাশে শিল্পসাহিত্যের মনের সক্রিয়তা যে আলাদা, সে কারোর অজানা নয়। মার্কসবাদী নন্দন-ভাবনাতে তার কথা বলা আছে বারবার। তার জন্য চাই ভিন্ন অনুশীলন, ভিন্ন চর্চা এবং ভিন্ন মানসের উদ্বোধন। লুকাচ যে বাস্তবতার সংজ্ঞায় ন্যাচারালিজমের বিরুদ্ধে বলেছেন, অনেকেই তাকে মনে করেছেন 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র নামে প্রচারিত সহজ ও যান্ত্রিক প্রতিফলনের সঠিক বিরুদ্ধতা।

কিন্তু শিল্পসাহিত্যের আধুনিকতার বিকাশে ঐ চক্ষুষ্মানতাও যথেষ্ট নয় বলে একসময় বোঝা গেল। কারণ শিল্প তো বাস্তবের প্রতিচিত্র নয়, বরং যেন উল্টো পথে চলতে চায় এখন সে। বাস্তবের সঙ্গে এই বিচ্ছিন্নতা শিল্পের এককে

বিভাগে একেক ভাবে এসেছে। উপন্যাসে গল্প বা প্লটের বদলে প্রধান হয়ে উঠেছে মন বা তার সঙ্গে জড়িত আবহাওয়া, কিংবা আজকের ভাষায় যাকে বলা হচ্ছে গঠন—সমাজের বহিরঙ্গতার বদলে মানসিক অন্তরঙ্গতার অণুবিশ্ব। কবিতায় আর ব্যাখ্যান নয়, তার জায়গায় মধ্যপদলোপী সংক্ষিপ্ততা ও তির্যকতা। উপমার বদলে রূপক, রূপকের বদলে প্রতীক—বাক্যের বিন্যস্ত সামাজিকতার জায়গায় শব্দধ্বনির প্রতীক। বিষ্ণু দে-র ভাষায়, 'অভিন্ন কবিত্বেরই স্বায়ত্তশাসিত, প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ আবেদন, তার নাম যাই দেওয়া হোক, অসীম বা অনির্বচনীয়।' চিত্রকলায় সমস্ত রকম প্রতিরূপ বর্জন করে রং ও রেখার নির্বস্তুকতা। সব কিছুতেই একমাত্রা ছেড়ে বহুমাত্রা। শিল্পসাহিত্যে বিজ্ঞানে সর্বত্রই 'প্রতিচিত্রের যুগ গেছে'। 'রিপ্রেসেণ্টেশনের সুবোধ্য সুবিধাবাদ সত্ত্বেও আমরা আজ অভিজ্ঞতার গতিশীল যাথার্থ্যই খুঁজি। তাই কবিতায় গল্প থাকে না, ছবিতে থাকে না বহির্বস্তুর যথাযথ নকল। আর বিজ্ঞানে বিশ্বের ছবির কারবার একেবারে উঠে গেছে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ সত্ত্বেও।'

মাঝে মাঝে ব্যক্তিময়তার অতিরেকে হয়তো সংযোগ রুদ্ধ হতে চায়, কিন্তু তা বলে শর্টকাট তো নেই। তা ছাড়া আধুনিকতার সেটা চোরাগলি। ব্যক্তিময়তার কৈবল্য ও শুদ্ধতা ও আত্মসচেতনতা সবসময় স্বচ্ছতার বিরোধী নয়। কখনো-কখনো তাই এই আধুনিকতা সহজের পথেও চলে—কঠিন সহজে—কিন্তু তাকেও বরণ করে নিতে হয় রূপাবয়বের এই বিকাশ।

এতকালের পরিচিত সাবেকি মার্কসবাদী বীক্ষায় মনে হতে পারে, এ বুঝি জীবন থেকে পালানো—শিল্পের বিকার। আসলে শিল্পসাহিত্যের উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদী শিল্পদৃষ্টিরও রূপান্তর প্রয়োজন, এটাই আজকের সার কথা। মার্কসবাদের অভ্যস্ত চেনা ভাষায় প্রকরণের এই স্বাধিকার অর্জনের মুক্তি ধরা যাবে না। রজের গারোদি যে একদা বলেছিলেন, 'শিল্পবিচারে মার্কসীয় নিয়মকানুন প্রযোজ্য নয়'—সে ঐ প্রথম স্তরের শিল্পদৃষ্টি নিয়ে আধুনিক শিল্পসাহিত্যের বহুমুখিতাকে বুঝতে না পারার দুর্বলতা মনে রেখেই। কিন্তু মার্কসবাদী শিল্পদৃষ্টির বিস্তার ঘটবে না মার্কসবাদের সৃজনশীলতায়, এমন তো মনে করার কোনো কারণই নেই।

পাঁচ

ঠিকই, শিল্পসাহিত্যের ভোক্তার জগতেই এমন অনেক পিছিয়ে পড়া আছে

সামাজিক ও মানসিক পশ্চাদবর্তিতার কারণে, যেখানে শিল্পসাহিত্যের ঐ আধুনিকতা অপরিচিত ও অজ্ঞাত, মার্কসবাদী নন্দনদৃষ্টির উত্তরণ সেখানে অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর। এই বিভক্ত ও ছিন্নভিন্ন বিশ্বে মানুষের মনের বাস্তবে এখনও এমন আদিমতা, মনের ভূগোলে বা পড়ে নি এমন জমি অনেক আছে। এখনও সমাজের প্রান্তবাসী বহু মানুষের শিল্প লোকশিল্প, সাহিত্য লোক-সাহিত্য। শিল্পসাহিত্যের প্রগতির সঙ্গে পরিচিত আমাদের দেশে কজন? আর এ দুয়ের মাঝখানে তো অসংখ্য অবস্থান—সেখানেও ঐ আধুনিক নন্দন-বিশ্ব ততটা প্রাসঙ্গিক নয় এখনও।

কিন্তু পিছিয়ে-থাকা মানুষ বরাবরই এরকম অপ্রস্তুত থাকবে, অনুভূতি ও চিন্তার দিক থেকে অনগ্রসর রয়ে যাবে, এটা যেমন কেউ ভাবতে পারে না; তেমনি শিল্পসাহিত্যের সংজ্ঞা তাদের মুখ চেয়েই শুধু তৈরি হবে, এই দাবিও তো করা যায় না। শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐ একপেশে মার্কসবাদী তত্ত্বের বড় গোলমালই এই যে, ধরে নেওয়া হয়, অনগ্রসর সমাজের অনগ্রসর মানুষের জন্যই বুঝি এই তত্ত্ব। বিষ্ণু দে-র কবিতা সম্পর্কে ৪৯-এর এবং ৭০-এর দশকের বামপন্থী সমালোচনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য। দুটোরই ধরতাই এক—বিষ্ণু দে মার্কসবাদী, কিন্তু তাঁর কবিতা কি জনসাধারণ বুঝতে পারে! বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরকম কি কখনো বলা যায়? তাকে তো তার নিজের নিয়মেই বিকশিত হতে দেওয়া হয়। কোনো আশু প্রয়োজনে শিল্পকে নানা কাজে ব্যবহারও হয়তো করতে হয়। কিন্তু তা বলে মানুষের মনের বিকাশকে যেমন রোধ করা যায় না অসাম্যের দোহাই দিয়ে, তেমনি তার নন্দনদৃষ্টিকেও প্রতিহত করা অসম্ভব। সার্বিক সামাজিক প্রগতির জন্য তা অপেক্ষা করে থাকে না। সমাজেরই দায় বরং সমস্ত মানুষকে মানসের ঐ অগ্রসরতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা একদিন।

তবে কি শিল্পের কোনো দায় নেই, এই রূপান্তরের ইতিহাসে? শিল্পীর কোনো সামাজিক দায়? আসলে শিল্প বা শিল্পীর সামাজিক দায়ের সঙ্গে শিল্পের ঐ সামাজিক প্রতিফলনের সহজ প্রত্যক্ষতাকে মিলিয়ে ফেলাতেই আপত্তি আজকে। দায় সে বহন করছে সমানই, আরো বেশি করেই বহন করতে চায়, কিন্তু অন্যভাবে। রূপাবয়বের পরিণত শুদ্ধতাতেই নিহিত রাখতে চায় সামাজিকতার অন্তর্বস্তু। আর সে কারণেই সমাজের সামাজিকতা ও শিল্পের শিল্পত্ব আগের মতো কোনো সম্বন্ধসূত্রে মেলানো নয়—শিল্পের স্বকীয়-তাতেই সামাজিকতা সংলগ্ন, অখণ্ড। এই প্রথম শিল্প ও সামাজিকতার

অচ্ছেদ্যতা। যেটা শুধু এতকাল তত্ত্ব বা লক্ষ্য হিসেবে ছিল, তা সত্যিই আজ বাস্তব হয়ে উঠল। বাইরের টেনশন ও দ্বান্দ্বিকতা শিল্পের ভেতরের সত্য হল। এখন শিল্পের দিক থেকেই, শিল্পের মধ্য থেকেই শিল্পের সামাজিকতাকে চেনা।

এই বিকাশের প্রধান লাভঃ শিল্পী ও ভোক্তার ব্যক্তিগত রুচির যে মর্যাদা তার প্রতিষ্ঠা এবং শিল্পগত যোগ্যতা অর্জনের যে প্রয়োজন তার স্বীকৃতি। ব্যক্তিগত রুচি মার্কসবাদে কোনোদিনই অস্বীকৃত ছিল না—মার্কস নিজেই বারবার তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু কার্যত তার সীমানা বড়ই অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। দর্শক বা শ্রোতা বা পাঠকের বুদ্ধি ও অনুভূতি, প্রস্তুতি ও চর্চা—এসব কথা এমন প্রাধান্য পায় নি আগে। মার্কসবাদীকেও যে প্রকরণের ন্যায়নীতির জটিলতা থেকেই শুরু করতে হবে, এটা মানতে হচ্ছে এখন। ফলে শিল্পের অধিকার-অনধিকার, যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্নে ভোক্তার মনস্তত্ত্বেও হানা দিতে হবে প্রয়োজনে।

শিল্পের নিজস্ব ভাষা আছে, ব্যাকরণ আছে, পরিমণ্ডল আছে, যুক্তিমালা আছে। শিল্পের রুচি ও বিচারবুদ্ধি তাকে বাদ দিয়ে গড়ে উঠতে পারে না। এই ব্যক্তিগত রুচি ও তার সমস্ত উপাদানের যেমন সামাজিক কার্যকারণ আছে, তেমনি আছে তার স্বাধীন সত্তা। নিশ্চয়ই শিল্পসাহিত্যের সমাজতত্ত্বের বোধ নিয়েই ব্যক্তিগত রুচি দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আজকে আরও বেশি জোর দিয়ে বলা দরকার, শিল্পসাহিত্যের সমাজতত্ত্বেরও অস্তিত্ব নেই ব্যক্তিগত রুচির বোধ ছাড়া। এ দুয়ের সংযোগ ও সংঘাত কীভাবে হতে থাকে তার সমাধানও শুধু শিল্পগত আবহাওয়ায়।

ঠিক এই অর্থেই শিল্পসাহিত্যের যে স্বাধীনতা ও অবচ্ছিন্নতা—বিকারের অর্থে নয়, আত্মসচেতন বিকাশের অর্থে—সে তার বাঁধন ছিঁড়ে উল্টো দিকে যেতে চায়। উল্টো দিক থেকে একই সত্যে পৌঁছনো। অভিনবত্বের জন্যই শুধু নয়, এখানেই তার শক্তি, যে শক্তি আর কারো নেই। আর কোনো বোধ বা জ্ঞান নেই, যার আত্মপরিচয় প্রকরণের নির্দিষ্টতায় ও অমোঘতায়, যার ক্ষতিবৃদ্ধি প্রকরণেরই নিরীক্ষায়। প্রকরণের মধ্য দিয়েই সে বলতে পারে এমন কোনো কথা, দেখাতে পারে এমন কোনো পথ; যা অন্য কারো জানা নেই। কারণ প্রকরণ সেখানে তো বাহন নয়, সে প্রসঙ্গেরই সত্তা। এইভাবে বাস্তবের অভিজ্ঞতা থেকে যে শিল্প বা তার উপাদানের জন্ম, বাস্তব থেকে তা বিমুক্ত হয়। শিল্পকর্ম স্বাধীন হয়ে ওঠে, ভিন্নভাবে লক্ষ্য পূরণ করে, ভিন্নপথে তার দায় পালন করে।

ছয়

বাস্তবের বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে, বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে—নেতির অভিযানেই—শুরু হতে পারে এই ভিন্নযাত্রা। তখন দেখা যায়, বাস্তব জীবনে আলো-অন্ধকার বা আশা-নিরাশাকে যে বিন্যাসে দেখেছি, সেই অর্থ এখানে মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। জীবনের তত্ত্বে ও কাজে আলোর প্রয়োজন ও চর্চা তো চলেছেই। কিন্তু সমগ্রতা কি খণ্ডিত হয় না ঐ অন্ধকারকে বাদ দিলে—শুধু কোনো এক সমাজে বা ব্যবস্থায় নয়, সব সমাজে সব ব্যবস্থায়? শিল্প কি তবে অন্ধকার হাতড়ে ঐ সমগ্রতাকেই আনতে চাইছে? কালের প্রতিমার অশ্রুকে সামনে এনেই কি শিল্পী তার বৃহত্তর দায়কে পালন করছেন?

১৯৪৭ সালে 'লেনিনগ্রাদ' পত্রিকায় রুশ কবি আন্না আখমাতোভা-র কবিতা ছাপানোর জন্য ঐ পত্রিকাকে খুব তিরস্কার করেছিলেন ঝ্দানভ। সেই ঝ্দানভ যিনি সমাজ ও শিল্পের সম্পর্কের পরোক্ষতাকেও মানতে নারাজ ছিলেন। সোভিয়েত ও সেই সূত্রে সারা বিশ্বেই মার্কসবাদী নন্দনভাবনার সে এক ঘোর দুর্দিন। ঝ্দানভের অভিযোগ ছিল, আখমাতোভা-র কবিতায় জনগণের কথা নেই, আছে কেবল বিষাদ, মৃত্যু, নৈরাশ্য। আখমাতোভা-র একটি কবিতার বর্ণনা এইরকম: চারদিকের লড়াইয়ের মধ্যে যখন সব কিছু ছেড়ে যেতে হচ্ছে সকলকে, তখন নির্জন নিঃসঙ্গ একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে একটি কালো বেড়াল, যেন শতাব্দীর চোখ নিয়ে। কবিতাটি কত ভালো গদ্য-অনুবাদে তা জানা যায় নি। কিন্তু ঝ্দানভ যে বলেছেন, এর সঙ্গে রুশ জনগণের যোগ নেই, তা কি ঠিক? তবে কবি বা কবিতাটি সকলের মন কাড়ল কেন? তখন অবশ্য প্রকাশ্যত একথা ভেবে ওঠা হয়তো সম্ভব ছিল না যে, আখমাতোভা-ও অভিজ্ঞতার কোনো এক সত্যই প্রকাশ করছেন, ঘুর পথে। শুধু চিরকালীন সত্য নয়, তার চেয়েও বড়, হয়তো স্তালিনীয় যুগের নানা পীড়নের দীর্ঘশ্বাস—হয়তো তার নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে চারপাশের প্রস্তুতি ও সক্রিয়তার উত্তরণ, সময়ের ঐ হাহাকারের অপচয়ও। অ্যাডর্নো হলে বলতেন, 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজে নির্জনতা বা নিঃসঙ্গতাও একটা সামাজিক প্রক্রিয়া এবং সেদিক থেকেও তার মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রসঙ্গ।' সচেতন মন তো তা বলে এই কুৎসায় কান দিতে পারে না যে, বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ায় 'ব্যক্তি' অনুপস্থিত, সে সমাজ ব্যক্তিবর্জিত সমাজ।

এই বিপরীত ব্যাপারই চলতে পারে শিল্পসাহিত্যের জগতে। ব্যক্তির

বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্বের মধ্য দিয়ে সামাজিক ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতাকে আভাসিত করে তোলা, শিল্পের জগতে নিরাশার মধ্য দিয়েই কঠিন আশাকে পাওয়া, অন্ধকারের ছবির মধ্যেই আলোর জন্য লুকনো আকুতি। শিল্পী যত ব্যক্তিগতে ছোটেন, ততই তাঁর সৃষ্টি বিশ্বগতকে প্রকাশ করে। তার বর্ণনা যত ক্ষেত্রনির্দিষ্ট ও অনুপুঙ্খ হয়, ততই তার প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে, যাকে মনে হয় আঞ্চলিক, তার মধ্যেই দেশকাল উন্মোচিত। এ যেন জিয়াকোমেত্তি-র ভাস্কর্য—মূর্তি যত ছোট হয়, ততই দর্শকের মনে এসে যায় বিশালের আভাস। শিল্পও যত সমাজকে পাশ কাটায় বাহ্যত, ততই তীব্র ও গোপন অনুভবে আসে সামাজিকতার চাপ। যতই তা অন্তর্নিবিষ্ট হতে চায়, ততই তা চারপাশে বিকিরিত হতে থাকে।

এভাবেই শিল্পের আদল যেন নাকচ করতে চায় নিজেকেই। প্রকরণের সচেতনতাই নিয়ে যায় প্রকরণসর্বস্বতার বিসর্জনে। ভাষার দূরত্বই হয়ে ওঠে গভীরতর সামাজিক সম্বন্ধের পাদপীঠ। কারণ, ভাষার কাগুজে সারল্য, যাকে আমরা সাংবাদিকতা বলি, সে তো মানুষের সমস্ত গভীর সম্বন্ধকেই অস্বীকার করছে, মানুষের বোধবুদ্ধি-জটিলতা সব কিছুকেই, মনুষ্যত্বকেই। সেই মানবিক সম্বন্ধের পুনরুদ্ধার সম্ভব ভাষার নিরূপিত বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে। দেবেশ রায়ের 'সময় সমকাল' বইটিতে পেয়ে যাই পিকাসো সম্পর্কে রোলাঁ পেনরোজ-এর কয়েকটি উক্তির অনুবাদ, ভিন্ন প্রসঙ্গে হলেও উদ্ধৃত করার লোভ জাগে: 'শুনতে-শুনতে বোঝা যায়, পিকাসো মনে করেন, সত্যের কাছে সহজে পৌঁছনো যায় না। সরল বিবৃতিতে মিথ্যা ঢুকে যায়—সেগুলো বিশ্বাস করা কঠিন। সূক্ষ্ম সব কৌশলে বরং সত্যকে আন্দাজ করা যায়, তাতে সত্যটি বেঁচে থাকে, পায়ের তলে দলে যায় না।' শেষ হচ্ছে কথাটি এইভাবে: 'পিকাসো যে-কোনো সমস্যার উল্টোদিকটা দেখাতে আমোদ পান।' আর অ্যাডর্নো-র উক্তি: 'আজ যখন অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য অগভীর সাংবাদিকতায় পর্যবসিত, তখন প্রকরণের চর্চার প্রয়োজন বেড়ে গেছে বিপুলভাবে। লুকাচ তো বিশৃঙ্খল ও ব্যক্তিসর্বস্বতার বিরুদ্ধে এত খড়্গহস্ত, তাকে কব্জা করতে পারে শিল্প এই কাঠামোর বিন্যাসেই।'

সাত

আমাদের আলোচনা কিন্তু এখানে শিল্পসাহিত্যের মূল্যায়নের নয়। মার্কসীয় দৃষ্টিতে মূল্যবিচারের প্রশ্ন তো স্বতন্ত্রভাবে আছেই। এখানে শুধু এ কথাটাই

উঠেছে যে, সেই বিচার শিল্পসাহিত্যের নিজস্ব সমস্যাকে উপেক্ষা করে নয়, ব্যক্তিগত রুচির টানকে অস্বীকার করে নয়।

মার্কসবাদী নন্দনভাবনার একটা বড় ঝোঁক অন্তত আমাদের দেশে এই যে, লেখক হিসেবে গ্রাহ্যতা বা স্বীকৃতি এবং শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা, এই দুয়ের মধ্যে তফাৎ না করা। দুই মেরুতে যাওয়া-আসা তো মার্কসবাদীরও স্বভাবে। তাই, হয় জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে খারিজ করতে হয়, না হয় তিনিই আমাদের সব পাওনা মিটিয়েছেন এরকম ভাবতে হয়—এর মাঝামাঝি অবস্থান, একটা নয় অনেক অবস্থান, যে থাকতে পারে, তার চর্চা নেই। কোনো লেখকের সীমাবদ্ধতা জেনেও তাকে বড় বলে মেনে নেওয়া যায়, যদি অবশ্য সমস্ত বৈপরীত্য সত্ত্বেও তিনি আমাদের বড় চাহিদা, নিশ্চয়ই শিল্পগত চাহিদা মিটিয়েছেন বলে মনে করি—অন্যদিকে, যিনি আমাদের বড় চাহিদা মেটান না, তাঁরও খুচরো গুণপনা, খুচরো জেনেই, উপভোগ করতে পারি—নান্দনিক সহিষ্ণুতা ও মাত্রাবোধের এই চর্চা একই সঙ্গে করতে পারাটা মার্কসীয় নন্দনবিচারে পরিত্যাজ্য, এমন মনে করার কারণ নেই।

মার্কসীয় সজ্ঞানতা সাহিত্যরুচির একটা যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে এনে দেয়, কিন্তু তারপর রুচির খোলা জমি। সেখানে কাউকে বেশি ভালো লাগে, কাউকে কম—এক সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন কারণে অনেককে অনেকভাবেই ভালো লাগতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের মূল্যায়নের প্রশ্ন আলাদা।

প্রকরণের মধ্য দিয়েই সাহিত্যের লক্ষ্য ও সিদ্ধিকে চিনে নেওয়া ছাড়া অন্য পন্থা থাকতে পারে না। চিনে নিতে গিয়ে দেখা যেতে পারে, কখনো ভাষার দূরত্ব, কখনো-বা আলোকিত নিশ্চিন্ত বহির্জগতে নিঃসীম আঁধারের নির্মাণই পাঠককে ঝাঁকুনি দেওয়ার কাজ করছে। সে কাজ তো শিল্পেরই। যা ঘুম পাড়িয়ে রাখে, অন্যমনস্ক করে রাখে, তার শিল্প হওয়ার অধিকার নেই। কিন্তু সেই কাজ কে কতটা করতে পারছে, মৌলিকভাবে করতে পারছে, তা তো বিচারের প্রশ্ন। কে কতটা অন্ধকারকে উদ্ঘাটিত করতে পারছে, তারই মধ্যে আবার আয়াসলব্ধ আলোর পিপাসাকে মূর্ত করতে পারছে, কিংবা আলো ও অন্ধকারের জটিল জাল বুনতে পারছে, শিল্পের প্রকরণের সীমানাতেই তার কি তর-তম নেই? ভাষার বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাকে ঠেলে যে শিল্পী লৌকিক ভাষার সম্ভাবনাকেও পৌঁছে দিচ্ছেন অন্য মর্যাদায়, তাঁর কি শিরোপা প্রাপ্য নয়? শুধুই উল্টো সাধনার কথা বলেছেন অ্যাডর্নো—হয়তো পশ্চিমী অভিজ্ঞতায় বাস্তবের সেই তীব্র চাপ এড়াতে পারা যায় নি। আমরা জেনেছি,

সেই আপাত নিরালম্ব ব্যক্তিত্বেরও অবলম্বন সমাজেই, মাটিতেই। তার ছবি আমাদের দেশেও আজ বাস্তব হয়ে উঠেছে।

কিন্তু যে বৃহত্তর মানসে অন্ধকারের সামাজিকতা এবং আলোর 'অবাস্তব' স্বপ্ন সংলগ্নতা পায়, মনের বিচ্ছিন্নতার বোধ অন্তর্দর্শী হয়ে ওঠে, 'বিরাগ-অনুরাগে আন্দোলিত' হয়—সেই বৃহতের দিকে যাওয়াই তো শিল্পের আরো মুক্তি, শিল্পীর মহত্ত্বের অভিজ্ঞান। আধুনিক শিল্পসাহিত্যের যন্ত্রণাবোধের মধ্যে সততা আছে, বাস্তবতা আছে, কিন্তু অসম্পূর্ণতাও কি নেই? নিশ্চয়ই বাস্তবের ঐ অসম্পূর্ণতা ধনতান্ত্রিক সমাজের অসম্পূর্ণতাতেই। কিন্তু সমগ্রতা বা সম্পূর্ণতার বোধকে শিল্পের চারিত্রে অন্তর্ভূত করার দায়িত্বও তো শিল্পেরই। যে অসম্পূর্ণতা সমাজে, তাকে ইচ্ছামতো কাল্পনিকতায় পূরণ করা নয়, শিল্পের স্বাধিকারেই তাকে সম্পূর্ণ করার কাজ, ছোট বাস্তবের জায়গায় বড় বাস্তবকে ফুটিয়ে তুলতে। অনিবার্যভাবেই তবে এর সঙ্গে যুক্ত সমাজ-রূপান্তরের স্বপ্ন ও তার লড়াই। শিল্পচিন্তায় ও রচনায় বড় বাস্তবের দিকে যাওয়াটাই সেই লড়াইয়ের অঙ্গ -প্রকরণের স্বায়ত্তশাসন সেই লড়াইয়ের হাতিয়ার। মার্কসবাদ নন্দনবিচার সেই লড়াইয়ের বিজয়ী বীরকেই শ্রেষ্ঠত্বের মালা পরাবে।

প্রশ্নকাতর ডাঙায়

পূর্ণেন্দু পত্রী

নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক বই। বাংলা ভাষায় লেখা। তারই সমালোচনা লিখতে হয়েছিল একবার এক দৈনিক পত্রে। আলোচনার সুতো ধরেই এসে গিয়েছিল কিউবিজম-প্রসঙ্গ। তখন বলতেই হয়েছিল যে কিউবিজমটা আকাশের কোনো আকস্মিক ডিম নয়, বাস্তব থেকে গজানো। হাতের কাছেই ছিল জন বার্জার-এর 'সাক্‌সেস অ্যাণ্ড ফেলিওর অফ পিকাশো'। কিউবিজমের জন্মের পিছনের ঐতিহাসিক কার্যকারণ, গদ্য-কবিতার স্তবক যেন কয়েকটি, ধাপে-ধাপে সাজানো সেখানে। বার্জার অবলম্বনেই তুলে ধরেছিলাম কিছু দৃষ্টান্ত।

১৯০০-য় প্যারিস শহরে বিখ্যাত প্যারিস প্রদর্শনী। শিল্প-বিপ্লবের আশ্চর্য সব ফসলের সমাবেশ। সেখানে মোটরগাড়ি, ক্রোমিয়াম, এ্যালুমিনিয়াম, সিনথেটিক কাপড়-চোপড়। সেখানে বিস্মিত ঝলকের বিদ্যুৎ। সেখানে ওয়ারলেস। সেখানে 'মাস প্রোডাকশন'-এর ব্যাপক সমারোহ। অবশ্য এই বিস্ময়ের শুরু ১৮৮৯-এ ঐ প্যারিসেই জমজমাট আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী থেকে, যাকে উপলক্ষ করে হাজার ফিট উঁচু ইফেল-টাওয়ারের জন্ম। আগাগোড়া ইস্পাতে গড়া ওই কাঠামো যখন বনেদিয়ানার গৌরবে স্ফীত যাবতীয় স্থাপত্যের অলঙ্কৃত মহিমাকে তুচ্ছ করেছিল নিমেষে, প্যারিসের বুদ্ধিজীবী মহল কৌরব-পাণ্ডবে ভাগাভাগি। অতঃপর নিন্দা এবং স্তুতির এক কুরুক্ষেত্র। চিন্তার দিক থেকে যাঁরা প্রগতিশীল তাঁরা এই ইস্পাত-স্তম্ভকে স্বাগত জানাতে

দেরি করেননি এক সেকেণ্ডও। ইফেল টাওয়ারের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই আরেক ধাক্কা বিদ্যুতের। ঐ প্রদর্শনীতেই ছিল প্রথম বিদ্যুতে আলোকিত এক ঝর্ণা। বিদ্যুতের যাদুকরী দক্ষতায় মুগ্ধ জনমানবের আলোড়িত অনুভবকে ১৯০৫-এর এক কবিতায় রূপ দিয়েছিলেন অ্যাপলিনের। তারপর প্রতিদিনই যেন সভ্যতার নব নব জন্মদিন। ১৯০১-এ ম্যাকস প্ল্যাঙ্ক-এর কোয়াণ্টাম থিয়োরি। ১৯০৩-এ রাইট ভাইদের এরোপ্লেন বানিয়ে উনষাট সেকেণ্ডের মতো আকাশে ওড়াওড়ি। ১৯০৫-এ আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির থিয়োরি। পুরনো সমাজ-কাঠামো ভাঙছে। ক্যাপিটালিজম জন্মেই আঙুল ফুলে কলাগাছের মতো মনোপলির চেহারায় হৃষ্টপুষ্ট। সমাজবিজ্ঞানীর মত খুঁটিয়ে না বুঝেও প্যারিসের সজীব শিল্পীরা টের পেয়ে গেছেন যে বুর্জোয়া সমাজটাকে তাঁরা ঘেন্না করেন হাড়ে-মাসে, সে-সমাজের রুচি-দম্ভ-দাপটের অবসানের দিন আসন্ন, আসছে নতুন ধাঁচের সমাজ, যা নতুন আবিষ্কার আর নতুন সব উৎপাদনের বৃহৎ এবং ব্যাপক সম্ভাবনায় টৈ-টম্বুর। আসছে 'অর্ডিনারি'-র মধ্যে 'একসট্রাঅর্ডিনারি'র আত্মপ্রকাশের কাল। কিউবিজম শিল্পীর চেতনে-অবচেতনে সামাজিক এইসব মৌল রূপান্তরেরই অনিবার্য প্রভাবের পরিণাম। লেখাটা যখন ছেপে বেরোল, দেখা গেল সবই আছে, নেই কেবল কিউবিজমের উৎপত্তির কার্যকারণ অংশটি। কেন নেই, তার কারণটাও অনন্নুমেয় নয় আদৌ। শৌখিন বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই এ-জাতীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে পেয়ে যান মার্কসবাদের গন্ধ, যা তাদের নাক অথবা ফুসফুসের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর, অতএব সমর্থনের পক্ষে অযোগ্য এবং অসহ্য। আর সেই কারণেই আমাদের দেশে সময় এবং সমাজ নিরপেক্ষ নীরক্ত শিল্প-আলোচনার এত কদর। আর সেটাই হয়ে উঠেছে স্থির ঐতিহ্যের মতো। গরিষ্ঠসংখ্যক সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠপোষতায় তার কলেবর ইদানীং ক্রমশই স্ফীতকায়। এখন আর তাই আশ্চর্য হই না আমরা, যদি দেখি বাংলা ভাষায় পিকাশো-সংক্রান্ত কোনো রচনায় কোথাও উল্লেখ না থাকে কমিউনিস্ট আন্দোলন-সম্পর্কিত কণামাত্র সংবাদ, অথবা থাকে পিকাশোর শিল্পজীবনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষয়ক্ষতিময় অপকারিতার অপব্যাখ্যা। আমাদের অধিকাংশ দেখাই এখন একচক্ষু। অন্তঃসারশূন্য সম্ভাষণ মাত্রেরই এখন বিপুল চাহিদা এবং ব্যাপক সমাদর। রদাঁর ভাস্কর্য-প্রদর্শনী ঘটে গেল কলকাতায়। আমরা, সবিস্ময়ে, প্রত্যক্ষ করলাম দুটি ঘটনা। জনসাধারণের উথলে-ওঠা কৌতূহল আর তারই সঙ্গে দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের পাথুরে নীরবতা। কথা বললেন কেবল

দু-চারজন শিল্পী। যেন একটা সভ্য দেশে এটাই নিয়ম যে, বিষয়টা যখন শিল্প, তখন কথা বলার দায়টা কেবল শিল্পীদেরই, আর কবি-সাহিত্যিক এবং অন্যান্য শিল্প-মাধ্যমের কর্মীরা হবেন ঐ বিষয়ে কানে কালা এবং চোখে কানা, অতএব মুখে বোবা। আবার অন্যদিকে রদাঁর সম্পর্কে শিল্পীরাও যা লিখলেন, সেখানে পুঁথিগত তথ্যের পুনরাবৃত্তির চেয়ে অতিরিক্ত কিছু খুঁজে পাওয়া অনেকটা পরিশ্রমেরই অপব্যয় যেন। এমন ফুলকি জ্বলে উঠল না অক্ষরে, যা বোধ-বিশ্লেষণের নতুন আলোয় মহত্তম কিছু সৃষ্টির নির্মাণ-রহস্যকে চিনিয়ে দিতে পারে নিমেষে।

অথচ শিল্প-সমালোচকের অনুসন্ধিৎসু মনের দরজা-জানলা খিদের হাঁ-এর মতো খোলা থাকলে একজন শিল্পীর সৃজনশীল ক্রিয়া-পদ্ধতির উন্মোচন হতে পারে কতখানি গভীর, একজন শিল্পীকে তাঁর নিজস্ব স্থান-কালের পটভূমিকায় ভিন্ন ভিন্ন শিল্পমাধ্যমের প্রাণ-ধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে কীভাবে শিল্পের ইতিহাস উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে ইতিহাসের শিল্পে, সৌভাগ্যবশত এই 'পরিচয়'-এর পাতাতেই তার বিরল নজিরটি চোখ এড়িয়ে যায় নি আমাদের। সিদ্ধার্থ রায়-এর সে-রচনার অগ্নিতাপে আমাদের খবরের-কাগজে কাণ্ডাকাণ্ডহীনমার্কা অথচ স্ফীত কলেবর অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন গলে গলে হয়ে যায় অব্যবহারের কাদা-জল, অন্যদিকে তেমনিই আমাদের আধো-সজাগ মননের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চারিয়ে দেয় উপলব্ধির এবং অবলোকন-ভঙ্গির ভিন্নতর বাষ্পকণা। সে-রচনায় আমরা দেখি ভাস্কর্যের আলোচনাতেও কী অপরিহার্য হয়ে ওঠে হ্বাগনারের প্রসঙ্গ, স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ, ব্লক এবং মায়াকভস্কির ছন্দস্পন্দের দৃষ্টান্ত, ফরাসি ও জার্মান সমাজের ভিতরকার রাজনৈতিক ভাঙচুরের উল্লেখ। এমন কী অপরিহার্য হয়ে ওঠে মার্কস-এর 'এইটিন্‌থ ব্রুমেয়ার'ও, রদাঁর 'দা ওয়াকিং ম্যান' কেন মাথাহীন, তার উত্তর-সন্ধানে। 'এইটিন্‌থ ব্রুমেয়ার'-এ মার্কস জানিয়েছিলেন বুর্জোয়া অভ্যুত্থান এক ক্ষণস্থায়ী ঝলক। প্রলেতারীয় বিপ্লব এক দীর্ঘ সামাজিক পরিবর্তনের পর্ব-পর্বান্তর। এক বিন্দু থেকে অভিযান শুরু করে আবার সেই বিন্দুতেই পরে ফিরে এসে আত্মসমালোচনার আলোয় অন্য পথ চিনে নেওয়ার মধ্যে দিয়েই প্রলেতারীয় বিপ্লব নিজেদের খামতিকে রূপান্তরিত করে দৃপ্ত অগ্রসরের ক্ষমতায়।

এই তাত্ত্বিক পটভূমিকায় রদাঁর 'দা ওয়াকিং ম্যান'কে এরপর সিদ্ধার্থ রায় নিজে চেনেন এবং আমাদের চিনিয়ে দেন এইভাবে ঃ

"রদাঁর সমকালকে যদি রদাঁর মূর্তিতে দেখতে চাই আমাদের আজকের ইতিহাসবোধকে অতীতে প্রক্ষেপ করে, তাহলে রদাঁর ঐ একটি মূর্তিতে আমাদের দেখা হতে পারে মার্কসের 'এইটিনথ ব্রুমেয়ার'-এর নতুন মানুষের উত্থান মূর্তিটির নিম্নাঙ্গ জুড়ে আর উর্ধাঙ্গে সেই মানুষেরই বিপর্যয়। ফরাসি সমাজের শ্রেণীসংগ্রামের এক আশ্চর্য-প্রতিমা হয়ে ওঠে 'দা ওয়াকিং ম্যান'-মূর্তিটি।" শিল্প-সংস্কৃতির আলোচনায় ইতিহাসবোধের প্রসঙ্গ তুললে আমাদের চোখে পড়বেই বিশেষ এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ভীত-সন্ত্রস্ত নাসিকাকুঞ্চন। ইতিহাসবোধ নামক শব্দবন্ধটিতে তাঁরা যেহেতু শুনতে পান মার্কসবাদের অনুরণন, আর মার্কসবাদ-সঞ্জাত যে-কোনো উচ্চারণই যেহেতু তাঁদের ভাবনা-চিন্তার নিরাপদ শরীরকে আক্রান্ত করে তোলে বিরাগ-বিরক্তির বিষ-ফোঁড়ায়, সুতরাং ইতিহাসবোধ-এর দাবি তাঁদের ব্রাহ্মণ সুলভ বৈদগ্ধ্যের পবিত্র প্রাঙ্গণে অস্পৃশ্য-অচ্ছুৎ হিসেবে অনাদৃত হবে, এটাই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক আরো এক কারণে যে, ইতিহাসবোধকে মেনে নিলে আর টিকিয়ে রাখা যায় না দীর্ঘ-লালিত এই প্রত্যয় যে, শিল্পকলা শিল্পীর সমাজ-সম্বন্ধহীন ব্যক্তিগত কল্পনারই সন্তান-সন্ততি। এই সব মগজ-ব্যবসায়ীদের মগজের ঘি-অংশে সম্ভবত পৌঁছতে পারেনি এই সরল সত্যটুক যে, শিল্প-সংস্কৃতির আলোচনায় ইতিহাসবোধ ব্যবহারের এই গরজটা মার্কসবাদের পেটেন্ট-মার্কা আবিষ্কার নয়, অবহমান-সময়ের অভ্যন্তরে ইতস্তত প্রবহমাণ এই বোধকে একটা নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা-যোগ্য, বিশ্লেষণ-নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞানের অবয়ব দেওয়াটাই মার্কস-বাদের স্মরণীয় কীর্তি, সভ্যতাকে মার্কসের প্রজ্ঞাময় ব্যক্তিগত দান। স্বদেশের অগ্রজ কবির উপলব্ধির ভাষায় আমরা পেয়ে যাই এই 'বিশ্বকৌষিক মন' ও 'বিজ্ঞানবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ মননশীল' মানুষটির সবচেয়ে বড় কৃতিত্বের মূল্যায়ন—"সবচেয়ে বড় কথা যে তাঁর চিন্তা ও ক্রিয়াকর্মের কল্যাণে পরবর্তী আমরা সবাই পেয়েছি সর্বমানবের ইতিহাস বিষয়ে কাজ করবার বৈজ্ঞানিক রীতিটি আর পুরোধা তথ্য ও তত্ত্বসন্ধানের উত্তরাধিকার।" (বিষ্ণু দে, 'সাহিত্যের সেকাল থেকে মার্কসীয় কাল')।

মার্কসবাদী নন এমন শিল্পসমালোচকও যখন ইতিহাসবোধ এড়ানো শিল্পসমালোচনাকে মনে করেন অনভিজ্ঞের অনধিকারচর্চা, বিষয়টি তখন স্বভাবতই দাবি করে বসে অধিকতর মনোযোগ। আর তেমন শিল্পসমালোচকের উদাহরণ চাইলে আমরা নির্দ্বিধায় বহু থেকে বেছে নিতে পারি বোদলেয়ার-কে। দেলাক্রোয়ার ঐতিহাসিক নবজন্ম ঘটানোর সূত্রেই শিল্প-

সমালোচক হিসেবে বোদলেয়ারের বিশ্ব-প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ঐ দিগন্ত-উন্মোচনকারী প্রবন্ধটি ছাড়াও শিল্পকলা বিষয়ে তাঁর রচনার সংখ্যা অজস্র। 'সিলেকটেড রাইটিংস অন আর্ট অ্যাণ্ড আর্টিস্ট' নামের সংকলনেই মোট ১৫টা প্রবন্ধের মধ্যে ৬টার বিষয় সাহিত্য, কবিতা, উপন্যাস আর সঙ্গীত, বাকি সব শিল্প। ঐ সংকলনের শেষ দীর্ঘ প্রবন্ধের নাম—'দা পেণ্টার অফ মডার্ন লাইফ'। ভূমিকা-পর্বে একগুচ্ছ ফ্যাশন-প্লেটের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মন্তব্য—

"The costumes, which many thoughtless people, the sort of people who are grave without true gravity, find highly amusing, have a double kind of charm, artistic and historical. They are very often beautiful and wittly drawn, but what to me is as least as important and what I am glad to find in all or nearly all of them, is the moral attitude and the aesthetic value of the time."

এইটুকু বলেই থামেন নি। অদৃশ্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে, অথবা আরো স্পষ্টভাবে, প্রতিপক্ষের 'থিয়োরি অব ইউনিক অ্যাণ্ড এ্যাবসলিউট বিউটি'-র বিরুদ্ধে খোলা তরবারির মতো উঁচিয়ে ধরছেন তাঁর চ্যালেঞ্জ—

"তথাকথিত আর্ট-হিস্টোরিয়ানরা যেমন খুশি চেঁচিয়ে মরুক, শিল্প যে দুটো বস্তুর যোগফল, তার ব্যতিক্রম প্রমাণ করার ক্ষমতা নেই কারো।"

বোদলেয়ারে সে দুটো বস্তুর স্বরূপ—

১। "an element that is external and invariable, though to determine how much of it there is extremely difficult."

২। "a relative circumstantial element, which we may like to call, successively or at one and the same time contemporaneity, fashion, morality, passion."

সৌন্দর্য-লক্ষণের এই দুই তটরেখার মাঝখান দিয়ে এগোতে এগোতে তিনি পৌঁছে যান আরও বড় এক মোহানার কাছে। শিল্পের অথবা শিল্পীর অন্তর্গত অমোঘ দ্বান্দ্বিকতার উৎসমুখও তিনি খুঁজে পান অতীতের শিল্পে, ধর্ম বনাম সমাজের টানাপোড়েনে। ধর্মীয় শিল্পে খুঁজে পান একই সঙ্গে শিল্পীর আত্মপ্রকাশের এবং আত্মগোপনের অভিপ্রায়, একই সঙ্গে অভ্যাসকে অনুসরণের অভ্যাস এবং অভ্যাস থেকে উত্তরণের আততি।

আসলে সময় বা ইতিহাসের কেন্দ্রে নিজের অবস্থিতি সম্পর্কে যে শিল্পী

সজাগ, তার শিল্পের আত্মায় অথবা শরীরে, ফর্মে অথবা কনটেন্টে, নির্মাণ বনাম সৃষ্টির কোনও সংকটাপন্ন মুহূর্তে ফুটে উঠবেই অনুচ্চারিত কিন্তু গর্জমান কোনো না কোনো প্রশ্নচিহ্ন। আর সে প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে আগ্রহী হলে শিল্প-সমালোচককেও দাঁড়াতে হবে ইতিহাসবোধের কঠিন-জটিল-প্রশ্নকাতর ডাঙায়।

আধুনিককালের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে-ধরনের কাজ বা কাজের পদ্ধতিকে বলে থাকি 'কমার্শিয়াল', সে-নিরিখে এল গ্রেকো 'কমার্শিয়াল আর্টিস্ট' অভিধার পক্ষে একান্তই উপযুক্ত, কারণ তাঁকে দিয়ে ছবি আঁকাতেন যাঁরা, তাঁরাই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দিতেন ছবির মূল বিষয়, কী কী থাকবে ছবিতে এবং সব মিলিয়ে ছবিটি ব্যক্ত করবে কোন বক্তব্য। অথচ এই এল গ্রেকো সম্বন্ধেই এখন সগর্বে উচ্চরিত হয় যে, তাঁরা এক একটি ছবি মানেই এক একটি ভয়ঙ্কর অন্তর্ভেদী প্রশ্ন।

তাকানো যাক একটা বিশেষ ছবির দিকে। ডন ফার্নান্দো নিনো ডে গুয়েভারা। ক্যাথলিক স্পেনের গ্রাণ্ড ইনকিউসিটর। রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের দক্ষিণ হস্ত। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে এবং ক্ষমতার দম্ভে মহাশক্তিমান এই মহান বিচারকের পূর্ণাবয়ব মূর্তিটি আঁকা যখন শেষ হল, সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ। হ্যাঁ, মহামান্য প্রধান বিচারপতির হুবহু প্রতিমূর্তিই বটে। সেই ধূর্ত এবং আমূলবিদ্ধ করা চাউনি, সেই জাঁকজমক, সেই কর্তৃত্বময় ভঙ্গি আর দু-জোড়া আপাত নিস্পৃহ চোখে বরফের মতো জমাট অভিযোগ।

অথচ এই আপাদমস্তক বাস্তব প্রতিমূর্তির মধ্যেই বিস্ময়কর নৈপুণ্যে এল গ্রেকো জুড়ে দিলেন তাঁর নিজস্ব সমালোচনা, নিঃশব্দ বিদ্রূপের মতো ধারালো। পরিণামে ডন ফারনান্দোর ঐ প্রতিমূর্তি একই সঙ্গে হয়ে উঠল তাঁর আকৃতির স্বরূপ এবং প্রকৃতির সংকট। এই 'Paradox' এল গ্রেকোর অধিকাংশ ছবিরই মহত্ত্বের মৌল-বীজ।

আলোচ্য ছবির কৃৎ-কৌশলের দিকে তাকানো যাক এবার। সমগ্র ছবিটিকে কৌশলে, রঙের বিন্যাসে, বিভক্ত করে দিয়েছেন দুভাগে। ডান দিকটায় ডন ফারনান্দোকে লোকে যে ভাবে দেখে। বাঁ দিকটায় ফারনান্দো নিজেকে যে ভাবে দেখেন। ডান দিকের ছড়ানো হাত প্রসন্ন, উদার, রমণীসুলভ রমনীয়তায় পেলব। বাঁ দিকের হাত ক্ষমতালোলুপ, তাই চেয়ারের হাতলটা জাপটে আছে লুব্ধ থাবায়। এরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ডান দিকের পোশাক পরিপাটি, বাঁ দিকের বিস্রস্ত বিশৃঙ্খল, ভাঁজে ভাঁজে বিকৃত মোচড়। আর নিবিড় অবলোকনে চোখে পড়বেই, দুই ঠোঁটের মাঝখানে যে মুখ-ভঙ্গি, সেখানে

বিস্ময়কর এক নিরাপত্তাহীনতার ছাপ। যেন বিপন্ন, যেন নিজের কৃতকর্মের বিরুদ্ধেই তাঁর নিষ্ঠুর অভিযোগ। ক্যাথলিক-দাপটের সেই স্বর্ণযুগে, দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের চরিত্র-চিত্রণে এল গ্রেকোর এই সমালোচক-সুলভ মনোভঙ্গির পিছনে আমরা কি অবশ্যই অনুমান করে নিতে পারি না সমসাময়িক সমাজেরই ছাইচাপা আগুনের প্রতিফলন? একটা নির্দিষ্ট শিল্পকে তার জন্ম-লগ্নের ইতিহাস-পটভূমি থেকে উপড়ে নিছক ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ লাগার সোচ্চার ঘোষণায় শিল্প-অনুভবের প্রগতি এবং প্রসারণ যে অসম্ভব, সেটা তর্কাতীত। আর এইখানেই দায়িত্ববান সমালোচনের কাঁধে চেপে বসে বাড়তি এক বড় দায়। অর্থাৎ তাঁর কার্যক্রম হয়ে দাঁড়ায় দু-দফা। এক, কোনো একটি নির্দিষ্ট শিল্প বা শিল্পকলার নির্দিষ্ট পর্ব-পর্বান্তর সম্পর্কে, প্রায় আগাছা-সাফাই-এর ভঙ্গিতে, এতাবৎ গড়ে-ওঠা যাবতীয় ভ্রান্ত সংস্কারের অপনোদন। দুই, আবার ঐ শিল্প অথবা ঐ শিল্প-অধ্যায় সম্পর্কে নতুন মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠা। শিল্পের ঐ মানুষটি মুণ্ডু ছাড়াই হাঁটতে চায় কেন অথবা ঐ মানুষটিকে মুণ্ডু ছাড়াই হাঁটাতে চেয়েছিলেন কেন রঁদা, তার উৎস-সন্ধানে সমকালীন ইতিহাস অন্বেষণ ছাড়া একজন শিল্প-সমালোচক যতখানি অনন্যোপায়, আবার ইতিহাসের সূত্র-সন্ধানে সার্থক হলে কতখানি সহজ হয়ে যায় জটিল জিজ্ঞাসার উন্মোচন, সিদ্ধার্থ রায়ের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে আমরা পেয়ে যাই তারও এক স্তম্ভিত দৃষ্টান্ত। তিনি জানান—

"স্পেনীয় শিল্পী আন্তোনিও সোওরা এক অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন আমাদের—মাদ্রিদে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় তিনি তাকিয়েছিলেন জানলা দিয়ে—সামনে ফুটপাথে এক পদযাত্রী চলমান। হঠাৎ মুহূর্তে ফেটে পড়ল একটা বোমা আর নিক্ষিপ্ত স্প্লিণ্টারের আঘাতে লহমায় উড়ে গেল পদযাত্রীর মুণ্ডু গলার কাছ থেকে; বিস্ফারিত চোখে সোওরা দেখলেন সেই মুণ্ডহীন, স্বাস্থ্যবান ধড় হেঁটে চলেছে সামনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই তো কত ভাস্কর্য পড়ে ছিল সারা ইউরোপ জুড়ে।"

পিকাসোর গের্নিকার দিকে তাকিয়ে একদল জার্মান সৈনিকের মুখে 'এটা কি তোমার তৈরি' প্রশ্নের উত্তরে পিকাসো জানিয়েছিলেন:

—না, এটা তোমাদের তৈরি।

ঠিক সেইভাবে আমরা কি এখন ভাবতে পারিনা যে বিরুদ্ধ পক্ষের মুখে ঐ জাতীয় প্রশ্ন উচ্চারিত হলে রঁদার উত্তরটাও হত প্রায় ঐ একই রকমের বিদ্রূপাত্মক?

অবশ্য মুণ্ডুহীনতার জন্যে রঁদাকে যে জীবনে কখনো অভিযুক্ত হতে হয়নি, সত্যি নয় সেটাও। তাঁর গড়া এক 'টরসো'-র নাম ছিল 'সাইক'। একই সঙ্গে 'ভিগরাস' আর 'সাপ্‌ল'। টরসো-র অর্থ দেহকাণ্ড। সেখানে হাত-পা-মাথা-মুণ্ডুর ঠাঁই নেই কোনো। সাইক-এর স্ফীতবক্ষ শরীরে ফুটন্ত জল অথবা জলন্ত আগুনের মতো জীবনস্পন্দ যেন। কোনো এক দর্শকের অশিক্ষিত চোখ শুধু ধড় দেখে বিরক্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে প্রশ্ন করেছিল রঁদাকে—

—কিন্তু মাথাটা গেল কোথায়!

রঁদার উত্তর

—দা হেড? ইট ইজ এভরিহোয়ার।

রঁদার এই উত্তর যেন ত্রিভুজের মতো নানা কোণওয়ালা। একবার মনে হয় যেন রঁদা তাঁর জিজ্ঞাসু দর্শককে উত্তর-সূত্র ধরিয়ে দিলেন দুভাবে। টরসোর সর্বাঙ্গে ফুলের মতো বিকাশোন্মুখ যে যৌবন অথবা প্রাণপ্রাচুর্য, অদৃশ্য মাথাটা লুকোনো আছে সেখানেই, টরসো-র বিস্ফোরক প্রাণশক্তিই নিজের দেহকাণ্ডে আত্মস্থ করে নিয়েছে মাথাটাকে। আবার অন্যভাবে যেন তিনি জানিয়ে দিলেন যে, মাথাটা নেই, সেটা অনুসন্ধানযোগ্য। আছে অথবা থাকতে পারে সর্বত্রই। সময়ের ভিতরে মানুষের বহু-বিভক্ত অবস্থান, সমাজের ভিতরে মানুষের সংগ্রাম-সংকট-সংগঠন ঘেঁটে ঘেঁটে ঐ দেহকাণ্ডের পক্ষে উপযুক্ত মাথাটিকে খুঁজে দেওয়ার দায়টা অতএব তাদেরই। আর এ থেকেই যেন জলস্তম্ভের মতো লাফিয়ে অন্য এক সত্য, শিল্পের অনুধাবনে সমাজ-পর্যবেক্ষণ, যা রঁদা-কথিত 'এভরিহোয়্যার', এক অপরিহার্য কার্যক্রম।

একজন মার্কসবাদী শিল্পসমালোচক এইখানেই চলতি হাওয়ার পন্থী না, পরিপন্থী। শুধু স্রোতের উত্তালতায় অথবা উৎক্ষেপে না মজে তিনি যেতে চান উৎস সন্ধানে। ডালপালার বিস্তার এবং ফুলের অজস্র-উৎসারিত বাহারও তাঁকে বিরত করতে পারে না শিকড়ের প্রতি অভিনিবেশে। ইতিপূর্বে সমাদৃত, সুতরাং উঁচুতে তুলতে হবে সমর্থনের হাত, এমন নিয়মে আস্থাহীনতাই তাঁর স্বতন্ত্র অনুসন্ধানের প্রাথমিক শর্ত! আর এরই ফলে, আমাদের অনেক আগে-জানা শক্ত-সমর্থ সিদ্ধান্তের উপরে আলো ফেলেন যখন তাঁরা, হঠাৎ দেখতে পাই সেগুলো অনেকটা বহুকাল আগে ক্ষয়ে-যাওয়া কালো ছোপের নড়বড়ে বিপজ্জনক দাঁতের মতোই। আবার এতদিন যাকে জানা ছিল অকিঞ্চিৎকর, তার গায়ে ফুটে ওঠে গহন কোনো প্রয়োজনের সাড়া।

শেলির একটা প্রেমের কবিতার প্রথম পংক্তি ছিল—

'একটি কথা বারে বারে সয়েছে নীরবতা'।

একেই একটু উল্টে-পাল্টে বলতে পারা যায়, পৃথিবীর ইতিহাসে একটি শিল্প-পর্বকে বারে বারেই সইতে হয়েছে সরব তিরস্কার। তার নাম রোমান্টিসিজম। মহাকবি গ্যেটের কাছেও জোটেনি সামান্যতম প্রশ্রয়। তিনি তো দ্বিধাহীন উচ্চারণে জানিয়ে দিয়েছিলেন একদা।"

'দা ক্লাসিকাল ইজ হেলথ; অ্যাণ্ড দা রোমান্টিক, ডিজিজ'। গ্যেটে যখন বলেছিলেন, জার্মান রোমান্টিসিজমের সঙ্গে লিপ্ত প্রগতি-বিরোধী সংকীর্ণতার শুদ্ধিতেই তখন হয়তো প্রয়োজন ছিল এই বিরুদ্ধাচরণের, প্রয়োজন ছিল হাওয়ার মুখকে ঘুরিয়ে দেওয়ার, ব্যক্তিগত বিষণ্ণতার শোক-গাথা থেকে ব্যক্তিসত্তার গভীরতর ধ্যানে। কিন্তু আজকের আমরা যদি 'রোমান্টিক' এই উচ্চারণের সঙ্গে বুঝে যাই যে এটা একটা নিন্দোক্তি মাত্র, এ বুঝি বায়ুভুক, উন্মার্গগামী, ছিন্ন-শিকড় এক শ্রেণীর শিল্পীর এবং কবির জীবন-বিদ্বেষী স্বেচ্ছাচার, তাহলে বুঝতে হবে, তার এই কিংবদন্তী-তুল্য মিথ্যা-পরিচয়ের পিছনে রয়েছে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটহীন ভ্রান্তি-নির্ভরতা। অথচ এমন নয় যে রোমান্টিসিজম এ-যুগে অনালোচিত। বরং সত্যি এর উল্টোটাই। বই-এর পর বই, গবেষণা, তদন্ত, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পাহাড়। অথচ কত দেরি হয়ে যায় তাকে সঠিক আলোয় চিনে নিতে। অথচ কত ঘুর পথে হেঁটে-হেঁটে ক্লান্তিতে ভেঙে অবশেষে জানতে পারি তার আগ্নেয় পরিচয়। রোমান্টিসিজম-এর আন্দোলন যে তার সমকালে একটা প্রচণ্ড প্রতিবাদ, প্রটেস্ট, 'প্যাসফেট অ্যাণ্ড কনট্রাডিকটরি প্রটেস্ট এগেনস্ট দা বুর্জোয়া ক্যাপিটালিস্ট ওয়ার্ল্ড, দা ওয়ার্ল্ড অফ 'লস্ট ইলিউশনস', এগেনস্ট দা হার্স প্রোজ অফ বিজনেস এ্যাণ্ড প্রফিট', তার সম্পর্কে এই সত্য-ভাষণে সংকোচের বিহ্বলতা যেন ঘুচবার নয় তথাকথিত এমনকি তথ্যনিষ্ঠ শিল্প-গবেষকদের ভূরি ভূরি রচনায়।

হুগ অনার তাঁর 'রোমান্টিসিজম'-এ থরে থরে সাজিয়ে দেন বেটোফেন, দেলাক্রোয়া, হাইনে, শ্লেগেল, উগো, শেলি, কিয়েৰ্কেগার্ড, অ্যাঙ্গ, ব্লেক, গোয়া প্রমুখের এমন সব উক্তি যা থেকে খুবই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে সমাজ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনেতা অথবা আধুনিক ভাষায় যাবতীয় প্রতিষ্ঠান বা প্রাতিষ্ঠানিক-বিগ্রহের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিমান, অভিযোগ, তিরস্কার আর সেই সঙ্গে ঝড়-বাতাসের বিরুদ্ধতা ঠেলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে একলা চলার স্পর্ধিত প্রতিজ্ঞা। এরই গায়ে গা লাগিয়ে থাকে আরও সব নতুন অগ্নিবস্ত অনুভব: আত্মত্যাগ, দারিদ্র্যকে স্বেচ্ছা-আলিঙ্গন, শূন্যতাকে চিরসখারূপে চিনে

নেওয়া, অসুখী জীবনকে ঈশ্বরের উপহার হিসেবে মান্য করা। হাইনে এই তালিকায় যোগ করে দেন আরও এক ব্যাপ্ত অনুষঙ্গ : শহিদত্ব।

"বাইরে থেকে কোনো শত্রুতার মুখোমুখি যদি নাও হতে হয়, প্রতিভাবানেরা নিজের ভিতরেই খুঁজে পাবে এমন শত্রু যা দুর্যোগ ডেকে আনবে নিজের অভ্যন্তরে। সেই কারণেই শ্রেষ্ঠ মানবের ইতিহাস আসলে এক চিরকালীন শহিদকাহিনী : যখন তারা বৃহৎ মানবসমাজের জন্যে বেদনাবিদ্ধ নয়, তখনও বেদনার্ত নিজেদের বৃহদত্বে, নিজেদের ব্যক্তিগত আচরণের বৃহদত্বে, ফিলিস্টিনিজমের বিরুদ্ধে ঘৃণায়, ভণ্ড জনসাধারণের মাঝখানে নিজেদের অস্বস্তিতে, চারপাশের পরিবেশে ছড়ানো নীচতায়, যা তাদের স্বভাবতই ঠেলে দেয় অসংযমে, অমিতাচারে…।" ব্যক্তিগত শহিদত্বের অন্তঃশীল অনুভব থেকে রোমান্টিকরা কীভাবে এবং কত সহজে নিজেদের সৃষ্টিসত্তার অঙ্গীভূত করে নিতে পারে সমাজের, এবং সাহিত্যেরও, বিপর্যস্ত, বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত, অনাদৃত, শৃঙ্খলিত প্রবল সব চরিত্রকে, তারও বিস্তৃত বিবরণ অনার-এর 'রোমান্টিসিজম'-এ। আমাদের জানা হয়ে যায় রোমান্টিকদের কাছে এইভাবেই আত্মীয়, তাদের সৃষ্টিতে এইভাবেই সমুজ্জ্বল প্রেরণা হয়ে ওঠে বন্দী কলম্বাস, পাগলা-গারদে নিক্ষিপ্ত তরকুয়াতো টাসো (যাকে নিয়ে দেলাক্রোয়া, গ্রানেট প্রমুখদের ছবি, গ্যেটে, শেলি, বায়রন প্রমুখদের কবিতা), ডন কুইক্সোট, হ্যামলেট, ওফেলিয়া।

কিন্তু এত সব তথ্য-সম্ভার সত্ত্বেও রোমান্টিজম ভরাট এক বেলুনের মতো ভেসে থাকে শূন্যে, শরীরহীন ছায়ামূর্তির মতো মনে হয় যেন। অনার তাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না কোনো দৃঢ়মূল তাত্ত্বিকতায়। আর তারই ফলে ব্যাখ্যাহীন, ব্যাখ্যার বিজ্ঞানহীন নিছক তথ্যসম্ভার অকর্ষিত মননে সহসা গজিয়ে তুলতে পারে এমন ধারণা যে, শিল্পসাহিত্যের যে-কোনো রকম ওলোটপালোট আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে, চাষাবাদের ক্ষেত্রে মান্য জমির যথাযোগ্য কর্ষণের মতো সচেতন প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই। এমন ধারণার সপক্ষে আমরাও তুলতে পারতাম সমর্থনের লম্বা হাত, যদি জানা থাকত যে পৃথিবীর আদিচিত্রকলাও স্থান-কাল এবং প্রয়োজন নিরপেক্ষ রূপে শিল্পীর নিজস্ব খেয়ালিপনারই নিছক এক প্রকাশ মাত্র। বস্তুত ঘটনাটা তার বিপরীত। আদি মানবের দৈনন্দিন জীবনযাপনের, আত্মরক্ষার, এবং শারীরিকভাবে টিঁকে থাকার এমন-কি একটা মানুষকে দলবদ্ধ সংগঠনে প্রাণিত করার এক সফল হাতিয়ার হিসেবেই আদিম শিল্পের ভূমিকা। মানুষের সামান্যতম

সৃষ্টি, এমনটি অনাসৃষ্টিও যে ব্যাপ্ত সমাজভূমির সঙ্গে তার নিজস্ব সামাজিক অবস্থানের দ্বান্দ্বিক বোঝাপড়ারই পরিণাম, এ সত্যে বিশ্বাস রাখলে রোমান্টিসিজমের মতো একটা বহু শ্রুত এবং বহু নিন্দিত আন্দোলনকেও আমরা চিনে নিতে পারি তার যথার্থ বৈপ্লবিক স্বরূপে। চিনে যাইও, যখন আনস্ট ফিসারের প্রাজ্ঞ উচ্চারণে শুনি—

"রোমান্টিসিজম হল প্রতিবাদের এক আবেগময় আন্দোলন, বিরুদ্ধাচারণের প্রতিবাদ, বুর্জোয়া-লালিত ধনতন্ত্রের পৃথিবী, 'লস্ট ইলিউশন'-এর পৃথিবীর বিরুদ্ধে, বিজনেস অ্যাণ্ড প্রফিটের কর্কশ গন্ধময় পৃথিবীর বিরুদ্ধে।"

তাঁর মুখ থেকেই আরো যে, রোমান্টিসিজম তার জন্ম-মুহূর্তে ছিল পাতি-বুর্জোয়ার বিদ্রোহ—"against the classicism of nobility, against rules and standard, against aristocratic form, against a content from which all 'common' issues were excluded For these romantic rebels there were no privileged themes : everything was a fit subject for art."

আবার একই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন এই আন্দোলনের স্ববিরোধিতা, প্রগতি-বিমুখতারও পরিচয়। জানিয়ে দেন নিজেদের হারানো আত্মপরিচয়ের সন্ধানে বেরিয়েই রোমান্টিসিজম কীভাবে আবিষ্কার করে হারানো লোকগীতি, লোকগাথা, লোকশিল্প; ব্যক্তিগত এবং যৌথ এই উভয় অস্তিত্বের সংকটকে একসূত্রে মেলাতে।

শিল্প-আলোচনায় মার্কসবাদীদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা এই ইতিহাস-চেরা ব্যাখ্যা-বিজ্ঞানের বাবদেই।

কবিতার ভাষ্য

শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত

বোদলেয়ারের সনেট 'লে শা'-এর পরিশ্রমী বিশ্লেষণে ক্লদ লেভি স্ট্রাউস ও রোমান জেকবসন, যাঁদের অধীত ক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক, একটি বিষয়ের দিকে বারবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। উভয়েই কবিতা ও পুরাণের মধ্যে সাদৃশ্য প্রমাণে প্রয়াসী। তাঁরা এই বিশ্লেষণের নাম দিয়েছেন মাইক্রোস্কোপি। প্রকৃতপক্ষে এটি গঠনভিত্তিক বিশ্লেষণের সার্থক দৃষ্টান্ত। ভূমিকায় দুই সমালোচক বলেছেন, 'ভাষাবিদের চোখে কাব্যের যে গঠনবৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়, জাতিতত্ত্ববিদ পুরাণের মধ্যে সেই গঠন-বৈশিষ্ট্যই দেখেন। জাতিতত্ত্ববিদ মাত্রই জানেন, পুরাণ শুধু কতগুলি ধারণার বিন্যাস নয়, তা এমনই শিল্পকৃতি যা শ্রোতার নান্দনিক অনুভব উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম। এটা কি হতে পারে যে দুটি বিষয় আসলে একই?'

একান্ত তত্ত্বনির্ভর এই বিশ্লেষণে কিছু স্ববিরোধ রয়েছে। সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুটি শ্রেণীর মধ্যে গঠনসাদৃশ্য প্রমাণ করতে গেলে এ ধরনের স্ববিরোধ অনিবার্য। আসলে পুরাণ নান্দনিক অনুভব সৃষ্টিতে সক্ষম, অতএব শিল্পপদবাচ্য—এই মূল ধারণাই ভ্রান্তির উৎস। পুরাণ তার প্রাকৃত অবস্থায় কখনও শিল্প নয়। কিন্তু আঙ্গিকে, কাহিনীসূত্রে, এমনকি প্রতীকী ব্যঞ্জনার প্রকাশ ও বিকাশে সে শিল্পের সহায়ক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইডিপাসের কাহিনী মানবমনীষার সীমাবদ্ধতার দ্যোতক। রবার্ট গ্রেভের মার্জিত কথনেও কিন্তু তা শিল্প হয়ে ওঠে নি। একমাত্র সোফোক্লেস যখন একে সাজিয়েছেন তাঁর অনন্য কাব্যপংক্তিতে, ইডিপাস

এক শাশ্বত ট্রাজেডি হয়ে উঠেছে, তার আগে নয়। কিন্তু সোফোক্লেসের ইডিপাস আবার পুরাণ নয়, ইডিপাস কাহিনী অবলম্বনে একটি ট্রাজেডি—এই এর চূড়ান্ত পরিচয়। এই ট্রাজেডি থেকে সঞ্জাত নান্দনিক অনুভব ও কাহিনীটি শোনার পর আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কিন্তু গুণগত পার্থক্য আছে। ইডিপাস-কাহিনী আমাদের বিচলিত করে, আমরা ঈডিপাসের জন্য দুঃখবোধ করি, ইডিপাসের নিয়তির পরিহাস আমাদের স্তব্ধ করে দেয়। কিন্তু আবার সেই বহু-ব্যবহৃত অথচ অনিবার্য শব্দটির কাছেই ফিরে বলতে হয়, ইডিপাসের কাহিনী শোনার সময় ক্যাথারসিসের কোনো স্বাদ পাই না আমরা।

কবিতা ও মিথের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ সত্য, কিন্তু উভয়ের জাত সম্পূর্ণ পৃথক। একটি অপরটির স্বত-অনুসারীও নয়। কবি লোককথা তথা পুরাণের নির্যাস নিয়ে তা থেকে নতুন কিছু রচনা করেন ও কবিতাকে পুরাণের অনুসারী করেন। সেক্ষেত্রে কবিতা ও পুরাণের বিশ্লেষণের মধ্যে সাদৃশ্যানুসন্ধানের কোনো প্রয়োজন নেই। পেত্রার্কের একটি সনেটের বিশ্লেষণ ও জুপিটারের লোক-সংস্কারের বিশ্লেষণের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য কী করে থাকতে পারে? একার্থক, সরল জুপিটার কাহিনী। পেত্রার্কের একাধিক ব্যঞ্জনায়, তাৎপর্যে জটিল। অতএব, দুটির মধ্যে সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাছাড়া পুরাণ-কাহিনী কোনো নান্দনিক অনুভবের জন্ম দেয় না। কবিতা-পুরাণের সম্পর্ক ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক। পুরাণের বাহুল্যবর্জিত কাহিনী-কাঠামো কবিতার অলংকরণ ও ভাষার প্রাচুর্যের বিপরীতধর্মী। দুয়ের সংঘর্ষে মূল কাঠামোটি পায় নান্দনিক নবরূপ।

এ দুয়ের সম্পর্ক ঐতিহাসিক, কেননা কবি প্রাচীন কল্পনা ও সংস্কারকে নিজের কাল ও পরিবেশের উপযোগী করেন। সার্তর-এর হেকুবা ইউরিপিদিস-এর হেকুবাই বটে, কিন্তু দুজন সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন সৃষ্টি ও চরিত্র। সার্তর-এর ট্রোজান উইমেন-এর অন্তিম নৈরাশ্য পসিডনের চূড়ান্ত ঘোষণার অস্তিত্ববাদী প্রতিক্রিয়া। আবার এই সার্তর বলেছেন, 'দ্বান্দ্বিক চিন্তা কী, লেভি স্ট্রাউস জানেন না। শুধু তাই নয়—জানার ক্ষমতাও তাঁর নেই। যিনি এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের সাদৃশ্যানু-সন্ধান করেন, তাঁর পক্ষে কখনও দ্বান্দ্বিক চিন্তা বোঝা সম্ভব নয়।'

এবার দুই সমালোচকের বিশ্লেষণরীতির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। লেভি-স্ট্রাউস ও জেকবসন কবিতার ভাষার বিভাজন ও পুনর্গঠন-প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করেছেন। কবিতার শব্দশরীর গড়ে তোলার যাবতীয় উপাদান—ছন্দ-পরিকল্পনা থেকে শুরু করে পদ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে একের সঙ্গে অপরের সাযুজ্য

ও বৈপরীত্য দেখিয়েছেন তাঁরা। শব্দার্থের দিকে তাঁদের মনোযোগ অপেক্ষাকৃত কম। মূলের এই পরিশ্রমী বিশ্লেষণ কিন্তু কেবল আঙ্গিকের স্তরে সীমাবদ্ধ, যেন আঙ্গিকই কবিতার একমাত্র বিচার্য। রবার্ট হ্বাইমান যথার্থ বলেছেন,

'এই সমালোচকদ্বয় গঠনরীতির সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্কস্থাপনে যে অক্ষম, এমন নয়। "এল"-এর আগে "আর"-এর বিলুপ্তি যে বাস্তবের বেড়ালকে অলৌকিক ও রহস্যময় করে তুলছে, এই উপলব্ধি তাঁদের ক্ষমতার পরিচায়ক। অথচ তাঁরা গঠনের বা আঙ্গিকের সার্বভৌমত্ব প্রমাণ করার খাতিরে কিছুতেই শব্দের সঙ্গে অর্থের সাযুজ্য খুঁজবেন না। গূঢ় অর্থ বিশ্লেষণে তাঁদের এই অনাগ্রহের প্রমাণ বিষয় বা অর্থ নিয়ে তাঁদের দ্বিধা। ঈর্ষণীয়ভাবে নিখুঁত ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের মাঝে মাঝেই এসেছে দ্বিধাজড়িত প্রশ্ন, সংশয়, যেমন, 'তার অর্থ কি এই যে, নিজেদের বাড়ি নিয়ে গর্বিত এই বিড়ালরা গর্বের মূর্ত প্রতীক? অথবা বাড়িটিই তার বিড়াল বাসিন্দাদের গর্বে গর্বিত হয়ে ইরেবাসের মতো তাদের পোষ মানাতে চায়?'. সমালোচকদের এই সংশয়িত প্রশ্ন থেকে বোদলেয়ারের প্রকৃত রহস্য কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক। বোদলেয়ারের বিড়াল নারীসুলভ কমনীয়তা ও অতিপৌরুষের সহাবস্থানের প্রতীক, তবে কোথাও কোথাও অতি গভীর অর্থোপলব্ধি পাঠককে চমৎকৃত ও সন্তুষ্ট করে, যেমন, সম্পূর্ণ মেয়েলি একটি বিষয়ের জন্য পুরুষোচিত ছন্দের স্ববিরোধী নির্বাচন।' কিন্তু পাঠকের প্রত্যাশা আরও বেশি। চোমস্কির মন্তব্য স্মরণ করে বলতে হয়, পাঠক চান লেভি স্ট্রাউস ও জেকবসনের উচ্চারণ ও ব্যাকরণ ভিত্তিক বহির্গঠনের বিশ্লেষণ অর্থের আন্তর গঠনকেও উদ্ভাসিত করুক। দুটির চলার কথা সমান্তরালে। কিন্তু তা না হওয়ায় কবিতাটির দীর্ঘ প্রশস্তি শুধু ভাষার কারাকক্ষে বন্দী। অথচ মজার কথা এই যে, অতিমনোযোগপ্রাপ্ত এই ভাষাকাঠামো কিন্তু ভালেরির আত্মভূক সর্পের মতোই নিজেই একটি নতুন বিষয় হয়ে যায়। এবং একথা মনে করা ভুল হবে না যে, বহিরঙ্গ বিশ্লেষণকে বিষয়-বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত জেকবসন কাব্য ও ভাষাতত্ত্বের উপর একটি বিবৃতিতে বলেন, 'শুধু বার্তাটির দিকে লক্ষ্য রাখা ভাষার কাব্যিক কাজ।' নব-সমালোচনার অগ্রদূত নরথপ এরি, যিনি এতটা নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন যে 'ঐতিহ্য' কথাটি পর্যন্ত সমর্থন করতেন না, তা বর্তমানের থেকে অতীতকে পৃথক করে বলে, শেষ পর্যন্ত একটি বইয়ে আদর্শবাদ, স্বপ্নবিলাস, বৈপ্লবিক সচেতনতাকে মূল্য দিয়েছেন।

পুরোপুরি রচনা-কেন্দ্রিক এই বিশ্লেষণের গুরুত্ব কম নয়। তবে অর্থ থেকে এর যথেচ্ছ বিযোজন নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা

বোঝা যায় সার্ত্র-এর বোদলেয়ারের মূল্যায়ন পড়লে, যা প্রধানত মনস্তাত্ত্বিক। মাইকেল বিউটরের প্রধানত জীবনীভিত্তিক ব্যাখ্যা ও ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের ইতিহাসভিত্তিক বিশ্লেষণও নিহিত ভাবনা ও তার মাত্রার উপর জোর দিয়েছে।

গঠনভিত্তিক সমালোচনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে সংশোধন করেন লুসিয়েন গোল্ডমান। গোল্ডমান ব্যাকরণ ও শব্দের বিশ্লেষণের যাথার্থ স্বীকার করেছেন, আবার আঙ্গিকের সঙ্গে সমকালীন ইতিহাস ও শিল্পীর জীবনবোধের সমন্বয় অন্বেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে তিনি ঐ পদ্ধতি প্রয়োগ করেননি বটে, কিন্তু তাঁর পদ্ধতি যে কোনো বড় কবির সৃষ্টির রসগ্রহণের সহায়ক। সমালোচনার ঐতিহ্যমণ্ডিত বিন্যাসের ধারা ভেঙে তিনি প্রথম কবি ও তাঁর সমাজের মধ্যে কালানুবর্তী সম্পর্ক স্থাপন করেন। কবি একটি শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর কবিতায় সমকালীন সমাজের সংঘাত ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণীরূপ দেন। তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে উচ্চারিত থাকে সমকাল ও স্বীয় শ্রেণীসম্পর্কে সর্বাধিক সচেতনতা। ফলে তাঁর বোধ ও সমাজের গঠন-প্রকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য থেকেই যায়। অবশ্য একথা সত্যি যে এধরনের সাদৃশ্য খুব বিশদ ব্যাখ্যা না করলে ছাপমারা হয়ে যায়, অসঙ্গতি ধরা পড়ে। কিন্তু সে ত্রুটি অমনোযোগী সমালোচকের, মতবাদের নয়।

গঠনভিত্তিক সমালোচনার বৈশিষ্ট্যই হল, তা বিষয়ের সরল অনুকরণে আগ্রহী নয়, তার আগ্রহ ভাষার গঠনের বৈচিত্র্যে। গোল্ডমান নিজেও অনেকসময় সরলীকরণের শিকার হয়েছেন।

গোল্ডমানের আর একটি সংযোজন প্রচলিত খণ্ড সমালোচনার ধারা থেকে সরে আসার চেষ্টা। কবির বোধ তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতেই পরিব্যাপ্ত—অতএব, একটি গীতিকবিতাকে তাঁর সৃজন-প্রক্রিয়ার সামগ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। অর্থাৎ লেভি স্ট্রাউসের মতো গোল্ডমান মূল কবিতার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তিনি সেটিকে ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন, যা স্ট্রাউস করেন নি। এই সংযোগ দ্বান্দ্বিক—ফলে আবার তৈরি হয়েছে সেই নান্দনিক সংশ্লেষ যা কবির সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে একটি সম্ভাব্য চেতনার রূপ পায়। একদিকে কবিতাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তার অলংকরণের প্রাচুর্যে-বর্ণে, শব্দে, ধ্বনিতে, বাস্তব চরিত্রে। অপরদিকে রয়েছে এক সামগ্রিক বোধ যাতে কিছু বস্তুর অস্তিত্বকে মূল্য দেওয়া হয়েছে, স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে গঠনভিত্তিক চিন্তাধারায় গোল্ডমানের অবদানকে প্রাহা ভাষাতত্ত্বে ইয়ান মুকারভস্কির ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

এই ধারার প্রাথমিক ভ্রান্তি—শব্দের ধ্বনিকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দেবার প্রবণতা মুকারভস্কি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। অন্য একটি ভ্রান্তিরও তিনি শিকার হননি, তিনি সাহিত্যকে রচনার বহিরঙ্গের সঙ্গে একাত্ম করেন নি।

স্বীকৃতভাবে নান্দনিক ও অ-নান্দনিকের মধ্যে কোনো অনপনেয় ব্যবধান নেই—এই ধারণাকে ভিত্তি করে মুকারভস্কি তাঁর কাজ শুরু করেন। সৃজন-প্রক্রিয়ায় অ-নান্দনিকের বিষয় নান্দনিকের উপাদান হয়। তখনই সাধারণ ভাষার ব্যাকরণ পায় প্রকৃত নান্দনিকের বৈশিষ্ট্য যা আবার ভাষার গঠনের বিবর্তন না জানলে সম্ভব নয়। ভাষা থেকে নান্দনিক প্রকাশকে স্বতন্ত্র করে তার কাব্যিক গঠন, আর তাই তার স্বাধীনতাও অনেক বেশি। কিন্তু এই কাব্যিক গঠনের সঙ্গে তার সংযোগধর্মিতার কোনো বিরোধ নেই। বরং এই দুয়ের মধ্যে স্থাপিত হয় একধরনের দ্বান্দ্বিক ঐক্য যা কবিতার semiotic চরিত্র তৈরি করে। কাব্যভাষা বা শিল্পকর্মের বহিরঙ্গ উচ্চারিত শব্দকে অনুভবস্পর্শী হতে সাহায্য করে এবং এই অনুভবের স্তরই পাঠককে কবিতা ও তত্ত্বকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। শিল্পকর্মের দুটি অর্থের একটি স্বতন্ত্র, আরেকটি সংযোগনির্ভর। শিল্পকর্মের সমগ্র কাঠামো অর্থের বাহকের কাজ করে ও সঙ্গে সঙ্গে সংযোগের দায়িত্বও পালন করে থাকে। অতএব কবিতার তাৎপর্য তার বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, তার বিশিষ্ট আঙ্গিক সেই অনন্য তাৎপর্যের বাহক যা ঐ অর্থে একটি বিশেষ দ্যোতনা আনে। নীটশের কথায়, সেই 'সূক্ষ্ম প্রাচুর্য' কবিতার সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য। ফলে 'the time is out of joint'-এর মতো সরল বাক্যের শেষ তিনটি শব্দে নিহিত রূপকার্থ উক্তিটিকে অনেক বেশি ব্যাপক করে দেয়।

লক্ষণীয় লেভি স্ট্রাউস ও জেকবসন, এবং মুকারভস্কি ও গোল্ডমান প্রত্যেকেই শব্দকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কবিতার রসগ্রহণে অনুপ্রেরণা, বিষয়বস্তু, কবির আবেগ বা অন্তর্নিহিত কোনো তাৎপর্যকে তাঁরা কেন্দ্রীয় বলে মনে করেন না। কিন্তু শব্দ বা চিহ্ন আসলে কী? এর ভূমিকা কি কেবল উচ্চারণমুখী ও বর্ণনামুখী না একই সঙ্গে সে ভাববাহী ও অনুভবস্পর্শী? মালার্মে যখন বলেছিলেন কবিতা শব্দ দিয়ে তৈরি, চিন্তা দিয়ে নয়, তখন শব্দ আর চিন্তার এই স্পষ্ট পৃথগ্‌করণ কি যথার্থ ছিল?

'শব্দের' তাৎপর্য নিয়ে এই বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছিলেন ইতালির মার্কসবাদী সমালোচক গ্যালভানো দেলা ভলপে। তাঁর যুক্তিবাদী কাব্যতত্ত্বের ভিত্তি ফের্দিনা দ্য সোস্যুর-এর তত্ত্ব। সোস্যুর-এর মতে ভাষার ক্ষেত্রে চিন্তা

থেকে শব্দ বা শব্দ থেকে চিন্তাকে কখনও পৃথক করা যায় না। এই ধারণাকে ভলপে চিত্রকল্পের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছিলেন ও বলেছিলেন, শব্দ চিত্রকল্পের মাধ্যম এবং চিত্রকল্প অবধারিত ভাবে কোনো ধারণাকে মূর্ত করে। এই মতটিকে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি দান্তে থেকে মনতাল পর্যন্ত বিভিন্ন চিত্রকল্প বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। উপসংহারে তিনি বলেন, কোনো চিত্রকল্প তখনই আরও বেশি ইঙ্গিতময়, আরও বেশি রূপকল্প হয়ে ওঠে, যখন তা অর্থে সমৃদ্ধ হয়। সংক্ষেপে তাৎপর্য মণ্ডিত রূপকল্পই কাব্যিক হয়ে ওঠে।

অতএব শব্দ এবং অর্থ, রূপকল্প এবং ভাবের মধ্যে কোনো ছায়া আড়াল সৃষ্টি করছে না। ভাষাচিহ্নের এই জটিলতা অবশ্য গদ্য ও তাত্ত্বিক আলোচনাতেও রয়েছে। এবার প্রশ্ন, তাহলে কবিতা ও তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? অবশ্যই ভাষার এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যে নয়। দেলা ভলপের মতে, কাব্য তার নিহিত অর্থের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য পায়, এই আভাসধর্মিতা রচনাশৈলীর অঙ্গ— একে বলা চলে আঙ্গিক প্রাসঙ্গিক চরিত্র। অপরদিকে বিশ্লেষণীগদ্যের প্রকৃতি পুরোপুরি শব্দনির্ভর। অকাব্যিক রচনার একার্থক ভাষার পরিবর্তে কবিতায় সচেতনভাবে ব্যবহৃত হয় বাহুব্যঞ্জনাময় শব্দ। ব্যঞ্জনাময় শব্দের আঙ্গিক প্রাসঙ্গিকতা বা তাৎপর্যভিত্তিক বিন্যাস বলতে দেলা ভলপে বুঝিয়েছেন নির্দিষ্ট কথনভঙ্গি ও শব্দবিন্যাসের কথা। এই ভঙ্গি বা বিন্যাস অপরিবর্তনীয়। উদাহরণ স্বরূপ, ম্যাকবেথের সেই বিখ্যাত উক্তিটি নেওয়া যেতে পারে, 'If it were done when 'tis done, then 't were well/If were done quickly (প্রথম অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য)। শব্দগুলি অতি সরল, বিন্যাসও আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ, কিন্তু শব্দগুলো একটুও অন্যভাবে সাজালে বা কোনো একটা শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ বসালে পুনরাবৃত্তি-প্রসূত উত্তেজনার বোধ সঞ্চারিত করা সম্ভব হত না। তাছাড়া এই বাক্যবন্ধে প্রোথিত রয়েছে ম্যাকবেথের দ্বন্দ্ব, সংশয় এবং সেই কারণেই অপরাধ যত শীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করার তাড়না। সবচেয়ে বড় কথা, 'done' ও 'if' কথাটির পৌনঃপুনিক অভিঘাতে জিঘাংসা ও ধর্মভীরুতার মধ্যে খণ্ডিত এক ব্যক্তিত্বের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত।

সমালোচকের কাজ কবিতার এই ব্যঞ্জনার স্তর উন্মোচন করা। তিনি দেখাবেন 'সেই অতিরিক্ত অর্থপ্রাচুর্য যা কবিতার নির্দিষ্ট প্রসঙ্গের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত।' বস্তুত কাব্যে তত্ত্ব বা চিন্তা ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা বলতে এটাই বোঝায়।

সাধারণ আক্ষরিক গদ্যকে ব্যঞ্জনাময় কাব্যভাষায় যা উত্তীর্ণ করে তা

শিল্পনৈপুণ্য। অতএব 'ব্যক্তির সৃজনশীল অনুপ্রেরণা', প্রভৃতি কথা অর্থহীন, বিভ্রান্তিকর। দেলা ভলপের 'যুক্তিবাদী—কাব্যতত্ত্বের' এই হল মূল বক্তব্য।

চোমস্কির ভাষাতেই আবার বলা যাক, ভলপে উচ্চারণ ও ব্যাকরণানুগ বহিরঙ্গকে অন্তর তাৎপর্যের বাহক হিসাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

মালার্মের বক্তব্য তাই আংশিক সত্যমাত্র। তিনি শুধু এটুকু বলতে পারতেন, 'কবিতা শব্দ দিয়ে তৈরি'! কিন্তু শব্দ ও চিন্তার মধ্যে কোনো কাল্পনিক দেয়াল গড়ে তোলার চেষ্টা অযৌক্তিক। তাঁর নিজেরই অবিস্মরণীয়, সম্ভবত শ্রেষ্ঠ পংক্তি 'gloir du long desir, Idees' এত ধ্বনিময়, দৃশ্যময় হত না, যদি তাকে তার নিহিত প্লেটনিক চিন্তার সঙ্গে একাত্ম করা না যেত। শুধু অস্পষ্ট 'চিন্তার সৌন্দর্য' ও 'কামনার দীর্ঘস্থায়িত্ব' নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হত। কবি যে ঘনীভবনের জন্য হয়ত সামনে সাদাপাতা নিয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষা করেছিলেন, এমন অনন্য শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যার বর্ণে ধ্বনিতে রয়েছে সংকেত, যার ব্যাকরণ ও গঠনে বিধৃত রয়েছে গূঢ় ব্যঞ্জনা, আমরা পেতাম না।

মার্কসবাদ ও চলচ্চিত্র

হিমাচল চক্রবর্তী

তিন-এর দশকের গোড়ায় 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন' এবং 'মাদার' দেখে একজন জার্মান সমালোচক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন—'এতদিন জানতাম পুব দিক থেকে আলো আসে, এখন দেখছি চলচ্চিত্র শিল্পটি ঐদিক থেকেই আসছে—আজ একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় রুশ ছবিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ।' এই উচ্ছ্বাস অকারণ নয়। গ্রিফিথ গতিমান বিষয়কে চলচ্চিত্রের ভাষায় রূপায়িত করার প্রাথমিক ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, কিন্তু আইজেনস্টাইন, পুদোভকিন আর দোভঝেঙ্কো সেই ভাষায় আনলেন ব্যাপ্তি, এঁদের হাতে, মঁতাজের কৌশলে, চলচ্চিত্র-ভাষা পেল নিজস্ব গতি। এ জন্যই পোটেমকিন দেখে 'ইউনাইটেড আর্টিস্ট'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস-এর মনে হয়েছিল, আইজেনস্টাইন 'গতির বিজ্ঞান' আয়ত্ত করেছেন। চলচ্চিত্র জগতে মঁতাজ-পদ্ধতির প্রভাব সঙ্গে সঙ্গে অনুভূত হয়েছে, আজও এটি এই ভাষার আবশ্যকীয় অঙ্গ। 'পোটেমকিন' ও 'মাদার'-এর প্রথম প্রদর্শনের তিন-চার বছর পর আমেরিকায় লিউইস মাইলস্টোন এরিখ মারিয়া রেমার্কের অবিস্মরণীয় উপন্যাস 'অল কোয়ায়েট ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' নিয়ে একটি ছবি করলেন। ১৯৩০ সালে ছবিটি রিলিজ হয়; সে সময়ে পোস্টারে লেখা হয়েছিল 'এই ছবি সোভিয়েত চলচ্চিত্রের নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্মিত।'

এসব এখন অনেকেই জানেন। চলচ্চিত্রের ভাষা নির্মাণে প্রথম যুগের সোভিয়েত শিল্পীদের অবদান নিয়ে আলোচনাও হয়েছে অনেক। কিন্তু প্রায় সর্বদাই একটি প্রশ্ন উপেক্ষিত থেকেছে—বিপ্লবের পর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে

ঐতিহ্যহীন রুশ চলচ্চিত্রে এই অদ্ভুত বিকাশ সম্ভব হল কী করে? সমসাময়িক একজন ইংরেজ লেখকের মনে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। 'পোটেমকিন' এবং 'মাদার' দেখে তিনি লিখেছিলেন—'এক যুগ ধরে অন্য দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারা যে-সব জটিল প্রশ্নের সমাধান করতে পারেন নি বিপ্লবের পর কয়েক বছরের মধ্যে রুশ পরিচালকরা তা করলেন কী ভাবে?' তিনি ভেবেছিলেন বিষয়বস্তুর 'মানবতা'-র জন্যই এই কাজ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু 'মানবতা'-র ধারণা অত্যন্ত অস্বচ্ছ, আর সেজন্য মানবতাই কারণ বললে উত্তর নির্দিষ্ট হয় না।

প্রকৃত কারণের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন 'পোটেমকিন'-এর রচয়িতা নিজেই, ছবিটি প্রথম প্রদর্শনের আট বছর পরে লেখা একটি সংক্ষিপ্ত 'অটোবায়োগ্রাফিক্যাল নোট'-এ। তিনি লিখেছেন, রুশ বিপ্লব তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল 'a matter of blood and bones and innermost conviction'। আর তারই প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর কাজে, অস্ত্রোভস্কির নাটকের বিমূর্ত এবং এলোমেলো উপস্থাপনা থেকে 'পোটেমকিন'-এ উত্তরণ এর ফলেই সম্ভব হয়েছে। এক কথায়, প্রথম যুগের সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্পীদের ভাষার গতি, বিষয়ের গতিশীলতা, অর্থাৎ বিপ্লবের গতিশীলতার ফল।

১৯২০-এর দশকের প্রথম দিকে অন্যান্য দেশে যে-সব উল্লেখযোগ্য ছবি তৈরি হয়েছে সেগুলির বিষয়বস্তুর সঙ্গে আইজেনস্টাইন বা পুদোভকিনের ছবির বিষয়-বস্তুর তুলনা করলে এই বক্তব্যের তাৎপর্য ধরা পড়ে। গ্রিফিথের সব ছবির রচনাকাল ১৯০৯ থেকে ১৯২৪। এর মধ্যে দুটি বিশিষ্ট ছবি 'দ্য বার্থ অব এ নেশন' ১৯১৫ সালে এবং 'ইনটলারেন্স' ১৯১৬ সালে তোলা। প্রথম ছবিটির বিষয়বস্তু নিগ্রো সমস্যা এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের বিরোধ; পরিচালকের দৃষ্টিকোণ নিগ্রোবিরোধী, তাঁর সমর্থন দক্ষিণের প্রতি। দ্বিতীয় ছবিটি অসহনশীল মানসিকতা নিয়ে—পরিচালক দেখাতে চেয়েছেন অসহনশীলতা কী ভাবে ক্ষতিকর এবং মানবসমাজের পক্ষে ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। ১৯২০-২১ সালে তোলা ফ্ল্যাহার্টির 'নানুক অব দ্য নর্থ' একটি অসাধারণ ছবি: এস্কিমোদের জীবন নিয়ে এটি একটি তথ্যচিত্র, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম, এর বিষয়বস্তু। একই সময়ে তোলা রবার্ট ওয়েনের ডঃ কালিগরি (১৯২০) অসুস্থ মানসিকতার আর অসহায়তার শিল্পরূপ, ফ্রিৎজ ল্যাঙের ডেসটিনি (১৯২১) বা ডঃ ম্যাভিউজ (১৯২২)-ও তাই।

এই সময়ে সোভিয়েত চলচ্চিত্রে ত্রয়ী-র ছবি নিয়ে এল নতুন জীবন, নতুন সংগ্রামের কথা। আইজেনস্টাইনের স্ট্রাইক (১৯২৪)-এর বিষয় শ্রেণীসংগ্রাম।

পরের বছর আইজেনস্টাইন পোটেমকিন জাহাজে ১৯০৫ সালের বিদ্রোহের কাহিনীকে পুনর্নির্মাণ করলেন বিপ্লবের ডায়ালেকটিকসকে শিল্পরূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। পুদোভকিন-এর 'মাদার' বিপ্লবের গাথায় ব্যক্তির জীবনও সংগ্রামকে তুলে ধরল ; আর দোভঝেঙ্কো 'আর্সেন্যাল'-এর পটভূমি হিসেবে বেছে নিলেন গৃহযুদ্ধ। এই সম্পূর্ণ নতুন বিষয়বস্তু বা কনটেন্টের শিল্পরূপ এঁদের নতুন করে খুঁজতে হয়েছে; যেমন খুঁজতে হয়েছে মায়াকোভোস্কিকে কবিতায়। ১৯১৯ সালে লেনিনের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত ডিক্রির ফলে চলচ্চিত্র-শিল্পে ব্যক্তিগত পুঁজির অবসান পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ করে দিয়েছিল। রোজার মভেল-এর ভাষায়,

> Here at last was a country which put the film first and the box-office afterwards, and encouraged its brilliant directors to experiment at the state expense whether they made mistakes or not.

শিল্পকলার রূপ-বিন্যাসের উপর সমাজ-বিপ্লবের প্রভাব নতুন নয়, বিটোভেনের শিল্পের উপর ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব নিয়ে অনেকে আলোচনা করেছেন। বিটোভেনকেও ফরাসি বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে গিয়ে ফর্ম তৈরি করতে হয়েছে। আইনজেনস্টাইন, পুদোভকিনকেও তাই করতে হয়েছে। এবং এই কাজ করতে গিয়ে এঁরা মার্কসীয় গতির বিজ্ঞান ডায়ালেকটিক্সকে সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। আইজেনস্টাইনের বহু-পরিচিত 'এ ডায়ালেকটিক্যাল এ্যাপ্রোচ টু ফিল্ম ফর্ম', 'নোটস অব এ ফিল্ম ডাইরেকটার'-এর অন্তর্ভুক্ত পোটেমকিন-এর গঠনরীতি বিষয়ে প্রবন্ধ, কিংবা পুদোভকিন-এর 'ফিল্ম টেকনিক' (আইজেনস্টাইন ও পুদোভকিন-এর মধ্যে প্রয়োগরীতি নিয়ে মতপার্থক্য সত্ত্বেও) চলচ্চিত্র-মাধ্যমে ডায়ালেকটিকসের সচেতন ব্যবহার নিয়ে ভাবনা-চিন্তার নিদর্শন। অবশ্যই তাত্ত্বিক আইজেনস্টাইন ছিলেন এ-বিষয়ে অগ্রণী। তাঁর কাছে শিল্পের অর্থই রূপ নির্মাণে 'ডায়ালেকটিক সিস্টেম'-এর (যা চেতনায় বস্তুজগতের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার পুনর্নির্মিত) অভিক্ষেপ (প্রোজেকশান)। ফেয়ারব্যাঙ্কস যাকে মঁতাজের 'গতির-বিজ্ঞান' বলেছিলেন আসলে তা মার্কসীয় ডায়ালেকটিকসবিজ্ঞান। চলচ্চিত্রের কাঁচামাল শটকে পাশাপাশি সাজালে 'কনফ্লিক্ট' দ্বন্দ্বের ফলে তা কীভাবে গতিশীল হয়ে ওঠে 'স্ট্রাইক', 'পোটেমকিন', 'অক্টোবর', 'ক্যু ও ভিভা মেক্সিকো', 'ওল্ড এণ্ড দ্য নিউ', 'ইভান দ্য টেরিবল' প্রভৃতি ছবি তার উদাহরণ। দ্বন্দ্বের সম্পর্ক নানানভাবে সৃষ্ট হয়েছে, যেমন রেখাগত অবস্থানে, বিভিন্ন তলের পারস্পরিক সম্পর্কে, রঙের বিন্যাসে,

আলো-ছায়ায়, ক্যামেরার অবস্থানের তারতম্যে, বিপরীত গতির সান্নিধ্যে, কিংবা সমগ্র ছবির গঠন বিন্যাসে। ফর্ম-এ ডায়ালেকটিকসের ব্যবহার বিষয়বস্তু ও ফর্মের মধ্যে নতুন ঐক্য রচনা করেছে ; যা শিল্প সৌন্দর্যের মূলকথা।

পশ্চিমের চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকেরা আইজেনস্টাইন, পুদোভকিন, দোভ্‌সেঙ্কো প্রবর্তিত রুশ চলচ্চিত্রের শিল্পধারাকে ফর্মালিস্ট বা রাশিয়ান ফর্মালিজম আখ্যা দেন। বিশেষ করে 'তত্ত্ববিদ পণ্ডিত' আইজেনস্টাইনকে নয়া-কাণ্টবাদী লুগো. মুনশটারবার্গ বা রুডোল্যাং আর্নহাইমের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে চলচ্চিত্রে ফর্মালিজম সম্পর্কে আলোচনার রেওয়াজ আছে। আইজেনস্টাইন 'great esthete' (ত্রুফো) এবং আইজেনস্টাইনের ছবি, বিশেষ করে ইভান দ্য টেরিবল 'possibly the supreme formalist film of all time.' (P. Hourston)। শিল্পতত্ত্বে ফর্মালিজম এ্যাবসট্রাকট সৌন্দর্য সৃষ্টিকে শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করে। এই তত্ত্বে শিল্পের 'এসথেটিক ফাংশনই' মূল কথা, এবং সেজন্য ফর্ম বা রূপই মুখ্য, বিষয়বস্তু গৌণ। শিল্পতত্ত্বে এই ভাববাদী তত্ত্বের আদিস্রষ্টা অ্যারিস্টটল। সৌন্দর্য সৃষ্টিতে কনটেণ্ট এবং ফর্মের যুগপৎ ভূমিকা এবং দুই-এর মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে ভ্রান্ত ধারনাই ফর্মালিজমের উৎস।

মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বে কনটেণ্ট এবং ফর্ম সমান গুরুত্বপূর্ণ। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক ঐক্যের—অর্থাৎ একটিকে অপরটি থেকে বিশ্লিষ্ট করা যায় না। কনটেণ্ট বস্তু জগতের অর্থময় প্রকাশ ; শিল্পীর নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সাবজেক্ট বা বস্তুজগৎ—সমাজ সম্পর্ক ও বিভিন্ন ঘটনা—শিল্পের কনটেণ্ট হয়ে ওঠে। এজন্যই একই মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর কাজে ভিন্ন ভিন্ন কনটেণ্টের চেহারা নেয়। ফলে শিল্পের কনটেণ্টের অর্থ কী উপস্থিত করা হল তাই নয়, কী ভাবে উপস্থিত করা হল তাও—এই কীভাবে উপস্থিত হল, ফর্মেরও মূল কথা। আইজেনস্টাইন বা পুদোভকিন ফর্ম নিয়ে বিশেষ করে ভেবেছেন এজন্য যে তাঁরা শ্রেণীসংগ্রামকে বা সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর প্রক্রিয়াকে তাঁদের বিষয় করেছেন। ১৯৩৩ সালে নাৎসি পার্টির একটি সভায় গোয়েব্‌ল্‌স পোটেমকিন-এর মতো ছবি তৈরি করার জন্য জার্মান চলচ্চিত্র শিল্পীদের আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু ফ্যাশিস্তদের পক্ষে দ্বিতীয় পোটেমকিন রচনা সম্ভব হয়নি, কারণ পোটেমকিন-এর আসল বৈশিষ্ট্য মঁতাজ বা ভাষা নয়, আসল বৈশিষ্ট্য আদর্শগত কনটেণ্ট ভাষাশৈলীর মাধ্যমে যা রূপ পেয়েছে। আর এই কনটেণ্টের জন্যই তো জার্মান সরকার 'পোটেমকিন' দেখানো নিষিদ্ধ করেছিল, এমনকি 'পোটেমকিন'-এর বিরুদ্ধে মামলাও

করেছিল। 'পোটেমকিন'-এর কনটেন্টের চরিত্র সরকারি অভিযোগে স্পষ্ট —'যদিও এই ছবিটি ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে তোলা, এতে যুদ্ধের দৃশ্য এমন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যার উদ্দেশ্য কীভাবে জনসাধারণ রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিতে পারে তা দেখানো।...এই ছবিতে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ চিত্রায়িত করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রশক্তির ও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংসের মানসিকতা সৃষ্টির পদ্ধতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।' উল্লেখযোগ্য যে, জার্মান শ্রমিকশ্রেণী এবং সাধারণ মানুষ ঐ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং 'পোটেমকিন' দেখার অধিকার দাবি করে রাস্তায় মিছিল বের হয়; যার ফলে জার্মান সরকার যুবকদের এবং সৈন্যবাহিনীর কর্মীদের ছাড়া অন্যদের জন্য 'পোটেমকিন' দেখানোর অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। একবছর পর যখন জার্মানিতে 'মাদার' দেখানো হল তখন Das Deutsceh Tagleblatt পত্রিকা ক্ষিপ্ত হয়ে লিখল, আমরা জানতে চাই, কেমন করে কর্তৃপক্ষ এই দুই নম্বর পোটেমকিন ছবিটি দেখানোর অনুমতি দিলেন?

'জার্মান ইডিওলজি'-তে র‍্যাফেল প্রসঙ্গে স্টার্নারের বক্তব্যের সমালোচনা করে মার্কস-এঙ্গেলস যে মন্তব্য করেছেন তাতে শিল্প-বিষয়ে দৃষ্টি ভঙ্গিটি স্পষ্ট। মার্কস-এঙ্গেলসের মতে যে-কোনো শিল্পীর শিল্পকর্ম (১) বিশেষ মাধ্যমটির বা ভাষার অগ্রগতির স্তর, (২) শিল্পীর সমসাময়িক স্বদেশে সমাজ-সংগঠনের প্রকৃতি, এবং (৩) সেই দেশের সঙ্গে সংযোগ আছে এমন অন্যান্য দেশের শ্রমবিভাগ অর্থাৎ শ্রেণীব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। এইগুলি একদিকে শিল্পের বিষয়গত পরিধি, অপরদিকে শিল্পীর চেতনা বা বোধের সীমা নির্দেশ করে। অন্যত্র মার্কস লিখেছেন, 'মানবসত্তার ঐশ্বর্যের বিষয়গত উন্মোচনের মধ্য দিয়ে তার বিষয়ীগত বোধবৃত্তি অংশত বিকশিত অংশত সৃষ্ট হয়।' সব শিল্পীর চেতনার শিকড় থাকে 'মানবীকৃত প্রকৃতি'তে, অর্থাৎ মেটিরিয়াল কণ্ডিশন অব লাইফ-এ; সমাজ-জীবন যার অঙ্গ। শিল্প শুধু সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিতই নয়, শিল্প সমাজ প্রক্রিয়ার অঙ্গও। শিল্প ও শিল্পী সমাজের প্রোডাকশন এবং রিপ্রোডাকশানে—অর্থাৎ বিশেষ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে কিংবা গুণগত পরিবর্তনের দ্বারা নতুন সমাজ নির্মানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে; কেননা মূলবোধের বা ধ্যান-ধারণার কাঠামো সমাজ-জীবনেরই অংশ।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আধুনিক চলচ্চিত্রের ধারা বুঝতে অসুবিধে হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের

অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে মানুষে-মানুষে বৈষয়িক সম্পর্কের কাঠামো এবং তার সঙ্গে মূল্যবোধ বা ধ্যান-ধারণার কাঠামোটাও পালটে গেছে। স্তালিন আমলের সাময়িক বিভ্রান্তি বাদ দিলে, নতুন সোভিয়েত সমাজের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সম্পর্কের নতুন বিন্যাস, দেশপ্রেম, আন্তর্জাতিকতা, শান্তি ও মৈত্রী এখন চলচ্চিত্রের বিষয়। চুখরাই-র 'ফরটিফার্স্ট' এবং 'ব্যালাড অব এ সোলজার', কালাটোজোফ-এর 'দ্য ক্রেনস আর ফ্লাইং', বন্দরচুক-এর 'দ্য ফেট অব এ ম্যান' বা গাব্রিলোভিচ ও রাইজম্যান-এর 'দ্য কম্যুনিস্ট' ছবিতে এই সবই শিল্পরূপ পেয়েছে। তারকোভস্কির 'দ্য মিরর' বা 'স্টকার' ছবিতে ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয়ের সমস্যা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত। বিষয়ের পরিবর্তন ভাষায় পরিবর্তন এনেছে, কিন্তু সে ভাষায় ঐতিহ্যের ধারা অস্বীকৃত নয়, অন্যান্য দেশের প্রভাবও আছে। শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নেই নয়, একইভাবে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের ছবিতেও সমাজ-বাস্তবতা শিল্পকর্মে রূপায়িত হতে দেখা যায়। ভাইদার ছবি, পোলানস্কির প্রথম দিকের ছবি বা ইয়াংসোর ছবি উদাহরণ। কখনো-কখনো সমাজ-জীবনের তীক্ষ্ণ সমালোচনাও দেখা যায়, যেমন ভাইদার 'দ্য হান্টিং ফ্লাইজ' বা সাম্প্রতিক হাঙ্গেরিয়ান ছবি 'এ্যাঙ্গি ভেরা'তে। কিন্তু সব মিলিয়ে এসব ছবি 'পজিটিভ সিনেমা', নিঃসঙ্গ ব্যক্তির মানসিক বৈকল্যের রূপায়ণ নয়।

অনেক সমালোচক মনে করেন সমাজতান্ত্রিক দেশের চলচ্চিত্রে ব্যক্তিকে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ বুর্জোয়া ব্যক্তিকে দেখা যায় না, যেমন দেখা যায় ফ্যাসবিন্ডার-এর 'ডেসপেয়ার' বা আন্তোনিওনির 'ল্যা নোতে'তে। কেউ কেউ খেদ করেন এই বলে যে, 'রুশ ছবি যৌন বিষয়ে গোঁড়া (পিউরিট্যানিকাল), শিশুদের ব্যাপারে আবেগপ্রবণ, এবং নৈতিকতায় অমলিন ভিক্টোরিয়ার যুগের।' সোভিয়েতের মানুষের কাছে আন্তোনিওনির 'লা নোতে'-র ছবিতে বিষণ্ণ একাকী নির্বীর্য মানুষের বিষাদ ও পতন অভিজ্ঞতার সত্য নয়—ইউতকোভিচের এই মন্তব্য, এই সব সমালোচককে বিহ্বল করে।

মার্ক্স-এঙ্গেলস শিল্পের 'উৎপাদন-সংগঠন'কে শিল্প-আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন সংগঠনে ব্যক্তিগত পুঁজি কর্তৃত্ব করে। ফলে সাহিত্য থেকে শুরু করে সঙ্গীত পর্যন্ত সব শিল্পকলার উপরেই 'ফিন্যান্স ক্যাপিটালে'র নিয়ন্ত্রণ থাকে। চলচ্চিত্রের ওপর বেশি, কারণ অনেক বেশি মূলধন লগ্নী করতে হয়। ফলে চলচ্চিত্র নির্মিত হয় প্রধানত 'মুনাফা, মুনাফা, এবং আরো মুনাফা'র উদ্দেশ্যে। এ কথা ঠিক। কিন্তু মুনাফাই ধনতান্ত্রিক

দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, সমাজের রিপ্রোডাকশনে চলচ্চিত্রের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বস্তুত চলচ্চিত্র অন্যান্য শিল্পকলা থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, প্রথমত, অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের আবেদন যেখানে কয়েক সহস্র মানুষের কাছে, চলচ্চিত্রের দর্শক যেখানে লক্ষ-লক্ষ। দ্বিতীয়ত, দর্শকদের মানসিকতা ও চেতনাকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা, তুলনায়, চলচ্চিত্রের বেশি। আভাঁ গার্দ পরিচালক লুই বুন্যুয়েল-এর ভাষায়,

> Motion pictures act directly upon the spectator ; they offer him concrete prsons and things ; they isolate him, through silence and darkness. from the usual psychological atmosphere. Because of all this the cinema is capable of stirring the spectator as perhaps no other art. . But as no other art, it is also capable of stupefying him.

চলচ্চিত্রের 'stupefying' ভূমিকার ভালো উদাহরণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট ছবিগুলি। এক্সপ্রেশনিস্টদের তাত্ত্বিক বক্তব্য ছিল এইরকম ঃ সব অচেতন বস্তুরই প্রাণ আছে, এবং সেই অজানা শক্তি সর্বত্র ক্রিয়াশীল থেকে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়ত, মানুষের মনে ছাড়া বাস্তবতার অস্তিত্ব নেই, একমাত্র ব্যক্তির মনোলোকেই নানা বস্তু ও শক্তির উপস্থিতি অনুভূত হয়। এর অর্থ, ব্যক্তি নৈতিক, পারিবারিক বা সামাজিক বন্ধনে বদ্ধ নয়, সে তার মনোজগতে অজানা শক্তির ক্রীড়নক। চলচ্চিত্রের ভাষায় এই তত্ত্বের প্রয়োগের ফল হল অবাস্তব পরিবেশ রচনা, অদ্ভুত 'সেট' নির্মান ইত্যাদি—যেমন 'মেট্রোপলিস' ছবির কল্পনার শহর। 'ডেসটিনি'র ভাগ্য নিয়ন্ত্রার মতো অদ্ভুত বিশাল দুর্ভেদ্য দেওয়াল। এই ধারার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি রবার্ট উইয়েন-এর 'দ্য ক্যাবিনেট অব ডঃ ক্যালিগরি'। কলা-কৌশলে ছবিটি উন্নত মানের কিন্তু একটি পাগলের কল্পলোকের কাহিনী এই ছবিতে আলোর ব্যবহারে, দৃশ্য পরিকল্পনায়, ধীর গতিতে এমন এক পরিবেশ রচনা করা হয়েছে যা দর্শকদের মনে হতাশা আর আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। ঐ সময়ের সব জার্মান ছবিরই—যেমন, বিখ্যাত ফ্রিৎজ ল্যাঙ্গের 'মেট্রোপলিস', 'ডেসটিনি', 'ডঃ ম্যাবিউজ', 'ডেথ অব সিগফ্রিড' প্রভৃতি—বৈশিষ্ট্য পরিকল্পনা, ফটোগ্রাফি, চরিত্রায়ণ একসঙ্গে এমন পরিবেশ রচনা করে যাতে দর্শকের মনে হয় তার করার কিছুই নেই, সে ভাগ্যের হাতে পুতুলমাত্র। আমেরিকার চলচ্চিত্রে

রিয়ালিস্ট তত্ত্বের প্রবক্তা Siegfreid Kracauer তাঁর 'From Caligory to Hitler' বইএ ফ্যাসিজম-এর অভ্যুত্থানের মানসিক পটভূমি রচনার জন্য এই ছবিগুলিকে দায়ী করেছেন।

সব ছবিতে কাহিনী নির্বাচন থেকে শুরু করে দৃশ্য-পরিকল্পনায়, ক্যামেরার অবস্থানে, আলোছায়ার ব্যবহারে, সর্বত্র পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান। রিয়ালিস্ট বা নিও-রিয়ালিস্ট ছবিতেও পরিচালক সম্পর্ক ও ঘটনাকে উপস্থিত করেন বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে, যার আড়ালে গোপন থাকে একটি মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণার কাঠামো। ধনতান্ত্রিক দেশের সব ছবিই যে বিশেষ মূল্যবোধ প্রভাবিত, তা নয়। অনেক ছবিতে ঐ মূল্যবোধের সমালোচনা বা বিপরীত মূল্যবোধ প্রধান, যেমন ডি সিকা, রসেলিনি, কুরোসোয়ার ছবিতে বা সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, শ্যাম বেনেগাল, সৈয়দ মির্জা, পূর্ণেন্দু পত্রী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, সাথ্যু, ধর্মরাজ—(একটিই অসাধারণ ছবি করেছেন : 'চক্র') প্রভৃতি ভারতীয় পরিচালকের ছবিতে। কিন্তু পশ্চিম ইয়োরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের অধিকাংশ ছবিই পূর্বোক্ত ধরনের—এগুলি শুধু সস্তা এনটারটেনমেণ্ট বিলিয়ে মুনাফাই করে না, এইসব ছবি দর্শকের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে সাহায্যও করে।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনায় ফর্মালিজম-এর ঝোঁক প্রবল। স্বতন্ত্র করে মাধ্যমটির আলোচনা বা রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের এই ঝোঁক অকারণ নয়। ক্যামেরার কাজ, দৃশ্যপরিকল্পনা, অভিনয়রীতি, এডিটিং শব্দ ধ্বনি এবং সঙ্গীত ইত্যাদি শৈল্পিক দিকগুলি অবশ্যই আলোচ্য, যেমন আলোচ্য সাহিত্যে টেকনিক বা শৈলী। কিন্তু যখন এককালের খ্যাতনামা সমালোচক (Cahiers du cine'ma-র) লেখেন, ভিট্টেরিও ডি সিকার 'বাইসিইকল থিফ' নিয়ে 'এমন আলোচনা করা হয় যেন এই ছবিটি যুদ্ধোত্তর ইতালির বেকার সমস্যা নিয়ে একটি ট্র্যাজেডি, যদিও সুন্দর এই ছবিটির বিষয়বস্তু আসলে বেকার-সমস্যাই নয়, এর বিষয়বস্তু—ককতো-র The earrings of Madcame de-র প্রায় আরব্য গল্পের মতো এমন একটি লোকের কথা, যাকে তার বাইসাইকেলটি খুঁজে পেতেই হবে', তখন প্রশ্ন করতেই হয়। চলচ্চিত্রের ক্রাফট নিয়ে আলোচনা হতেই পারে, যেমন সত্যজিৎ রায় করেছেন। কিন্তু ছবি শুধু পরিচালকের আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি, (ত্রুফো), এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেমন ছবির আলোচনা হয় সে আলোচনা ছবি বুঝতে সহায়ক হয় না। আবার জগৎ এবং মাধ্যমটি সম্পর্কে

'একটি ভাবনা-ধারনার' -প্রকাশ থাকলেই ভালো ছবি হবে, এ বক্তব্যও মানা যায় না, কেননা জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট ছবিতেও জগৎ সম্পর্কে একটি ধারণা ছিল, কিন্তু তার জন্যই কি ঐসব ছবিকে ভালো ছবি বলা যাবে ?

সম্প্রতি বহু প্রচলিত ফিল্ম কালচারের ধারণায় এই ফর্মালিস্ট ভঙ্গি প্রচ্ছন্ন আছে। কেননা শিল্প মাধ্যমে হিসেবে চলচ্চিত্র দেশের সামগ্রিক সংস্কৃতির অঙ্গ। আর্টফিল্ম এবং কমার্শিয়াল ফিল্মের মধ্যেও পার্থক্য করতে দেখা যায় এইভাবে—আর্ট ফিল্ম শিল্প, তার উদ্দেশ্য নান্দনিক, আর কমার্শিয়াল ফিল্মের উদ্দেশ্য বাণিজ্য বা মুনাফা, রুচিশীল সাহিত্য এবং বটতলার সাহিত্যের মধ্যে প্রভেদ অবশ্যই করতে হয়, তেমনি ভালো ফিল্ম খারাপ ফিল্মে পার্থক্য থাকবে ; কিন্তু এক ধরনের ছবি বাণিজ্যের মাধ্যম অপর আর এক ধরন শিল্পের মাধ্যম, এরকম ধারণায় চলচ্চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সবচেয়ে অস্বীকৃত হয়।

এই প্রসঙ্গে চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্বের প্রয়োজনের কথা এসে পড়ে—দর্শকদের শ্রেণীগত বা পেশাগত বিন্যাস নিয়ে নয়, সমাজের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে অনুসন্ধান যার মুখ্য বিষয়। ছবির সার্বিক মূল্যায়নের জন্য এই সমাজতত্ত্ব আবশ্যক। আর এ বিষয়েও একমাত্র মার্কসবাদই পথনির্দেশ করতে পারে।

কমিউনিস্ট শিল্পীর বাস্তবতার সন্ধান : সেকেরাস

তপনকুমার ঘোষ

অগ্রগমনের স্তরে, নিজেকে ক্রমশ বদল করতে করতে, এক ব্যাপকতর সামাজিক চৈতন্যময়তায় সংযুক্তি লাভ করে শিল্প—এইরকমই এক অনুভবের মধ্যে মার্কসবাদ ও কমিউনিজমে বিশ্বাসী সমস্ত শিল্পীদের শিল্পচেতনা চিরকাল ভর পেয়ে এসেছে। এই বিশ্বাসের মধ্যেই তাঁদের নতুন বাস্তবচেতনার আশ্রয়, এর মধ্যেই তাঁরা খুঁজে নেন তাঁদের শিল্পসৃষ্টির অন্বিষ্টকে, যদিও এই বাস্তবতার চরিত্র ও মাত্রা সময়ের বিবর্তনে বদলে যায়। তাই পোশাক বদলের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ শিল্পকাঠামো নতুন নাড়ীর স্পন্দনে জেগে ওঠে, তাপ ও নিশ্বাস গ্রহণের পালাবদলের মধ্যে তার সম্পূর্ণ অবয়বটি ধরা দিতে থাকে তখন, আরো বিস্তৃত কোনো সংযুক্তির তাগিদে। বাস্তবতা সম্পর্কে এই জাতীয় বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ লক্ষ করা যাবে মেক্সিকোর ম্যুরাল শিল্পী ডেভিড সেকেরাসের 'আর্ট এণ্ড রেভলিউশন' গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে যেখানে তিনি সোভিয়েত শিল্প ও পিকাসো সম্পর্কে নিজের কিছু ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। সমস্ত গ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত সেকেরাসের ২২টি ভাষণ সন্নিবেশিত হয়েছে, কখনও সম্পূর্ণভাবে, আবার কখনও সেইসব ভাষণের কিছু অংশবিশেষ। গোটা বইটি আমাদের রীতিমতো প্ররোচিত করে। সেই সঙ্গে একটা প্রাসঙ্গিক আকর্ষণীয় তথ্য আছে এই বই-য়ের প্রায় শেষ অংশে। সেকেরাসেরই ঈষৎ সীমায়িত কোনো অনুকরণে তথ্যটি আমরা এই আলোচনার শেষ পর্বের জন্য তুলে রাখলাম।

বাস্তবতা ও টেকনিকের বিচারে সোভিয়েত শিল্পের যে সমালোচনা সেকেরাস করেছেন তা কমিউনিজমে গভীরভাবে বিশ্বাসী এক শিল্পীরই সচেতন ভাবনার পরিচয় তুলে ধরে। সেইসঙ্গে মেক্সিকোর চিত্রকলার সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন তিনি, অনুভব করতে চেয়েছেন নিজের সীমাবদ্ধতা। তাই সোভিয়েত শিল্পের যে-সমালোচনা করেছেন তিনি, তার মধ্যে আত্ম-বিশ্লেষণও একটা বড় জায়গা করে নিয়েছে। কম্যুনিস্ট শিল্পীর এই সততা আসলে তাঁর বাস্তবতার ক্রমিক অনুসন্ধানেরই প্রতিফলন। সেকেরাস এক জায়গায় জানাচ্ছেন,

'আমি নিশ্চিত যে আমার সোভিয়েত বন্ধুশিল্পীরা স্বীকার করবেন যে বাস্তবতা কোনো স্থির ফরমুলা নয়, অপরিবর্তনীয় কোনো নিয়মের মধ্যেও আবদ্ধ নয় সে। শিল্পের ইতিহাস ও তার অগ্রগতি এই সাক্ষ্যই বহন করে যে বিভিন্নসময়ে এই বাস্তবতার ফর্ম ও সেই সংক্রান্ত ভাবনা আরো ব্যাপক ও গভীরতর কোনো অন্বেষণের তাগিদে নিজেকে বারবার পরিবর্তন করেছে। প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও রেনেসাঁসের বেলায় কথাটা পুরোপুরি সত্য। যাঁরা বলে থাকেন যে কোনো শিল্পকর্মই অপর একটি থেকে গুণগতভাবে উঁচুমানের নয়, এবং কোনো যুগের শিল্পই অন্য আর একটি যুগের তুলনায় বড় নয়, তাঁদের সেই ধারণার সঙ্গেও আমরা মিলিত হতে পারি। কিন্তু এ থেকে আমরা এই সত্য অস্বীকার করতে পারি না যে শিল্পভাবনা তার দীর্ঘ পরিক্রমণের পথে নতুনতর সমৃদ্ধ ফর্মগুলির এক ধারাবাহিক অন্বেষণ, বাস্তবতা প্রকাশের পরিণত, উন্নত ও আরো প্রকাশক্ষম কোনো ভাষার নিয়ত-নিশ্চিত এক অনুসন্ধান। যে যুগের শিল্প অপরিবর্তনীয় কোনো ফর্মুলার ধারণায় আড়ষ্ট না থেকে নতুন রূপ-রীতির উদ্‌ভাবনে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে, তখনই সেখানে আরো গভীর কোনো এক বাস্তবতার ইঙ্গিত দিয়েছি আমরা। ধারাবাহিক অগ্রগমনের নামে শিল্পসৃষ্টির নতুন পদ্ধতিগুলির আবিষ্কার ছাড়া বাস্তবতাকে আর অন্য কোনো-ভাবে চিহ্নিত করতে পারি না আমরা।'

সেকেরাস তাই সোভিয়েত শিল্পকর্মের মধ্যে ফর্মনির্ভর এক ধরনের তাত্ত্বিক প্রকাশ দেখতে পাচ্ছেন, সেইসঙ্গে বাস্তবতার ঈষৎ যান্ত্রিক এক অনুবর্তন। কিন্তু নিজের দেশের শিল্পকর্ম-সম্বন্ধেও তাঁর অকপট স্বীকারক্তি—'we have been contaminated by formalism'—যে প্রভাবের উৎস, তাঁর মতে, বুর্জোয়া অর্থনীতির মধ্যে। মার্কসবাদ ও কমিউনিজম বিশ্বাসী শিল্পীদের বাস্তবতার এই ক্রমিক অনুসন্ধান সত্ত্বেও বুর্জোয়া শিল্পতাত্ত্বিকরা অনেকসময় এই অভিমত

ব্যক্ত করেন যে মার্ক্সীয় শিল্পীরা নাকি বাস্তবতার বহিরঙ্গ ও পরোক্ষ এক প্রতিফলনের মধ্যে তাঁদের চৈতন্যময়তাকে আবদ্ধ রাখেন যেমন ভেবেছিলেন এর্নষ্ট কেসিরা, অথবা এডওয়ার্ড বেলার্ড। প্রতিফলন বা ছায়া নয়, পুনরুক্তিও নয়, বরং শিল্পকে মার্কসীয় তাত্ত্বিকেরা বাস্তবতার সৃজনধর্মী পুনরাবর্তন হিসেবেই লক্ষ্য করেছিলেন। আমাদের প্রসঙ্গত মনে হতে পারে বৃদ্ধবয়স সম্পর্কে বালজাকের অপূর্ব বাস্তবানুগ এই কয়েকটি শব্দের চিত্রণ, যা অন্য আর এক শিল্পিত উপলব্ধির সঙ্গে আসক্ত করে আমাদের—'The winter of life: red nose, hallow cheeks and numbed fingers.' এখানে শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগে বাস্তবতার এক গূঢ় চিত্র আঁকেন বালজাক।

শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে সৃষ্টিময়তার বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেই যে মার্কসবাদীরা তাঁদের দৃঢ় কোনো আশ্রয়ভূমি খুঁজে নেন তারই প্রমাণ শিল্পবোধ, বাস্তবতা ও শিল্পচর্চার মাধ্যম নিয়ে তাঁদের নিরন্তর গবেষণা। সেকেরাসের আলোচনা এই সত্যই প্রমাণ করে। আবার বাস্তবতার সঙ্গে ধর্ম এবং 'মাইথলজি'র সম্পর্ক নিয়ে এই সেকেরাস সম্পর্কেই আভনার জিস তাঁর 'ফাউণ্ডেসানস্ অব মার্কসিস্ট ইসথেটিক্স' গ্রন্থে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তাও এখানে স্মরণযোগ্য। জিস বলছেন যে ভিন্ন কারণে ধর্ম-সংক্রান্ত কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করেও একজন বাস্তবতাবাদী তাঁর শিল্পকে গড়ে নিতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে জিস সেকেরাসের নাম উল্লেখ করেছেন, এবং তাঁরই সহযোগী মেক্সিকোর শিল্পী জোস অরজকোর (Jose Orozco ?) 'Chryst Destroys His Cross' এই শিল্পকর্মটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাস্তবতা নিয়ে এক ধারাবাহিক ভাবনা ও জিজ্ঞাসার পরিচয় বহন করে এইসব সচেতন বিশ্লেষণ। এই বাস্তবতার খাতিরেই সেকেরাস নিজে প্যারিসের 'ফর্মালিস্ট' চিত্রকলা সম্পর্কে বারবার তাঁর অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন।

আসলে আজীবন সংগ্রামী শিল্পী সেকেরাস ম্যুরাল শিল্প নিয়ে তাঁর অবিরাম চর্চাকে এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরই পরিপূরক হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ না থাকলেও সেকেরাস একজন অক্লান্ত কর্মী। শিল্পকর্মকে তিনি গ্যালারি-প্রদর্শনীর পোশাকি আবহাওয়া থেকে মুক্ত করে রৌদ্র ও বর্ষণে স্নাত খোলা আকাশের নীচে টেনে আনতে চান, সেখানে তাঁর সচেতন অভিপ্রায়ের সঙ্গে ব্যাপক জনমানসের সংযুক্তি সম্ভব হতে পারে। সংগ্রাম ও প্রতিরোধের চিত্র আঁকবার জন্য লস এঞ্জেলস্ থেকে বিতাড়িত হন তিনি। কিন্তু

ম্যুরাল শিল্পকর্মকে তিনি কতখানি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন তারই স্মারক হয়ে থাকে ১৯৩২ এ লস এমেলস্ থেকেই মেক্সিকোতে বসবাসকারী এক আমেরিকান বন্ধুকে লেখা তাঁর একটি চিঠি। অন্য এক প্রসঙ্গে সেকেরাস জানাচ্ছেন,

যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন এমন বিষয় নিয়ে কেন আপনার ম্যুরাল শিল্প কর্ম আঁকেন যা কখনই স্থায়ী হতে পারে না—শত্রুপক্ষ মুছে ফেলে আপনার সেইসব কাজ? আমার উত্তর এই যে সংগ্রামের যে-উদ্দেশ্যগুলিকে আমার শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে আমার সামনে আমি দেখতে চেয়েছি সেই উদ্দেশ্যের মধ্যেই আমাদের এই ম্যুরালিস্ট আন্দোলন তার পরিণত চেহারা খুঁজে নেবে। ম্যুরালিস্ট আন্দোলনের মধ্যেই প্রলেতারিয়ান ইচ্ছাগুলি বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠবে।

সেকেরাসের দীর্ঘ সংগ্রামী শিল্পচর্চার শুরু সেই ১৯১১-তে যখন ইউরোপের অভিব্যক্তিবাদী চিত্রকলার বিরুদ্ধে এক আন্দোলনে তিনি সামিল হয়েছিলেন। ১৯৭৪-এ মারা গিয়েছেন সেকেরাস, কিন্তু রেখে গেছেন পাবলিক অট্টালিকাগুলির বাইরে উৎকীর্ণ তাঁর অজস্র ম্যুরাল শিল্পকর্মকে, যা রোদ, বৃষ্টি, ঝড় মাথায় করে জনমানসের চেতনায় বাস্তবতার নতুন এক অভিব্যক্তি হিসেবে আজও ধরা আছে।

উত্তেজক যে তথ্যটি এখনও আমাদের সঙ্গে আছে তা হল এই মহান শিল্পী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁর সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন, সেই সঙ্গে মেক্সিকোর শিল্পকলা সম্পর্কেও। সেকেরাসের অনুপ্রেরণায় ভারতবর্ষে শিল্পকর্মকে সীমিত মানুষের ঘেরাটোপ থেকে বের করে এনে সমগ্র জনসমাজের কাজে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন জওহরলাল। আরও স্মরণযোগ্য যে সেকেরাস নিজেই আমাদের এই তথ্য জানিয়েছেন।

সম্পাদনা দপ্তর—৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা—৭০০ ০০৭

দাম : ষাট টাকা

পরিচয়

সমালোচনা সংখ্যা

৫৩ বর্ষ

১১-১২ সংখ্যা,
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৯১

আপনার আশা আকাঙ্খার
কুঁড়িগুলি পিয়ারলেসের
সঞ্চয় প্রকল্পের মাধ্যমে
অনুপম ফুল হয়ে ফুটে উঠুক
দি পিয়ারলেস জেনারেল
ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন
৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৬৯
স্থাপিত ১৯৩২
ভারতের বৃহত্তম নন্-ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান
PRASA/PGF-84/83

বিজ্ঞপ্তি

তিনটি বিশেষ সংখ্যাসহ মোট সাত খণ্ড 'পরিচয়' ৫৩ বর্ষে প্রকাশিত হল। এই সংখ্যাই ৫৩ বর্ষের শেষ সংখ্যা।

শারদীয় সংখ্যা (অগাস্ট-অক্টোবর) মহালয়ার পূর্বে বেরবে আশা করছি। এই সংখ্যাটি বড় হবে, বুকপোস্ট করে পাঠালে মাঝপথে খোয়া যাবার আশঙ্কা রয়েছে। তাই কলকাতা, হাওড়া ও চব্বিশ পরগনার গ্রাহক, আজীবন গ্রাহক ও সৌজন্য-সংখ্যা-প্রাপকদের জানানো যাচ্ছে, তাঁদের জন্য উক্ত সংখ্যা মনীষা গ্রন্থালয়ে জমা থাকবে, একমাস পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা তাঁদের সংখ্যা অনুগ্রহ করে সংগ্রহ করে নেবেন। যাঁদের পক্ষে তা সম্ভব হবে না, আমরা তাঁদের সংখ্যা ঐ নির্দিষ্ট সময়ের পরে পাঠাব। প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য সবার সংখ্যা রেজিস্ট্রিডাকে আর্থিক কারণে পাঠানো সম্ভব নয় বলেই এই ব্যবস্থা। আশা করি সংগ্রহের অসুবিধা সবাই মেনে নেবেন। যাঁরা নিজে আসতে অক্ষম, তাঁরা প্রেরিত লোকের নিকট অনুগ্রহ করে সংগ্রহের অনুমতিপত্র দিয়ে দেবেন।

উপরোক্ত তিনটি জেলা, আসানসোল ও বার্নপুর ছাড়া অন্যত্র শারদীয় সংখ্যা ডাকযোগে (সম্ভব হলে রেজিস্ট্রি ক'রে) পাঠানো হবে।

রঞ্জন ধর
কর্মাধ্যক্ষ
পরিচয়

যাঁরা কেবল হতাশের দলে

আচ্ছা সবাই কি আজকাল হতাশায় ভুগছেন? কারণ লক্ষ্য করেছি যখন আমরা বিদ্যুতের সম্বন্ধে কোন আশার কথা শোনাতে যাই তখনই দেখি অনেকের মুখে অর্থপূর্ণ অবিশ্বাসের মুচকি হাসি।

তাই হতাশার শিকার এই অবিশ্বাসীদের দুকথা শোনাব বলে ঠিক করেছি (অন্য কেউ শুনলে হয়তো দ্বিগুণ উৎসাহী হয়ে উঠবেন)। বিদ্যুতের চাহিদা আর যোগানের মধ্যে ফারাকের কথা কাউকে আর আজ ডেকে বোঝাতে হয় না। লোডশেডিং তো আমাদের নিত্যসঙ্গী তবু আগামী দিনে বিদ্যুতের কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় একবার যাচাই করেই দেখা যাক না।

১। কোলাঘাটের ২১০ মেগাওয়াটের একটি ইউনিট এই মাসেই চালু হবে। (অবিশ্বাসীদের মনে রাখতে; খুব বেশি হলে আগামী মাসের মধ্যেই চালু হবে)

২। কোলাঘাটের ২১০ মেগাওয়াটের আরও একটি ইউনিটও এ বছরের মধ্যে চালু হবার কথা।

৩। আগামী বছরের (১৯৮৫) মধ্যে কোলাঘাটের তৃতীয় ইউনিটটিও বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৯৮৫ সালের মধ্যে আমরা ৩টি ইউনিট চালু করতে পারছি (অবিশ্বাসীদের জন্য সুখবরও আছে—মাঝে-মধ্যে যন্ত্র বিকল হবার সম্ভাবনাও থাকবে)

৪। ফরাক্কা ও চুখা থেকে আসছে বছরের মাঝামাঝি নাগাদ কিছু বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

৫। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন টিটাগড়ের আরেকটি ইউনিট (৬০ মেগাওয়াট) চালু করে ফেলেছেন। এ বছরের মধ্যে টিটাগড়ের ৬০ মেগাওয়াটের অন্য ইউনিটটিও তৈরি হয়ে যাবে। ওদের সাদার্ন স্টেশনের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা হচ্ছে নতুন মেশিন বসিয়ে।

আশাবাদীদের জন্যেও কিছু খবর :—

কোলাঘাটের দ্বিতীয় স্তরে ২১০ মেগাওয়াটের আরও তিনটি ইউনিট বসাবার কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে।

বক্রেশ্বরে ২১০ মেগাওয়াটের তিনটি ইউনিট বসাবার সরকারি অনুমতি ইতিমধ্যে এসে গেছে। এই সব কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে কারণ হতাশা হয়তো একদিন কাটবে কিন্তু বিদ্যুতের চাহিদা তো বেড়েই চলেছে। তাই বলে কি ভবিষ্যতে বিদ্যুতের ঘাটতি বলে কিছু থাকবে না? যাঁরা কোথাও কিছু ভালো দেখতে পান না তাঁদের জেনে রাখা ভালো যে নতুন প্রকল্পের সঙ্গে পুরনো উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে চাঙ্গা করার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুত চুরি বন্ধের সঙ্গে চাহিদা মতন গ্রাহকরা যাতে বিদ্যুতের যোগান পান তারও চেষ্টা চলছে।

আর যদি যাঁরা কেবল হতাশায় ভোগেন তাঁদেরই জয় হয় তবে ভরাডুবি হবে আমাদের এই রাজ্যের। তাতে কার ভাল হবে জানি না।

এই বিশ্বাস আর অবিশ্বাস আশা ও নিরাশার দোলায় না দুলে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে হলে লিখুন :

জনসংযোগ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

৪৮/১, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা—৭০০০২৭

শিক্ষা ও সুস্থ সংস্কৃতির সম্প্রসারণে বামফ্রণ্ট সরকারের নজিরবিহীন সাফল্য

শিক্ষা ঃ—শিক্ষা ক্ষেত্রে বামফ্রণ্ট সরকারের সাফল্য অবশ্যই নজিরবিহীন। ১৯৭৬-৭৭-এর ১২৯ কোটি টাকা থেকে বর্তমান বছরে শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ৪৫৯ কোটি টাকায় যা উচ্চতম ব্যয়বরাদ্দের এক নজির সৃষ্টি করেছে। নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে সরকার শিক্ষা জগতে সুস্থ এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছেন। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে এবং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে। ৩১ লক্ষ শিশুর মধ্যে বিনামূল্যে ভাল খাবার বণ্টন করা হচ্ছে। ৮০০০ নূতন প্রাথমিক ও ২০০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ফলে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে ১৫ লক্ষ এবং মাধ্যমিক স্তরে ১৮ লক্ষ। স্নাতক-ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নূতন পাঠ্যক্রম ও বিষয়সমূহ চালু হয়েছে। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় সহ সরকারী উদ্যোগে হলদিয়া ও সল্টলেকে দুটি কলেজ চালু করার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ এবং অনুন্নত এলাকায় ২৩টি মহাবিদ্যালয় ইতিমধ্যে খোলা হয়েছে।

সাহিত্য কৃতির জন্য প্রতিবছর রবীন্দ্র, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। মাদ্রাসার শিক্ষও ও অ-শিক্ষক কর্মীবৃন্দকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সমান হারে সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধাদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা কেন্দ্রগুলির সংখ্যা ১৬,৬০০ তে দাঁড়িয়েছে।

রাজ্যের গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭৫৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪১১ হয়েছে। রাজ্যের ২৪১১ টি গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৪,৫০ কোটি টাকা। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সংশোধিত বেতনক্রমের সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব সরকার স্বয়ং গ্রহণ করেছেন।

সংস্কৃতি ঃ—সংস্কৃতির নামে অসুস্থ প্রবণতার বিরুদ্ধে এই সরকার সুস্থ জীবনমুখী সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারে সহায়তা করছেন। লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশনা অনুদান, গ্রুপ থিয়েটার সহ সমস্ত রকমের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহদান, প্রতিষ্ঠিত ও নবীন চলচ্চিত্র-কারদের পরিচালনায় চিত্র প্রযোজনা, দুটি নাট্য মঞ্চ নির্মাণ, কলকাতায় নির্মীয়মাণ একটি কালার ফিল্ম লেবরেটারি এবং একটি আর্ট ফিল্ম কমপ্লেকস্ শিল্প-চর্চার প্রসারের ক্ষেত্রে বামফ্রণ্ট সরকারের ঐকান্তিক উদ্যোগের পরিচায়ক।

যুবকল্যাণ ঃ—সীমিত ক্ষমতা সত্ত্বেও যুবকল্যাণ প্রসারে বামফ্রণ্ট সরকারের প্রয়াস লক্ষ্যনীয়। ৩৩১টি ব্লকে যুব দপ্তর স্থাপিত হয়েছে এবং ৪০০০ যুবকের কর্মসংস্থান-এর জন্য ৪.৮০ কোটি টাকা অর্থসাহায্য দান করা হয়েছে। তফসিলি জাতি ও উপজাতির প্রায় ১৭০০০ যুবককে কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় একটি সর্ব ব্যবস্থাযুক্ত রাজ্য যুব কেন্দ্র স্থাপনও বামফ্রণ্ট সরকারের কৃতিত্ব।

—আই. সি. এ ৬০১২/৮৪—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পরিচয়

জুন-জুলাই ১৯৮৪   আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৯১   ৫৩ বর্ষ   ১১-১২ সংখ্যা

প্রচ্ছদ

সোমনাথ হোর ও পূর্ণেন্দু পত্রী

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস।

সম্পাদক

দেবেশ রায়

সম্পাদক কর্তৃক গুপ্ত প্রেশ, কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লুকাচের আত্মজীবনী

সিদ্ধার্থ রায়

রেকর্ড অব এ লাইফ। গেঅর্গ লুকাচ সম্পাদনা: ইস্তভান এওরসি। ভারসো এডিশন। ১৯৮৩। ব্রিটেন। ৪.৯৫ পাউণ্ড।

'আজ এ-উপলব্ধিটুকু চালু হয়ে গেছে যে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও—অর্থাৎ সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে সংকটযন্ত্রণা ও উত্তরণের পর্বপরম্পরা ব্যক্তি-বিশেষের সীমায়িত সমস্যা মাত্র,...সেখানেও ব্যক্তিসত্তার সার্থকতা, স্বাস্থ্য ও উৎকর্ষ নির্ভর করে কী ভাবে ঐ সংকটপর্বগুলি মানুষটি, ব্যক্তির অহংসর্বস্বতায় নয়, বরঞ্চ অন্য-সংলগ্নতায়, অর্থাৎ ব্যক্তি, সমাজ ও ইতিহাসের অর্থে, অতিক্রম করে। এবং এই সংকট ও উত্তরণ পর্বপরম্পরার পুরুষার্থ সুষ্ঠু হয়, যখন মানুষটির সত্তাসমস্যা নিছক ব্যক্তিকভাবে অস্বাস্থ্য ও স্বস্তিলাভ, বন্ধন ও উন্মোচনের ব্যাপার থেকে যায় না, যখন আধিব্যাধি উপচিয়ে লোকটির চরিত্র হয়ে ওঠে রূপকের মতো ব্যাপ্ত অর্থাৎ সামাজিক, ঐতিহাসিক অর্থেই অর্থবহ, মূল্যবান। মানবমন ও মানবেতিহাস অঙ্গাঙ্গী দ্বন্দ্বময়তায় জঙ্গম ঐক্যে অন্যোন্য।'

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে আত্মপরিচয়ের প্রতিষ্ঠাসংকট নিয়ে লিখেছিলেন বিষ্ণু দে এই দ্বন্দ্বময় জঙ্গম ঐক্যের জটিলতার কথা। প্রায় ১৯ বছর আগে এরিকসনীয় তত্ত্ব-ব্যবহারের এই উচ্চারণের পর, এতদিনে আমরা জেনে গিয়েছি, ব্যক্তি-মনের সমাজসংলগ্নতায় ইতিহাসও হয়ে উঠছে মনেরই জীবন, যে-মন একই সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বেঁচে থাকে এবং জানে যে ঐভাবেই তার বাঁচা সম্ভব। সে ঐতিহাসিক জীবনচর্যাই তখন এক অর্থে 'আত্মার পিতৃদায়', ব্যক্তির নৈতিক পিতৃত্বের স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞান।

আজ এই কথাগুলো অনিবার্য মনে পড়ে, গেঅর্গ লুকাচের আত্মজীবনী, 'রেকর্ড অব এ লাইফ—এ্যান অটোবায়োগ্রাফি', হাতে নিয়ে। অনিবার্য এ কারণে যে, নৈঃসঙ্গ্য ও অন্তরঙ্গতার দ্বান্দ্বিক সমস্যা, সৃজনশীলতার সংকট ও স্বভাব-কৈবল্যের সমস্যা, এই তিন চূড়ান্ত পর্বেই লুকাচের জীবন যে উত্তরণের দৃষ্টান্ত, তাতে প্রমাণ পাই যে হাঙ্গেরির এই আজীবন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী দার্শনিক ব্যক্তিঅহমের পরিধির বাইরে মানব-সত্তার আত্মীয়তায় পৌঁছুতে চাইছিলেন বার বার।

১৯৭১ সালে, মৃত্যুর কয়েকমাস আগে আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেন লুকাচ। প্রায় ৮৬ বছরের উপান্তে এসে আট দশক ব্যাপ্ত সাধনা ও জীবন-যাপনের জটিল প্রক্রিয়ার দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি, স্বভাবত দার্শনিক প্রজ্ঞায়। তাঁর শরীর ক্যান্সারে আক্রান্ত। ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে ডাক্তাররা এ অসুখ ধরবার পর, তিনি যখন জানলেন, তখন লুকাচের জিজ্ঞাসা ছিল, কতদিন আছে তাঁর আয়ু। কারণ তখনও 'অন্টলজি'-র কাজ শেষ হয় নি, পাণ্ডুলিপি ফিরে পড়া বাকি। 'অন্টলজি'-র কাঠামোর জন্যে তো বটেই, শারীরিক অবসন্নতায় তাঁর কাজ করবার তীব্র স্পৃহা ঝিমিয়ে এসেছে বার বার, বেশি দিন নেই এ জীবনের, জেনেও। শুধু ক্যান্সারই নয়, 'আরটেরিওস—ক্লেরসিস' (ধমনীকাঠিন্য)-অসুখে নিবিষ্টতা ভেঙে যাচ্ছিল প্রায়ই। ১৯৭১ সালের শুরুতেই, এই কর্মে ব্যাপৃত মানুষটিকে বলতে হলো, " 'অন্টলজি' বিচার করবার যোগ্যতা আর নেই আমার।"

যেহেতু কর্মহীনতা তাঁর কাছে মৃত্যুরই সমান, ছাত্ররা বললেন, আপনি আত্মজীবনী লিখুন। লুকাচের মনে আত্মজীবনী লিখবার পরিকল্পনা আগে থেকেই ছিল। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী, গারটুর্ড বরৎস্টিয়েবার, ১৯৬৩-র ২৮ এপ্রিল মারা যাবার আগে পর্যন্ত, আত্মজীবনী লেখার কথা বলেছেন লুকাচকে। ১৯৬৩ পর্যন্ত হয় নি—এমন কি তিনি আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠেন। অবশ্য আত্ম-বিনাশের সেই বিধ্বংসী মানসিকতা সৃষ্টিশীল সদর্থকতায় বদলে প্রকাশ পেল মোৎসার্ট ও লেসিং সম্পর্কিত, গারটুর্ডের প্রিয় দুই ব্যক্তিত্ব বিষয়ে, অসামান্য এক প্রবন্ধে।

১৯৭১ সালে মৃত্যুর নিশ্চিত দ্রংষ্টা যখন অভিভূত করছে প্রতিদিন, তখন আত্মজীবনী লিখবার তাগাদা অনুভব করলেন লুকাচ। অভ্রান্ত তথ্য ও ইতিহাসের পরম্পরা যাচাই না করে লিখবেন না বলেই, সমস্যা দেখা দিল, কারণ লাইব্রেরি বা সংগ্রহশালায় গিয়ে কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু লেখার তাগাদায় দীর্ঘ আট যুগ ধরে অর্জিত অভ্যাসকে সরিয়েই, তিনি স্মৃতি থেকে লিখতে শুরু করেন আত্মজীবনী, যার নাম 'গেলেব্‌টেস ডেনকেন', ইংরিজিতে 'লিভড থট', বাংলায় 'মানস যাপন'। খুব কম সময়ের মধ্যে, জার্মান ভাষায়, ৫৭টি টাইপ করা পাতায় তিনি নোটের মতো করে লিখলেন, আত্মজীবনীর খসড়া। যেকোনো লেখারই খসড়া করতেন তিনি। আর সম্পূর্ণ জীবনী শেষ না করতে পারলেও এই নোটের ভিত্তিতে গবেষণা হতে পারে ভবিষ্যতে, লুকাচ এমনই ভেবেছিলেন।

সেই অনুসন্ধান শুরু হয় লুকাচ মারা যাবার আগেই। খসড়া জীবনী লেখার পর লুকাচ নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন, শরীর তাঁকে আর লিখতে দেবে না। কিন্তু চিন্তার প্রক্রিয়ায় তো ছেদ নেই। ছাত্ররা তাই প্রস্তাব দিলেন, টেপে কথা বলুন। ১৯৭১ সালের মার্চে ও মে মাসে (লুকাচ মারা যান ৪ জুন) এরজেবেত ভেজের ও ইস্তভান এওরসি লুকাচের জীবনের কথা টেপ করেন। 'মানস যাপন' থেকেই নানা প্রাসঙ্গিক, অব্যাখ্যাত, কোনো ছোটখাট ঘটনার মন্তব্যকে সূত্র ধরে, ভেজের ও এওরসি লুকাচের স্মৃতিচারণে সাহায্য করেছেন। এওরসি বলছেন, মে মাসে টেপ করবার সময় ক্যান্সারের যন্ত্রণায় বিহ্বল লুকাচ যেভাবে বার বার ফিরে আসছিলেন তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণ আলাপচারিতে, সে সংগ্রাম চোখে দেখা যায় না। হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় কথিত এই আত্মজীবনী 'রেকর্ড অব এ লাইফ' সম্পাদনা করে, 'মানস যাপন' ও 'নিউ লেফট রিভিয়্যু'-তে একটি আত্মজৈবনিক সাক্ষাৎকার সহ, ১৯৮৩-র শেষে ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে এই বই, 'রেকর্ড অব এ লাইফ—এ্যান অটোবায়োগ্রাফি'।

কিন্তু আমরা প্রথমেই মনে করেছিলাম এরিকসনের নির্ণয় বিষ্ণু দে-র ভাষায় যে, ব্যক্তিঅহম নয়, মানবসত্তার প্রেমময়তায় নিজেকে যুক্ত করে আত্মজীবনের পরিণাহ উপলব্ধিতেই একটি জীবন ঐতিহাসিক অর্থে প্রতিষ্ঠা পায়, সে কথা লুকাচ প্রায় প্রতিধ্বনি করেন, অবশ্যই মার্কসবাদের আজীবন অবিচল ভূমিতে দাঁড়িয়ে, তাঁর আত্মজীবনীর শুরুতে, 'অব্যবহিত অর্থে আমার জীবন নয়।' মানবিক অর্থে শুধু দেখতে চাই, এই বিশেষ বোধময় চিন্তাপ্রক্রিয়া, ভাবনার এই ধরণ (ব্যবহারের এ রীতি) জীবন থেকে প্রাণ পেয়েছে। আজ পেছনে তাকালে বোঝা যায়ঃ ব্যক্তিঅহম শুরুও নয়, পরিণামও না। কিন্তু ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা, ঝোঁক, প্রবণতা, বিকশিত হবার পূর্ণ সুযোগ পেলে, পরিবেশ অনুসারে—কতখানি সামাজিক অর্থে টাইপ হয়ে ওঠে, বা আমার চিন্তাভাবনাকে মনে রাখলে, কীভাবে প্রজাতির চারিত্রে প্রতিষ্ঠা পায় বা অর্থবহ হয়ে উঠবার চেষ্টা করে, [সেটাই মূল লক্ষ্য]' (পৃষ্ঠা) ১৪৩-১৪৪)। এবং একেবারে শেষে গিয়ে বলছেন, 'মার্কসবাদের গভীরতম সত্যকে আমরা বুঝতে পারি মানুষকে মানবায়িত করে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার আধার হিশেবে গড়ে তোলা, যে ইতিহাস আবার প্রতিটি ব্যক্তিজীবনের বহুধা বৈচিত্র্যে রূপায়িত। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি—সচেতন বা উদাসীন হোন না কেন—এই সর্বাত্মক রসায়নের একটি উপাদান মাত্র, যে রসায়নের পরিণাম সে নিজেও। ব্যক্তি-

অহমের ভেতরেই প্রজাতি-চারিত্র প্রতিষ্ঠা এই বাস্তব, অবিভাজ্য বিকাশ প্রক্রিয়ার প্রকৃত মোহানা' (পৃষ্ঠা ১৬৯)। মার্কসবাদের সত্যে এই প্রজাতি-চারিত্রের সার্থকতায় পৌঁছে দেয় কমিউনিস্ট পার্টি, লুকাচ যাকে, সব সংকট ও কঠিন সময় পেরিয়ে আসার পরও, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, 'মাই পার্টি, রাইট অর রং।' মৃত্যুর আগে 'নিউ লেফট রিভিয়্যু'-র সাক্ষাৎকারে লুকাচ স্পষ্ট জানালেন, পার্টি থেকে তাঁর সদস্যপদ খারিজ, নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পর তাঁর অতীত সম্পর্কে উদাসীন অবজ্ঞা বা ব্যক্তি হিশেবে পার্টির সঙ্গে তাঁর অস্বচ্ছন্দ লাঞ্ছনায় ব্যক্তিগত অর্থে তাঁর কোনো খেদ তো নেই, কোন কৈবল্যও নয়, নিজের যেকোনো ভুল তিনি মেনে নিয়েছেন সহজেই, কারণ ব্যক্তি কেবল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সামান্য উপাদান, মানবজীবন ও মানবেতিহাসের জঙ্গম অঙ্গাঙ্গী দ্বন্দ্বময়তায় পার্টিই ব্যক্তিজীবনকে ইতিহাসের প্রকৃত মঞ্চে যথার্থ করে তোলে, কারণ, 'একমাত্র কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে থেকেই ফ্যাসি-বাদের বিরুদ্ধে সফলভাবে লড়াই করা যায়। আমার এ দৃষ্টিভঙ্গি কোনোদিন বদলায় নি। সব সময়েই মনে হয়েছে, ধনতন্ত্রের সর্বোত্তম অবস্থায় দিন কাটানোর বদলে সমাজতন্ত্রের সব চাইতে খারাপ পর্বে বেঁচে থাকাও ভালো' (পৃষ্ঠা ১৮১)। অন্যত্র, ভিয়েনার পত্রিকা 'নিউজ ফোরামে', ১৯৬৯ সালে লুকাচ বলেন, সবচাইতে খারাপ সমাজতন্ত্রও উন্নততম ধনতন্ত্রের চাইতে ভালো।

এওরসি এ ধরনের উচ্চারণকে আক্রমণ করেছেন, তাঁর স্তালিন বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যে, লুকাচের সমস্ত 'নিগ্রহ' সত্ত্বেও পার্টির ব্যাপারে এমন অন্ধ মতামত তাঁর আত্মসমর্পণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অথচ, প্রায় অর্ধ শতকে ছড়ানো এই ইতিহাসলগ্ন সচেতন জীবনযাপনের অর্গ্যানিক বিকাশে এ উচ্চারণ অবশ্যম্ভাবী। ভূমিকায় এওরসি নিজেই বলেছেন, পার্টি তাঁর কাছে ছিল শ্রেণীসচেতনতার প্রত্যক্ষ মাধ্যম। বিশ্বসত্তার দিকে লুকাচের যাত্রাকে তৈরি করেছে পার্টি। দলীয় সাহিত্য বিষয়ে লুকাচ জানান আমাদের, 'পার্টির লেখক নেহাত নেতা বা সৈনিক নন, তিনি পার্টিজান। অর্থাৎ প্রকৃতই পার্টির লেখক হলে পার্টির ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও পার্টি নির্দিষ্ট লাইনে নিজেকে একাত্ম করে তুলবেন, নিজের মতামত থাকা সত্ত্বেও।' সুতরাং আনুগত্যের প্রশ্নেও, আমরা পড়ি, লুকাচ ব্যক্তিজীবনের ওপরে স্থান দেন নিয়মানুবর্তিতাকে। 'পার্টির নিয়ম', লুকাচ লিখছেন, 'এক উচ্চতর এ্যাবস্ট্রাক্ট আনুগত্য। ইতিহাস-নির্ধারিত প্রবণতার প্রতিই থাকবে সচেতন কোনো ব্যক্তির আনুগত্য, বিশেষ কোনো প্রসঙ্গে একমত না হলেও।' লুকাচের

এই একান্ত পার্টি আনুগত্য, মার্কসবাদকে ধরে ৮৬ বছর ব্যাপ্ত জীবনবোধে 'মাই পার্টি, রাইট অর রং' এমন উচ্চারণকে এওরসি দার্শনিকের আশাহত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর চতুর প্রসাধন বলতে পারেন, কারণ এওরসির ঠিক সেই মুহূর্তে লুকাচের অর্গ্যানিক আত্মবিকাশের কথা মনে থাকে না; প্রজাতি-চারিত্রময় ব্যক্তিজীবনকে ইতিহাস থেকে সরিয়ে বিচার করেন; মনে হয়, এই বিশ্ববোধ তাঁর বানানো। সংকট অনেকবার এসেছে, পার্টির বাইরেও থেকেছেন লুকাচ, ১৯৫৬-তে রুমানিয়ায় দেশান্তর ঘটে তাঁর, লেখা নিয়ে লেনিন থেকে শুরু করে কোলাকাওস্কি পর্যন্ত সমালোচনা করেছেন, ১৯৪৯-এ 'লুকাচ বিতর্ক' হয়েছে, ১৯৬৮-তে চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনায় বিব্রত বোধ করেছেন, তবু যে বিশ্বসত্তার উপলব্ধি তাঁর মানবায়িত আত্মবিকাশের পরিণাম, সেই কথা মনে রেখেই কিন্তু লুকাচকে বিচার করতে হবে। নিজেও তিনি সে কাজই করেছেন, আত্মজীবনীতে, আত্মজৈবনিক কথাবার্তায়, সাক্ষাৎকারে। ১৯৬৯-এ পার্টি সদস্যপদ পাওয়ার সংবাদ লুকাচের মুখ থেকেই জানবার পর, অতি-উৎসাহে এওরসি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তাহলে বোঝা গেল, কমরেড লুকাচ পার্টির কাছে যত না গেলেন, পার্টিই বোধ হয় লুকাচের কাছে বেশি করে গেছে'—লুকাচ জীবনসায়াহ্নে, তাঁর বিশিষ্ট তাকাবার ভঙ্গিতে, হেসে, ৮৬ বছরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ভরা স্বরে বলেছিলেন, 'আনফরচুনেটলি, ইট উড বি প্রিম্যাচিওর টু ক্লেইম দ্যাট।'

জীবনের কোনো এক পর্বকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আলাদা করে দেখলে মনে হতে পারে অবাঞ্ছিত বন্ধুরতা। কিন্তু লুকাচ প্রথমেই একাধিকবার এওরসিকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাই অত্যন্ত ঘনভাবে বোনা (পৃষ্ঠা ২৬)', 'আমার জীবনের সবকিছুই একে অন্যের থেকে অবিচ্ছিন্ন। আমার বিকাশে কোনো নন-অর্গ্যানিক উপাদান আছে বলে আমি মনে করি না' (পৃষ্ঠা ৮১); নেই বলেই মার্কসবাদের অর্গ্যানিক সমগ্রতায় তিনি খুঁজে পান তাঁর ব্যক্তিঅহমের ঐতিহাসিক পুরুষার্থ, আর হাঙ্গেরির লেখক, ফিল্মতাত্ত্বিক ও চিত্রনাট্য লেখক হারবার্ট বাউএর (১৮৮৪—১৯৪৯), যিনি বেলা বালার্জ নামে লিখতেন, কমিউনিজমে নিবেদিতপ্রাণ হলেও, তাঁর নন-অর্গ্যানিক বিকাশে ক্ষতিগ্রস্ত কাব্যচর্চাকে বাতিল করেন লুকাচ। ব্যক্তিজীবন ও মানবেতিহাসের দ্বন্দ্বময় জঙ্গম সংশ্লেষেই এমন বিকাশ সম্ভব, এওরসি এই দ্বন্দ্বময় ঐক্যের কথা মনে রাখেন না।

দ্বন্দ্ব শিশুকাল থেকেই, 'মানসযাপনে' লুকাচ যাকে 'স্বতস্ফূর্ত বিদ্রোহ'

বলেছেন। সম্ভ্রান্ত ব্যাঙ্কারের ছেলে হয়েও পারিবারিক মূল্যবোধের সঙ্গে বিরোধ লেগেছে তখন থেকেই। পোশাকি নিয়মকানুন, লুকাচের ভাষায় 'দ্য স্পিরিট অব প্রোটোকল' তৎকালীন ব্যবহারবিধির সমাজস্বীকৃত রীতি থেকে মুখ ঘুরিয়ে ছিলেন। 'লুকাচেস কনসেপ্ট অব ডায়ালেকটিক' নামে বইতে লুকাচের জীবন ও সৃষ্টিকে মিলিয়ে দেখার সময়, লুকাচের দ্বন্দ্বময় সত্তা কথা বললেও এই স্বতস্ফূর্ত বিদ্রোহের মেজাজে স্বীকৃত সামাজিকতাকে অস্বীকার করবার কথা মেসিয়ারোস উল্লেখ করেন নি। অথচ কাঁচা বয়সে এই নৈঃসঙ্গ্য ও অন্তরঙ্গতার দ্বৈতাদ্বৈত সমস্যা লুকাচের জীবনে প্রাথমিক সংকটপর্ব। যেমন রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃত কাঠামো থেকে সচেতনবাল্যেই সরে এসেছিলেন স্বতন্ত্র নির্জনতায়। লুকাচ আত্মজীবনীতে বলছেন, 'প্রথাসিদ্ধ ব্যবহারবিধিকে আমি সম্পূর্ণ নাকচ করেছিলাম। এমন কী কাকা-কাকীমাদের সঙ্গে ব্যবহারেও। মা বলেছেন, বাড়িতে কোনো অতিথি এলে তাঁকে সম্ভাষণ করি নি কোনোদিন, আমন্ত্রণ তো নয়ই। অতিথিকে সম্ভাষণ করার অর্থই তো আচারের শুরু' (পৃষ্ঠা ২৬-২৭)। সামাজিকভাবে নির্ধারিত জীবনক্রমের ভেতর না গেলে নৈঃসঙ্গ্য অনিবার্য, লুকাচের 'কোনো বন্ধু ছিল না ছোটবেলায়। এমনকি স্কুলেও কেউ ছিল না বহু বছর যার সঙ্গে বিশেষভাবে আত্মীয়তা অনুভব করতে পারি' (পৃষ্ঠা ২৯)। কিন্তু এই নিসঙ্গতায় নিজের যে বিশ্ব গড়ে তুলেছিলেন লুকাচ, সেই অপরিণত, কিন্তু লক্ষণাক্রান্ত তত্ত্ববিশ্বের অস্পষ্ট কাঠামোয় অচেতন-ভাবে কেউ ছুঁয়ে গেলেও নিজেকেই চেনা হয় যেন, 'আমাদের খেলার সময় দেখাশোনার জন্য একজন বৃদ্ধা ছিলেন। কিছু খেলনা হারিয়ে যাবার পর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, সেগুলো কোথায়? তিনি জবাব দেন—জর্জ, ওগুলো তুমি যেখানে রেখেছ, সেখানেই আছে। এই উত্তর আমাকে ভীষণ নাড়া দেয়। কারণ এতদিন বড়দের কাছ থেকে অর্থহীন কথাই শুনে এসেছি। যেমন ইরমা কাকীকে বলতে হত—আমি আপনার ভৃত্য। অথচ, খেলনা আমি যেখানে ফেলেছি সেখানেই আছে, এই উত্তরে নিহিত যুক্তি আমি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করি। আমি নিজে খুব একটা আগোছালো ছিলাম না। আর এই যুক্তিবাদী কাঠামোতেই আমি বাধা দিয়েছি তথাকথিত প্রথাগত ব্যবহারবিধি' (পৃষ্ঠা ২৭)। কিন্তু এই স্বতস্ফূর্ত বিদ্রোহ অবশ্যই কৌশলী ছিল। হাল্কাভাবে লুকাচ একে 'গেরিলা যুদ্ধ' বলেছেন। নিজের স্বাতন্ত্র্য রাখবার জন্যই, প্রয়োজন হলে অতিথিদের সম্ভাষণ করেছেন, নিজেকে বাঁচাবার জন্য নয় ঠিক, একটি সঙ্কটকাল উত্তরণের তাগিদে; দরকারে ইরমা

কাকীকে 'আপনার ভৃত্য' বলেছেন। মা ঘরে বন্ধ করে রাখলে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই নিজের দোষ স্বীকার করেছেন; দুপুরবেলা বাবা আসবার সময় বন্ধ করলে দোষ স্বীকার করেন নি, কারণ বাবা অশান্তি পছন্দ করতেন না বলে মা এমনিতেই মুক্তি দিতেন।

এমন ঘটেছে বহুবার। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে পার্টির অবস্থা বদলালে, যখন বহিষ্কারের সম্ভাবনা কম, আত্মসমালোচনা থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত থেকেছেন তিনি, পার্টির সঙ্গে অন্বিত বলেই। আবার ১৯২৯ সালে 'ব্লুম তত্ত্ব' লেখার পর পরই তাঁকে আত্মসমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখতে হয়েছিল 'উজ মারকিউস' পত্রিকায়, পার্টির সঙ্গে অন্বিত বলেই। তিনি জানান, হাঙ্গেরিয়ান পার্টির প্রতি অনিবার্য সমালোচনা বন্ধ করতেই এই চেষ্টা...তাই এই শর্তহীন আত্ম-সমর্পণ।' ১৯২১-এ জার্মানির মার্চ এ্যাকশনের লেখা পার্টি সমালোচনা করলে বা পার্লামেন্টারিজমের ওপর লেখা নিবন্ধের পর লেনিন নিজে লুকাচের লেখাকে আক্রমণ করলে, লুকাচ আনুগত্যে দলীয় নিষ্ঠায় মেনে নিয়েছিলেন সব অভিযোগ, পার্টির সঙ্গে অন্বিত বলেই। তিনি বলেছেন, 'আমি সম্পূর্ণ ভুলপথে এগিয়েছিলাম। দ্বিধাহীনভাবে আমি সে তত্ত্ব ত্যাগ করি। আমার প্রবন্ধের সমালোচনা পড়ার আগেই আমি লেনিনের 'লেফট-উইং কমিউনিজম: এ্যান ইনফ্যানটাইল ডিজঅর্ডার' পড়ি এবং সে লেখায় পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের প্রশ্নে তাঁর যুক্তি আমি সম্পূর্ণ মেনে নিই। তাই আমার প্রবন্ধের সমালোচনা নতুন করে আমায় বদলায় নি...' (পৃষ্ঠা ১৭৭)।

মেসিয়ারোস তাঁর বইতে লুকাচের তত্ত্ববিশ্ব তৈরিতে নানা ব্যক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা বলেছেন, যেমন, জর্জ সিমেল, উইলহেলম ডিলথে, এমিল ল্যাস্ক, এরভিন জাবো, জর্জেস সোরেল, হাইনরিখ রিকার্ট ও নব্য-কান্টবাদী অংশের ফ্রেইবুর্গ স্কুলের অন্যান্য সদস্যরা, ম্যাক্স ওয়েবার, হেগেল, মার্ক্স, রোজা লুক্সেম-বুর্গ ও লেনিন। আর হাঙ্গেরির প্রতিভাবান লিরিক কবি আন্দ্রে এ্যাডির কবিতা লুকাচকে কতখানি বদলে দিয়েছিল মানসিক ধাঁচে, সে কথা আমাদের হয়তো অনেকেরই জানা। কিন্তু সিমেল-লেনিন-জাবো-এ্যাডিতে পৌঁছুবার একটা পথ কৈশোর থেকেই তৈরি হচ্ছিল লুকাচের পরিবেশে, তত্ত্ববিশ্বের অপরিণত চেহারা হলেও। সেই প্রাথমিক তত্ত্ববিশ্ব গড়ে উঠবার ধরন না বুঝলে এ্যাডির কবিতা ধরে, মার্ক্সবাদ ও কম্যুনিজমের পৌঁছুবার প্রক্রিয়া ধরা যায় না, মেসিয়ারোসের বর্ণনায় এই প্রথম ধাপটিই বাদ। লুকাচ আত্মজীবনীর খসড়ায় তো বটেই, এওরসির সঙ্গে কথায় সেই 'মানসযাপন'-এর নোট ব্যাখ্যার সময়েও,

এই প্রাথমিক প্রস্তুতির প্রসঙ্গে জোর দিয়েছেন। 'আমার যখন ন বছর বয়স, একটি বই আমাকে ভীষণ প্রভাবিত করে—সেটা হলো হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় অনূদিত 'ইলিয়াড'। এর ছাপ পড়েছিল গভীর, কারণ নিজেকে হেক্টরের সঙ্গে মিলিয়ে নিতাম, অ্যাকিলিসের সঙ্গে নয়। সে সময় আর একটি বই পড়ি, 'দ্য লাস্ট অব দ্য মোহিকানস'। এই দুখানা বই আমার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাবা, অত্যন্ত মার্জিত ও সম্মানীয় ব্যক্তি হলেও, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হিশেবে বিশ্বাস করতেন, সঠিক পদক্ষেপের প্রকৃত মাপকাঠি হল সাফল্য। এ দুটো বই থেকে শিখলাম, সাফল্য কোনো মাপকাঠি নয়, ব্যর্থতাই আসলে সঠিক। 'ইলিয়াড'-এর চাইতেও 'দ্য লাস্ট অব দ্য মোহিকানস'-এ এ ব্যাপারটা স্পষ্ট হত, কারণ বিজিত ও অত্যাচারিত ইণ্ডিয়ানরাই আসলে নিশ্চিত সত্যের দিকে ছিল, ইউরোপীয়ানরা নয়। আর একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার হল, সে সময় বুদাপেস্টে প্রথমে ফরাসী শেখার রেওয়াজ ছিল, কিন্তু আমরা প্রথমে শিখেছিলাম ইংরিজি। বাবা একটু ইংল্যাণ্ডের আদবকায়দা ঘেঁষা ছিলেন' সেই সূত্রেই 'টেলস ফ্রম শেক্সপিয়র'-এর বই পড়ে মুগ্ধ হয়েছি ভীষণ। মার্ক টোয়েনের উপন্যাস 'টম সোয়েইয়ার' ও 'হাকলবেরি ফিন' পড়ি। জীবনের আদর্শ চিনতে তৈরি করেছিল আমায় এসব বই। প্রথমদিকার পাঠে নঞর্থকভাবে উঠে আসত অনেক ভাবনার আদল, পরে তাদেরই সদর্থকভাবে দেখতে শিখি। মানুষের কী ভাবে বাঁচা উচিত, এ-রকম একটা ধারণা হতে থাকে। ছোটবেলায় ভাবতাম, টম সোয়েইয়ারের মতো বাঁচা উচিত। পরে আউরবাখের উপন্যাস 'স্পিনোজা' আমাকে প্রভাবিত করে [জার্মান ইহুদী লেখক বারথোল্ড আউরবাখের (১৮১২-৮২) 'স্পিনোজা' প্রকাশিত হয় ১৮৩৭ সালে]। বিশেষ করে ধর্ম ও ধর্মীয় নৈতিকতার বিরুদ্ধে স্পিনোজার লড়াই,' (পৃষ্ঠা ২৮)।

হোমর, শেক্সপিয়র এবং তৎকালীন ধ্রুপদী সাহিত্যের সিঞ্চনে জমি তৈরি হচ্ছিল বলেই এ্যাডির প্রতীকী লিরিক কবিতার কাছে সহজে পৌছেছিলেন লুকাচ। ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে এ্যাডির কবিতা ভালো লাগা নয়, কবিতার মধ্যেই এ্যাডিকে চেনা, যেমন জানা শেক্সপিয়র; হোমর, মার্ক টোয়েন বা আউরবাখকে। মায়ের দৌলতে জার্মান ভাষায় দক্ষতার জন্য জার্মান দর্শন আর পৃথিবীর ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলেও নিজের শিকড় যে দেশে প্রোথিত, সেই হাঙ্গেরিই এতদিন অজানা ছিল। এ্যাডির কবিতায় তিনি প্রথম সেই মাটিকে চিনলেন। 'একথা হয়তো বলা যায়, হাঙ্গেরি মানেই

আমার কাছে ছিল এ্যাডির কবিতা' (পৃষ্ঠা ৩৯)। শুধু দেশকেই চেনা নয়, যে জার্মান দর্শনের প্রভাবে গড়ে উঠছিল লুকাচের তত্ত্ববিশ্ব, কাণ্ট থেকে হেগেলে যাবার পথে যে সংরক্ষণশীলতার চাপ ছিল, এ্যাডির কবিতা সেই পথকে সহজ করে দিল, নিজের চিন্তাকে মুক্তবিহারের স্বাধীনতা উজ্জীবিত করে, যে উজ্জীবনের সঙ্গীত লুকাচ শুনছিলেন হেগেলের 'ফেনোমেনোলজি' আর 'লজিক'-এর ভেতর। ১৯০৬-এ এ্যাডির 'নিউ পোয়েমস' প্রকাশের পর লুকাচের মনে হয়েছিল, বামপন্থী ও সীমার-ভেতর বৈপ্লবিক মনোভাব নিয়ে দাঁড়াবার সময়েও একজন ব্যক্তি একই সময়ে হেগেলপন্থী ও মানবশাস্ত্র বিভাগের প্রতিনিধি হতে পারেন। আর লুকাচই বোধহয় হাঙ্গেরির প্রথম বুদ্ধিজীবী, বিপ্লবের সঙ্গে এ্যাডির মানসিক নৈকট্যের দিকটা যিনি উন্মোচিত করলেন, কারণ আত্মবোধন, এ্যাডির কাছে, বিপ্লব ছাড়া হয় না। লুকাচের তত্ত্ববিশ্বের রূপরেখায়, লুকাচ নিজেই বলছেন, এ্যাডির কবিতায় পৌঁছুনো কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বয়ঃসন্ধির উন্মাদনাও না। হোমার, শেকস্পিয়ার, টম সোয়েইয়ার ও জার্মান দার্শনিকতার পারিবারিক বাধ্যতায় এ্যাডির কবিতাই হতে পারে লুকাচের আধুনিকতার আততির যোগ্য সমর্থন। অর্থাৎ ২১ বছরের আধুনিকতার জমি তৈরি হচ্ছিল এক যুগ আগে থেকেই।

মাঝখানে অবশ্য ঘটে গেছে নানা বদল। স্কুলে, লুকাচের ইচ্ছে ছিল, ভালো ছেলে হয়ে থাকবার, অথচ সহপাঠীরা পড়ুয়াও বলবে না। একবার একটি ছেলে ক্লাশে পেটের মধ্যে মারে। লুকাচ তাকে পিঠে আঘাত করেন। লুকাচকে মাস্টারমশায় দেখে ফেলায় তিনি লুকাচকে শাস্তি দেন, লুকাচ প্রতিবাদ করলেও। ফিফথ ফর্মের সেদিনকার লজ্জা মনে ছিল সারা জীবন এবং, লুকাচ লিখছেন আত্মজীবনীতে, সারা জীবন তাঁর প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করেছে। 'জনজীবনের শৃঙ্খলা আমি যে এত মানি, তার কারণ বোধহয় ফিফথ ফর্মের সেই লজ্জা। মনে হয়, এ ধরনের লজ্জার অভিজ্ঞতা জীবনে সদর্থক প্রভাব ফেলে' (পৃষ্ঠা ২৯)।

সামাজিক মূল্যবোধের একটা ব্যবহারিক স্বতন্ত্র বিধি লুকাচ ঐ সময়েই গড়ে নিয়েছিলন। এখনকার সম্ভ্রান্ত বুর্জোয়া পরিবারে গৃহশিক্ষক, বিশেষ করে শিক্ষিকাদের, একটু হেয় চোখে দেখা হত। শিক্ষিত ভৃত্য হিশেবে তাঁদের মনে করা হলেও লুকাচ প্রথম থেকেই এই গভর্ণেসদের দিকেই থাকতেন। যে স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের কথা লুকাচ লিখেছিলেন, এই কৈশোরক সিদ্ধান্ত তারই অংশ। স্বীকৃত সামাজিক বিধিকে অস্বীকার করে নিজের মূল্য-

বোধের সামাজিক শ্রেণীলগ্নতা নির্ধারণ নিশ্চিত, বুর্জোয়া মূল্যবোধের ভেতর বড় হবার সময়, একটা বড় পদক্ষেপ।

হাঙ্গেরির কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক গিয়ুলা ইলিয়েস (১৯০২-১৯৮২) বলেছিলেন, লুকাচের ইহুদি উত্তরাধিকার হলেও, ইহুদি প্রতিহিংসার মানসিকতা তাঁর বিপ্লবী হয়ে ওঠার পক্ষে কোনো প্রভাব ফেলে নি। ফেলতে পারে না, কারণ লুকাচ নিজেই তো স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছেন বুর্জোয়া জীবনযাপনের সহজ সুযোগ। আত্মার পিতৃদায় থেকে যে নতুন তত্ত্ববিশ্বে নিজের আশ্রয় নির্মাণ লুকাচের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য, সেই প্রক্রিয়ায় সচেতন আত্মনিক্ষেপে লুকাচের 'কোনোদিন মনেই হয় নি যে আমি ইহুদি। ইহুদি বংশে জন্মেছিলাম, এটুকুই সত্য, অন্য কোনো অর্থ নেই আর।' লুকাচ আত্মজীবনীর প্রথমেই বলেন, 'শুদ্ধ ইহুদি পরিবারের ছেলে। সেই কারণেই জুড়াইজমের তত্ত্ব কোনো প্রভাব ফেলে নি আত্মিক বিকাশে।' 'সেই কারণেই' কথাটা গুরুত্বপূর্ণ লুকাচের মতে, এই জন্যে যে লিওপোল্ডস্টাদৎ এলাকা সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে ধর্মের প্রভাব সে অর্থে ছিল না। আচার অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিশেবে প্রথাগত যেটুকু চল, তাছাড়া ইহুদি ধর্মের ব্যাপারে সবাই স্বভাবতই ছিলেন উদাসীন। এমন কী ইহুদি সমস্যা তখন থাকলেও লিওপোল্ডস্টাদৎ এলাকার সামাজিক শ্রেণীচিহ্ন ছিল এ্যারিস্টোক্র্যাট। তাই ইহুদি বংশজাত হলেও এই ঘটনা লুকাচের মানসিক ও সামাজিক বিকাশে কোনো প্রভাব ফেলে নি। কিসফাল্ডি সোসাইটির পুরস্কার 'ক্রিস্টিনা লুকাচ প্রাইজ' পাবার ঘটনাও তাঁর ইহুদি বংশজাত উত্তরাধিকারকে অবান্তর করে তোলে, কারণ বিওথি সোল্ৎ (১৮৪৮-১৯২২) ও বেরনাত আলেক্সাণ্ডারের (১৮৫০-১৯২৭) মতো হাঙ্গেরির বুদ্ধিজীবীরা লুকাচকে স্বীকৃতি দেন। ভুলভাবেই, কারণ বিওথি ছিলেন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মানসিকতায় ভরা, সাহিত্যেও থাকবে সেই স্বদেশাত্মার ছবি আর এই জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসে তাঁর কাছে সবচাইতে গ্রহণযোগ্য শ্রেণী ছিল জেন্ট্রি। পরে তিনি সব প্রগতিশীলতারই বিরোধী হয়ে ওঠেন। কিন্তু লুকাচের ক্ষেত্রে এই জাতীয়তাবাদী চক্রের স্বীকৃতিতে তাঁর ইহুদি উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গ সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ অবান্তর হয়ে যায়।

কিন্তু স্বীকৃত সমাজ বিধিকে সচেতনভাবে ত্যাগ করলে নিজেকে খুঁজে নিতে হয় পরিপূরক কোনো কাঠামো। ১৫ বছর বয়সে বয়ঃসন্ধির একাকিত্ব নিয়ে লুকাচের প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে বই এবং লেখা। 'প্রত্যেক কিশোরের মতোই আমি খুব বই পড়েছি। আগে অনেক বই আমাকে নাড়া দিয়েছে,

কিন্তু ১৫ বছরে পা দিয়ে মনে হল, 'নিজেও বোধ হয় লেখক হতে পারি' (পৃষ্ঠা ৩০)। ধ্রুপদী সাহিত্য ও এ্যাডির কবিতা দিয়ে যে প্রাথমিক তত্ত্ববিশ্ব গড়ার কাজ চলছিল, বাবার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বই পড়া। মেসিয়ারোসা বলছেন তাঁর লেখায়, এই সংগ্রহ থেকে সিমন স্যুডফেল্ড ওরফে ম্যাক্স নরডু-র (১৮৪৯-১৯২৩) লেখা 'ডিজেনারেশন' বইতে ইবসেন, তলস্তয়, বোদলেয়ার, স্যুইনবার্ন প্রভৃতির সূত্রে অবক্ষয়ের চেহারা সম্পর্কে প্রথম সচেতন হলেন লুকাচ। কথাটা আংশিক সত্য। আসল কথা লুকাচ নিজেই বলছেন আত্মজীবনীতে, পারিবারিক ট্রাডিশনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তলস্তয় ও ইবসেনকে তাঁর তত্ত্ব-বিশ্বের প্রধান পুরুষের আসন দিলেন তিনি—'আমি একেবারে মোহিত হয়ে গেলাম, এবং আমাদের পরিবারে তাঁরা অবজ্ঞাত হলেও ইবসেন ও তলস্তয়ের বিহ্বল সমর্থক হয়ে পড়ি। ছোট ছোট 'রিক্লাম' এডিশনে তাঁদের লেখা সংগ্রহ করে পড়তে থাকি। সেই ১৫ বছর বয়সেই আমি পশ্চিমী মানে চূড়ান্ত এক আভা গার্দ দৃষ্টিভঙ্গি পেয়ে যাই' (পৃষ্ঠা ৩০)। 'আমাদের পরিবারে তাঁরা অবজ্ঞাত'—এই বাক্যটি আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। পারিবারিক প্রভাবের প্রকৃষ্ট পরিবেশ সত্ত্বেও, তাকে পেরিয়ে, ইহুদি হিশেবে নিজেদের পারিবারিক ধর্মীয় উত্তরাধিকার সম্পর্কে উদাসীন থেকেও, নরডু-র মতো একজন জিওনিস্টের বই থেকে লুকাচ ঐ বয়ঃসন্ধিতে বেছে নিলেন এমন লেখকদের, প্রায় আট দশক জোড়া সহবাসের সিদ্ধান্ত এলো তখনই।

হাঙ্গেরির নাট্যকার এলেক বেনেডেক (১৮৫৯-১৯২৯) ও তার পুত্র লুকাচেরই বয়সী সাহিত্যিক মাসরেল বেনেডেকের (১৮৮৫-১৯৭০) একটা নৈতিক প্রভাব ছিল লুকাচের ওপর। স্বতন্ত্র তত্ত্ববিশ্বের একটা নির্দিষ্ট গড়ন পাবার সময় লুকাচ যে সাহিত্যচর্চার দিকে ঝুঁকবেন, সেটা স্বাভাবিক। নাটক লিখেছিলেন হপটমান ও ইবসেনের ধাঁচে, 'কী সৌভাগ্য, সেগুলোর কোনো চিহ্ন নেই আর।...১৮ বছর বয়সেই আমার সব পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলি।' কিন্তু লেখার সূত্রেই লুকাচ সেই সময়ে সমালোচনা সাহিত্যের প্রথম স্বাদ পেলেন। আলফ্রেড কার-এর ইমপ্রেশনিস্টিক স্টাইলে 'মাগিয়ার জালন' বা 'হাঙ্গেরিয়ান সালোজ' পত্রিকায় নাট্য সমালোচনা করেছিলেন, স্বনামে, সিকৃস্থ কর্মে থাকতেই, লুকাচের মতে অবশ্য, মূলত প্রিমিয়ার শো-র টিকিট সম্পাদকের পক্ষে পাওয়া সহজ হতো বলেই। ১৮ বছরের দুঃসহ সময়ে, বাড়ির পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে যেমন এর আগে গ্রহণ করেছিলেন ইবসেন আর তলস্তয়ের মহান ঐতিহ্য, তেমনি তৎকালীন স্বীকৃত ও বহুলপ্রচারিত, পরিচিত হাঙ্গেরির

সমালোচকদের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করলেন লুকাচ। স্যাণ্ডর ব্রডি (১৮৬৩-১৯২৪) বিংশ শতাব্দীর হাঙ্গেরিতে সবচাইতে সম্মানিত ঔপন্যাসিক-দের একজন; প্রকৃতিবাদ ও 'আর্ট নভ্যু' আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা এই নাট্যকারের 'আইডিলস অব দ্য কিংস' ন্যাশনাল থিয়েটার প্রযোজনা করে। চলে নি তো বটেই, ব্রডিকে দেশাত্মবোধহীনতা, হাঙ্গেরির ইতিহাসের বিকৃতির দায়ে অভিযুক্ত করা হলো। সমস্ত বুদাপেস্টের সমালোচকরা তীব্র নিন্দে করেছিলেন। একমাত্র লুকাচ, তখন নেহাতই স্কুলের ছাত্র, সমর্থন করেছিলেন ব্রডির নাটককে, অন্য সমালোচকদের নিন্দের ঐকমত্যকে অবজ্ঞা করে। এ্যাডিও সমর্থন জানান, কিন্তু লুকাচ সেকথা জানতেন না। ব্রডির পত্রিকা 'দ্য ফিউচার'-এ লুকাচ লেখেন। কিন্তু মতপার্থক্য হবার পর তাঁর সঙ্গে ব্রডির ভাব থাকে না আর। ১৫ থেকে ১৮ বছর অধ্যায়কে 'কৈশোরক পল্লবগ্রাহীতা'-র পর্ব বলে লুকাচ বর্ণনা করলেও, মনে রাখতে হবে এবং লুকাচের সম্পর্কে কোনো রচনায় এ কথা ঠিকভাবে ব্যাখ্যাতও নয়, যে, স্বীকৃত সামাজিক বিধির বাইরে গ্রহণ-বর্জনে নিজের স্বতন্ত্র মানসপৃথিবী কিন্তু লুকাচ তৈরি করছেন ঐ পর্বের নানা সংকট উত্তরণের মধ্যে দিয়ে—এ প্রক্রিয়া বাদ দিলে লুকাচের বিকাশ বোঝা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। লুকাচ আত্মজীবনীতে এ ব্যাপারে অত্যন্ত স্পষ্ট,-'সমালোচক ও লেখক হিশেবে আমার লেখা কাঁচা হলেও নিজের একটা পথের সন্ধানে মগ্ন ছিলাম' (পৃষ্ঠা ৩২)। সেই পথের সন্ধানে মাইলস্টোন কখনও হোমর, শেকস্পিয়র, এ্যাডি, বা কোনো পরিবার আর সামনে গড়ে উঠছে এক নতুন মানস নির্মাণ। এরকমই এক পরিবার, 'বানোৎসি ফ্যামিলি' আর সেই পরিবারের প্রধান পুরুষ, শতাব্দীর বদলে হাঙ্গেরির নাট্যজগতের বিপ্লবী লাজোল বানোৎসি। লুকাচ বলছেন. তত্ত্ব ও ইতিহাসের অকৃত্রিম পর্বের প্রথম শিক্ষা তিনি পেয়েছেন এই পরিবারের কাছ থেকে। লাজোলের বাবা জোসেফের প্রসঙ্গে লুকাচের মনে আসে—যেকোনো পল্লবগ্রাহীতাকেই উনি 'এপিকিউরিক্ত' শ্লেষ নিয়ে দেখতেন। যে ইমপ্রেশনিস্ট স্টাইলকে তিনি মনে করতেন সঠিক, লুকাচ ঘুরে দাঁড়ালেন সে দিক থেকে—চার বছর কিছু লেখেন নি।

গেটে যাকে বলেছেন, 'কিছু করার জন্য নিজেই কিছু হয়ে ওঠা', লুকাচের এই হয়ে-ওঠার পর্ব, প্রাথমিক নৈঃসঙ্গ্য ও নতুন তত্ত্ববিশ্ব গড়ে তোলার অনিশ্চিত সময়ে এই পরিবারের প্রভাবে ইমপ্রেশনিস্ট স্টাইল থেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নতুন সংকটই তৈরি করে, কারণ কার ও ব্রডির অবলম্বনে যে আশ্রয়

তিনি পেয়েছিলেন, তা থেকে সরে এলে নতুন তাত্ত্বিক অবলম্বন খুঁজতে হয় লুকাচকে। 'থালিয়া সোসাইটি' গঠন এর পরের পদক্ষেপ, সে ঘটনা অনেকেরই জানা। আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে 'থালিয়া সোসাইটি' থেকেই, লুকাচের মতে তত্ত্বের সিরিয়স পঠন শুরু, ইমপ্রেশনিস্টিক সমালোচনার ঝোঁকের বদলে জায়গা করে নেয় জার্মান দর্শন, নন্দনতত্ত্ব, কাণ্ট, আধুনিক চিন্তাবিদ ডিলথে ও সিমেল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, মেসিয়ারোস বা সেই অর্থে আধুনিক দার্শনিক গিওর্গি বেনস ও ইয়ানোস কিস সিমেল ও অন্যান্যদের প্রভাবের কথা লিখেছেন, সেখানে পৌঁছুতে লুকাচকে পেরতে হয়েছে এই দীর্ঘ, জটিল, কঠোর চিন্তাগত বিবর্তন। 'থালিয়া সোসাইটি' তাঁকে বুঝিয়ে দিল যে, তিনি লেখক ও প্রযোজক হবার মতো ক্ষমতা রাখেন না। কবিতা? 'নেভার।' ডেভিড ও লিও পপার তাঁকে প্রথম শেখান, 'শিল্পের ক্ষেত্রে ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।' 'ক্রিস্টিনা প্রাইজ' তাঁকে বিষণ্ণ করেছিল, কারণ লুকাচের মনে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর লেখায় কোনো গলদ আছে।

আসলে, তখন 'অবস্থা বদল করবার' ঝোঁক লুকাচের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে, বিশেষ করে হাঙ্গেরির সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায়। কিন্তু তত্ত্ববিশ্ব গড়ে তোলার কৈশোরক সংকট যখন বদলে যাচ্ছিল পরিণত সৃজনশীলতার সংকট ও তা উত্তরণের সংগ্রামে, লুকাচ তখন 'নিজের পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত··· পরিবারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই ছিল না। আমরা মা, তাঁর বিচক্ষণ স্বভাবে, বুঝেছিলেন কী ঘটছে। বুকের ক্যান্সারে অসুস্থ হয়ে তিনি মারা যান। পরিবারের অন্যান্যদের চাপে তাঁকে চিঠি লিখতে বাধ্য হই। পেয়ে মা বলেছিলেন, 'গেঅর্গ যখন চিঠি লিখেছে, তখন সত্যিই আমি খুব অসুস্থ' (পৃষ্ঠা ৩৫)। আমাদের মনে থাকে, এই মায়ের প্রভাবেই কিন্তু দর্শন ও সাহিত্যের কাছে পৌঁছুতে পেরেছিলেন লুকাচ। অথচ সেই মা, গোটা পরিবারের সঙ্গে এমন সম্পূর্ণ বিযুক্তি লুকাচের কাছে নিশ্চয়ই খুব সুখের ছিল না, 'হয়ে-ওঠা'-র সমস্যা তাতে আরও বেড়েছে।

এই সংকটপর্বেই কিন্তু লুকাচ এগিয়ে চলছিলেন 'সাহিত্যের চৌকাঠের দিকে।' তাঁর আত্মজীবনী ছাড়া জানাই যেত না, হিউগো হেবইগেলসবার্গ ওরফে ইগনোটাস (১৮৫৯-১৯৮২) 'নিউগত' বা 'দ্য ওয়েস্ট' পত্রিকার সম্পাদক হিশেবে ও সমালোচক হিশেবে তাঁর দক্ষতায়, প্রকৃতপক্ষে লুকাচকে আত্ম-আবিষ্কারে সাহায্য করেন। লুকাচ ইগনোটাসকে বলেছেন, 'মাই থার্ড ডিসকভারার।' 'সোল এ্যাণ্ড ফর্ম' যাকে উৎসর্গ করেছিলেন, কমিউনিস্ট

এরনো সেইডলারের বোন, শিল্পী ইরমা সেইডলার আসেন তাঁর জীবনে, ১৯০৭ সালে। 'তাকে ভালোবাসা বলা যাবে কি না, সেটা প্রশ্ন নয়, আসলে ১৯০৭ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত আমার বিকাশে তাঁর প্রভাব সাংঘাতিক। ১৯১১ সালে তিনি আত্মহত্যা করেন। তার পরে 'অন পভার্টি ইন স্পিরিট' বলে একটি প্রবন্ধ লিখি, তাতে ইরমার মৃত্যু ও আমার অপরাধবোধ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে' (পৃষ্ঠা ৩৭)।

লুকাচ ১৯১১ সাল নাগাদ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, 'পরবর্তী জীবনে যে ঘটনার প্রভাব অপরিসীম' বলে লুকাচ মনে করেন। বার্লিনে যাবার আগে পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাস ছিল, 'লিটেরারি হিস্টোরিয়ান'-দের প্রভাব পড়ে ঘটনা প্রবাহে। কিন্তু সেখানে তখন ঘোর বিতর্ক চলছিল, গেটের 'হেবরদার'-এ লেটে-র চোখের রঙ কেমন। একদল বলেছিলেন, তার চোখ ছিল নীল, অথচ আসলে তা ছিল কালো। এ নিয়ে এক লেখক আবার বইও লিখে ফেলেন। সমালোচক, লেখক, শিল্প অনুরাগী, পাক্ষিক 'নিউগাৎ'-এর প্রধান অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষক লাজোস ব্যারন হাৎভানি (১৮৮০-১৯৬০) এ ধরনের বিতর্ককে বলেছেন, 'দ্য নলেজ অব হোয়াট ইস নট ওয়র্থ নোইং।' আত্মজীবনীতে হাৎভানি-র এই কথাটি ব্যবহার করেন লুকাচ (যদিও হাৎভানি-র একটি বইয়ের নাম কথাটি) তৎকালীন সমালোচনা সাহিত্যের প্রতি মোহভঙ্গের তীব্রতা বোঝাতে। আর এই মোহভঙ্গে লুকাচ নৈঃসঙ্গ্য ও প্রাথমিক অন্বেষণের স্তর পেরিয়ে পৌঁছলেন নতুন এক অধ্যায়ে—সৃজনশীলতার সংকট। আর 'লিটেরারি হিস্টরি' থেকে তিনি আশ্রয় পেলেন দর্শনে, সিমেল ও ম্যাক্স ওয়েবারের প্রভাবে। শিল্পের সামাজিক চরিত্র সম্পর্কে লুকাচকে সচেতন করেছিলেন সিমেল, নাটকের ওপর লেখা বইতেও মূলত সিমেলের দার্শনিক মতবাদ প্রতিফলিত। ওয়েবারের প্রভাব অবশ্য আরও বেশি, অকপটে স্বীকার করেছেন লুকাচ। সিমেলের মধ্যে এক ধরণের চাপল্য লক্ষ্য ছিল লুকাচের মতে সেদিক থেকে ওয়েবার ছিলেন সিমেলের চপলতাহীন, সাহিত্যের সম্পূর্ণ তত্ত্ব নির্ণয়ের দিকেই মনোযোগ ছিল তাঁর। ওয়েবারকে লুকাচ একবার বলেন, যদিও কান্টের মতে নান্দনিক নির্যাস প্রধানত নান্দনিক বিচারের ওপর নির্ভরশীল, 'আমি মনে করি, নান্দনিক বিচারের এমন কোনো অগ্রাধিকার নেই।...'শিল্পকর্ম তো আছেই নিয়ত, তাহলে তাদের সম্ভাব্য বলি কী করে?' এই প্রশ্ন ওয়েবারকে করি। তিনি খুব নাড়া খেয়েছিলেন প্রশ্নটিতে। 'হাইডেলবার্গ ইসথেটিকস্'-এর প্রধান বিচার্য বিষয় এটাই।' লুকাচ নিজেই

বলছেন, ১৯০৮ নাগাদ হাঙ্গেরির সামাজিক ও শিল্প জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে কোনো মূল্যায়ণ সাহিত্যিক ইতিহাসে পাওয়া যাবে না।

প্রাথমিক সত্তাসংকটের পর্ব থেকে লুকাচ যখন পৌছুলেন সৃজনশীলতার সংকটে, তখন প্রথম বুঝলেন, যে কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তিনি উৎসাহী, তাঁদের সঙ্গে আত্মার যোগ, তিনি মনে করলেও, আসলে তা নেই। এ্যাডি বা সমসাময়িক বার্তোক, বা সেই অর্থে এরউইন জাবো-র প্রতিও ব্যক্তিগত নৈকট্য-বোধ ছিল অনুপস্থিত, যদিও হাঙ্গেরির চিন্তাবিদদের মধ্যে জাবোর কাছেই লুকাচ সবচাইতে বেশি কৃতজ্ঞ। জাবোর সঙ্গে এলোমেলো সম্পর্ক হলেও, তৎকালীন 'একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিরোধী সোশালিস্ট আন্দোলন ফরাসী সিণ্ডিক্যালিজমের কাছে' লুকাচকে নিয়ে যান এই জাবো। তাঁর সঙ্গে অবশ্য 'ফাইন আর্টসের' অনেক লোকের সঙ্গে সখ্যতা ছিল, যেমন, মার্ক ভেডরেস, কারোলি ফেরেনজি, এ্যালক ফেনিয়েস, রিপল রোনাই। কিন্তু, লুকাচ বলছেন, হাঙ্গেরির সমালোচকদের একটি অংশ তখন ভায়া প্যারিস নানা পশ্চিমী ধ্যানধারণা আমদানী করতেন নির্বিচারে এবং যতোই তা মাঝারি বা নিম্নমানের হোক না কেন সেই মূল্যায়ন হাঙ্গেরির সংরক্ষণশীলতায় চালিয়ে দেবার চেষ্টায় থাকতেন। 'নিউগত'-এর সম্পাদক ও নামকরা সমালোচক এরনো ওসভাতকে লুকাচ এই 'সম্ভ্রান্ত সংরক্ষণশীলতার' কারণেই সহ্য করতে পারতেন না, যেমন জেলিটান আমক্রস বা সেই স্কুলের সমালোচনার ধারা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। বিদেশী মূল্যায়নের নির্বিচার আমদানীতে ওসভাত ও তাঁর মতো অন্যান্যদের সাহিত্যিক বিচারে হাঙ্গেরির প্রাসঙ্গিকতা জায়গা পায় নি, ফলে তাদের প্রায় সব মতামতই ইতিহাস ভুল বলে প্রমাণিত করেছে। ওসভাতের রচনাসংগ্রহ ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হবার পর বোঝা গেল, যে সব লেখককে উনি বাতিল করেছিলেন কলমের এক আঁচড়ে তাঁরা হাঙ্গেরির সাহিত্যে তখন সুপ্রতিষ্ঠিত, অথচ বিস্মৃত ও অপঠিত ফেরেনচ হারচেগ (১৮৬৩-১৯৬৪) বা ইস্তভান জোমাহাজি (১৮৬৪-১৯২৭) ওসভাতের কাছ থেকে পেয়েছিলেন অকুণ্ঠ প্রশংসা। লুকাচ আত্মজীবনীতে বলছেন, ওসভাত সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বিরোধী এই মূল্যায়ন, কিন্তু সাহিত্যিক ও শিল্পগত বিচারে ওসভাত সম্পর্কে এই বিচারই সঠিক। এমনকি নস্যাৎ করবার উৎসাহে ওসভাত একবার বলেছিলেন, 'হেগেল? ও তো লিখতেই জানে না।' লুকাচের আত্মজীবনীতে এই ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়াতে এভাবেই লুকাচ আত্মপ্রকাশের প্রকৃত মাধ্যম

খুঁজে বেড়াবার পর্ব থেকে উত্তীর্ণ হলেন সৃজনশীলতার পর্বে—রুশবিপ্লব প্রথম মহাযুদ্ধের দোরগোড়ায়—সাহিত্যের ইতিহাস থেকে দর্শনের নবদিগন্তে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হাঙ্গেরির বুদ্ধিজীবিদের নানাভাবে ভাগ করে দিল। লুকাচ শুরু থেকেই এ যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। এমনকি সিমেল ম্যাক্স ওয়েবারের স্ত্রী ম্যারিআনকে ১৯১৪-র অগাস্টে চিঠি লেখেন যে যুদ্ধের সহনীয়তা বুঝতে হয় স্বজ্ঞায়; লুকাচ যদি এটা না বোঝে, তাহলে ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করে লাভ নেই। যুদ্ধ নিয়ে লুকাচের বিশ্লেষণ তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন: 'রুশ বাহিনীকে জার্মান ও অস্ট্রিয়ান সৈন্যরা পরাজিত করতে পারে; তাহলে রোমানোভদের পতন হবে; সেটা ঠিক আছে। কিন্তু ফরাসী ও বৃটিশদের হাতে জার্মান ও অস্ট্রিয়ানরা হারতে পারে। তাহলে হাপসবার্গ ও হোহেনজোলার্নরা ক্ষমতাচ্যুত হবে। এটাও ঠিক আছে। কিন্তু পশ্চিমী গণতন্ত্রের হাত থেকে আমাদের কে বাঁচাবে? এই প্রশ্নের সমাধানই প্রধান সমস্যা…সেদিক থেকে ১৯১৭-র বিপ্লব আমাদের কাছে এক বিরাট অভিজ্ঞতা, কারণ অন্যরকম ব্যবস্থাও যে সম্ভব তা প্রমাণিত হলো' (পৃষ্ঠা ৪৪)।

হাঙ্গেরিতে তৎকালীন দুর্নীতির সুবিধে থাকায়, লুকাচের বাবার যোগাযোগে পাওয়া মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের জোরে লুকাচকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হয় নি। আত্মকথায় তিনি স্পষ্ট লিখেছেন, 'আমার কোনো জীবনী থেকেই এ ঘটনা বাদ দেওয়া উচিত না। ক্রেডিট ব্যাঙ্কের ডিরেকটরের ছেলে হয়ে জন্মাবার ঘটনাটির কোনো সাহিত্যিক প্রভাব হয়তো নেই, খুব শাদামাটা ভাষায় বলতে গেলে প্রভাব আছেও। এইসব যোগাযোগ না থাকলে, কে বলতে, পারে কোনো রুশ ক্যাম্পে আমাকে মরতে হত!' (পৃষ্ঠা ৪৬)। শুধু পশ্চিমি গণতন্ত্র থেকে বাঁচবার জন্যই নয়, লুকাচ, একটু ঠাট্টা করেই বলেছেন, যুদ্ধবিরোধী হবার কারণ তিনি মৃত্যুকে ভয় পেতেন।

জীবনে যখন তীব্র দ্বন্দ্ব, চারিদিকে মৃত্যুর উল্লাসের মাঝখানে প্রথম স্ত্রী এলেন— ইয়েলেনা গ্রাবেংকো। রুশ এই মহিলা সোশাল রিভল্যুশনে বিশ্বাসী ছিলেন। যুদ্ধের সময় লুকাচ ও গ্রাবেংকো আলাদা থাকতেন আর্থিক সাহায্য আসত প্রধানত লুকাচের কাছ থেকেই। যদিও লুকাচের সঙ্গে গ্রাবেংকোর সম্পর্ক থাকে নি বেশিদিন, লুকাচ গ্রাবেংকো সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান মহিলা ছিলেন। অসম্ভব দক্ষ প্রতিভাবান শিল্পী বলে তাঁর খ্যাতি তো ছিলই' (পৃষ্ঠা ৪৭)। গ্রাবেংকোর একটি মন্তব্যের কথা লুকাচ বার বার উল্লেখ করেছেন। ১৯১৯ সালে হাঙ্গেরিয়ান সোভিয়েত

রিপাবলিকের প্রধান নেতা বেলা কুন-কে (১৮৮৬-১৯১৯) দেখে ইয়েলেনার মনে হয়েছিল, বালজাকের বহু উপন্যাসের খুনী, ভদ্রের মতো দেখতে যেন। লুকাচের সঙ্গে কুনের সম্পর্ক ভালো ছিল না, লুকাচ ল্যাণ্ডলার ফ্যাকশনের দিকেই ঝুঁকেছিলেন বেশি। কুনের সম্পর্কে গ্রাবেংকোর এই বর্ণনা, লুকাচ মনে করেন, যেমন কুন-কে চিনতে সাহায্য করে, তেমনি গ্রাবেংকোর বিচক্ষণতাও বুঝিয়ে দেয়।

যুদ্ধে যখন পৃথিবী ভাঙছিল, বিবাহবিচ্ছেদে ভাঙছিল লুকাচের মন, ঠিক সেই জটিল সময় জুড়েই লেখা হয় 'দ্য থিয়োরি অব দ্য নভেল'। ফিকটের প্রভাবে, জার্মান দার্শনিকতার ধাঁচে, লুকাচ সেই গোটা যুগকেই পাপের যুগ বলে বর্ণনা করলেন। নৈতিকভাবে, এই যুগ ভর্ৎসনা ও শিল্প প্রশংসার, যোগ্য, লুকাচ বলেন; শিল্প প্রশংসার যোগ্য তখনই, যখন তা এই যুগের বিরোধিতা করে। এই তত্ত্ব থেকে রুশ সাহিত্য, বিশেষ করে তলস্তয় ও দস্তয়েভস্কি, লুকাচের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন, কারণ রুশ সাহিত্যেই বোঝা গেল একটি প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থাকে পচা শেকড়বাকড় শুদ্ধ কীভাবে প্রকাশ করা যায়। ধনতন্ত্রের কোনো বিশেষ ত্রুটি হয়তো আলাদাভাবে তাঁদের রচনায় নেই, কিন্তু গোটা ব্যবস্থার পাশবিকতা তাঁরা ধরেছেন। উপন্যাস ও ইতিহাসের এই যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার অন্বেষণ নিঃসন্দেহে তখন চমকে দিয়েছিল তৎকালীন সমালোচকদের। 'তলস্তয় ও দস্তয়েভস্কি পৃথিবীর বিপ্লবী সাহিত্যের শিখর, আমার এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই ঠিক নয়; কিন্তু বুর্জোয়া সাহিত্যের কাঠামোর ভেতর হলেও বইটিতে বিপ্লবী উপন্যাসের তত্ত্ব অনুসন্ধানের একটা চেষ্টা আছে। সে সময় এমন চেষ্টার কথা ভাবাও যেত না। ত-কালীন উপন্যাসের তত্ত্ব ছিল সংরক্ষণশীল—শিল্পগত ও আদর্শগত দিক থেকে। আমার তত্ত্ব সমাজতান্ত্রিক অর্থে বৈপ্লবিক ছিল না, কিন্তু তখনকার মানদণ্ডে বিচার করলে নিশ্চয়ই' (পৃষ্ঠা ৪৮)। ফিকটে 'এজ অব এ্যাবসলিউট সিনফুলনেস' যদিও 'থিওরি অব দ্য নভেল' সম্পর্কে খাটে, তবে সেটা নঞর্থক দিক; কিন্তু লেনিন যাকে বলেছিলেন আগাগোড়া সমাজ বদলের প্রেরণা, 'থিওরি অব দ্য নভেল'-এ সেই মাত্রা ছিল না।

'সানডে ক্লাব' ও 'গালিলেও সার্কল'-এর নানা নৈতিক ও সাহিত্যিক প্রভাব লুকাচকে নিয়ে যাচ্ছিল নন্দনতত্ত্বের প্রশ্নের মুখোমুখি। প্রাথমিক গড়ে-ওঠার পর্বে সাহিত্যিক ইতিহাস থেকে দর্শনের মধ্যে দিয়ে, এখন নতুন পরিণত সৃজনশীলতার সংকটে লুকাচ পৌছুলেন নন্দনতত্ত্বে, পরে এথিকসে, সেই

সূত্রে বিপ্লবে—'মাই ইনটারেস্ট ইন এথিকস লেড মি টু দ্য রেভলুশন' (পৃষ্ঠা ৫৩)। লুকাচ প্রথম 'এথিক্যাল কনফ্লিক্ট' বা নৈতিক দ্বন্দ্বের প্রশ্ন তোলেন—অনৈতিক কাজও কখনো কখনো সঠিক পদক্ষেপ হয়ে ওঠে। ফ্রিডরিশ হেবেল-এর নাটক 'জুডিথ'-এ নায়িকার মানসিক দ্বন্দ্ব হয়তো লুকাচের এই নৈতিক দ্বন্দ্বের তত্ত্বকে প্রভাবিত করেছে, লুকাচের 'এথিক্যাল কনফ্লিক্ট'-কে 'হেবেলস প্রবলেম' বা 'জুডিথ্স ডিলেমা'-ও বলেন অনেকেই। মনে রাখা দরকার, ১৯১৮-তে কারোলি-র 'অটাম রোজ রেভলুশন' (হাঙ্গেরির ঐ বিপ্লব ছিল রক্তপাতহীন, বিক্ষোভকারীরা শরতের গোলাপ মাথায় জড়িয়ে মিছিলে আসতেন) হয়ে গেলে ১৯১৮-র ডিসেম্বরে ৩৩' বছর বয়সে লুকাচ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন—লুকাচের সারা জীবনকে প্রভাবিত করবে যে সিদ্ধান্ত। সৃজনশীলতার সংকটপর্বে, এই বিলম্বিত অথচ পরিণত সিদ্ধান্ত নিতে হল 'ব্যালান্সিং অব একাউন্টস' হিশেবে 'ট্যাকটিকস এ্যাণ্ড এথিকস' লিখতে লিখতে। জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের নৈকিতার সমর্থন খুঁজতে হচ্ছিল নৈতিকতার সিদ্ধান্তের বিচারে। মার্কসবাদ সম্পর্কে পল্লবগ্রাহী ধারণার সেই পর্বেও মার্কস ও লেনিন হয়ে উঠলেন লুকাচের প্রধান পুরুষ। কিন্তু লুকাচের কাছে রাজনীতির সব প্রশ্নই তত্ত্বগত; কারণ, 'এ্যাকটিভ' রাজনীতিতে লুকাচ কখনোই মানিয়ে নিতে পারেন নি; আর তাত্ত্বিক প্রশ্নের নিরসনেই তো প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর আসা। নানা জটিলতায়, একটু বিহ্বল অপ্রস্তুত অবস্থাতেই যদিও তিনি পার্টিতে আসেন, সেই অপ্রস্তুত বিহ্বলতা তাঁকে কাটাতে হয়েছে তত্ত্বেরই মাধ্যমে। তাই তিনি বলেছিলেন, 'আই জয়েনড দ্য পার্টি কমপ্লিটলি আনপ্রিপেয়ারড' (পৃষ্ঠা ৫৬)।

ফলে, পার্টি সদস্য ও তাত্ত্বিক লুকাচের মধ্যেও এক দ্বন্দ্ব শুরু হল। বুর্জোয়া সংরক্ষণশীলতায় বেড়ে উঠবার ফলে 'সর্বহারার একনায়কতন্ত্র'-এর শ্লোগানে আদর্শগত সংকট আসে লুকাচের মনে। এমন কি তিনি এর বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধও লেখেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী হলেও ভূমিসংস্কারের মতো জটিল প্রশ্নে বুর্জোয়া বিপ্লবের স্তরকে বাদ দিয়ে সোজা বড় এস্টেটগুলোকে সমবায়ে বদলে দেবার মতবাদে সমর্থন জানালেন। মেসিয়ারোস অবশ্য এই দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন এবং এই বিরোধ তাঁর সৃষ্টিশীল কাজে প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের নিরসনেও ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টিকে, পণ্যদ্রব্যের চরিত্র থেকে তুলে, শিল্পী-সাহিত্যিকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া, সামাজিকীকরণের যে প্রক্রিয়া কমিউনিস্ট পার্টি শুরু করেছিল, লুকাচ

পিপলস কমিশার হিশেবে, সে প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ অংশ ছিলেন। নিজের আমূল পরিবর্তনের এই দ্বন্দ্বময় যন্ত্রণার প্রসঙ্গে আত্মকথায় লুকাচ লিখছেন, 'মার্কসবাদে বিশ্বাস তো দোকানে স্যাম্পেল দেখা নয়। হয় আপনাকে এই মতবাদে উত্তীর্ণ হতে হবে—আমি নিজে জানি, এটা কত কঠিন, কারণ এ সিদ্ধান্ত নিতে আমার ১২ বছর লেগেছে—অথবা বামপন্থী বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই পৃথিবীকে দেখতে হবে' (পৃষ্ঠা ৬৩)।

এই জটিল সময়ে ১৯১৯-র জুলাইতে প্রতিক্রিয়ার আঘাতে লুকাচকে হাঙ্গেরি ছাড়তে হল। তার আগে থেকেই, প্রথম বিবাহবিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল গারটুর্ড বোরৎস্টিয়েবার-এর সঙ্গে প্রেম। সেই বাবার যোগাযোগেই সামরিক বাহিনীর এক লেফটেনাণ্ট কর্নেলকে ঘুষ দিয়ে, হাত-বেঁধে, ঐ কর্নেলের আহত ড্রাইভার সেজে ভিয়েনায় যে এসেছিলেন লুকাচ, সে কথা আমাদের জানা; আমরা জানি, গারটুর্ড ভিয়েনাতে এলে লুকাচ ও তিনি একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন। মেসিরারোসের মতো অনেক লুকাচ-শিষ্যেরই ধারণা—তাঁরা লিখেওছেন—যে, ১৯২০-তেই গারটুর্ড ও লুকাচ বিয়ে করেন। লুকাচের ৩৫/৩৬ বছর থেকে পরবর্তী জীবনে যে নারীর প্রভাব অবিসংবাদিত, তাঁকে কিন্তু লুকাচ বিয়ে করেন ১৯২৩ সালে। কারণটা নেহাতই আর্থিক। আত্মকথায় লিখছেন লুকাচ, 'সৌভাগ্য, যে আমাদের তেমন কোনো গোঁড়ামি ছিল না। আমরা একসঙ্গে ইতিমধ্যে থাকতে শুরু করলেও বিয়ে না-করার সিদ্ধান্ত নেই, কারণ, একজন সিভিল সার্জেণ্টের বিধবা হিশেবে গারটুর্ড পেনশন পেত ছেলেমেয়েদের জন্য এবং সেই পেনশন না নেবার তো কোনো কারণ থাকতে পারে না। পরে ১৯২৩ সালে জেনাতে একটা পেশাদারি চেয়ার পাবার কথা হয়। একটি অবিবাহিত লোক একজন মহিলা ও বাচ্চাসহ জেনাতে যেতে পারে না বলেই বিয়ে করার প্রয়োজন দেখা দিল। তাই ভিয়েনাতে বিয়ে করে নিলাম। কিন্তু জেনার ব্যাপারটা কেঁচে যায়। তখন অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে গারটুর্ড ভান করেছিল, যেন বিয়েটা হয় নি, এবং হাঙ্গেরির এমব্যাসিতে তার বিধবা হিশেবে পাসপোর্ট রিনিউ করে। অর্থাৎ ১৯৩৩ সাল অবধি সরকারিভাবে আমরা অবিবাহিত ছিলাম' (পৃষ্ঠা ৭১)।

আর্থিক প্রয়োজন থেকেই গারটুর্ড হুটেলডরফে বোনের সঙ্গে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন, লুকাচ পেয়িং গেস্টের মতো একটা ঘরে, সে বাড়িতেই। বার্লিনেও গারটুর্ড যে ফ্ল্যাটে থাকতেন, লুকাচ আসবাবপত্রসহ একটি ঘর ভাড়া করেন সেখানেই। শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই এই বিশৃঙ্খলা নয়, লুকাচের প্রধান

অবলম্বন পার্টি মেম্বারশিপেরও জটিলতা অনেক। যেমন, ১৯৩০ সাল অবধি লুকাচ অস্ট্রিয়ান পার্টির সদস্য ছিলেন, পরে রাশিয়ার রুশ পার্টির। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত তিনি জার্মান পার্টির সদস্য ছিলেন। কিন্তু রাশিয়াতে ফিরে যাবার পরও তিনি জার্মান পার্টিতেই থাকেন, ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। ব্লুম থিসিসের সময় অবধি লুকাচের পার্টি সদস্যপদ ছিল অস্ট্রিয়াতে, কারণ অস্ট্রিয়ায় বসবাসকারী হাঙ্গেরির কমিউনিস্টদের অস্ট্রিয়ার পার্টির সদস্যপদ নিতে হতো হাঙ্গেরির পার্টি তখন নিষিদ্ধ। কিন্তু সংগঠনের দিক থেকে সব অর্থেই তিনি হাঙ্গেরির পার্টির অধীন। এই জটিলতা তাকে অনেক সময় সাহায্য করেছে। যেমন বিংশ শতাব্দীর হাঙ্গেরিতে শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন আটিলা জোসেফকে (১৯০৯-১৯৩৭) পার্টি থেকে বহিস্কার করা হয় মার্কসবাদকে 'সাইকো-এ্যানালিসিস'-এর সঙ্গে মিলিয়েছিলেন বলে। আটিলা জোসেফের কবিতা নিয়ে উচ্ছ্বসিত লুকাচকে কমিউনিজমের ছিদ্রানুসন্ধানীরা আটিলা জোসেফের প্রতি পার্টির আচরণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে লুকাচ বলেন, আটিলা জোসেফ বিতর্কের সময় হাঙ্গেরির আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না। মনে পড়ে লুকাচের অবিস্মরণীয় উচ্চারণ, মাই পার্টি, রাইট অর রং। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সবচাইতে উন্নত স্তরের চাইতেও সমাজতন্ত্রের সবচাইতে খারাপ স্তরে বেঁচে থাকা সুখের, এই মনোভাবেই যে নিহিত আছে মার্কসবাদী ও কমিউনিস্ট লুকাচের ব্যক্তিঅহমকে উত্তরণের প্রমাণ, তা আমরা আগেও দেখেছি। কমিউনিস্ট-বিরোধীদের নানা প্রশ্নের উত্তরও লুকাচ দেন পরিবেশ বুঝে, নিজের জটিল সামাজিক ও পার্টিগত অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে। স্তালিনের প্রসঙ্গেও লুকাচ আত্মজীবনীতে অসামান্য ব্যাখ্যা করেছেন নানা অভিযোগ ও প্রশ্নের, বিশেষ করে 'ডেস্ট্রাকশন অব রিজন' বইটির সঙ্গে জড়িত নানা প্রসঙ্গে। যেমন এ বইটিতে নিটশে ও অন্যান্য 'ইররাশনালিস্ট' দার্শনিকদের মতবাদ থেকেই ফ্যাসিবাদের জন্ম বলে এক দীর্ঘ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন লুকাচ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তো আরও প্রশ্ন ওঠে নিটশে, কিয়ের্কগার্দ যদি ফ্যাসিবাদের জন্য দায়ী হন, তাহলে মার্কসবাদও কী স্তালিনিজমের জন্য দায়ী? স্তালিনের 'ইররাশনালিজম'-কে লুকাচ তাহলে সমালোচনা করেন নি কেন? প্রথম অভিযোগ সম্পর্কে লুকাচ বলেন, 'আমি যদি বলি, দুই আর দুই চার এবং আমার গোঁড়া সমর্থক হয়ে কেউ যদি বলে যে, না, উত্তর হবে ছয়, তার জন্যে আমি দায়ী নই।…ঐতিহাসিক দায়িত্ব নির্ধারিত হয় একটি তত্ত্বের প্রকৃত আত্তীকরণে' (পৃষ্ঠা ১০১-১০২)। বালজাকের প্রসঙ্গে

শিল্প ও আদর্শের একটা অনন্বয় থেকে এঙ্গেলস যেমন তলস্তয়ের একটি দিক বুঝবার চেষ্টা করেন, সেই কাঠামো কেউ অনুসরণ করলে সে ক্ষেত্রে তলস্তয়ের মূল্যায়নে এঙ্গেলসই প্রধানত দায়ী। এঙ্গেলসের কাঠামোকে বিকৃত করলেই সে দায়িত্ব এঙ্গেলসের ওপর কখনোই বর্তাবে না, লুকাচের এই স্পষ্ট ব্যাখ্যা থেকেই তাঁর জবাবের শ্লেষ ধরা পড়ে। স্তালিনবাদের যুক্তিহীনতার প্রসঙ্গে লুকাচের মতামত হল, স্তালিনবাদ 'ইররাশনাল' নয়, দার্শনিক বিচারে তা হাইপার-র‍্যাশনাল। শিলিং থেকে কিয়ের্কেগার্দ-সবাই জার্মান দর্শনে যুক্তিবাদের বিরোধী। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এদের মতবাদকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু স্তালিনবাদ বড় বেশি র‍্যাশনাল যেন, মাঝে মাঝে অবাস্তব হলেও। লুকাচ লিখছেন, 'নিটশে বা অন্যান্যদের মতো আরও একজনকে খুঁজে পাওয়া গেল বলেই স্তালিনের নিন্দে করতে হবে এমন অধিকার আমাদের নেই। এইভাবে স্তালিনবাদ সম্পর্কে সঠিক বোঝা যাবে না।' (পৃষ্ঠা ১০৪)। স্তালিনের এই 'হাইপার-র‍্যাশনালিজম'-কে সমর্থন করে লুকাচ বলেন, যে, হিটলারকে ধ্বংস করবার মতো একজনই ছিলেন তখন, স্তালিন। পশ্চিম থেকে এমন কোনো ব্যক্তিত্ব অনুপস্থিত সে সময়। রোবস্পিয়র দাঁত-র বিরুদ্ধে যে ব্যবহার করেন, ট্রটস্কির বিরুদ্ধে স্তালিন তেমন কোনো অস্ত্র ব্যবহার করলেও সমসাময়িক ইতিহাসের ব্যক্তিনিরপেক্ষ মানে তাকে বিচার করতে হবে।

'আমার মতে স্তালিনবাদের মূল ব্যাপার হল, মার্কসবাদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে রূপায়িত হয়। কিন্তু প্রয়োগের সময় বাস্তবতার প্রতি গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ক্রিয়াকলাপ নির্ধারিত হয় না। বরং সে অন্তর্দৃষ্টি বদলে যায় কৌশলের চালে। মার্কস ও লেনিনের সামনে সমাজবিকাশের মূল নির্দেশ ছিল। সেই মানদণ্ডে কিছু কিছু কৌশলগত সমস্যা বিশেষ কোনো সময়ে দেখা দেয়। আর সেই মানদণ্ডের ভেতরেই নানা কৌশলগত বিকল্প থাকে সামনে। স্তালিন এই স্তরপরম্পরা উল্টে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে কৌশলটাই মুখ্য হয়ে ওঠে, তা থেকেই যত সিদ্ধান্ত করতেন তিনি। যেমন, হিটলারের সঙ্গে চুক্তিটা নিশ্চয়ই কৌশলী চাল, স্তালিন ঠিকভাবেই সে চাল দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই কৌশলী চাল থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভুল এক তত্ত্বগত সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরই মতো' (পৃষ্ঠা ১০৪)।

স্তালিনের প্রসঙ্গে লুকাচের এই বিপর্যয়ের তত্ত্বকে ধরেই অনেকে প্রশ্ন তোলেন, সুপার-র‍্যাশনালিজমকে সাধারণ যুক্তিহীনতা থেকে আলাদা করা যায় কী না, কারণ বিশ্বইতিহাসের প্রজ্ঞা বাস্তবায়িত হতে পারে ব্যক্তিঅহমেরই

ভেতর। লুকাচ তা মানেন যুক্তিবাদকে পেরিয়ে যুক্তিহীনতার চৌকাঠে পৌঁছানো অস্বাভাবিক নয়। স্তালিনের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যাপারটা গৌণ। তাহলে লুকাচের মতে স্তালিনবাদের উৎস কোথায়? সামাজিক নিমিত্তবাদকে (সোশ্যাল ডিটারমিনিজম) যুক্তিগত অবশ্যম্ভাবিতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছিলেন এঙ্গেলস ও পরে অনেক সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটস, মার্কস কথিত সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার সম্পূর্ণ বিপরীতে। লুকাচ মনে করেন, এই গুরুত্বপূর্ণ বিকৃতি ছাড়া স্তালিনবাদ জন্মাত না। মার্কস বলেছিলেন, বার বার, একটি বিশেষ সমাজে 'ক' সংখ্যক মানুষ 'ক' পথের সন্ধান পাবে যেখানে নির্দিষ্ট শ্রমকাঠামোয় প্রতিক্রিয়া সম্ভব, এবং এই সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার সংশ্লেষ থেকেই সামাজিক বিশিষ্টতার প্রক্রিয়া শুরু হয়। দুই আর দুই চার, এই অর্থে উপরিউক্ত প্রক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী হতে পারে না, লুকাচ বলেন। স্তালিনিজম ও এঙ্গেলসের এই বিশ্লেষণের যোগাযোগ লুকাচ বোধ হয় আত্মজীবনী ছাড়া আর কোথাও লেখেন নি। এবং এই সিদ্ধান্ত নিয়েও নিশ্চিতই তুমুল বিতর্কের অবকাশ আছে।

১৯১৯ সালে বেলা কুন আর ইয়েনো ল্যাণ্ডলার গোষ্ঠীতে ফাটল ধরে। প্রথম স্ত্রী গ্রাবেংকোর কুন সম্পর্কে মন্তব্য থেকেই আমরা জানি, লুকাচ কুনের বিপক্ষে, ল্যাণ্ডলার গোষ্ঠীর সমর্থক ছিলেন। পার্টির ভেতরে এই টানাপোড়েনের সময়ই 'হিস্টরি এ্যাণ্ড ক্লাস কনসাশনেস' লেখা হচ্ছিল। পার্টির জটিল পরিস্থিতির প্রভাব নিশ্চয়ই পড়েছিল এই বইতে। কারণ লুকাচ বলেন, সে 'ডুয়ালিজম'—কাজ করে—আন্তর্জাতিক অর্থে তাঁরা তখন 'মিসাআনিক সেকটারিয়ান' আর হাঙ্গেরির প্রশ্নে 'রিয়ালপলিটিকে' বিশ্বাসী। তাই লেনিনের বিপ্লবসংক্রান্ত তত্ত্বের প্রথম মার্কসবাদ ভিত্তিক প্রয়োগ থাকলেও এই বইটির প্রধান ত্রুটি, লুকাচ মনে করেন, সামাজিক অস্তিত্বকেই তিনি একমাত্র সত্য অস্তিত্ব বলে মানেন। শ্রমকাঠামোর মধ্যে দিয়ে সমাজের যে অর্গ্যানিক আদলের কথা মার্কসের বিচারে পাই, প্রকৃতি থেকেও নির্যাসিত অর্গ্যানিক সমগ্রতা সেই সর্বজনীন পরিণতি নেই বইটিতে। ১৯৬৮ সালে তথাকথিত ফরাসী আন্দোলনের সমর্থকরা 'হিস্টরি এ্যাণ্ড ক্লাস কনসাশনেশ' খুব পড়েছে। লুকাচের ধারণা, মার্কসবাদের সর্বজনীন ব্যাপ্তি নেই বলেই বুর্জোয়া মূল্যবোধের কাছে এ বইটি সহজেই প্রিয় হয়ে উঠবে।

ব্লুম থিসিসের অপ্রিয় প্রতিক্রিয়ায়, জোসেফ রেভাই-এর সঙ্গে তীব্র মতভেদে, কুনের প্রতি বিরোধিতায় জিনোভিয়েভের বিরুদ্ধে স্তালিনের

বৈরিতার সমর্থনে, হাঙ্গেরিতে বেআইনিভাবে যাতায়াতে এবং পরে মস্কোতে থাকবার সময়, ১৯৩০-এ, লুকাচকে আদর্শগত সত্তাসংকট থেকে আবার বৃহত্তর সত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিল স্তালিনেরই মতামত। স্তালিন ডেবোরিন ও তাঁর শিষ্যদের দার্শনিক তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। স্তালিনের মূল আক্রমণ ছিল প্লেখানভপন্থী গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। প্লেখানভকে মার্কসবাদের প্রধান তাত্ত্বিক বলে স্বীকার না করে স্তালিন মার্কস-লেনিন লাইনকেই সঠিক ঐতিহাসিক বাস্তবতা হিশেবে বর্ণনা করেন। প্লেখানভ ও সেই সঙ্গে মেহরিং-ও সমাজ ও অর্থনীতির পরিধির বাইরেও মার্কসবাদের বিস্তার চেয়েছিলেন বা বলা যায় মার্কসবাদের পরিপূরক খুঁজছিলেন। মেহরিং মার্কসবাদের মধ্যে কান্টের নন্দনতত্ত্ব মেশাতে চান। স্তালিনের প্লেখানভ-সমালোচনা থেকেই লুকাচ মেহরিঙের সমালোচনার দিকে এগুতে পারেন, সেই অর্থে মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের নতুন উপলব্ধিতে—যাকে তিনি পরের অনেক রচনায় মার্কসবাদের অর্গ্যানিক প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন।

মার্কসবাদের এই অর্গ্যানিক সমগ্রতার উপলব্ধি নিয়ে লুকাচ যখন ১৯৩১ সালে বার্লিনে পৌছন, সেই সময়েই লুকাচ আগামী ৪০ বছরের লুকাচকে খুঁজে পান—যে লুকাচকে আমরা আজ জানি, ব্রেখট বা মান সম্পর্কে লুকাচের যে মূল্যায়ন জানি আমরা, 'রাইটারস এলিট' বলে বর্ণিত সেই লুকাচ গড়ে উঠছিলেন এই সময়েই। সম্পাদক এওরসি এক আশ্চর্য কার্যকারণ বের করেছেন, লুকাচের প্রবাসজীবনে প্রায় অধিকাংশ জায়গাতেই প্রতিবিপ্লব সফল হবার পর লুকাচ মাত্র মাস দুই থেকে দেশান্তরে চলে গেছেন। যেমন, হিটলার ক্ষমতায় আসেন ১৯৩৩-এর জানুয়ারিতে, লুকাচ জার্মানি ছাড়েন মার্চে। এই ক'বছরে বার্লিনের জার্মান রাইটারস এ্যাসোসিয়েশনের সান্নিধ্যে লুকাচ তাঁর সৃজনশীলতার সংকটপর্বের নতুন স্তরে এসে পৌছন। লুকাচ অধিকাংশ আধুনিক লেখককেই বাতিল করেছেন নানা সময়ে। যেমন আওনেস্কো বা ব্রেখটের নাটক। লুকাচের কাছে আধুনিক চিত্রকলার পরম প্রকাশ ছিল সেজানে বা ভ্যান গগে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাই। এই নিয়ে রুশ দার্শনিক মিখেইল লিফশিট্জের (১৯০৫) সঙ্গে লুকাচের মতপার্থক্য ছিল। বিশেষ করে ব্রেখট সম্পর্কে আত্মকথায় লুকাচ বলছিন, ব্রেখটের প্রথম দিকের নাটক সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা কঠোর হলেও, তাঁর উচিত ছিল, ব্রেখটের পরিণত বয়সের নাটকের মূল্যায়ন করে একটা প্রবন্ধ লেখা। লুকাচ লেখেন নি। ব্রেখটের স্ত্রীর সঙ্গে এই মূল্যায়ন নিয়ে লুকাচের তীব্র মতপার্থক্য ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

চলাকালীন মস্কোতে ব্রেখটের সঙ্গে এক কাফেতে বসে তাঁর কথা হয়। ব্রেখট বলেছিলেন, 'বহু লোক আমাকে তোমার বিরুদ্ধে ও তোমাকে আমার বিরুদ্ধে লাগাতে চায়। আমরা ওদের ফাঁদে নিশ্চয়ই পা দেব না' (পৃষ্ঠা ৯১-৯২)। শুধু ৪০-এর দশকে ব্রেখটের শেষ নাটকগুলো নিয়ে প্রবন্ধ লিখলে লুকাচের ব্রেখট-বিরোধিতা নিয়ে এমন ভুল বোঝার সুযোগ থাকত না, এ কথা অকপটে নিজের ত্রুটি বলে স্বীকার করে নিয়েছেন লুকাচ।

মান ও লুকাচকে নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। কোলাকাওস্কি তাঁর বইতে লিখছেন যে, টমাস মানের 'ম্যাজিক মাউন্টেন' উপন্যাসের চরিত্র জেসুইট নাফতা লুকাচের আদলে গড়া—এক প্রখর ধীমান যে কর্তৃত্বের কাছে ব্যক্তিঅহমের অহংকারকে সম্পূর্ণ সঁপে দেয়। কোলাকাওস্কি নিন্দে করেই লিখেছেন। অথচ এর পেছনের ঘটনা না জানলে, মান-লুকাচ সম্পর্ক ভাল করে না বুঝলে, ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোই স্বাভাবিক, বা কোলাকাওস্কির মতো অতি-সরলীকরণে।

আত্মকথায় লুকাচ এ বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। প্রথমেই মনে রাখা দরকার, লুকাচের প্রতি মানের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত 'ডিপ্লোম্যাটিক'। কারণ হিশেবে লুকাচ বলেন, 'হি উড নেভার সে এনিথিং গুড এ্যাবাউট মি উইদাউট ইমিডিয়েটলি কোয়ালিফাইং ইট' (পৃষ্ঠা ৯৩)। মান আগে নানা রাজনৈতিক সংকটে লুকাচকে উদ্ধার করলেও নিজের বুর্জোয়া সম্মানবোধের ব্যাপারে মান অতিসচেতন ছিলেন। লুকাচের ধারণা, মান তাঁকে অতিপ্রাকৃত কোনো জীব ভাবতেন ('প্রকৃত হাঙ্গেরিয়ান প্রতিশব্দ আমার জানা নেই'—পৃষ্ঠা ৯৩)। কমিউনিজমের প্রতি লুকাচের বিশ্বাস নিশ্চয়ই একটা কারণ। কিন্তু শুধুই কী তাই? টমাস মান আর্কাইভসে 'ডেথ ইন ভেনিস'-এর পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করতে করতে এক মার্কিন প্রফেসার দেখেন লুকাচের 'সোল এ্যাণ্ড ফর্ম' বই থেকে অনেক অংশ উদ্ধৃত, উদ্ধৃতিচিহ্নহীন। টমাস মান প্রথম সুযোগেই অপরিচিত কোনো সমালোচকের সঙ্গে আলাপ করে নিতেন। অথচ লুকাচের বেলায় উনি তেমন কোনো চেষ্টা কোনোদিনই করেন নি।' প্রথম দিকে লুকাচ তো কমিউনিস্টও ছিলেন না। অথচ কারণটা কোনোদিনই লুকাচ বুঝতে পারেন নি। তাই তাঁর মনে হয়, মানের চোখে তিনি বোধ হয় কোনো অতিপ্রাকৃত জীব।

লুকাচের কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই যে নাফতার মডেল তিনি নিজেই। কিন্তু নাফতার মতামত থেকে লুকাচের মতামত অনেক আলাদা। টমাস

মান তা জানতেনও। এই প্রসঙ্গে নানা চিঠিপত্রেও মান 'ডিপ্লোম্যাটিক' মন্তব্য করেছেন। যেমন ফরাসি বংশোজাত এক জার্মান সমালোচককে তিনি নাফতা প্রসঙ্গ তুলতে বারণ করে লেখেন, কারণ মানের ধারণা ছিল, যেহেতু লুকাচ 'ম্যাজিক মাউন্টেন' সম্পর্কে প্রশংসাই করে গেছেন, নাফতাকে তাঁর মডেলে গড়ে তোলার ব্যাপারটা তিনি লক্ষ্য করেন নি। 'আমি 'স্পিয়েগেল' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম যে ভিয়েনাতে আমাকে মডেল হিশেবে ব্যবহার করবার প্রসঙ্গ মান তুললে আমি নিশ্চয়ই রাজি হতাম যেমন রাজি হতাম সিগার কেস আনতে ভুলে গেছেন বলে মান আমার কাছে সিগার চাইলে' (পৃষ্ঠা ৯৪)।

এমন কি ভাষাগত প্রমাণও আছে। লুকাচের ব্যাপারে চ্যান্সেলর সেইসেল-কে মান যে চিঠি লেখেন, তাতে নাফতা সম্পর্কে হানস কাবসটরপের বক্তব্য প্রায় আক্ষরিকভাবে লুকাচের প্রসঙ্গে উদ্ধৃত। কিন্তু নাফতার সঙ্গে নিজের এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ লুকাচ সাহিত্যের নিরিখেই বিচার করতে চান। মানের উদ্দেশ্য একটা টাইপ তৈরি করা, সে কাজে তিনি সফল। লুকাচের সঙ্গে অমিলও তো কম না। ১৯১৯ সালে বুদাপেস্ট ছাড়বার সময় তিনি কপর্দকশূন্য। একটি মাত্র স্যুটই কেবল ছিল। সেই বেশেই ১৯২০ সালে মানের সঙ্গে তাঁর দেখা। অতএব, মানের পক্ষে তাঁকে 'এ্যালিগ্যাণ্ট ম্যান' হিসেবে ভাবা প্রায় অসম্ভব ছিল। অথচ তাঁর নাফতা 'এলিগ্যাণ্ট' কারণ উপন্যাসের কাহিনী তা দাবি করে। শিল্পী ম্যাক্স লাইবারম্যানের একটি কথার প্রসঙ্গ এনে নাফতার মডেল বিষয়ে লুকাচ বলেন যে শিল্পী নিজের মতো করে নেন সব চরিত্রকেই, প্রয়োজনে; যেমন ক্যানভাসে অনেক মডেলের মধ্যেই পাওয়া যায় শিল্পীর এক আবছা আদল।

আর টমাস মান এক ধরনের দূরত্ব বজায় রাখতেন। ১৯৫৫ সালে, জেনা-তে, শিলারের ১৫০ তম জন্মবার্ষিক উদ্‌যাপনের সময় একই হোটেলে ছিলেন লুকাচ ও মান। সেখানে সম্ভ্রান্ত আহারের হলে ছিল মানের জায়গা, আর মধ্যবিত্ত পরিবেশে লুকাচের। মান লুকাচকে তাঁর জায়গায় ডাকেন নি।

অর্থাৎ লুকাচ বলতে চান, শিল্পী হিসেবে মান নাফতার কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মডেল হিসেবে তাঁকে ব্যবহার করলেও মানের এই চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম করে লুকাচের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সৃষ্টিশীল ভূমিকার মূল্যায়ণ ঠিক নয়—তাতে অতি সরলীকরণের বিপদ থেকে যায়।

এর পরের ইতিহাস, ১৯৪৫ সালে দেশে ফিরে আসবার পর থেকে,

'লুকাচ বিতর্ক' পর্ব পেরিয়ে, ইমরে ন্যাগির বিতর্কিত অধ্যায়ের পর, ইয়াংসোর ফিল্ম সম্পর্কে উৎসাহের জোয়ারে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদে ফিরে আসবার ঘটনা আমাদের খুব নিকট অতীত। আত্মকথায় লুকাচ সেই রাজনৈতিক বিহ্বলতার জটিলতা ব্যাখ্যা করেন বিস্তৃত। কিন্তু শেষ কথা হিসেবে বলে যান জীবনের অর্গ্যানিক সমগ্রতার কথা, মার্কসবাদের সর্বজনীন পরিণামের কথা। অনিবার্য মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই উচ্চারণ—'এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম—যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত···তখন আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড ভাবে সঞ্চারিত হতে···যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে···' (ছিন্নপত্র, পৃষ্ঠা ১৩৮)।

মার্কসের প্রসঙ্গেও লুকাচ 'অনটলজি'-র ব্যাখ্যায় জীবনের এই অর্গ্যানিক সমগ্রতার রোমাঞ্চ নিয়ে বলছেন, যে, সেই আদিতম যুগ থেকে প্রথম অর্গ্যানিক জীবনই আজ মানুষের এই উন্নত ইতিহাসে প্রবাহিত—সেই গাছপালার প্রাণ থেকে এই মানবায়িত দ্বন্দ্বময় ইতিহাস। লুকাচ আত্মজীবনীর শেষ লাইনে রবীন্দ্রনাথের থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন। পৃথিবীর ইতিবৃত্তে এমন কি একটি নুড়ি পাথরের অনুপম অস্তিত্ব আর মানুষের অদ্বিতীয় ইতিহাস দীর্ঘ যন্ত্রণাময় প্রবাহের সূত্রে গ্রথিত।

লুকাচের এই অসামান্য আত্মজীবনী লণ্ডনে সবে প্রকাশিত। ভারসো পাবলিশার্স থেকে এই বই কবে কলকাতায়, আমদানির জটিল নিয়ম পেরিয়ে, আসবে বলা শক্ত। মলাটে অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবি, নোট, জীবনীমূলক নির্দেশিকা, কয়েকটি ছাপার ভুল থাকলেও মূল জীবনী ও 'মানসযাপনের' অংশসহ এই বই লুকাচপ্রেমী ও মার্কসবাদে বিশ্বাসীদের অবশ্য পাঠ্য। আগামী বছর লুকাচের জন্মশতবর্ষে তাঁর কথাতেই তাঁকে জানার সুযোগ করে দিলেন এওরসি।

রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার

অরুণ সেন

নির্মাণ আর সৃষ্টি। শঙ্খ ঘোষ। রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী। ১৯৮২। ২৮·০০

জীবনের শেষপর্বের একটি কবিতায় বিষ্ণু দে লিখেছিলেন, 'জ্ঞানে-অজ্ঞানে চেতনার নীলে আমরা রাবীন্দ্রিক যে।' 'রাবীন্দ্রিক' কথাটি তো তার অনেক আগেই অনাধুনিকতার চিহ্নবাহী হয়ে গেছে। তাই যে কবি তাঁর প্রায় লেখার শুরুতেই ভাবনায় ও প্রকরণে রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন, অন্তত তাঁর সমকালীনদের অনেকের থেকেই বেশি করে এবং যিনি রাজনীতি সমাজনীতি ও নন্দন ভাবনায় রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতায় গভীরভাবে লালিত, তিনি যখন নিজেকে রাবীন্দ্রিক বলে ঘোষণা করেন, তখন বোঝা যায়, এর অন্য কোনো মানে আছে। শঙ্খ ঘোষকেও 'রাবীন্দ্রিক' বলে ঠাট্টা করতে দেখেছি নবীন উত্তরসূরিদের কাউকে কাউকে। তাঁর রাবীন্দ্রিকতা তো স্বতঃসিদ্ধ! কারণ, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত, আমাদের রবীন্দ্রপাঠে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহায়, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে একাধিক বইয়ের রচয়িতা—তিনি 'রাবীন্দ্রিক' হবেন না তো আর কে হবেন? হয়তো তাঁদের কবিতার স্বভাব একটু মুশকিলে ফেলে, কারণ কোনো দিক থেকেই তো তাঁদের রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের সদস্য মনে করা যায় না। তখন ভাবতেই হয়, রবীন্দ্রনাথকে অনেকটা ছাড়িয়ে এসেও তাঁরা কী অর্থে আবার রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে যেতে চাইছেন? এ কি সত্যিই ফিরে যাওয়া, না কি রবীন্দ্রনাথকেই কাছে নিয়ে আসা? রবীন্দ্রনাথকেই পুনরাবিষ্কার আধুনিকের প্রয়োজনে?

সৌভাগ্যের কথা, এসব বিষয় নিয়ে তাঁরা নিজেরাই মথিত হয়েছেন তাঁদের নিজেদের লেখায়। বিষ্ণু দে তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা' বইতে সেই রাবীন্দ্রিকতার স্বরূপকেই তাঁর দীর্ঘতম রচনায় নিজের মতো করে উদ্ঘাটিত করে গেছেন। শঙ্খ ঘোষেরও এতাবৎ সবচেয়ে বড় রচনা এই 'নির্মাণ আর সৃষ্টি'। তাঁরও উদ্দেশ্য, আধুনিকের কাছে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কী হতে পারে, কিংবা রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা আজকের আধুনিকের কাছে কতখানি যাথার্থ্য নিয়ে আসে, সেই প্রসঙ্গ। আশ্চর্যজনক দুটি বইয়ের সমান্তরালতা। নানা দিক থেকে অমিল সত্ত্বেও মিলের কথাই মনে হয় বেশি

করে। দুটি বইয়েরই মৌল তাগিদ এবং সেই সূত্রে পরিকল্পনা ও পদ্ধতির অনিবার্য সাধর্ম্য আমাদের বিস্মিত করে। তাই একটি বই প্রসঙ্গে অন্যটির এরকম প্রত্যক্ষ অনুষঙ্গ মোটেই খাপছাড়া নয়। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নিজের রচনার এবং আধুনিক নন্দনভাবনার প্রাসঙ্গিকতায় চিনে নেওয়া খুবই, সার্থক হতে পারে এই বই দুটোর একক ও পরিপূরক সামর্থ্যে।

অমিলও অনেক। লিখনগত তো বটেই। বিষ্ণু দে-র বইটি সম্পর্কে কেউ কেউ অভিযোগ করতে পারেন, এর বিন্যাসে কিছু অসমতা আছে, হয়তো কিছু পারম্পর্যের শৈথিল্যই—যেন একটু দমকে দমকে লেখা। সে তুলনায় শঙ্খ ঘোষের বইটি সুগঠিত ও সুগ্রথিত। এতটাই যে প্রতিটি অধ্যায়ের অন্তর্গত অংশগুলির সংখ্যা সব সময়ই অনধিক সাত। নিশ্চয়ই খানিকটা মজাই পেয়েছেন লেখক এইভাবে ভাগ করতে। যেমন শুনেছি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কীরকম কসরৎ করতেন তাঁর প্রবন্ধের প্রতিটি অনুচ্ছেদকে সমান মাপের দাঁড় করাতে। হয়তো অভিযোগ সেখানেও উঠতে পারে, বক্তব্য ও ভাষার এতটা স্বাচ্ছন্দ্য পাঠককে একটু অন্যমনস্ক করে দেয় কিনা। গ্রন্থনার আকস্মিকতা এবং শব্দের কষ্টসাধ্য মোচড় অনেক সময় লেখকের অভিজ্ঞতার তীব্র একমুখিনতা সম্পর্কে পাঠককে যতখানি সতর্ক করে রাখে, যুক্তি ও ভাষার অতিরিক্ত সাবলীলতায় তা কখনও ব্যাহত হতেও পারে। শঙ্খ ঘোষের অসামান্য আত্মসচেতন ভাষা ও যুক্তিবিন্যাস সম্পর্কে অবশ্য এ প্রশ্ন উঠছে না। কিন্তু এটাও ঠিক, ভাবনার কাঠামোর দিক থেকে এক কথাও যখন দুজন ব্যক্তি ভাষার দুরকম ঝোঁকে বলেন, তখন সেটা আর সত্যি সত্যিই এক কথা থাকে না। কে কীভাবে বলেন, কীভাবে পাঠককে সঙ্গে নিয়ে চলতে চান, তা তখন আর বাইরের ব্যাপার থাকতে পারে না। একই সত্যে পৌঁছনোর জন্য উচ্চারণের এই ভিন্নতা নান্দনিক অংশগ্রহণের বা নিজের ভূমিকা পালনের দুটি ধরনই প্রকাশ করে। আধুনিক হয়েও দুজনের আধুনিকতার রং একটু পালটায়।

আর এখানেই দুটি বই আলাদা হয়ে যায়। এমন বলা যাবে না যে, বিষ্ণু দে-র কথাই শঙ্খ ঘোষ বললেন। হয়তো ষাটের দশকের মাঝামাঝি বিষ্ণু দে-র উক্তিতে (তাঁর রচনাটি ১৯৬৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া বক্তৃতা) যে ঝাঁঝ ছিল, সত্তরের দশকের শেষে শঙ্খ ঘোষের খানিকটা আত্মপক্ষ সমর্থনের শান্ত ভঙ্গিতে তা নেই (১৯৭৮-এ বিশ্বভারতীর ভিজিটিং ফেলো থাকার সময় এটা লেখা), সময় ও পরিবেশের বদলের কারণেই—দুজনের স্বভাবের পার্থক্যের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কারণ ইতিমধ্যে তো

সামাজিক নৈরাশ্য আরো ঘন হয়েছে, ব্যক্তির সংকট আর ক্ষয় আরো বেড়েছে, রাবীন্দ্রিক সমগ্রতা হয়ে উঠেছে আরো সুদূর।

সুতরাং দুটি বইয়ের তফাতের কথা আমাদের খুবই মনে আছে। তা সত্ত্বেও যুক্তির কেন্দ্র ও নান্দনিক তাগিদের দিক থেকে, এমনকী রচনার বিস্তার ও গাঁথনির ধরনেও দুটোই আমাদের প্রায় একই ভাবে আলোড়িত করে এটাও বলার কথা। নান্দনিক সাযুজ্যে দুজনেই আমাদের কাছে সমান জরুরি কথা শোনান।

জরুরি কোন দিক থেকে? দুজনেরই আলোচনা, বলাই বাহুল্য, আমাদের দেশে যাকে বলা হয় অ্যাকাডেমিক, সেরকম কোনো প্রেরণায় লেখা নয়, যদিও উপলক্ষ থেকে এরকম ভুল কেউ ভাবতেও পারেন। দুজনেই বাংলা কবিতার আধুনিকতার দুই পর্বের বড় কবি। আর আধুনিক বাংলা কবিতার জন্মলগ্ন থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার সম্পর্ক পুরোপুরি যাচাই তো ঠিক হয়নি, আজও পর্যন্ত সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অনেক অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। যাকে বলে ঠিকমতো জায়গা দেওয়া তা এখনও ভালোমতো ঘটে ওঠে নি। এর একটা কারণ, রবীন্দ্রনাথের বিশালত্ব—রচনার প্রাচুর্যে ও মহত্ত্বে। রবীন্দ্রনাথকে অনেকখানি ছেড়ে এসেও তাই বারবার পেছনে ফিরে তাকাতে হচ্ছে। এটা ঠিকই রবীন্দ্রোত্তর মানস এখন যথেষ্টই শিকড় গেড়েছে। সমাজের বদল, অভ্যাসের বদল, ভঙ্গির বদল এখন আর আলগা হয়ে নেই। এমনকী অনেক বিদেশী প্রভাবকেও আমরা আত্মস্থ করে নিয়েছি। তবু, এ অবস্থাতেও, রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতা বাঙালির কাছে এত বড়, তিনি আজকের মানুষের কাছেও জরুরি এমন কিছু মৌলিক কথা বলে গেছেন যে বারবার সেই উৎসে যেতে হয় আমাদের। রবীন্দ্র-বহির্ভূত উপাদান ও তত্ত্বকেও মেলাতে হয় রবীন্দ্রলালিত উপাদান ও তত্ত্বের সঙ্গে। শুধু খুঁজে নিতে হয় কোনটি প্রাসঙ্গিক ও স্থায়ী এবং কোনটি সাময়িক ও অস্থায়ী, অন্তত আধুনিকের কাছে। এই তীব্র প্রাসঙ্গিকতার বোধের জন্যই দুজনের যাত্রা শুরু হতে পারে একই সমতল রেখায়, যাত্রা শেষও হতে পারে আধুনিক কবিতার একই উঁচুনিচু জমিতে। আধুনিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া এবং রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার সীমা ও স্বরূপ: এইসব প্রশ্নগুলি থেকে দুজনেই আজকের আধুনিকতাকে সমৃদ্ধ করে নিতে চান।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতার সমস্যা বিষয়ে শঙ্খ ঘোষের যুক্তির পরিধি বা কাঠামোটি খুবই স্পষ্ট। তিনি তিনটি স্তরে একে বিন্যস্ত করেছেন।

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব আধুনিকতার বিন্যাস। লেখক শুরুই করেছেন রবীন্দ্রনাথের 'আমি'-র উপলব্ধির ইতিহাস দিয়ে। কীভাবে আত্মোপলব্ধি এক-একটা স্তর অতিক্রম করে যায়। সেই উপলব্ধির মধ্যে গড়ে ওঠে অনেকগুলি 'তল'—তাতে বিধৃত হয় সমাজ, দেশ, কাল। তিনি পৌঁছন 'গীতাঞ্জলি' কিংবা 'গোরা'-'চতুরঙ্গ'-'ঘরেবাইরে'-র জগতে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের সাহিত্যে পশ্চিমী প্রভাব ও আধুনিকতার বহির্লক্ষণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বোঝাপড়া। নিঃসন্দেহে এটা একটা অস্থির সন্ধিক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা, অনিশ্চয়তা ও দ্বন্দ্বের সময়। আগের পর্বের ধ্যান ভেঙে যায়। প্রথম প্রতিক্রিয়ায় অনাগ্রহ ও বর্জন ঘটতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার এই লক্ষণগুলিকে দুর্লক্ষণ বলে মনে করলেন—তাদের নিন্দা এবং অস্বীকার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, সেই লক্ষণগুলো তাঁর রচনাতেও প্রবেশ করছে, গোচরে ও অগোচরে স্থান করে নিচ্ছে। সেটা যে ঠিকমতো মিশছে তাও নয়। হয়তো স্বভাববিরোধী উটকো অলংকার হিসেবেই থেকে যাচ্ছে। বারবার এ প্রসঙ্গে 'শেষের কবিতা' বা 'বাঁশরী'-র কথা উঠেছে। শঙ্খ ঘোষ বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তাঁর কবিতায় ও গদ্যে বিদেশী বুলি বা ভঙ্গি কীভাবে এসে যাচ্ছে, যার নিন্দায় তিনি ছিলেন পঞ্চমুখ।

তৃতীয়ত, ঐ মধ্যবর্তী স্তর উত্তীর্ণ হয়ে, 'চলতি আধুনিকতার সঙ্গে সংঘর্ষের প্রাথমিক উত্তেজনাকে অতিক্রম করে', আবার সেই নিজের বৃহত্তর আধুনিকতায় পৌঁছনো। মধ্যবর্তী স্তর নিশ্চয়ই গৌরবের কাল নয়। কিন্তু সেটা তাঁর কাছে হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতিরও কাল—আত্মপ্রস্তুতির। তিনি পৌঁছে যাচ্ছেন তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে, যেখানে 'চিরকালীন আধুনিকতা'র অবস্থান। অর্থাৎ, আধুনিকতার ঐ ঠুনকো বহির্লক্ষণের মধ্য দিয়ে গিয়েও তিনি তার অন্তঃসারকে বা পেছনের সত্যবস্তুকে গ্রহণ করছেন। তাঁর শেষজীবনের নাটক বা কবিতা সেই উপলব্ধিরই ফসল।

যুক্তির এই কাঠামোটাই বারবার ফিরে এসেছে শঙ্খ ঘোষের প্রবন্ধে। একেকটি অধ্যায়ে এই কাঠামোরই উপজীব্য বিষয়গুলি, যেমন তাঁর আমি-র বোধ কিংবা আধুনিকতার বাইরের অস্থির রূপ ও ভেতরের স্থির সত্তা, কিংবা আধুনিকতার প্রকরণগত চরিত্র, এসবই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

বিষয়ের সেই ঝোঁক নিয়ে তিনি বারবার ঐ কাঠামোটিকেই কিন্তু মেলে ধরেছেন। অর্থাৎ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে সেই যুক্তির পরম্পরাকেই উন্মোচিত করেছেন।

বিষয়গুলির আলোচনায় তিনি একান্তভাবে অনুপুঙ্খ ও একাগ্র। ন্যায্যতার বোধে পরস্পরবিরোধী প্রতিটি ধারণাকে সমান মর্যাদা দিতে চান। বিরুদ্ধ মতের বিস্তারেও এতটা সময় দেন যে তাতে পাঠক সাময়িকভাবে দিশেহারাও হতে পারে। অবশ্য এই নেতি-নেতি করে এগোনো নিশ্চয়ই একটি স্বীকৃত পদ্ধতি। কিন্তু এতে লেখকের কণ্ঠস্বরে এমন একটা অতিরিক্ত সহানুভূতির সুর লাগে যে প্রশ্নের উদয় হয়, লেখক কি পাঠককে সামান্য অনিশ্চিত করে দিতে চান? আরো মনে হয়, এর ফলে মূল যুক্তির টেনশন কি সময় সময় ক্ষয় পায় না? অনুপ্রেরণার চাপ এই লেখায় একেবারেই নেই তা তো নয়। কিন্তু অংশের টেনশনের স্বাধিকারে সমগ্রের টেনশন পুরো দানা বাঁধতে পারে না বা এক টেনশন যেন অন্য টেনশনকে শিথিল করে দেয়।

তার ফলে কখনো কখনো সংশয়ও তৈরি হয় লেখকের বলার ভঙ্গিতে। যেমন, ১৭২ পৃষ্ঠায় তিনি যে বললেন, রবীন্দ্রনাথ একদিকে 'আধুনিক কবিতার জগৎ প্রত্যাখ্যান' করতে চান, 'লক্ষ করতে পারেন না জীবনের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়া এর মূল সত্তা; এর তত্ত্বাশ্রয়'— অন্যদিকে তিনি 'উন্মুখ কৌতূহলে' তুলে আনেন আধুনিক কবিতার জগতেরই 'বহিরঙ্গ আভরণ, ছন্দে শব্দে প্রতিমায়' এবং এভাবেই 'নিজেকে তৈরি করে তোলেন নূতন আর সতেজ এক কবি হিসেবে'—এতে কি ভুল বোঝার একটু অবকাশ রইল না? শুধু বহিরঙ্গ আভরণ অবলম্বন করে, তার তত্ত্বাশ্রয়কে এড়িয়ে কী করে হওয়া যায় 'ভিন্ন রকমের' আধুনিকও? তা ছাড়া ঠিক পরের 'প্রতিমা' অধ্যায়ে তো শঙ্খ ঘোষই জানিয়েছেন, 'কবিতার প্রতিমা…বিচ্ছিন্ন কোনো অলংকার মাত্র নয়, সম্পূর্ণ জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভিতর থেকে কোনো এক সংগতি…আছে তার।' তাই কোনো এক অধ্যায়ের কোনো এক স্তরের যুক্তির নিহিত উত্তেজনাতেই নিশ্চয়ই তিনি বলে ফেলেছিলেন, 'বিষ্ণু দে-র বিচারমতো, তাঁর শেষ বয়সের কাব্যগ্রন্থগুলিকে "এলিয়টের, পিকাসোর প্রায় সহযাত্রী সমধর্মী অগ্রজ" বলে মেনে নেওয়া শক্ত হবে।' না হলে তাঁর মতো সূক্ষ্মদর্শী কবি এই উপমার আপাত বৈসাদৃশ্যতেই ঠেকে থাকবেন, বুঝে নেবেন না তার ইশারা, এ কি হতে পারে?

এর জের বোধহয় আরো গভীরে। বিষয়ের যে অংশটি আলোচনা করেন, তাকেই তিনি সম্পূর্ণতা, হয়তো প্রাপ্যেরও বেশি মূল্য দিতে চান বলেই, এমন ধারণাও তৈরি হতে পারে যা তাঁর অভিপ্রেত নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রাক-আধুনিকপর্বের আলোচনায়, অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব আধুনিকতার বিকাশের আলোচনায় কখনো-কখনো মনে হতে পারে, সেখানে বুঝি কোনো অপূর্ণতাই নেই। ঠিকই, 'বলাকা'-র দুটি কবিতা উল্লেখ করে তিনি দেখান, একটিতে কীভাবে আধুনিকের সংহতি গড়ে উঠেছে, আরেকটিতে গড়ে উঠে নি—তবু ঝোঁকটা যেন রবীন্দ্রনাথের নিজের আধুনিকতার সংহতিকেই একটু বেশি মূল্য দেওয়া। অপর পক্ষে, মনে হতেও পারে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী পর্যায়ের কথা বলতে গিয়ে, আমাদের সাহিত্যে আধুনিক প্রকরণের বহিরঙ্গতার যে ঐতিহাসিক ভূমিকা তার কথা তিনি কম বলেন, তার নিঃস্বতার ওপরই বেশি জোর দিয়ে ফেলেন।

এর ফলে তাঁর যুক্তির যে কাঠামো ছড়ানো আছে প্রত্যেক অধ্যায়ে, সেই কাঠামোর সামগ্রিক ঐতিহাসিকতার বিষয়ে তিনি অনেক সময়ই স্বল্পবাক্ হয়ে যান, বা বলা যায়, সেই ঐতিহাসিকতাকে তার স্বদেশগত ও বিশ্বগত রাজনীতি-অর্থনীতির দ্যোতনা সহ ভাষা দিতে চান না। সেই ঐতিহাসিকতাতেই তো একমুহূর্তও বিস্মৃত হবার নয় যিনি ধনতান্ত্রিক বিকাশের যুগের প্রাথমিক আধুনিকতা থেকে যাত্রা শুরু করে ধনতান্ত্রিক ক্ষয়ের যুগের আধুনিকতায় পৌঁছেছেন, সহস্র বাধা ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে, তাঁর অভিযানের অতুলনীয়তা—যদিও সমাজে বা অর্থনীতিতে সে বিকাশ বা ক্ষয় কোনোটারই ছোঁয়া নেই, শুধুই শিকড়হীন মনে তার যেটুকু বাস্তবতা। এই অতুলনীয়তার ধারণা শঙ্খ ঘোষের প্রবন্ধে একেবারেই নেই, এমন তো হতেই পারে না। তাঁর যুক্তির কাঠামোর মূল প্রেরণাও সেখানেই। কিন্তু সুবিচারের দায়বোধে তিনি ঐ কাঠামোরই পর্বে পর্বে অন্য ভাবনার প্রশ্রয়ে এমন জড়িয়ে পড়েন যে, ঐ বিরাটত্বের চকিত বোধ যেন দূর থেকেই গ্রহণ করতে হয়। অথচ যে উত্তেজনায় হয়তো, কারো মনে হতে পারে, বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধের বইটি আকীর্ণ এবং সেখানে মার্টিন লুথার থেকে বের্টল্ট ব্রেখট অবধি উপমানের যে কাঠামোটি গড়া হয়েছিল, তার ন্যায্যতা। আপাতদৃষ্টিতে তাকেই আকস্মিক ও অত্যুৎসাহী মনে হতে পারে কারোর। একই জর্মানির ইতিহাসে তো রেনেসাঁস-মানবিকতার সূত্রপাত লুথারে এবং ধনতান্ত্রিক মরণকামড়ের যুগে প্রতিবাদী মানবিকতার প্রতিভূ ব্রেখট।

শঙ্খ ঘোষের যুক্তি-কাঠামোর প্রত্যেকটি উপাদান এত সর্বাঙ্গীণভাবে আমাদের কাছে পৌঁছয় যে তাদের অনুধাবন করেই আমরা রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার শুধু নয়, আধুনিকতারই সমগ্র ধারণা পেয়ে যাই। এই ধারণা-গুলোই গড়ে ওঠে এই কাঠামোর মধ্যে। কাঠামোর যেমন, তেমনি এই ধারণাগুলির বোধও আলোচ্য গ্রন্থপাঠের উপার্জন। প্রত্যেকটি ধারণাই পাঠকের মনে কতকগুলি জিজ্ঞাসা, এমনকী হয়তো তর্কও উস্কে দেয় এবং তা যে দেয় সেটাই তাঁর লেখার সবচেয়ে বড় জোর। কয়েকটি ধারণা এবং তার জন্য তৈরি করা কয়েকটি শব্দবন্ধ বা সংজ্ঞা ধরে ধরে বইটির অসামান্য প্রাণবস্তু আমাদের কাছে এইভাবে পৌঁছয়।

যেমন, প্রথম অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা বুঝতে তাঁর আত্মশক্তির উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতির কথা বলা হয়েছে তাঁর 'আমি'-রই কতকগুলি রূপ ও রূপান্তরে—'ব্যক্তিগত আমি', 'বিশ্বগত আমি', 'মূর্তিগত আমি', 'নাট্যগত আমি' ইত্যাদি। কারণ শঙ্খ ঘোষ প্রথমেই বলে নিয়েছেন: 'আমি-র সঙ্গে সকল-এর যৌগিকতাকে বলা যায় রবীন্দ্রভাবনার কেন্দ্র।' তাঁর 'আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা'তেই ঘটে যায় 'দেশের আত্মপরিচয় ও ব্যক্তির আত্মপরিচয়'-এর সম্মিলন। এটা একটা খুব বড় সিদ্ধি নিশ্চয়ই, কিন্তু আধুনিকের নৈর্ব্যক্তিকতাও তা বলে নয়। কারণ, ব্যক্তিকে বর্জন বা ছাড়িয়ে যাওয়াতে নয়, 'নিজেকে দিয়েই আধুনিক কবি অনেক সময় বুঝতে চান তাঁর জটিল সময় আর পরিবেশকে।' রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার এই দ্বৈততাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। অথচ সেই অন্তর্বস্তু বাদ দিয়ে আধুনিকতার বাইরের লক্ষণগুলোর মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, প্রাথমিক প্রতিরোধ ও যুদ্ধের পর। হয়তো-পাঠকের চোখে আধুনিক হবার লোভেই—শঙ্খ ঘোষ যাকে বলেছেন রবীন্দ্রনাথের 'মূর্তিগত আমি'। আর তখনই তাঁর লেখায় চলে আসে আধুনিক বুলি নিয়ে বাকসর্বস্ব মানুষের ভিড়, কোনো কবিতায় সেই কবিতারই স্বভাব-বিরুদ্ধ শব্দ ও প্রতিমার উগ্র আধুনিকপনা। মনে হতে পারে, তাঁর আবরণ-মোচনের সাধনা ঝাপসা হয়ে গেল সাময়িকভাবে। কিন্তু তা থেকেও উঠে এলেন তিনি—'আরো স্পষ্ট এক মুক্তির দিকে'। তাঁর কবিতায় এসে গেল মানবসমাজ থেকে 'অনেক মুখের ভিড়'। রবীন্দ্রনাথ যেন এদের সঙ্গে, এমনকী এদের ব্যক্তিগত বিড়ম্বিত জীবনের সঙ্গেও একাত্ম হয়ে উঠতে চাইলেন। শঙ্খ ঘোষ এর নাম দিয়েছেন 'নাট্যগত আমি'। এই পথ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বগত আমি'-র নতুন স্তরে পৌঁছলেন। 'ছিন্নবিচ্ছিন্ন মানবচিত্র' থেকে

'মানবসভ্যতায়', 'মানবসভ্যতা' থেকে 'মানবসত্তার প্রশ্নে'। আমাদের লেখকের ভাষায়ঃ 'ঘরে ঘরে জীবনস্রোত, তারপর দেশদেশান্তরের ভাঙাগড়া, চিরকালের মানুষ, আর তারপর অনন্ত, এই ক্রমটি হল তাঁর বিশ্বগত আমিতে পৌঁছবার স্পষ্ট এক ক্রম।'

একটা প্রশ্ন তবু জাগে। রবীন্দ্রনাথের ঐ আধুনিক-পূর্ব যুগেও তো শুধু গোরা বা নিখিলেশ বা শচীশ নয়, ক্রমশই অন্য কতকগুলো মুখও উঁকি দিচ্ছিল। প্রধান হয়ে দাঁড়াচ্ছিল 'অমিত অতীন আদিত্য বা শশাঙ্কের দল'। 'অস্পষ্ট সূচনা সন্দীপের ভাবনায়'। তবে ঐ আধুনিকতার প্রতি লোভকে শুধু মূর্তিগত আমি-র টান বলে মনে করা হবে কেন? গোরা চতুরঙ্গ-ঘরেবাইরে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিকাশই কি চাইছিল না মনের কোনো লম্বা লাফ?

আধুনিকতার ঐ বাইরের ধাক্কা ছাড়াই রবীন্দ্রনাথের নিজের বাস্তবতাতেই যে রূপান্তরের সম্ভাবনা গড়ে উঠছিল, তা সাহিত্যে যতটা না বোঝা যায়, তার চেয়ে বেশি বোঝা যায় তাঁর ছবিতে। এই ছবি প্রকাশ করে তাঁর নিজের ভেতরকার লড়াই। আধুনিকতার বাইরের কোনো আলোড়ন দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না—না দেশের, না বিদেশের।

এই ছবির আলোচনায় শঙ্খ ঘোষ অসামান্য মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এর আগে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের অবচেতন দিয়ে একে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। যাঁরা তা স্পষ্টত করেন নি, তাঁরাও ওরই কাছাকাছি কিছু বলেছেন। শঙ্খ ঘোষ মনে করেন, বয়সের ভার কিংবা ভয় কিংবা অবসাদকে ছুঁড়ে ফেলে এ এক আত্মসচেতন লড়াই, সচেতনতার যন্ত্রণাবোধ, 'ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রৈতি'। শেষ বারো বছরের 'প্রচলবিরোধী আড়াই হাজার ছবি'র 'অনভ্যস্ত শিল্প' বা অ্যাডভেঞ্চারই হয়ে উঠেছিল সেই অবসাদ দূর করা প্রাণ-শক্তির লড়াই। শঙ্খ ঘোষের এই বিশ্লেষণ আরো অসামান্য হয়ে ওঠে, যখন দেখি তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে আদিম বিশৃঙ্খলের রূপ সচেতনভাবে যে আঁকছেন, যেমন প্রাগৈতিহাসিক জন্তুগুলির ক্ষেত্রে, সেটা শুধু 'বিশ্বসৃষ্টির রহস্যমোচন'ই নয়, যে বর্বরতা তিনি মানবসমাজে দেখতে পাচ্ছেন—ধনতান্ত্রিক সভ্যতার জান্তবতা—সেই বর্বরতারই প্রতিরূপ। তিনি বলছেন, 'সমকালীন পৃথিবীর প্রতি এই হয়ে ওঠে তাঁর ধিক্কারের একটা ধরন'। ছবিগুলো যেন 'ইতিহাসেরও এক অসুস্থ মুহূর্তের ধারক'। যে রবীন্দ্রনাথ ন্যাশনালিজমের বক্তৃতা দিচ্ছেন, কালান্তর-এর প্রবন্ধ কিংবা মুক্তধারা-রথযাত্রা-রক্তকরবী লিখছেন, এ তাঁরই আঁকা ছবি। '১৯২৮ সাল থেকে শুরু হওয়া

তাঁর ছবি যেমন এই দ্বন্দ্ব থেকে ছুটি নেবার আয়োজন, মুক্তির চেষ্টা, অন্যদিকে তেমনি সেই ছবি হয়ে ওঠে তাঁর এই গহন দ্বন্দ্বেরই কোনো প্রতিফলন, নিজের সঙ্গে নিজের সংঘাতে আর নিজের সঙ্গে সময়ের সংঘাতে কেবলই জেগে ওঠে যে দ্বন্দ্ব।'

ছবির ব্যাপারে এই যে নিশ্চয়তা তা কিন্তু সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায় না —আধুনিকতার সঙ্গে সংযোগের আদিকালে। তার একটা বড় কারণই এই, শঙ্খ ঘোষ বলতে চেয়েছেন, সাহিত্যের আধুনিকতা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিকাশে আসে নি, বাইরের চাপে এসেছে। হয়তো আসতে পারত নিজস্বতার পথ ধরেই—কিন্তু তার আগেই ঐ মূর্তিগত আমি-র হাতছানিতে তিনি আলোড়িত হয়েছেন পশ্চিমী আধুনিকতার এদেশী রূপায়ণের প্রভাবে। সেই আধুনিকতার 'দর্শন' তাঁর মনের অনুকূল নয়, অপরিচিত, হয়তো বিরোধী-ই—কিন্তু তার বাইরের লক্ষণগুলোকেই তিনি বিচ্ছিন্নভাবে বরণ করে নিলেন। এরই নাম দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ আধুনিকতার 'মুখোশ'।

আধুনিকতার বিরুদ্ধে স্বভাবতই বিদ্রোহী মন নিয়েই রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন। ১৯২৭ সালে তাঁর দুখানি বই 'সাহিত্যধর্ম' ও 'সাহিত্যে নবত্ব' তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল ক্ষুব্ধ এক তর্কযুদ্ধের মাঝখানে। অন্যদিকে আধুনিকরাও রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকারের চেষ্টা করেছেন সবলে। রবীন্দ্রনাথের কী প্রতিক্রিয়া ঘটল? তিনি যদি নির্বিকার হতেন বা শুধুই উগ্র প্রতিবাদী কিংবা নিজের সম্পর্কে হতাশ, তাহলে তাঁর পরিণতি হত একেক রকম। কিন্তু তাঁর প্রতিক্রিয়া হল জটিল। শঙ্খ ঘোষ তাকেই বলেছেন 'যন্ত্রণাময় আত্মদ্রোহ'— 'এদেশীয় আধুনিকের সঙ্গে বিচিত্র এক মিলন-বিরোধ সম্পর্ক'।

তার ফলে রুচির অনিশ্চয়তাও ঘটে—কখনো কোনোটা ভালো মনে হয়, কখনো মন্দ। নিজের অনভ্যাসেরই কারণই শুধু নয়, 'আধুনিকতাবিরোধী অন্য পাঠকের প্রতিক্রিয়া'-ও তাঁকে চালনা করে। আবার আধুনিকতার ভুল লক্ষণগুলোও ভুলভাবে তাঁর রচনায় আসে। কোনো কোনো লক্ষণ স্ববিরোধী বা স্বভাববিরোধীভাবেও। আধুনিকতা তার মুখোশ নিয়ে আসে।

কী সেই মুখোশের চেহারা? আধুনিকেরা ভাবছেন 'ফ্যাক্টরির কথা, মেট্রোপলিসের কথা', জ্ঞানবিজ্ঞানের ফ্যাশনেবল বুলি—যন্ত্রযুগের যন্ত্রকেন্দ্রিক প্রতিমা—'অসুন্দরের প্রতি অসংগত ঝোঁক', কেবলই 'সুস্থতা ও ভাঙনে'র শব্দ, 'ব্যস্তবাগীশ দৌড়'। ছবি বা প্রতিমা ব্যবহারের 'চমকপ্রদ আঘাতকারী প্রয়োগ', 'অলস মনকে ঝাঁকুনি দেবার মতো সচেতন কিছু আয়োজন'।

কিন্তু এ তো শুধু নির্মাণের দিক—'আধুনিকতার নির্মাণ'। নিশ্চয়ই এই

প্রয়োগ বা আয়োজনের পেছনে কোনো সত্য আছে। 'নির্মাণ' কখনো কখনো তো 'সৃষ্টি'রই ভিত্তি—সেখানেই তার বড় ভূমিকা। 'আধুনিকতার মুখোশ'-এর পাশাপাশি তাই শঙ্খ ঘোষ চয়ন করেছেন আধুনিকতার 'মুখশ্রী' শব্দটি। নির্মাণ যখন সৃষ্টিতে পৌঁছে দেয়, তখন পাই সেই মুখশ্রী। যখন তা পৌঁছে দেয় না, তখনই শুধু 'নির্মাণের প্রতিপত্তি'—তখন আধুনিকতার মুখশ্রী নয়, মুখোশ। 'মুখোশ' ও 'মুখশ্রী' নিশ্চয়ই বিপরীত ধারণা—কিন্তু নির্মাণের দুটি চেহারা। কখনো তা মুখশ্রী-র পূর্বাভাস, কখনো মুখোশের অঙ্গাঙ্গী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই 'যন্ত্রণাময় আত্মদ্রোহে'র কালে কখনো মুখোশ পরছেন, কখনো মুখোশ খুলে রেখে বুঝে নিতে চাইছেন মুখশ্রীকে। আবার পরের মুহূর্তেই হয়তো আধুনিকতার মুখোশকে মুখশ্রী সুদ্ধ বিসর্জন দিতে চাইছেন। 'বিস্ময়ের সঙ্গে ধিক্কার, বিশ্বাসের সঙ্গে সংশয়, আগ্রহের সঙ্গে আঘাত এইভাবে মিলে যায়···।'

মূলত কিন্তু আধুনিক কবিতার জগৎকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যানই করেন, লক্ষ করেন না 'জীবনের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়া এর মূল্ তত্ত্বাশ্রয়'। শুধু তাঁর অন্য এক মন সে জগতের প্রতি উন্মুখ কৌতূহলে তুলে নেয় এর কোনো কোনো বহিরঙ্গ আভরণ। খানিকটা দোষারোপের সুরও যেন এসে যায় আমাদের লেখকের বর্ণনায়, বিশেষত 'চালচিত্র'-অধ্যায়ে, যেখানে তিনি দেখান, যদিও রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন একদা, 'তাঁর স্বভাবে আছে ভারতীয়তার সঙ্গে সমপরিমাণ ইওরোপীয়তা', অথচ তিনি তাঁর ব্যাপক বিশ্বভ্রমণেও নাকি উৎসুক হন না বিদেশের নবীন বা আধুনিক লেখকদের সম্পর্কে, আধুনিক সাহিত্য-আন্দোলন সম্পর্কে। শুধু তাই নয়, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখের অত্যুৎসাহ সত্ত্বেও, ইওরোপীয় আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তেমন সাড়া দেন না। এতৎসত্ত্বেও তাঁর পরিচিতি ও পঠনের ব্যাপকতা যে বিস্ময়কর তা শঙ্খ ঘোষ নিশ্চয়ই মানেন—কিন্তু দোষারোপের ভঙ্গিটি যেন থেকেই যায়।

অবশ্য, একদিক থেকে এটাই তো স্বাভাবিক, রবীন্দ্রনাথ তাঁর রুচির নির্দিষ্ট প্রেরণায় এসব প্রত্যাখ্যান করবেন। তা ছাড়া আধুনিকতার একটা বড় যে লক্ষণ 'শিল্পিত রচনা' কিংবা তাঁর চোখে শুধুই 'নির্মাণের জগৎ'—সাময়িক বিভ্রান্তিকর অবলম্বন সত্ত্বেও—শেষপর্যন্ত কী করে প্রশ্রয় পাবে তাঁর রুচিতে ?

সুতরাং আধুনিকতার এই মুখোশের গ্রহণবর্জনে রবীন্দ্রনাথ যেমন দ্বন্দ্বময়, তেমনি আধুনিকতার মুখশ্রীর সঙ্গে তাঁর সাযুজ্যেও তাই। এই মুখশ্রীর বহু চিহ্ন তাঁর রচনায় আজীবন রয়েছে। আবার তার লঙ্ঘন বা বিচ্যুতিও দেখা

গেছে। যেটুকু রয়েছে বলে মনে হয়, তাও সবসময় ঠিক আধুনিকের মতো করেই রয়েছে এমনও হয়তো নয়।

যেমন, প্রতিমা-র কথাই ধরা যাক। আধুনিক সাহিত্যে প্রতিমা-র যে সংজ্ঞা, তার মধ্যেই আধুনিকতার মুখশ্রীর অনেক লক্ষণই সংহত। শঙ্খ ঘোষ তাকে বিস্তৃত করে বলেন, 'প্রতিমা বা প্রতীকের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার জগৎকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করবার এই চেষ্টাতেই আধুনিক কবিতা হয়ে এল এমন তীব্রভাবে ঘনতাময়, গূঢ়ভাবে ইঙ্গিতবহ।' এই পরিণাম কি রবীন্দ্রসাহিত্যেও নেই? তাঁর 'চতুরঙ্গ' বা 'রক্তকরবী'-র মতো নাটকে-গল্পে? 'চতুরঙ্গ' সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষ বলেন, 'যা ছিল তরল রূপকে ছড়ানো একদিন তা ঘন হয়ে এল প্রতীকে বা প্রতিমায়। একটির সঙ্গে অন্য ছবি যেখানে গাঁথা হয়ে যায় এমন এক সংগতিতে, সামান্য ইশারায় সেখানে সম্ভব হয়ে ওঠে এমন এক বহুস্তর বেদনার প্রকাশ যে আধুনিকের কোনো মন মস্ত এক ভর পেয়ে যায় সেখানে।' এই উপার্জনের জন্য কোনো বৈদেশিক আধুনিকতার মুখশ্রীর অপেক্ষা করে থাকতে হয় নি রবীন্দ্রনাথকে।

আবার দেখা যায়, 'বলাকা'-র কোনো কবিতার মতো 'পুনশ্চ'-র কোনো কবিতায় শুধুই 'সরল চালে' 'গ্রামজীবনের কিছু চলতি ছবির বর্ণনা'—সেখানে প্রতিমা সৃষ্টির কোনো প্রয়াসই নেই। 'বলাকা'-র দেখা আর 'পুনশ্চ'-র দেখা-র মধ্যে কোনো তফাৎই নেই তখন—শুধু 'তাঁর দেখার এই টুকরোগুলিকে তিনি সাজিয়ে নিতে চান আধুনিকের পছন্দমতো অনভ্যস্ত কোনো কোনো উপমানে।' বোঝা যাচ্ছে, আধুনিকতার মুখশ্রীকে তিনি ছুঁতে চাইছেন না বা পারছেন না, তার মুখোশ নিয়েই খুশি থাকছেন। এই অস্বীকার যে তার নিজের ভেতর থেকেই উঠে আসছে তা বুঝি, যখন মনে পড়ে, তাঁর অনুজ বাঙালি কবিরা অনেকে তখনই প্রতিমা বা প্রতীকের মধ্য দিয়ে মুখশ্রীর ঐ জগৎকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছেন এবং তাঁদেরই হাতে বাংলাদেশেও "আধুনিক কবিতা হয়ে এল এমন তীব্রভাবে ঘনতাময়, গূঢ়ভাবে ইঙ্গিতবহ'।

আসলে রবীন্দ্রনাথের কাছে আধুনিকতার লক্ষণগুলো বিচ্ছিন্নভাবে আসে। আধুনিকতার সত্যকেও তিনি অবিরলভাবে ছুঁয়ে থাকতে পারেন না। তাই তাঁর শেষজীবনের বহু রচনাকেই বিভিন্ন দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার প্রবণতা জাগে। শঙ্খ ঘোষ 'নবজাতক' ও 'সানাই'-এর কবিতাগুলিকে এরকম দুই শ্রেণীতে ভাগ করে প্রশ্ন করেছিলেন, এই ভাগাভাগি কি তাঁর মনের দ্বিধার পরিচয় নয়? তাই কখনো তিনি 'মননজাত' রচনার কথা বলেন,

নিজের মতো করে তা লেখেনও, আবার কখনো তাকে বর্জন করেন। কখনো বলেন, গ্রীক পাত্রকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, গ্রীক হাতুড়ি দিয়ে নয়—আবার কখনো 'ইন্টেলেকটের এক নূতন ব্যবহার' আনতে চান কবিতায়। কখনো দৈনন্দিনের-প্রত্যক্ষের মর্যাদা দানের কথা ভাবেন, কখনো তার বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেন। কিন্তু আধুনিকতার মুখশ্রীর যা অন্বিষ্ট, সেই 'মনন আর অনুভবের সমন্বয়', তথ্য ও সত্যের অদ্বৈত কিংবা দৈনন্দিনের মধ্যেই চিরকালীনের প্রকাশ—তা অখণ্ডভাবে আসতে পারে না তাঁর কবিতায়।

তাই কি? তাহলে 'শিশুতীর্থ'-এর মতো কবিতা কী করে পেলাম তাঁর হাত দিয়ে? মনন আর অনুভবের সমন্বয় ঘটে নি সেখানে? তাছাড়া আধুনিকতার যে একটা বড় লক্ষণ সমগ্রকে ছুঁতে পারা, তা কি ঘটে নি সেখানে? শঙ্খ ঘোষ বললেন, 'এর মধ্য দিয়ে আমরা ছুঁতে পারলাম একটা মহাসময়ের হৃৎপিণ্ডকে, আধুনিক সভ্যতার প্রাণান্তকর ব্যাধি আর তার মুক্তির ছবিকে।' বললেন, 'শিশুতীর্থের সেই মুখশ্রী থেকে শুরু হল রবীন্দ্রনাথের নতুন কবিতার কাল'—সঙ্গে সঙ্গে একথাও: 'কিন্তু মুখোশটাও ধরা থাকবে তাঁর হাতে, এর পরেও আরো কিছু দিন।'

সত্যি বটে, তিনি তাঁর প্রাক-আধুনিক পর্বেই 'জড়িত হয়ে তবু নৈর্ব্যক্তিক' থাকার কথা বলেছিলেন, বিচ্ছেদের 'সৃজনময় তাৎপর্যের' কথাও—কিন্তু তবু তা কি আধুনিক নৈর্ব্যক্তিকের সমার্থক? রবীন্দ্রনাথের কাছে বরং নৈর্ব্যক্তিক ও নিরাসক্ত কাছাকাছি। কিন্তু আধুনিক কবি তো 'লিপ্ত হতে চান সমস্তের মধ্যে'। আধুনিক লেখক ব্যক্তিগতকেও ছাড়েন না, আবার নৈর্ব্যক্তিকতার পথেও যেতে চান। তাই ব্যক্তিগত আবেগ হয়ে ওঠে সমাজেরও আবেগ, ব্যক্তিগত ভাষা সকলেরও ভাষা। যাওয়া আসা চলতে থাকে 'দুইতলে'। ভাষা তখন 'প্রতীককেন্দ্রিত ভাষা'—'সে ধারণ করতে পারে নিজেরই মধ্যে বিশ্বকে'।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, আধুনিক কবিতার কি এটাই পুরো ছবি? এলিয়টের নৈর্ব্যক্তিকতার সংজ্ঞাই শেষ কথা নয় এটা ঠিক। কিন্তু শঙ্খ ঘোষ যে বলেন, 'নগ্ন করে দেখানো'কেই যাঁরা মনে করেন আধুনিকতা, যেমন গিন্‌সবার্গেরা, তাঁদের নগ্নতার সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায় এই 'নৈর্ব্যক্তিকতা'—সেটা কি সবসময়ই ঠিক? ধরা যাক গিন্‌সবার্গ বা তাঁর এদেশী ও বিদেশী অনুব্রতীদের লেখায় তাই পেলাম—কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত কি আমাদের হাতে নেই, যেখানে 'নগ্ন করে দেখানো'-র ঐ ভঙ্গিতে আমরা শুধু ক্ষুদ্র তুচ্ছ জগতেই লীন হয়ে যাই?

অথচ সেই ছোট জগৎ থেকে উঠে আসাই যে আধুনিকতার দায় তা বলতে

শঙ্খ ঘোষ ভোলেন না। 'মুখশ্রী' অধ্যায়ে জানিয়েছেন, শূন্যতা বিবমিষা বিরক্তি এইসব নেতিবাচক অভিজ্ঞতাই আধুনিকতার সার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ যে সেটা অগ্রাহ্য করেন সেটা তাঁর অনাধুনিকতা নয়। এসব হল 'এক বিশেষ সমাজের বিশেষ মানুষের মুদ্রা'। আধুনিকতা শুধু বোদলেয়রের নয়, আধুনিকতা ব্রেখটেরও।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আধুনিকের যে সবচেয়ে বড় অভিযোগ, তাঁর "অতিকথনের প্রবণতা'—সেটাও কি সব সময়ই সত্য? এটাকেও দেখতে হবে দ্বন্দ্বময় গ্রহণবর্জন ও নির্মাণসৃষ্টির সেই ইতিহাসে। শেষ কটি কাব্যগ্রন্থে তিনি ভাষার যে আততিতে পৌঁছেছিলেন, তা তো আধুনিকেরও লক্ষ্য। শেষজীবনের ভাষায় যে 'রূপ'-এর প্রকাশ ঘটে, কবিতার অবয়বে একটা 'নির্দিষ্টতা' আসে, বাকবিস্তারের শিথিলতার বদলে 'ইঙ্গিতের সংহতি'—তা কি আধুনিকতারই মুখশ্রী নয়?

হয়তো এটা সত্য যে, সব সময় পশ্চিমের আধুনিকতার সঙ্গে তা খাপে খাপে মিলবে না। তাছাড়া পশ্চিমী আধুনিকতারও আছে বিস্তার, জটিলতা ও বহুরূপ—সঙ্গে সঙ্গে তার সংকট ও বিকৃতিও। সেখানেও তো একের সঙ্গে অন্যের মেলে না। রুচির বিস্তারে আমরা তার দিকে লক্ষ্য রাখি—কিন্তু শিল্পের দায়বোধে ও জীবনের অঙ্গাঙ্গিতায় বেছে নিই তার কোনো একটার বা কতকের সহমর্মী অভিযানকেই শুধু। সুতরাং আমরা কী করে খুঁজব রবীন্দ্রনাথের কোনো মূর্তিগত মুখশ্রী?

তাই তো শঙ্খ ঘোষ শেষপর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দেন রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব আধুনিকতার রূপান্তরের জগতে, তাঁর আধুনিকতার নিজভূমিতে—আদিপর্বের পারম্পর্যে, মধ্যপর্বের নির্মাণমুখর দ্বন্দ্বময় অভিজ্ঞতায় তিনি যা অর্জন করেছিলেন। তখন বাইরের আধুনিকতার পুরুষার্থগুলো অবান্তর হয়ে যায় না ঠিকই, কিন্তু তাঁর অনিবার্য সীমাবদ্ধতা বা পিছিয়ে-পড়াগুলো মেনে নিয়েও খুঁজে নিতে পারি তাঁর মধ্যে আধুনিকতার মৌল চারিত্রকে।

সেই চারিত্রই হল শঙ্খ ঘোষের ভাষায় 'চিরকালীন আধুনিকতা'। তিনি আরও বলেছেন, 'অভ্যাস থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবার দীর্ঘ ইতিহাসই হয়ে ওঠে তাঁর সাহিত্যচর্চার বড় ইতিহাস।' এ কারণেই নির্দিষ্ট একটা স্থির বিন্দুতে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে থাকেন না কখনো। আধুনিকের কাছেও তো এই পরিবর্তমান বিশ্বে চলাটাই বড়। শঙ্খ ঘোষের ভাষায়, হয়ে-থাকার চেয়ে হয়ে-ওঠাটাই বড়।

তা বলে গা ভাসিয়ে দেওয়া নয়। গা ভাসিয়ে দিতে পারেন তিনি যাঁর কেন্দ্র নেই। রবীন্দ্রনাথের বিকাশ এক 'কেন্দ্রীয় চৈতন্যের বিকাশ'। কেন্দ্রকে স্থির রেখে অস্থির জগতের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে, গ্রহণবর্জনেরও নিরন্তর প্রশ্নের সম্পর্ক নিয়ে এগিয়ে চলা। সেই চলার অভিজ্ঞতায় কেন্দ্রেরও স্বরূপ পালটায়—সেই স্বরূপের নিজস্ব তাগিদে মুখের শ্রীও বাড়ে, নতুন হয়। রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কবিতার মুখশ্রী সেভাবেই গড়ে উঠেছিল।

শঙ্খ ঘোষ এবং বিষ্ণু দে উভয়ই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতাকে তাঁর জীবনের ও সৃষ্টির সামগ্রিকতার মধ্যেই অনুসন্ধান করেন। অর্থাৎ তাঁরা জানেন, আধুনিকতার এই অভিযান রবীন্দ্রনাথের লেখার গোড়া থেকেই শুরু হয়েছিল এক-অর্থে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের রচনার আদিপর্ব এবং তার সংকট ও উত্তরণ শঙ্খ ঘোষের প্রবন্ধের বিষয় নয়। তার ফলে সময়-সময় মনে হয় এই দ্বন্দ্বময় লেখকজীবনের সমগ্রতার চেহারাটাকে একটু যেন অসম্পূর্ণ রেখে দিচ্ছেন তিনি পাঠকের কাছে—পৌঁছে দিচ্ছেন না সেই খবর, যাকে বিষ্ণু দে তাঁর প্রবন্ধে বলেছিলেন 'কিশোরকবির নৈঃসঙ্গ্যবোধ, বিষাদ, তাঁর সংকটের আর্তনাদ'। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী আধুনিকতারও স্বরূপ বোঝার জন্য এই বিস্তারের কি প্রয়োজন ছিল না? শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রমনে পশ্চিমী আধুনিকতার অভিঘাত এবং তার আলোড়নই যেহেতু শঙ্খ ঘোষের প্রবন্ধের বিষয়গত কেন্দ্রবিন্দু, তাই আলোচনাটা অনিবার্যভাবে যে দুটি পর্বে ভাগ হয়ে যায়, তাতে মনে হতে পারে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের বিকাশ বুঝি খানিকটা অনায়াস, প্রথম পর্বের আধুনিকতার উপার্জনে বোধহয় গভীর কোনো সংকট নেই। অন্তত পরবর্তী পর্যায়ের সংকটের তুলনায় তা যেন অনেকটাই ফিকে। সেখানে সমন্বয়ের বা উত্তরণের গৌরবটাই বেশি করে বলা হয়, 'সংকটের আর্তনাদ' নয়। অথচ বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধে দেখি, তিনি শুরু করেন রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক 'আত্ম-পরিচয়ের প্রতিষ্ঠাসংকট' থেকেই এবং সেই সূত্রে তিনি বলতে পারেন: 'এই কবিত্বের তাড়নাতেই তাঁর শান্তি ছিল না কোনোদিন।' এই অশান্তি, বা বিষ্ণু দে যাকে বলেন 'রবীন্দ্রবিশ্বের ভূগর্ভস্থ তাত্ত্বিক সংকট', নিশ্চয়ই বিভিন্ন সময়ে তার প্রকৃতি বদলেছে—কিন্তু পর্ব-পর্বান্তরে তার সংলগ্নতা হারায় নি। তাঁর সৃষ্টির ভেতরে নিহিত এই যে আনুপূর্বিক ও সামগ্রিক দ্বন্দ্বময়তা তাই হয়ে যায় 'দ্বন্দ্ববদ্ধ একতা'। কারণ তার পেছনে আছে সেই মানুষটির যাকে বিষ্ণু দে বলেন 'তত্ত্বসংগঠন' কিংবা শঙ্খ ঘোষ বলেন 'কেন্দ্রীয় চৈতন্য', তা-ই।

রবীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধতা কোনখানে আধুনিকের কাছে, সে বিষয়ে নির্বাক নন দুজনের কেউই। শঙ্খ ঘোষ বলেন, 'মিথ্যে নয় যে রবীন্দ্রনাথের রচনায় অনেক সুকুমার অনুভব অনেক সময়েই দুলে উঠেছে এই সেন্টিমেণ্টাল ঢেউয়ে, আর সেইখানে তা সরে যায় আধুনিকের রুচি থেকে।' বিষ্ণু দে-ও বলেন, 'আমাদের স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে আমাদের মহাকবি তাঁর মতামতে তো বটেই, এমনকী বিরাট সাহিত্যকীর্তিতেও দেশকালে বাধ্যতই নির্দিষ্ট ছিলেন।' কিন্তু তাকে ছাপিয়ে বলবার কথা এটাই: শঙ্খ ঘোষের ভাষায়, 'নিজের এই বিরুদ্ধতা, ক্রমিক এই নৈর্ব্যক্তিকতা, আমাদের এই কবিকে কেবলই যুক্ত করে দেয় বহির্বিশ্বের সঙ্গে, ব্যাপ্ত কালের সঙ্গে', এবং বিষ্ণু দে-র ভাষায়, 'বিশ্ববিচারে আমাদের গৌরব হচ্ছে তিনি কীভাবে এবং কতখানি ঐ নির্দিষ্টতাকে ক্রমান্বয়ে সংকট ও উত্তরণের চৈতন্যময়তায় ঐশ্বর্যবিস্তারে অতিক্রম করেছিলেন।'

সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের রচনার ঐশ্বর্যই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা বিষয়ে আজকের যে কোনো আধুনিককে সঞ্জীবিত করে। উদ্ধৃত করা যায় এ-প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ উচ্ছ্বসিত উপলব্ধি: 'মনে রাখব যে রবীন্দ্রনাথ অনভ্যস্ত ও তাঁর পক্ষে স্বাধীন বলেই চিত্ররচনার স্রোতে তাঁর চৈতন্যকে অবাধ ঐশ্বর্য দিয়েছেন, যার ফলে তাঁর চিত্র স্বাধীন চেতন-অবচেতনের সংলগ্নতায় মূর্তি পেয়েছে দুহাজার চিত্রপটে। আর ভুলতে দেব না যে দীর্ঘ সত্তরপঁচাত্তর বছরের আস্তিক্যের অভ্যস্ত শাসন সত্ত্বেও এই কবি বিশ্বের কালান্তরে এবং নিজের চৈতন্যনাশা অসুস্থতার মধ্যে বিবিক্ত আত্মসচেতনতার সংকটের মৌলপ্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং উত্তীর্ণ কৈবল্যে লিখেছিলেন বার্ধক্যেও নতুন আবিষ্কারের বিরল দ্বিধান্বিত ভাষায় ছন্দে বাংলার আধুনিকতম বেশ কিছু কবিতা—আধুনিকতম যদিচ সরলরেখায় উত্তরণশীল।' কিংবা শঙ্খ ঘোষেরও প্রশান্ত বাচন: 'একদিকে "প্রান্তিক", আর অন্যদিকে "রোগশয্যায়", "আরোগ্য" "জন্মদিনে", "শেষলেখা", পাঁচখানি এই কবিতার বই একটি সামগ্রিক প্রতিমা হয়ে আমাদের সামনে তুলে আনে সেই সত্তাচৈতন্যের উপলব্ধি। এই সবকটি বইতেই আমরা পাই অহংপরিচয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে আমির সঙ্গে না-আমির এক পরিণত সম্পর্কের আদল।'

কিন্তু, তা সত্ত্বেও, এটাও ঠিক যে দুজনেই এই শেষজীবনের রচনাতেই শুধু তাঁদের আধুনিকতার সন্ধান করেন নি। শঙ্খ ঘোষ প্রথম পর্বের সংকটের বর্ণনায় যদি-বা কিছুটা অন্যমনস্ক হয়েও থাকেন, তখনকার আধুনিক

প্রাসঙ্গিকতার কথা তিনি সবিস্তারেই বলেছেন। এমনকী মুক্তধারা-রক্তকরবী-রথযাত্রা নাটক প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এই তিনখানি নাটকের মধ্যদিয়ে তৈরি হয়ে উঠছিল তাঁর আধুনিকতায় পৌঁছবার এক তোরণ, চলমান সময়ের মধ্যে গোরা-শচীশ-নিখিলেশদের যোগ্য এক পরিণাম।' বিষ্ণু দেও বলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, 'এই অসাধারণ শেষপর্ব বাদ দিলেও আধুনিকতার ইতিহাসে কেউ রবীন্দ্রকীর্তিকে বাদ দিতে পারবেন না, উত্তরাধিকারকে রূপান্তরিত করতে, সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারেন মাত্র।'

এই উত্তরাধিকারের প্রশ্নই আজ আধুনিকের কাছে সবচেয়ে বড়। বিষ্ণু দে বলেন, 'আমাদের শিল্পসাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, আমাদের ইতিহাসের মানসে রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে, বিস্তৃতভাবে আধুনিকতার আর্কেটাইপ, মৌলিক প্রতিনিধি···।' শঙ্খ ঘোষ তাঁর বইতে এই উক্তিটি শুধু উদ্ধৃতই করেন নি (অবশ্য 'সংস্কৃতিতে, আমাদের ইতিহাসে' অংশটি বাদ দিয়েছেন, বাক-সংকোচনের জন্যই হয়তো), বারবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে নিজের ভাষায় এই অনুভবকেই জানিয়েছেন। কেন এই কথা উঠেছে? কেন শঙ্খ ঘোষও বলছেন, রবীন্দ্রনাথের 'সে মুখশ্রীতে এক দীপ্ত আর কালোত্তীর্ণ আধুনিককেই দেখতে পাব আমরা'?

আজকের আধুনিককেও কি তবে সেই একই সমস্যায় ও সংকটে পড়তে হয়, যা রবীন্দ্রনাথকে পদে পদে বিচলিত করেছিল? আজকেও আধুনিকতার ঘূর্ণাবর্ত। দেশী বিদেশী অনেক মুখোশ হাতে উঠে আসার জন্য প্রস্তুত। নানা প্রলোভনে ব্যক্তিগতের হাতছানি ও জৌলুশ শিল্পসাহিত্যে। ছোট জগৎ উজিয়ে বড় জগতের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার পথে অনেক বাধা। সংবাদপত্র, পুরস্কারব্যবস্থা, সাহিত্য সম্মেলন বা সাহিত্যভ্রমণের পথ ধরে অনেক 'মূর্তিগত আমি' গড়ার আয়োজন। আমাদের সামাজিক বাস্তব ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে ব্যক্তির ভূমিকাকে। আমাদের রাজনীতি এমন রূপ নিতে চাইছে, যাতে অংশগ্রহণ ও অপসরণ প্রায় এক জায়গায় পৌঁছে গেছে, একই ভাবে দৃষ্টিকে ক্ষীণ করে দিতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে শিল্পসাহিত্যে আজকের লড়াইয়ের জন্য কি তবে চাই চোখের সামনে একটা বড় লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত? রবীন্দ্রনাথের কাছে কি এজন্যই বারবার ফিরে আসতে হয় সচেতন আধুনিককে? তাঁর নির্মাণ ও সৃষ্টি প্রেরণা জোগায়, শুশ্রূষা ও পরামর্শ দেয়, জানায় কীভাবে 'আত্মবলয়' ভেঙে আজকের লেখকশিল্পী এগিয়ে যাবে 'আধুনিক এক হার্মনির দিকে'?

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের শিল্প ও নন্দন চিন্তা

মৃণাল ঘোষ

চিত্রকথা: বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। সম্পাদনা: কাঞ্চন চক্রবর্তী। অরুণা প্রকাশনী। কলকাতা। ১৩৯০। ৪০ টাকা

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে 'প্রবাসী'তে (চৈত্র ১৩৩৭)। প্রবন্ধের নাম 'ফ্রেস্কো'। প্রথম লেখার সঙ্গে দ্বিতীয় লেখা প্রকাশের ব্যবধান প্রায় দশ বছর। 'শিল্পের উপকরণ' নামে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায় (৮ ভাদ্র, ১৯৪৭)। এর পর থেকে শিল্পকলা বিষয়ে কিছু কিছু নিবন্ধ তিনি মাঝে মাঝে লিখেছেন। যদিও লেখক হওয়ার কোনো সচেতন অভিপ্রায় তাঁর ছিল না গোড়ার দিকে। শেষ বয়সে তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধে, যাঁদের মধ্যে সত্যজিৎ রায় অন্যতম, তিনি নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। ছোট-বড় শিল্প-বিষয়ক প্রবন্ধ ও আত্মজীবনীমূলক রচনা, সব মিলিয়ে বাংলায় প্রায় ৮০টি এবং ইংরেজিতে ৩১টি লেখা সারা জীবনে আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি।

তিনটি আত্মজীবনীমূলক রচনা ও 'শিল্প জিজ্ঞাসা' নামে শিল্প-বিষয়ক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ নিয়ে 'চিত্রকর' নামে তাঁর প্রথম রচনা-সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৭৯তে। এটি অবশ্য তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ নয়। এর আগে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর 'আধুনিক শিল্পশিক্ষা' ১৯৭২-এ। এটি এখন দুষ্প্রাপ্য। এই 'আধুনিক শিল্পশিক্ষা' সহ মোট ২৩টি বাংলা ও ৬টি ইংরেজি ছোট ও বড় লেখার সংকলন হিসেবে সম্প্রতি (এপ্রিল ১৯৮৪) প্রকাশিত তাঁর 'চিত্রকথা' গ্রন্থটি বাংলা প্রকাশনা ও শিল্প-আলোচনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। 'শিল্প জিজ্ঞাসায়' নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয়তা ও গভীরতার পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম। দীর্ঘ ৪০ বছরে ব্যাপ্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়ানো তাঁর নানা লেখার স্মৃতি

আমাদের মনে তাঁর শিল্প ও নন্দন চিন্তার একটি অবয়ব রচনা করেছিল। এই বই-এর নির্বাচিত রচনাগুলি একত্রিত হয়ে সেই অবয়বকে সম্পূর্ণতা দিতে পারল। বাংলায় সমকালীন শিল্পচিন্তার ইতিহাসে 'চিত্রকর' ও 'চিত্রকথা' এই দুটি গ্রন্থের গুরুত্ব যথেষ্ট।

চিত্রশিল্পী হিসেবে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অনন্যতা আজ আর আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। তবু ভালো ছবি-আঁকিয়ে বা উচ্চমার্গের শিল্পী, এটুকুই তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের ধারায় এবং তার পরবর্তী অপেক্ষাকৃত সমকালীন পর্যায়ে ভারতীয় আধুনিকতার ভিত্তিভূমি নির্মাণে তাঁর যে অবদান, তার মূল্যায়ন হয়তো এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। আধুনিকতার সমস্যা ও প্রকৃতি যুগে যুগে বিবর্তিত হয়। ঐতিহ্য ও পরম্পরাগত সম্পূর্ণ এক অন্ধকার পটভূমিতে আধুনিকতাজনিত যে-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ এবং যেভাবে তার সমাধান তিনি খুঁজেছিলেন তাঁর আজীবনের সাধনায়; তা ছিল বাস্তবতারই এক অনুধ্যান ও বিশ্লেষণ। সেই বাস্তবতার বোধ কিন্তু তরলায়িত হয়ে গেল তাঁর পরবর্তী প্রজন্মে বা তাঁর শিষ্য-পরম্পরার হাতে। ঐতিহ্য ও সমকালীন বাস্তবতার নূতন সমন্বয়ে নিয়োজিত হয়েছে নন্দলালের প্রতিভা। ধ্রুপদী ভারতীয়তা বা ধ্রুপদী প্রাচ্য পরম্পরার আলোতে প্রকৃতি ও জীবনের সমন্বয়ে আদর্শায়িত এক বাস্তবতার রূপ সন্ধান করেছেন তিনি। পাশ্চাত্য থেকে নিয়েছেন সামান্যই। চেতনার এক আদর্শায়িত রূপের দিকে তাঁর লক্ষ্য নিয়োজিত ছিল। রূপ ও ভাব উভয়তই তাঁর বাস্তবতা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সেই আদর্শায়িত শীর্ষ থেকে। এই পরম্পরার প্রসারণ হলেও সময়-প্রবাহের অনিবার্য নিয়মেই বিনোদ-বিহারীর সমস্যা কিছু জটিলতর ছিল। আদর্শায়িত কোনো শীর্ষ থেকে বাস্তবতাকে দেখা যেমন সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে, তেমনি সম্ভব ছিল না বাস্তবের একেবারে নগ্ন শূন্যতা বা নেতির দিক থেকে দেখাও। এই দুই চরমের মধ্যবর্তী এক বিন্দু থেকে আদর্শ, প্রকৃতি ও সমকালীন জীবনপ্রবাহকে সমন্বিত করে বাস্তবতার আধুনিক বিন্যাস ও মাত্রা যোজনায় নিয়োজিত ছিল তাঁর চিত্রসাধনা।

আধুনিকতার এই স্বতন্ত্র পথ নির্মাণে বিনোদবিহারীর প্রচেষ্টা দুই ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। চিত্রসাধনায় যেমন, তেমনি তত্ত্বগত দিকেও। 'চিত্রকথা' প্রকাশের পর তাঁর সেই তত্ত্বগত ভূমি আমাদের ধারণায় সম্পূর্ণতা পেল।

আমাদের আধুনিক শিল্পকলার ইতিহাসে নূতন পথ বা ধারার প্রবক্তাদের

তত্ত্বের জমি তৈরি করার দৃষ্টান্ত নূতন না হলেও, খুব অবিরলও নয় তা। অবনীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথে এই প্রয়াস যে স্বতন্ত্র নন্দনচর্চার স্বীকৃতি পায়, নন্দলালের তত্ত্বগত ভূমি ততটা বিস্তৃত নয়। বেঙ্গল স্কুলের পরবর্তী প্রজন্মে বিনোদবিহারী এদিক থেকেও অনন্য। তাঁর সমসাময়িক বা পরবর্তীদের মধ্যে, নীরদ মজুমদার, পরিতোষ সেন, কে. জি. সুব্রহ্মণ্যম বা প্রদোষ দাশগুপ্তের নানা লেখার কথা মনে রেখেও বলা যায়, এত সুচিন্তিত ও সুগ্রথিত শিল্প-আলোচনা, যা নূতন প্রজন্মের নান্দনিক ভাষ্য হয়ে উঠতে পারে, তার দৃষ্টান্ত বেশি নেই।

অথচ তাত্ত্বিক কোনো জটিলতা নেই তাঁর লেখায়। সহজ আলাপচারির মতোই সাবলীল তাঁর সমস্ত আলোচনা। শেষ জীবনে দৃষ্টিহীনতার জন্য নিজে লিখতে পারতেন না। বলে যেতেন, অন্য কেউ লিখে নিত। কথোপকথনের সরসতা তাঁর অধিকাংশ লেখারই প্রধান গুণ। সহজ ভাষায় নিজের চিন্তা ও উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন, বিশিষ্ট বা নূতন কোনো তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়াসে নয়। কিন্তু এতই উজ্জ্বল ও সংশয়মুক্ত ছিল তাঁর চিন্তা যে, সেই সাবলীল উপস্থাপনা থেকে রচিত হয়ে যায়, তাঁর চিত্রকলারই মতো, স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এক তত্ত্বের জগৎ। এরকম, একই সাথে সাবলীলতা ও গভীরতায় দীপ্তিময় রচনার দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই আমাদের শিল্পচিন্তার ইতিহাসে। একজন শিল্পী যখন তাঁর শিল্পচিন্তা ব্যক্ত করেন, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, তাঁর আলোচনা বিস্তৃত হয় শিল্পের প্রয়োগগত সমস্যাকে কেন্দ্র করে, সমসাময়িক শিল্পের অন্তর্নিহিত বাস্তব সমস্যার বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে। শিল্পতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিকের আলোচনার মতো সামগ্রিক ইতিহাসচেতনার বিস্তৃত ভূমি তাঁর আলোচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে যদি নাও থাকে, সমকালীন শিল্পের অন্তর্নিহিত বাস্তব সমস্যার বিশ্লেষণ তাঁর আলোচনাতে স্বতন্ত্র এক মাত্রা যোগ করে। বিনোদবিহারীর লেখায় এই মাত্রা যেমন স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান, তেমনি তথ্য ও ইতিহাস চেতনার গভীরতারও কোনো অভাব নেই। বরং ভারতীয় জীবনধারা ও সভ্যতার মর্মস্থানটিকে বারবারই তিনি অন্বেষণ করেছেন। বর্তমানের সঙ্গে তার যোগসূত্র নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। সেই ঐক্যের চেতনা থেকে বর্তমানকে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। শিল্পী ও শিল্পতাত্ত্বিকের সমন্বয় তাঁর লেখাকে আরও দীপ্তি ও অনন্যতা দিয়েছে। কখনোই নিছক তত্ত্বের শুষ্কতার দিকে যেতে দেয় নি।

আলোচ্য গ্রন্থটি চারটি পর্বে বিন্যস্ত। প্রথম পর্বের দশটি প্রবন্ধে সামগ্রিক

ভাবে ভারতশিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প-নন্দনের নানা সাধারণ সূত্রের বিশ্লেষণ করেছেন। তাতে ভারতীয় মহাকাব্যের আলোচনা যেমন আছে, তেমনি আছে লোকশিল্প বা শিল্পীর স্বাধীনতার মতো গভীর বিষয়। আবার এরই সঙ্গে 'শিশুদের ছবি আঁকা' বা 'রন্ধনশিল্প' সম্বন্ধেও আলোচনা রয়েছে। 'রন্ধন-শিল্প'-এর মতো হাল্কা ও সরস লেখাতেও শিল্পের সংজ্ঞার মতো গভীর বিষয়কে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় পর্বে 'আধুনিক শিল্পশিক্ষা' নামে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত পূর্বোক্ত গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক শিল্পশিক্ষার বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এখানে তিনি আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসই ব্যক্ত করেছেন। তৃতীয় পর্বের এগারটি লেখা শিল্পী-সম্পর্কিত। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার হালদার, রবীন্দ্রনাথ ও রামকিঙ্কর এই কজন শিল্পী যাঁরা নূতন মাত্রা সংযোজন করেছেন আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলায়, তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা ছাড়াও রয়েছে আরও দুজন বিদেশী শিল্পীর পরিচয়ঃ উইলিয়ম ব্লেক ও জ্যাকব এপস্টাইন। চতুর্থ পর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'ভারতীয় চিত্রকলার নূতন উন্মেষ' নামক আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার সূচনাপর্বের উপর আলোচনা ছাড়া পাঁচটি ইংরেজি প্রবন্ধ। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবনীন্দ্রচিত্রের কালানু-ক্রমিক সূচি,' জাপানের শিল্পকলা, ও ভিত্তিচিত্র নিয়ে তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষা বিষয়ে *My Experiments with Murals* নামক লেখা তিনটি। এ ছাড়া এই রচনা-সংকলনের সম্পাদক কাঞ্চন চক্রবর্তীর করা 'বিনোদবিহারীর রচনাপঞ্জী'ও এই গ্রন্থের এক মূল্যবান সম্পদ।

দুই

'চিত্রকর' গ্রন্থের 'শিল্প জিজ্ঞাসা' ও 'চিত্রকথা'র প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে বিনোদ-বিহারীর শিল্পচিন্তা একটি বৃত্তের সম্পূর্ণতা পায়। বিভিন্ন সময়ে নানা প্রয়োজনের তাগিদে এগুলো লেখা হয়েছে, কোনো তত্ত্ব-নির্মাণের সচেতন প্রয়াসে নয়। তাই প্রথাগত অর্থে শিল্প ও সৌন্দর্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এখানে স্বভাবতই পাওয়া যাবে না। কিন্তু যখন খুব হাল্কা চালেই তিনি বলেনঃ 'যখন ছন্দের উপলব্ধি থেকে কোনো বস্তু-আশ্রিত আকার নির্মাণ করি, সেটি হল শিল্পকলা' (পৃ. ৯৬) বা 'সকল কর্মকে ছন্দে পরিণত করা এবং ছন্দোময় কর্মশক্তির দ্বারা সমাজকে প্রভাবান্বিত করা সম্ভব। এই কারণেই শিল্প জনশিক্ষার সর্বপ্রধান উপায় বললে অন্যায় হবে না' (পৃ. ৯৭), তখন শিল্পের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণার স্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা পেয়ে যাই। আর

পুলকিত হই যে এরকম সারগর্ভ উক্তি তিনি করতে পারেন 'রন্ধনশিল্প'-এর মতো হাল্কা মেজাজের লেখাতেও। অথবা 'শিশুদের ছবি আঁকা' সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে যখন শৈশবের সীমা নির্ধারণ করেন এভাবেঃ 'যতদিন পর্যন্ত ইমপ্রেশনটাই প্রধান, ততদিন পর্যন্ত শৈশব বর্তমান। যখন থেকে ইমপ্রেশনের পরিবর্তে অবজারভেশন শুরু হয় অর্থাৎ মন যখন বিশ্লেষণ করতে শুরু করে, তখন থেকেই ছোটদের বড় বলে ধরা যেতে পারে' (পৃ. ৮২), তখন শুধু জ্ঞান নয়, অন্য এক প্রজ্ঞার স্বাদ পাই তাঁর লেখায়। এরকম দৃষ্টান্ত অজস্র ছড়িয়ে আছে।

শিল্পীচেতনা ও বাস্তবতার পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাস ও বিবর্তনধারার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে শিল্পকলার স্বরূপ ও ইতিহাস। এই সম্পর্ক যেমন বিবর্তিত হয়, তেমনি প্রত্যেক যুগকেও তার শিল্পকলার ঐতিহ্যকে নূতন করে বুঝে নিতে হয় এই সম্পর্কের নূতনতর বিন্যাসের মধ্য দিয়ে। প্রাজ্ঞ শিল্পালোচনা আমাদের সামনে সেই সম্পর্ককেই পরিস্ফুট করে, এবং বিস্তৃত করে বিনোদবিহারীর সমস্ত আলোচনা নিয়ন্ত্রিত হয় এই দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর নিজের সময়ে শিল্প ও বাস্তবতার সম্পর্কজনিত যে সমস্যা, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি যেমন বুঝে নিতে চান অনাদি কাল থেকে প্রবহমাণ ভারতশিল্পকে, তেমনি আধুনিকতার বিভিন্ন পর্যায়েও বুঝে নিতে চান এই সম্পর্কের স্বরূপ। এবং এই সূত্রেই বিশ্লেষণ করেন শিল্পকলার সফলতা বা ব্যর্থতার প্রকৃতি। তাঁর আলোচনা বিস্তৃত ও বিবর্তিত হয় তিনটি সম্পর্কের উপর ঃ শিল্প ও প্রকৃতির সম্পর্ক, শিল্প ও বাস্তবতার সম্পর্ক, শিল্প ও সমাজের সম্পর্ক। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে এই সব কটি সম্পর্কই সাধারণভাবে শিল্প ও বাস্তবতার সম্পর্কের আওতায় চলে আসে।

প্রকৃতি ও জীবনের সঙ্গে একাত্মতাই, তাঁর মতে, ভারতশিল্পের স্থায়ী ভাব। 'মহাকাব্য ও ভারতশিল্প' নামের প্রথম প্রবন্ধে ভারতশিল্পের মূল স্বরটির অনুসন্ধান করেছেন তিনি। তাঁর এই অনুসন্ধানের বিশিষ্টতা এখানেই যে, ভারতশিল্প-সম্পর্কিত দীর্ঘলালিত যে অলৌকিকতা বা আধ্যাত্মিকতার তত্ত্ব, তার থেকে অনেক দূরবর্তী তাঁর সন্ধানের পথ। ভারতশিল্পের গভীরে সঞ্চালিত এক ছন্দের বোধ। প্রাগৈতিহাসিক শিল্প, যেমন মহেঞ্জোদারোর নারীমূর্তিতে ও 'সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে' যে হিন্দোল বয়ে যায়, সেই ছন্দের উপস্থিতি সমস্ত সফল শিল্পেরই প্রাণস্বরূপ। প্রকৃতির সাহচর্য ও তার সঙ্গে একাত্মতা থেকেই আহৃত হয়েছে এই ছন্দ। মহেঞ্জোদারোর সময় থেকে সাঁচী, ভারহুত বা অমরাবতীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকলাতে প্রকৃতি ও জীবনের সঙ্গে এই

একাত্মতা অনুভব করা যায়। এই একাত্মতায় সমন্বয় ঘটেছে চিত্র ও ভাস্কর্যের, নৃত্য ও নাট্যের। এই ঐক্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ মথুরার বুদ্ধমূর্তি।

গুপ্তপূর্ব যুগ পর্যন্ত ভারতশিল্পের এই যে নির্লিপ্ত সংযমপূর্ণ, অনাড়ম্বর অথচ প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল প্রকাশ, সেই আদর্শ অবনমিত হল গুপ্তযুগে এসে, নানারকম ধর্মীয় সংস্কার ও শিল্পশাস্ত্রীয় নির্দেশে আতিশয্য ও নাটকীয়তার প্রকাশ ঘটতে লাগল। জনজীবনের স্বচ্ছন্দ প্রবহমাণতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গুপ্তশিল্প এক বিদগ্ধ সমাজের শিল্পে পরিণত হল। নাটকীয় আতিশয্য, মুদ্রার আতিশয্য এই সমস্তই এক অসংযমের প্রকাশ, প্রকৃতি ও জীবনের সঙ্গে অনৈক্য যার উৎস।

প্রকৃতি ও জীবনের সমন্বয়, মানবিক বোধ ও জনজীবনের সঙ্গে সাযুজ্যই আবহমান কাল থেকে মূল চালকশক্তি হয়ে এসেছে ভারতশিল্পের। এ থেকে যখনই বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তখনই অসংযমের আড়ষ্টতায় আবিষ্ট হয়েছে সে। যে মহাজীবনের অভিজ্ঞতার উপলব্ধি আনে ভারতশিল্প, সে উপলব্ধির শ্রেষ্ঠতম এক স্ফুরণ রয়েছে ইলোরার কৈলাশ মন্দিরে। দৈব ও পুরুষকার, জীবন ও প্রকৃতির যে সংঘাতের সমন্বিত রূপ রয়েছে সেখানে, সেই মহাজীবনের বা মহাকালের উপলব্ধি যেখানে আত্মস্থ করেছে ভারতশিল্প, সেখানে জীবনের সংলগ্নতা থেকেই তা এসেছে। উচ্চ শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতাতে নয়।

এই একাত্মতা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয় পরমের উপলব্ধিও। কালপ্রবাহ ও জীবনপ্রবাহ এসে মিলেছে একটি বিন্দুতে, সেখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার গতি। বুদ্ধদেব বা মহাবীর ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু এই দুই প্রবাহের মিলনবিন্দুটির সন্ধান তাঁদেরও সাধনা ছিল। এই ঐক্য ও পরমের যে উপলব্ধি, জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাই তারও ভিত্তি। এই ঐক্য থেকে যখন বিচ্যুত হয়েছে শিল্পকলা, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ভ্রান্ত বোধে বা দর্শন চেতনায়, তখনই তা অবনমিত হয়েছে।

পুনরুজ্জীবনবাদী ভ্রান্ত যে আধ্যাত্মিক অতীতচারিতা আমাদের শিল্পকলার আধুনিকতার সূত্রপাতকে নীরক্ত ও মেরুদণ্ডবিহীন করে তুলেছিল, যার প্রভাব এখনও সম্পূর্ণ অবলুপ্ত নয়, তার প্রতিক্রিয়ায় বিনোদবিহারীকে এভাবেই বুঝে নিতে হয়েছিল ভারতশিল্পের প্রকৃত স্বরূপ।

ভারতশিল্পের মূর্তির প্রত্যক্ষতাকে বিশ্লেষণ করে অন্তর্নিহিত বিমূর্ত গুণকে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। প্রকৃতির-সঙ্গে সহমর্মিতার সাযুজ্যে এসেছে 'তাল' বা 'তালমান'। মূর্তির অন্তর্নিহিত ছন্দের প্রকাশ এই 'তাল'। এই

'তালমানের সংযোগে মূর্তিতে বা চিত্রে যে গুণ আত্মপ্রকাশ করে তাকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে কতগুলি জ্যামিতিক আকার এবং বিভিন্ন আকারের দ্বারা সৃষ্ট 'টান' (tension)' (পৃ. ৪০)। মূর্তির মধ্যে এভাবেই এসে যায় বিমূর্ত গুণ।

এই বিমূর্ত আকারই ক্রমশ সঞ্চালিত হয় প্রাণশক্তির দিকে। প্রাণশক্তি রূপ পায় ভঙ্গিতে। বস্তুজগতের মধ্যে যে জীবনের ক্রিয়া চলেছে তার রূপায়ণ ঘটে শিল্পবস্তুর মধ্যে গতির সঞ্চারে। এই গতির বোধ বিমূর্ত। স্থিরমূর্তিতে বা চিত্রপটে গতির বোধ আসে 'টান'-এর মধ্য দিয়ে। 'টান' আবার রূপ পায় বা মূর্ত হয়ে ওঠে বিভিন্ন ভঙ্গিতে। সমভঙ্গ, আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, ও অতিভঙ্গ—এই চারভাগে ভাগ করা যায় মূর্তির অন্তর্নিহিত গতিভঙ্গিকে।

তাল ও টান এই দুই বিমূর্তগুণ সাদৃশ্যের সংযোগে বৈচিত্র্যময় হয়ে মূর্তিতে প্রকাশিত হয়। 'ধারণামূলক মনোময় জ্ঞান আর জীবনের অভিজ্ঞতা' যখন উপরোক্ত বিমূর্তগুণের সমন্বয়ে মূর্তিলাভ করে, তখনই তা শিল্পে উত্তীর্ণ হয়। এই উত্তরণের মূল নিহিত আছে জীবনের সঙ্গে সংযোগের মধ্যে। বৃহত্তর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় যখনই শিল্প, তখনই অন্তর্নিহিত প্রাণের উদ্ভাস নেমে আসে তার মধ্যে। এই বিমূর্ততা মূর্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূর্তিরই এক অবশ্যম্ভাবী গুণ। 'জন্মমৃত্যুর টানে যেমন মানুষ বেঁচে আছে তেমনি বিমূর্ত উপলব্ধি ও বাস্তব উদ্দীপনা এই দুই এর টানে (tension) সৃষ্ট হয় শিল্পরূপ। এই দুইয়ের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হলে দেখি বাস্তবতা, অপর দিকে পাই জ্যামিতিক আকার' (পৃ. ৬৩)।

পাশ্চাত্যে গ্রীক শিল্প থেকে এই বিমূর্তগুণ কমে গিয়ে প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পকলা এরই বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য শিল্পকলা আবার দীর্ঘচর্চিত প্রাকৃতিকতাকে প্রায় সম্পূর্ণ পরিহার করে বিমূর্ততাকেই প্রধান অবলম্বন করেছে। জ্যামিতিক আকারের দ্বারা সে এতই নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ হয়েছে, যে 'সাদৃশ্য' বর্জিত হওয়ায় সে তার সার্বজনীন-আবেদন হারিয়েছে।

প্রাকৃতিকতা ও বিমূর্ততা, সাদৃশ্য ও বিমূর্তগুণ এই দুই-এর মধ্যে সংযোগ বা সেতু রচনাই আধুনিক যে-কোনো শিল্পীর সামনে প্রধান সমস্যা। আমরা পরে দেখব এই সঠিক সেতু রচনার অভাবেই অবনীন্দ্র-পরবর্তী বেঙ্গলস্কুলের শিল্পকলা আনমিত হয়েছিল। এর অভাবে সমস্যাসঙ্কুল হচ্ছে আজকের শিল্পচর্চাও। এই সমস্যাকে তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে বিনোদবিহারীরও।

তাঁর নিজের চিত্রচর্চায় যেমন তিনি এর সমাধান করেছেন, তেমনি বাস্তবতার সঙ্গে বিমূর্ততার যোগসূত্রের একটি নিরিখও নির্মাণ করতে চেষ্টা করেছেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য।

তিন

আধুনিক ভারতীয় শিল্পচর্চার প্রারম্ভিক সময়ে যে অন্তরায়গুলি তৎকালীন শিল্পকলাকে ক্ষীণ ও দুর্বল করে রেখেছিল, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বাস্তবতাবোধের অভাব। লোকায়ত ও কারুশিল্পের ক্ষেত্রে একটা পরম্পরা তখনও ছিল। কিন্তু সেদিকে কারো নজর ছিল না। ইউরোপীয় আঙ্গিকের প্রভাব কিছু কিছু এসেছে। কিন্তু তখনও তা শিল্পসম্মত ভাবে রপ্ত হয় নি। ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিষয় নিয়ে বিমূর্তগুণ-বর্জিত সাদৃশ্যধর্মী অতি-নাটকীয় চিত্ররচনা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে তৎকালীন অভিজাত শিল্পের পরাকাষ্ঠা। দক্ষিণে রাজা রবিবর্মা, বাংলায় বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধারারই অন্যতম প্রতিভূ।

১৮৫৪তে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটির কার্যক্রম হিসেবে বিখ্যাত ধনী হীরালাল শীলের বাড়িতে 'স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' নামে একটি শিল্প শিক্ষায়তন খোলা হয়। এ অবস্থা থেকে এই শিক্ষায়তনকে উচ্চাঙ্গ শিল্পবিদ্যালয়ে পরিণত করার কৃতিত্ব অধ্যক্ষ এইচ. এইচ. লকের। এই আর্ট স্কুলের শিক্ষা তখন পাশ্চাত্য প্রকরণের অক্ষম নকলনবিশির বেশি কিছু ছিল না। আর্ট স্কুলে ভারতীয় ধারার চর্চায় প্রথম কৃতিত্ব হ্যাভেল সাহেবের। কিন্তু ভারতীয়তার সঠিক স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব হয় নি হ্যাভেল সাহেবের পক্ষেও। তাই তাঁর ভারতীয়তা হয়ে ওঠে জীবনবিচ্ছিন্ন এক ভ্রান্ত আধ্যাত্মিক অতীতচারিতা। শিল্পকলার তৎকালীন পরিস্থিতিতে ভারতীয়তার প্রতিষ্ঠায় ই. বি. হ্যাভেলের অবদান সম্পর্কে অবশ্য খুবই শ্রদ্ধাশীল বিনোদবিহারী। হ্যাভেলের অবদানের মূল্যায়ন সম্পর্কে নানা বিতর্ক সম্প্রতি জেগে উঠেছে। কিন্তু সে এক স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

এরকম একটা শূন্যতার পরিস্থিতিতে অবনীন্দ্রনাথের দায় ছিল অপরিসীম। এই দায় তিনি সম্পূর্ণভাবেই পালন করেছেন। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে তাঁর অবদান বৈপ্লবিক। অবনীন্দ্রনাথের পদ্ধতি ও অবদান সম্পর্কে গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন বিনোদবিহারী।

আপাতভাবে অবনীন্দ্র-চিত্রের ভাব ও প্রকরণে এক স্ববিরোধিতার উপস্থিতির কথা মনে হতে পারে। তাঁর চিত্রকলার বিষয়বিন্যাসে যে ভাবময়তা, তাঁর শিল্পসম্পর্কিত আলোচনা ও লেখায় যে আপাত-কলাকৈবল্য-বাদী আদর্শ, এগুলো অনেক সময়ই তাঁর মূল্যায়নে ভুল পথে চালিত করে তাঁর দর্শক বা পাঠককে। অবনীন্দ্র-পরবর্তী বেঙ্গল স্কুলের ইতিহাস এই ভ্রান্তিরই ইতিহাস। এরকম আপাত-ভাবময়তার গভীরে বা অন্তরালে অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সঠিক ভিত্তিভূমি কী, তাঁর শক্তি ও মহত্ত্বের সঠিক উৎস কোথায়, তা বুঝে না নিলে আধুনিক শিল্পের ইতিহাস যেমন অসম্পূর্ণ থাকে, তেমনি এই সময়ের শিল্পের সঠিক পথও নির্ধারিত হয় না। এ কথা বিনোদবিহারী গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের সঠিক মূল্যায়নের পথে হয়তো তিনিই পথিকৃৎ।

অবনীন্দ্র-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতি করেছে এটাই যে তাঁর প্রথম পর্বের পূর্ণ-পরিণত-নয় এমন রচনায় তথাকথিত পুনরুজ্জীবনবাদী গুণ আবিষ্কার করে, ভারতীয়তার সেই পরিচয়েই তাঁর পরিচিতি প্রচারিত হয়ে এসেছে। বিনোদবিহারী বলছেন : 'বিশেষভাবে তাঁর পরিণত রচনার পূর্বে যে মতামত দিয়েছিলেন হ্যাভেল বা কুমারস্বামী, সকলে সেটিকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়ার কারণে অবনীন্দ্র-প্রতিভার উপযুক্ত বিচার হয় নি।' (পৃ. ২০৮)।

তাঁর অবনীন্দ্র-মূল্যায়নে বিনোদবিহারী অবনীন্দ্রনাথের বিষয়গত আপাত-ভাবময়তার অন্তরালে আঙ্গিকের গঠনধর্মী দৃঢ় বুনন, যাকে ইমারতি গুণ বলেন তিনি, ও বাস্তবাশ্রিত এক স্বাভাবিকতার সন্ধান করেছেন, বা আবিষ্কারই করেছেন বলা যায়। তিনি দেখিয়েছেন, 'একদিকে মোগল চিত্রের আঙ্গিক ও ভারতীয় প্রাচীন ভাবধারার অনুসরণ, অন্য দিকে বাস্তব উদ্দীপনা ও পারিপার্শ্বিক সচেতন রিয়ালিস্টিক আঙ্গিকের প্রবর্তন' (পৃ. ২৩৭) কেমন করে অবনীন্দ্রনাথের ছবিকে ক্রমান্বয়ে এক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে আধুনিকতায় অভিষিক্ত করেছে। যে আধুনিকতায় পূর্ণ স্ফুরণ লক্ষ করা যায় আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলিতে (১৯৩০), যেখানে প্রত্যক্ষ, পরম্পরা ও নির্মাণগুণ একই সুরে সমন্বিত হয়ে সমকালীন জীবনধারার এক শিল্পরূপও করে তুলেছে এই চিত্রমালাকে। এই আধুনিকতাই 'কৃষ্ণমঙ্গল' ও 'কবিকঙ্কণ' সিরিজে (১৯৩৮-৩৯) এসে লোকায়ত পরম্পরার অনুষঙ্গে মিলে শিল্পীর উপলব্ধিকে 'দৃঢ়বদ্ধ রঞ্জিত আকারে রূপান্তরিত' (পৃ ২৪৩) করেছে। যে নির্জনতার মধ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, সে শূন্যতায় বাস্তবতা বা স্বাভাবিকতার

সন্ধান, ও বাস্তবের প্রত্যক্ষ ও স্পর্শযোগ্য গুণের আবিষ্কারই তাকে আধুনিকতার পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তা তিনি অর্জন করেছিলেন প্রকৃতি ও জীবনধারার সান্নিধ্য থেকেই।

অবনীন্দ্র-পরবর্তী যুগে বা তাঁর সমসাময়িক কালেও অবনীন্দ্র-প্রভাব দুটি ধারায় বিভক্ত। এক: পরম্পরামুখী, দুই: অবনীন্দ্র-অনুকরণধর্মী। এই উভয় ধারাই ক্রমান্বয়ে যে প্রাণহীন হয়ে গেল, তার কারণও নিহিত আছে বাস্তবতার সঠিক বোধ ও বিশ্লেষণের অভাবের মধ্যে। একদল ভারতীয় পরম্পরা থেকে দূরে সরে গিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের ভ্রান্ত প্রভাবের ভাবালুতায় সাহিত্যাশ্রয়ী হয়ে উঠল। অপর দল যে ভারতীয়তায় আটকে রইল তা এক ভ্রান্ত আধ্যাত্মিকতার ধারণা। অবনীন্দ্রনাথ যে বলতেন 'সৌন্দর্য বাহিরের বস্তু নয়, কিন্তু অন্তরের', তা ছিল তাঁর পূর্ববর্তী চিত্রধারার অন্তর্গত কল্পনাহীনতা ও ভ্রান্ত বাস্তবতাবোধের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। অবনীন্দ্র-অনুবর্তীরা একেই ভুল বুঝে বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে অলীক এক কল্পনার ধোঁয়ায় আবৃত করলেন তাঁদের চিত্রপটকে। বেঙ্গল স্কুলের এই ব্যর্থতার বিশ্লেষণ করেছেন বিনোদবিহারী অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে।

অবনীন্দ্রনাথের 'উচ্ছিষ্ট ভোজনের' এই ক্লৈব্য থেকে আমাদের চিত্রকলাকে উদ্ধারের দায় বহন করতে হয়েছে নন্দলাল বসুকে। তাঁর প্রথম পর্বের সাহিত্যধর্মী ধর্মীয় ও পৌরাণিক ভারতীয়তার সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের পথে তাঁকে বুঝতে হয়েছিল বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতায় বিষয়ের বস্তুসত্তা বা বাস্তবতা প্রকাশিত হয়। গভীর এক আধ্যাত্মিকতার বোধ তাঁর আজীবনের শিল্পসাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। 'যে অতিমানবীয় শক্তিকে প্রতীকের আশ্রয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন নন্দলাল, সেই শক্তির ক্রিয়া তিনি যাবতীয় পদার্থের মধ্যে উপলব্ধি করার সাধনা গ্রহণ করেন, তাঁর পরবর্তী কালের রচনা এই সাধনারই প্রকাশ' (পৃ. ২৬২)। প্রকৃতির প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা এই উপলব্ধিরই ফল। এই উপলব্ধির জন্যই এবং এই উপলব্ধি সত্ত্বেও বিনোদবিহারী বলছেন, 'বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হওয়াই ছিল তাঁর শিল্পসৃষ্টির অন্তর্নিহিত শক্তি' (পৃ. ২৬২)। এবং 'বর্ণ উজ্জ্বল প্রকৃতির মোহিনী রূপ অপেক্ষা রূপের বৈচিত্র্য গতি ও স্থাপত্যসুলভ নির্মাণ নন্দলাল রচিত শিল্পের বৈশিষ্ট্য' (পৃ. ২৬৩)। এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ তাঁর শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হয়েছে। মৌলিক রচনা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও পরম্পরা এই তিনের সম্বন্ধ স্থাপন যেমন তাঁর শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য, তেমনি

বাস্তব উদ্দীপনা, চিত্রের বাঁধন ও আঙ্গিকের নৈপুণ্য এই ত্রিধারার সমন্বয় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নন্দলালের অবদান।

নন্দলালের শিক্ষানীতি ও রবীন্দ্রনাথের শিল্পাদর্শের প্রভাবে ভারতে নানা শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কলাভবনই প্রথম সচেতন হতে পেরেছিল পাশ্চাত্য রীতি সম্পর্কে। কিন্তু নন্দলাল শেষ পর্যন্ত সর্বান্তঃকরণে সায় দিতে পারেন নি এই গ্রহণে। ভারতীয় পরম্পরাকে তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে রক্ষা করতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু সময়ের অনিবার্য নিয়মে চল্লিশের দশক থেকে সে প্রভাব ক্রমান্বয়ে সর্বব্যাপী হতে থেকেছে। বরোদার 'ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস'-এর শিক্ষানীতিতে পাশ্চাত্য ধারাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরে সব প্রতিষ্ঠানেই তা গৃহীত হয়। যদিও সম্পূর্ণ আত্তীকৃত হতে সময় লেগেছে অনেক। এবং আজও সেই আত্তীকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে। এই আত্তীকরণের পথে চল্লিশের দশকে ক্যালকাটা গ্রুপের আন্দোলনের কথা অজানা নয় কারো। বিনোদবিহারীর মতে তিনটি স্তরে কাজ করছে পাশ্চাত্য প্রভাব। এর মাঝখানে রয়েছে ভারতীয়তার স্বতন্ত্র একটি স্তর। 'প্রথমেই আর্ট স্কুলের শিক্ষাকে অবলম্বন করে শিল্প (Industry)-সুলভ প্রয়োগ-বিদ্যার (technology) ব্রিটিশ আদর্শ, দ্বিতীয় স্তরে এসেছে ফরাসী সাহিত্য প্রভাবান্বিত ভাবধারার ঢেউ, তৃতীয় স্তরে প্রকৃতি. নৃত্য-গীত অভিনয়কে অবলম্বন করে রূপনিষ্ঠ, বর্ণাঢ্য রেখানির্ভর ভারতীয় শিল্পাদর্শের প্রকাশ, চতুর্থ স্তরে সমকালীন আদর্শে আবার মার্কিন প্রয়োগ-বিদ্যার (technology) পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভূমিকাটি মুখ্য।' (পৃ. ২০২)।

অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভায় আধুনিক ভারতীয় শিল্পের প্রথম মুক্তি, তাঁর শিষ্য-পরম্পরার হাতে আবার তার আবিলতা, নন্দলালে নূতন ভারতীয় চেতনার জন্ম, তারও আবার সংস্কার-আচ্ছন্নতা, রবীন্দ্রনাথে পাশ্চাত্য অর্জনের সফল ব্যবহার, ক্রমান্বয়ে সেই প্রভাবেরও যান্ত্রিকতার দিকে চলে যাওয়া, এরকম ক্রমিক ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে আজকের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে আমাদের শিল্পকলা। এই ক্রমিক প্রবাহে ব্যক্তিপ্রতিভার অবদানকে স্বীকার করেন বিনোদবিহারী। ব্যক্তিপ্রতিভাই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংযোগ ক্ষেত্র। 'ব্যক্তিগত প্রতিভার মধ্যস্থতা ছাড়া নূতন পথ মুক্ত হয় না—এ কথার সমর্থন আধুনিক শিল্পের ইতিহাসে পাওয়া যাবে' (পৃ. ২১৪), এই তাঁর উপলব্ধি।

চার

শিল্পী ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে গভীরভাবে ভাবিত হয়েছেন. বিনোদবিহারী। সমাজ মানুষের সৃষ্টি। তবু মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজই বাধার সৃষ্টি করে। 'কারণ সমাজ সকল সময়েই অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত' (পৃ. ২০৬)। মানবিক বিকাশের জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সার্থক শিল্প সৃষ্টির প্রাথমিক শর্ত অভ্যাসের স্থবিরতাকে ভাঙা। এখানেই শিল্পী-সত্তার সঙ্গে সামাজিক-সত্তার সংঘাতের শুরু। শিল্পীর নূতন পরীক্ষানিরীক্ষা যেমন সামাজিক স্থবিরতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া থেকেই শুরু হয়, তেমনি শিল্প-শিক্ষা ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রিত হয় বা পরিবর্তিত হয় এরকম প্রতিক্রিয়া থেকেই। রবীন্দ্রনাথ যে স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছিলেন, সেখানে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা, সৃজনীশক্তি ও স্বাধীনতার পারস্পরিক বিরোধ দূর করে সৃজনীশক্তি ও স্বাধীনতার সমন্বয় সাধন। এ ছাড়াও আছে প্রকৃতি। সমাজ, বিজ্ঞান ও প্রকৃতি এই তিনের সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক যদি দাসত্বমূলক বা যান্ত্রিক না হয়ে স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলেই সম্ভব শিল্পের মুক্তি, জীবনের মুক্তি, সমাজেরও মুক্তি। আজকের শোষণকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় সেই মুক্তির পথ কোথায়?

ব্যক্তি ও সমাজের সার্থক সংযোগ শিল্পের ক্ষেত্রে এক চিরকালীন সমস্যা। বিনোদবিহারী বলছেন: 'সামগ্রিক মানবীয় চেতনা প্রায় সময়েই ব্যক্তির লক্ষের বাইরে থেকেছে। সমাজ ও গোষ্ঠীগত জীবন দৃঢ়তর ও সংগঠিত করে তোলার পথে ব্যক্তিকে যেমন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্কীর্ণ করে দেখা হয়েছে, শিল্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে ব্যক্তিত্বকে কোথায় প্রতিষ্ঠিত করব তেমন পাদপীঠের দৃষ্টান্ত আধুনিক সমাজে আছে কিনা বলা কঠিন।' (পৃ. ২১৭)। আজকের শিল্পকলায় বহু অভিনবত্ব এসেছে। মত ও পথের প্রাচুর্য ও নানা জটিলতাকে স্বাধীনতার নানা প্রকাশ বলেও মনে হতে পারে। বিনোদ-বিহারীর মতে আজকের এই অভিনবত্ব ব্যক্তি স্বাধীনতার থেকেও ব্যক্তিত্বের অস্থির চাঞ্চল্যেরই প্রকাশ। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়েছে তাকে: 'ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা সর্বৈব স্বীকার করলেও সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে বাধা আজও দূর হয় নি। সেটি দূর করে ব্যক্তি-সমাজের সার্থক সম্পর্ক চিহ্নিত করাই হ'ল ভবিষ্যৎ শিল্পকেন্দ্রের প্রধান দায়িত্ব' (পৃ. ২১৮)।

রেনেসাঁস জিজ্ঞাসা

অভ্র ঘোষ

রেনেসাঁস ও সমাজমানস। অরবিন্দ পোদ্দার। উচ্চারণ। ১৯৮৩। ১৫ টাকা

'রেনেসাঁস ও সমাজমানস' যখন কোনো গ্রন্থের নাম হয়, তখন পাঠক ভাবতেই পারেন যে, এতে পাওয়া যাবে এমন এক বিশ্লেষণ যার বিষয় রেনেসাঁসের চরিত্র ও তার নির্মাতাদের কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। বস্তুত অরবিন্দ পোদ্দার সে-কাজ করার চেষ্টাই করেছেন। বিভিন্ন সময়ে লেখা বিচিত্র বিষয়ের ওপর রচনাগুলিকে তিনি এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন একটি যুক্তিতেই যে 'একই সময়-সীমায় রচনাগুলো প্রসারিত, যে সময়টাকে সচরাচর রেনেসাঁসের উন্মেষ, বিবর্ধন, পরিণতি বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে'। গ্রন্থভুক্ত নটি পরিচ্ছেদের প্রথম পাঁচটি সরাসরি রেনেসাঁস ও তার স্থপতিদের বিষয়ে। বাকি চারটি পরিচ্ছেদের মধ্যে সর্ববৃহৎ যে পরিচ্ছেদ তা হল শরৎচন্দ্রকে নিয়ে, তিনটি বড় অংশে বিন্যস্ত সে আলোচনা। উনিশ শতকের বাংলাদেশে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘাত, আত্মপরিচয়ের সমস্যা, ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রশ্ন এবং সর্বোপরি হিন্দু নারীর সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয় সে-আলোচনায় এসেছে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস, বিশেষত 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসকে ঘিরে। গ্রন্থভুক্ত অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই বিশ্লেষণ বিষয়ের দিক থেকে কতখানি মানানসই, সে প্রশ্ন উত্থাপন করা সংগত হলেও গ্রন্থভুক্ত সব কটি প্রবন্ধে একটি ভাবগত সাদৃশ্য এবং বিশ্লেষণপদ্ধতির একটি পরিকল্পিত নির্দিষ্ট ছকের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই ছকের উপস্থিতি শরৎচন্দ্র-বিষয়ক প্রবন্ধত্রয়ীতেও স্পষ্ট। বিচ্ছিন্নভাবে নটি প্রবন্ধের বিশ্লেষণ না করে আমরা লেখকের এই সুপরিকল্পিত ছকটিকে ঈষৎ বিচার-বিশ্লেষণ করব গুটিকয়েক প্রবন্ধকে ধরে।

উনিশ শতকের বাংলাদেশ বিচার করার ক্ষেত্রে অরবিন্দ পোদ্দার ইদানীং একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করছেন, ফর্মুলার মতো ব্যবহার করেন তিনি সেটিকে। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা হল এই যে, উনিশ শতকের বাংলাদেশে অগ্রণী বাঙালি মনীষীরা অধিকাংশই সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনৈতিক পরবশ্যতার শিকার, পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার দাপটে তাঁদের ব্যক্তিত্ব ন্যুব্জ।

পাঁচ

প্রাচ্য বিমূর্ততা ও পাশ্চাত্য তথা সমকালীন বাস্তবচেতনার সঠিক সমন্বয় সাধনই, এক কথায় বলতে গেলে, এই সময়ের ছবিতে বিনোদবিহারীর অবদান। সমকালীন বাস্তবতার এই সমস্যা নন্দলালকেও ভাবিয়েছে। এবং প্রকৃতির সাথে পূর্ণ সাযুজ্যেই তিনি এর সমাধান খুঁজেছেন। কিন্তু প্রাচ্যবোধের সঙ্গে সমকালীন বাস্তবতার পূর্ণ মেলবন্ধনে বাস্তবতার অন্তর্গত মাত্রাময় গাঠনিক বস্তুসত্তার পূর্ণ স্ফুরণের দিকে তিনি যান নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে ব্যক্তি-সত্তা ও সামাজিক-সত্তার অন্তর্গত আধুনিক অভিব্যক্তিময় ট্র্যাজিক চেতনাকে বিস্তৃত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালের ধারার সমন্বিত রূপকল্পের স্বাভাবিক ধারা থেকে তাঁর পথ ছিল অনেক স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। এই ধারার পূর্ণ স্ফুরণের যে অভাব অনুভূত হচ্ছিল, নন্দলাল-পরবর্তী চিত্রকলায়, বিনোদবিহারী সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছেন তাঁর আজীবনের চিত্রচর্চায়।

কলাভবন ছাত্রাবাসের ভিত্তিচিত্রে (১৯৪০) বা হিন্দীভবনের ভিত্তিচিত্রের (১৯৪৭) ভারতীয় সন্তদের ছবিতে যথাক্রমে প্রকৃতি ও ঐতিহ্যাশ্রিত প্রবহমাণ জীবনধারার যে মরমী ও মায়াময় রূপ, তা তাঁর প্রথম পর্বের ছবির করুণাঘন অভিব্যক্তিময়তার উপর অনেকটা সেজানীয় মাত্রাময় বাস্তবতার আন্তরসত্তার গাঠনিক প্রকাশে যেমন উজ্জ্বল, তেমনি চিরন্তনতা ও অনির্বচনীয়তার অন্য মাত্রাতেও আলোকময়। ব্যক্তিগত চিত্রচর্চায় তাঁর এই যে অবদান, লুকাচের ভাষায় যাকে বলা যায়, চিরন্তন বাস্তবতা ও আপেক্ষিক বাস্তবতার (absolute reality and relative reality) সুপ্রযুক্ত সমন্বয়, সফল শিল্পের প্রাণকেন্দ্র যে সমন্বয়ে, এর প্রয়োজন ভারতীয় চিত্রকলায় দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছিল। বিনোদবিহারীর চিত্রচর্চায় তা এক নন্দনগুণসমৃদ্ধ সম্পূর্ণ আদল পেল।

বাস্তবতার এই সমন্বয়ের সমস্যা বিনোদবিহারীকে যেভাবে দীর্ঘদিন ভাবিয়েছে, তারই দলিল তাঁর সমস্ত চিন্তাগর্ভ আলোচনাগুলি। নিজের চিত্র-চর্চায় এই সমন্বয়ের এক আদল যেমন তিনি তৈরি করেছেন, তেমনি চিন্তার ক্ষেত্রেও এর সমাধান খুঁজেছেন। সমকালীন ভারতীয় সামাজিক পরিস্থিতিতে শিল্পকলায় বাস্তবতা বিন্যাসের এবং জীবন ও শিল্পের মেলবন্ধনের যে সমস্যা, তার সমাধানের অন্বেষণই এক কথায় বলতে গেলে, তাঁর শিল্প ও নন্দন চিন্তার মূলসূত্র। আরও অনেক বিষয় ও সমস্যার অনুপুঙ্খ তাঁর নানা লেখায় ছড়িয়ে আছে। কিন্তু মূল সুরটি এই, এ কথা বললে হয়তো ভুল হবে না।

দেশীয় জীবনধারা ও ঐতিহ্যের প্রতি এঁরা ছিলেন স্বভাবতই বিমুখ, ইংরেজি আদব-কায়দা ও মননে-বচনে এঁরা মুগ্ধ। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সংরক্ষণে ইংরেজি-শিক্ষিত এই মধ্যশ্রেণীর দেশীয় বুদ্ধিজীবীরা তাই তথাকথিত রেনেসাঁসের উদ্বোধন ঘটালেও, সে রেনেসাঁসের না ছিল কোন গণভিত্তি, না ছিল কোন ঐতিহ্যগত বা দেশীয় আশ্রয়। এই রেনেসাঁস একান্তই উৎকেন্দ্রিক। অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন, 'ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন হওয়ায় বিবর্তনের প্রত্যাশিত নিয়মেই, কিছুদিনের মধ্যেই শিক্ষা ও আইন সংশ্লিষ্ট পশ্চিমী ধাঁচের মর্যাদাসম্পন্ন এবং অর্থকরী বৃত্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়; আর ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক কাঠামোর পরিধি সুবিস্তৃত হতে থাকায় এবং দেশীয় ব্যবসাবাণিজ্য পাশ্চাত্যের অবয়ব ধারণ করায় সহর ও সহরে জনসমষ্টির আবির্ভাবও অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই জনসমষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর অবস্থান। নব উন্মেষিত, ইংরেজিভাষী এই শ্রেণী বাণিজ্য ও সরকারি পর্যায়ে ইংরেজ প্রভুদের আস্থা ও নির্ভরশীলতার স্তম্ভ। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও বাণিজ্যপদ্ধতির বাধ্যবাধকতা থেকে উদ্ভূত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলার সমাজজীবনে সম্পূর্ণ অভিনব, সনাতন ঐতিহ্যবাহী সমাজে এদের কোন স্বীকৃত পূর্বপুরুষ নেই।'

উনিশ শতকে বাংলাদেশে ইংরেজ ঔপনিবেশিকতা যে এদেশের সমাজ-জীবনে, আর্থিক জীবনে এবং রাজনৈতিক জীবনে ভয়ঙ্কর এক ওলট পালট ঘটিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই যে ইংরেজি ভাষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে এবং নতুন আর্থিক বনিয়াদে এক নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবও হয়েছিল। এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে ইংরেজি শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল আচারে-ব্যবহারে স্বতন্ত্র, যুক্তিবাদী মননে-বচনে দীক্ষিত, দেশীয় লোকাচার ও কুরীতির বিরুদ্ধবাদী। এই বিদ্রোহে কখনও কখনও কেউ কেউ অতিরিক্ত প্রগলভও হয়ত বা। আর এই তথ্যও স্বীকার্য যে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিপালিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশীয় ঐতিহ্য থেকে কখনও কখনও চ্যুত, আত্ম-পরিচয়ের সংকটও ঘনীভূত হয়েছে তখন। কিন্তু এসবের মধ্যেই কি গড়ে ওঠে নি সেসব মানুষের স্বাজাত্যাভিমান, আধুনিকতার আদর্শ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানসিকতার ক্রমস্ফুরণ—এক কথায় জাতীয়তাবাদের, স্বদেশ ব্রতের ধর্ম? জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণার এই নির্মাণপর্বে হয়ত স্বচ্ছন্দ গতি, অবাধ সঞ্চরণ সব সময়ে অব্যাহত ছিল না, দ্বন্দ্বসংঘাতমুখর ছিল সে-যুগ—কিন্তু সমাজগঠন স্বাদেশিক

ব্রত ও আধুনিকতার পোষণ ছিল সমগ্র উনিশ শতকের ইতিহাসের অন্তর্নিহিত সুর। রেনেসাঁস অভিধা তাকে দেওয়া হোক আর নাই হোক।

অরবিন্দ পোদ্দার যুগের এই নির্মাণপর্বে লক্ষ করেছেন ইংরেজ সরকার-শিক্ষা-ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি দেশীয় অগ্রসর মানুষের কেবলই পরবশ্যতা। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে অনেক, অরবিন্দবাবু উল্লেখ করেছেন সেসবের ভূরি ভূরি, কিন্তু পাশাপাশি এমন অনেক আরও কীর্তিও তো আছে সেসব প্রাগ্রসর ব্যক্তিদের, যাকে বলা যাবে না পরবশ্যতা। এমন অনেক পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিত্ব তো বিরল নন যাঁরা সেই পরবশ্যতার উদাহরণ হন না কিছুতেই। কিন্তু বিশেষ কোনো ফর্মুলা বা ছক তৈরি হয়ে গেলে তার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া খুবই মুশকিল। অরবিন্দবাবুও পারেন নি সে মুশকিল এড়াতে। একটি-ছুটি উদাহরণ দিলেই সে ব্যাপারটা স্পষ্ট ধরা পড়বে।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রবিচার সমালোচ্য গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধ। লেখক স্বীকার করেন যে বিদ্যাসাগর দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের ভাবধারার মিলনসাধন করে প্রকৃত আধুনিক হয়ে ওঠার পথ প্রশস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, রেনেসাঁসের অন্যতম পুরুষ হিসেবেও লেখক বিদ্যাসাগরকে স্বীকার করে নেন। কিন্তু তবু এই বিশ্লেষণে কিছু কিছু স্পষ্ট দ্বিধার সংকেত মেলে। ফর্মুলার প্রয়োগেই তা সম্ভব হয়ত বা। অরবিন্দবাবু লিখলেন, 'রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদরূপে গণ্য করার মধ্যে সে দাসত্বের স্বীকৃতি রয়েছে, প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের দিনে সে কথা কেউ বিশেষ উপলব্ধি করে নি; উপলব্ধি না করার পথে প্রেরণা জুগিয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাণিজ্যসঞ্জাত বৈষয়িক সমৃদ্ধির স্বার্থপরতা। যদিও এবংবিধ পশ্চাদাকর্ষণ বিদ্যাসাগরের ছিল না, তথাপি তাঁর রাজনৈতিক বোধও ইংরেজি শিক্ষাভিমানী বুদ্ধিজীবীদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল না, বরং এ সিদ্ধান্ত অমূলক নয় যে, বৃহত্তর কোনো রাজনৈতিক জিজ্ঞাসায় তিনি কখনও অস্থির হন নি এ কারণে যে ইংরেজ শাসনের পরোক্ষ সৃষ্টিশীলতায় তাঁর মন ছিল আবিষ্ট, এবং তিনি একে নিশ্বাস-বায়ুর মতোই সত্য ও ধ্রুব বলে মেনে নিয়েছিলেন। তার মধ্যে দাসত্ব কতটুকু, দাসত্বের বিনিময়ে লব্ধ কল্যাণের পরিমাণই বা কতটুকু এবং সেই বিশ্লেষণ ও বিচার তাঁর রচনায় অনুপস্থিত, বরং নির্ভরশীলতাই অধিক। সামাজিক ভাবনায় উদ্বিগ্ন সমকালীন অন্যান্যদের মতো তাঁর মনোজীবনের এই কাল-নির্ধারিত সীমারেখা অবশ্যই স্বীকার্য।'

এসব মন্তব্য শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, বিমূঢ় করে আমাদের। বিদ্যাসাগরকে

বিশ্লেষণ করছি আমরা তাঁর রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা-আবিলতা কী রকম ছিল তার ভিত্তিতে। রাজনৈতিক বোধের প্রখরতা একালে আমাদের বেশি বলে আমরা রাজনীতির সরাসরি চাপ কখনোই অতিক্রম করতে পারি না, স্থান-কাল-পাত্র ভেদ না করে রাজনীতি বিচার করি। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কারকদের ভূমিকা বিশ্লেষণে আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় গোলমাল এই রাজনৈতিক বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি। বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ মূলত স্বদেশীসমাজ গঠনে তৎপর ছিলেন, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে আত্মদৈন্য ঘুচিয়ে আত্মশক্তির উদ্‌বোধন ঘটাতে চেয়েছিলেন—সে যুগে এইটিই ছিল সামাজিক বিপ্লব, জাতীয়তাবাদ প্রসারের সঠিক ভিত্তিভূমি। ইংরেজ-শাসনের প্রতি অনীহা প্রকাশ করাটাই ছিল না বৈপ্লবিক বোধের একমাত্র ও অবিসংবাদিত প্রমাণ। অথচ ওই রাজনৈতিক স্বাধীনতাস্পৃহা সব লক্ষ্যের চরম বলে গণ্য হওয়ায় অরবিন্দ পোদ্দার অনায়াসে সিদ্ধান্ত করে ফেলেন, '…বিদ্যাসাগর বিপ্লবী ছিলেন না; বর্তমান যুগে যে গূঢ় অর্থে আমরা বিপ্লব শব্দটি উপলব্ধি করি, তিনি সেই অর্থে কোনোমতেই বিপ্লবী ছিলেন না। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ছত্রছায়ায় স্থিত থেকে তাকে কার্যত অমোঘ বলে স্বীকার করে নিয়ে, ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থাকে যতটা যুগোপযোগী করা সম্ভব, পাশ্চাত্যের ন্যায়শাস্ত্রাদি থেকে পাওয়া সর্বজনীন মানবিক আদর্শে যতটা উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব, আধুনিক দৃষ্টিতে যতটা সমৃদ্ধ করা সম্ভব, বিদ্যাসাগরের ধ্যানধারণা সেই লক্ষ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি যে নৈতিক মূল্যমানের কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন, বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, তাও ঐ শাসনকাঠামোর সঙ্গেই একাত্ম।'

'সর্বজনীন মানবিক আদর্শ' ছিল বিদ্যাসাগরের অথচ তাঁর 'নৈতিক মূল্যমানের কাঠামো' সাম্রাজ্যবাদী শাসনকাঠামোর সঙ্গে একাত্ম—বোঝা যায় না কী বলতে চান লেখক এইসব শব্দ ব্যবহার করে। বিদ্যাসাগর ইংরেজ শাসনব্যবস্থার অবসান চান নি? রাজনৈতিক আন্দোলন করতে নামেন নি, অতএব তাঁর 'নৈতিক মূল্যমান' সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থাশ্রিত। খুবই সোজা-সরল এ সিদ্ধান্ত। অথচ তাঁর সংস্কার আন্দোলন, শিক্ষার দর্শন, প্রাত্যহিক জীবন-বোধ এবং আজীবন সংগ্রাম ও ন্যায়পরায়ণতার যে 'নৈতিক মূল্যমান' তৈরি হয় তা অবান্তর! 'নৈতিক মূল্যমান' কি তাহলে ব্যক্তিজীবনে গড়ে ওঠে একমাত্র রাজনৈতিক বোধ-বুদ্ধিতেই? উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে যখন রাজনৈতিক বোধের প্রখরতা ছিল না এ যুগের মতো তীক্ষ্ণ ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদের ক্ষেত্র ছিল না এখনকার মতো এতটা বিস্তৃত ও প্রসারিত,

তখনও কি ব্যক্তির 'নৈতিক মূল্যমান' নির্ধারণে আমাদের একমাত্র অবলম্বন হবে তার রাজনৈতিক বিশ্বাস ও আস্থা ?

কেবল অরবিন্দবাবুই নন, বিদ্যাসাগর কৃষক-স্বার্থে উদাসীন ছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহে সরকারকে মদত জুগিয়েছেন—এ-জাতীয় মার্কসবাদী বিচার আমরা ইতিপূর্বেও দেখেছি বহুবার। বহুকাল ধরেই চলছে এ-জাতীয় আপাত-বৈপ্লবিক বুলি, বিপ্লবী মধ্যবিত্ততার অসুখ। অনেকেই ভাবেন না যে রাজনৈতিক পন্থা ও ক্ষেত্র ছিল না বিদ্যাসাগরের সাধনার বিষয়, রাষ্ট্রেতর বৃহত্তর সমাজে আত্মশক্তি অর্জনে ও সমাজশক্তি গঠনে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন —এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখতে হবে তাঁকে। ইংরেজ পরবশ্যতা খুঁজে বের করে তাঁর চারিত্রিক সীমাবদ্ধতা দেখানোর শৌখিনতাকে প্রশ্রয় দিলে আর যাই হোক বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ হয় না।

অরবিন্দ পোদ্দার এই একই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন মধুসূদনের ব্যক্তিত্বকেও। পাশ্চাত্যের পরবশ্যতা প্রমাণে তাঁর সুবিধেও হয়েছে অনেক। কেননা আপাদমস্তক সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত, ইংরেজি চিঠি লেখায় আগ্রহী এবং এমনকি ইংরেজ স্ত্রী সমভিব্যাহারে খ্রীস্টান মধুসূদনের স্বপ্নের জগৎ যে এ দেশ নয়, সমুদ্রপারের বিদেশ তাতে সন্দেহ কি ? অরবিন্দবাবু এসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন বিস্তৃতভাবেই, বলেছেন এর সঙ্গে মধুসূদনের সৃষ্টিশীল প্রতিভার ক্ষেত্রে বিদ্রোহী বায়রনী আদর্শের কথাও। বায়রনের আদর্শ মধুসূদনের বিদ্রোহী সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাঁর স্বাজাত্যাভিমান জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু বিদ্রোহী স্বদেশপ্রেমী মধুসূদন শেষ পর্যন্ত পরাজিত তাঁর পাশ্চাত্য মোহের কাছে। লেখকের বিচারে সেইখানেই মধুসূদন-জীবনের ট্র্যাজিডি। আর এইভাবেই বাংলাদেশের 'উৎকেন্দ্রিক রেনেসাঁসের' ট্র্যাজিডি মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের ট্র্যাজিডির সঙ্গে একাত্ম। অরবিন্দবাবুর লেখা থেকে দু-একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাক্।

'বায়রন-কাব্য যেমন ক্রমে ক্রমে অহং-এর সীমা উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বমানবের স্বাধীনতার আর্তির স্পন্দনে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল, মধুসূদনও তেমনি ইংল্যাণ্ড-প্রেমী জীবনদর্শন অতিক্রম করে মাতৃভূমির আর্ত ক্রন্দন আত্মস্থ করেছিলেন।

'...কিন্তু তার পরেও কথা থেকে যায়। আবেশের উপর যে বিজয়কে চূড়ান্ত ভাবা গিয়েছিল, দেখা গেল তা চূড়ান্ত নয়।...বস্তুত মধুসূদনের কাব্য ও প্রকৃতিতে যে অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতা লক্ষ্য করা যায়, তা উনবিংশ শতকীয় ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীদের রাজনীতির সমতুল এবং প্রায় প্রতিফলন, যে

রাজনীতি বৃটিশরাজের পিতৃত্ব কদাচ অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানে ইচ্ছুক ছিল না, যে রাজনীতি বিপিনচন্দ্র পালের কথায়, ভারতবর্ষের নামে শ্বেতদ্বীপকে ভালবেসেছিল। সাহিত্যবাসনার চরিতার্থতার পরক্ষণেই মধুসূদনের ইংল্যাণ্ড-কেন্দ্রিক আবেশ তাঁকে পুনরায় আচ্ছন্ন করে ফেলে।'

আত্মপরিচয়ের সংকট, দেশজ জীবনধারণ প্রণালীর সঙ্গে ইংরেজিশিক্ষিত নব্য মধ্যবিত্তের ক্রম অনন্বয় ইত্যাদি আরও অনেক সমস্যাই হয়তো তৈরি হয়েছিল, কিন্তু মধুসূদনের সৃষ্টিকর্মের বিশ্লেষণে এসবের যান্ত্রিক প্রয়োগ হলে সাহিত্য-বিচার যে কোন্ হাস্যকর জায়গায় পৌছুতে পারে এই প্রবন্ধটি তারই একটি উদাহরণ। লেখক 'মেঘনাদ বধ'-এর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বায়রনের বিদ্রোহী সত্তার প্রভাবের কথা বলেন, আবার যান্ত্রিকভাবেই সে প্রভাবের বিনষ্টির কথা আসে ইংল্যাণ্ড-প্রেমের পুনরাগমনে। সরল এই যোগ-বিয়োগের অঙ্ক দিয়ে আর যা কিছু হতে পারে ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ হয় না। ফর্মুলার প্রেমে পড়ে গেলে বিপদ এভাবেই ঘুরে ঘুরে আসে।

বিলিতি সভ্যতার পরবশ্যতার বিষয়টি যেভাবে আলোচ্য গ্রন্থে হাজির হয়েছে তাতে কারোর যদি মনে হয় যে অরবিন্দবাবুর কাছে চরম প্রাচ্যবাদিতাই সর্ববিষহর একমেবাদ্বিতীয়ম সর্বোত্তম আদর্শ তাহলেও হয়তো খুব একটা ভুল হবে না। 'জাতীয়তাবাদের প্রতিচ্ছবি : রজনীকান্ত গুপ্ত', শীর্ষক পরিচ্ছেদটি পড়তে পড়তে এ কথা মনে হয়।

এ কথা সকলেরই জানা যে উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে বাড়াবাড়ি রকমের প্রাচ্যবাদিতা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য-আসক্তির প্রতিক্রিয়াতেই এর প্রকাশ ঘটেছিল। এ ঘটনা ঐতিহাসিক, কিন্তু সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না হয়তো। উগ্র প্রাচ্যবাদিতা যে হিতকর নয়, জাতীয়তাবাদের উন্মেষের পক্ষে সহায়ক হলেও তা যে পরিণামে মঙ্গলজনক ছিল না, সে কথাও কিন্তু বুঝিয়েছিলেন ঐসব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই কেউ কেউ অচিরেই। আমাদের মনে রাখা দরকার যে উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এড়াতে পারেন নি চরম প্রাচ্যবাদিতার ভয়ানক প্রভাব। হিন্দু সতীর আচার, বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থাকে পর্যন্ত শ্রেয় বলে মেনেছেন তিনি, হয়তো 'ভারত-আত্মার অন্বেষণস্পৃহার' জন্য। অরবিন্দবাবু রজনীকান্তের জাতীয়তাবাদী মনোভঙ্গির বিশ্লেষণে ১৮৮৩-তে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'অনাবশ্যক' প্রবন্ধের বক্তব্য আশ্রয় করে মেনে নেন যে 'অনেক অর্থহীন আচার আচরণও মূল্যবান, কেননা তাতে আমাদের পিতৃপুরুষদের ইতিহাস বিজড়িত।

আমাদের অতীতে রয়েছে কিছু কিছু পবিত্র পুণ্যস্থান, আজকের দিনের তাপ, দুঃখবেদনা ও হতাশায় তাড়িত হয়ে আমরা সেখানে তীর্থযাত্রা করি।'

জাতীয়তাবাদী ভাবধারা পোষণে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা অবিসংবাদিত ভিত্তি হলেও তার উগ্র অসংলগ্ন প্রকাশ যে বৈজ্ঞানিক ছিল না, উগ্র হিন্দু-জাতীয়তাবাদ যে পরিণামে ভয়ঙ্কর ছিল সে কথা তো আজ নির্দ্বিধায় স্বীকৃত। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথও তো এ কথাই বার বার বলেছেন।

এসব কারণেই অরবিন্দবাবু অত্যুৎসাহে যখন রজনীকান্তের স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার কথা প্রমাণ করতে গিয়ে নির্বিচারে তুলে ধরেন রজনীকান্তের তাবৎ রচনা—'হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়' জাতীয় প্রবন্ধের বক্তব্যও যখন সঠিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হয়ে ওঠে তাঁর মতে, তখন আমাদের খটকা লাগে। পাশ্চাত্যমোহের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে একালেও যদি আমরা আর-এক চরম বিপরীতে পৌঁছে যাই তাহলে তো বিপদের কথা।

পরিশেষে, পাঠককে মনে করিয়ে দেওয়া ভালো যে উনিশ শতকচর্চায় পাশ্চাত্যের প্রতি অন্ধ আসক্তির এই তাত্ত্বিক ছক অরবিন্দবাবু এই গ্রন্থেই প্রথম ব্যাখ্যা করলেন তা কিন্তু নয়, ইতিপূর্বে তাঁর গবেষণাপ্রসূত, 'Bengal Renaissance: Quest and Confrontation'-এর দুই খণ্ডেই এর আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণ পাওয়া গেছে। এই গ্রন্থের টুকরো টুকরো প্রবন্ধগুলি সেই একই সুপরিকল্পিত ছকে রচিত।

বিপ্লবের 'মঞ্চ'

বিষ্ণু বসু

রিহার্সালস ইন্ রেভোলিউশন
দ্য পলিটিক্যাল থিয়েটার ইন্ বেঙ্গল
রুস্তম ভারুচা
সীগাল বুকস ক্যালকাটা ১৯৮৩ / ১০০ টাকা

এক

বেশ কিছুদিন আগে 'দ্য রিডার্স এনসাইক্লোপীডিয়া অব ওয়র্ল্ড ড্রামা' নামে একখানি বই ঘেঁটে দেখার সুযোগ হয়। স্বভাবতই কৌতূহলের বশে ভারতীয় নাটকের অধ্যায়টি পড়ি। এ অধ্যায়টির লেখক হেনরি ওয়েলস তাঁর আলোচনার পরিধি প্রাচীন ভারতীয় নাটকেই আটকে রেখেছেন। তখন প্রশ্ন জাগে, তাহলে আধুনিক ভারতে নাটক বলে কোনো ব্যাপার কি নেই-? অথচ এ বইয়ের অন্যসব অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশের সাম্প্রতিক নাটক ও থিয়েটার নিয়ে প্রচুর লেখা তো রয়েছে। তবে কি আধুনিক ভারতে নাটক ও মঞ্চ বিষয়টি একেবারেই অপরিচিত। অবশেষে বহু খোঁজাখুঁজির পর আধুনিক ভারতীয় নাটকের খবর না পেলেও বাংলা নাটক নিয়ে কিছু আলোচনার সন্ধান পাওয়া গেল। লেখক পাকিস্তানের নাট্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আধুনিক বাংলা নাটক নিয়ে গুটিকতক কথা লিখেছেন। তখনো বাংলাদেশ নামে রাষ্ট্রের জন্ম হয় নি। বাংলা নাটক অধ্যায়ে লেখক উদ্ভব থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নাট্যকারদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তার পর গোঁত্তা খেয়ে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের নাট্যকারদের প্রসঙ্গে চলে গেছেন। সেখানে মুনীর চৌধুরী ও পরবর্তীরাও উল্লিখিত হয়েছেন। অসাধারণ ব্যাপার! মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ সকলেই হলেন পাকিস্তানের লেখক এবং বাংলা-সহ আধুনিক ভারতীয় লেখায় নাট্যসাহিত্যের ভাঁড়ার শূন্য। বাংলা নাটক আধুনিককালে যতটুকু লেখা হয়েছে সবটাই তাহলে পূর্ববঙ্গে পড়ছে।

এ বই বেরোবার পর প্রায় বছর পনেরো কেটেছে। জানি না, নতুন সংস্করণে এসব তথ্য পাল্টানো হয়েছে কি না। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে অন্তত একটি বিষয় পরিষ্কার যে এখনো বেশির ভাগ বিদেশী পণ্ডিত ভারতীয় সাহিত্য

বলতে সংস্কৃত সাহিত্যই বোঝেন, কদাচিৎ কৃপাপরবশ হয়ে রবীন্দ্রনাথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এই প্রেক্ষিতে বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটার নিয়ে ইংরেজি ভাষায় লেখা আস্ত একখানি বই আমাদের কৌতূহলী ও উৎসাহিত করে তোলে।

বইখানির নাম 'বিপ্লবের মহলা: বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটার' (রিহার্স্যালস ইন রেভোলিউশন: দ্য পলিটিক্যাল থিয়েটার অব বেঙ্গল), লেখক হলেন রুস্তম ভারুচা। ভারুচা অবশ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিত নন, তবে তিনি বিদেশে বসবাস করেন এবং বাংলা লেখার সাক্ষ্য দেখে মনে হয় অল্পই জানেন। তবু তার মধ্যেও তিনি বাংলা নাটকের এক আলোড়িত সময়ের ভেতরে চলে যেতে চেয়েছেন নিজের মতো করে।

ভারুচার বইটিতে আছে মোট চারটি অধ্যায়। তার মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়টিতে তিনি জোর দিয়েছেন বেশি। এ দুটি অধ্যায়ে তিনি পর পর আলোচনা করেছেন উৎপল দত্ত ও বাদল সরকারকে নিয়ে। প্রথম অধ্যায়ে মাত্র গুটি-ত্রিশেক পৃষ্ঠার পরিসরে ইতিহাসের সন্ধানে যাত্রা করে ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে গণনাট্য ও বিজন ভট্টাচার্য পর্যন্ত বাংলা রাজনৈতিক থিয়েটারের একটি চেহারা তুলে ধরতে চেয়েছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে প্রায় অনুরূপ পরিসরে থিয়েটার কমিউন, চেতনা ও খড়দার লিভিং থিয়েটারের গুটিকয়েক প্রযোজনা নিয়ে আলোচনা এবং বাংলা মঞ্চে ব্রেখ্‌ট। এ ধরনের মনস্কতার মধ্য দিয়ে ভারুচার প্রবণতার চেহারাটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বইটি ভারুচা শুরু করেছেন ভারতীয় পাঠকদের কাছে কিছু কথা নিবেদনের মারফত। ১৯৮৩ সালের ১লা অক্টোবর ঘেঁষ চাপা পড়ে কয়েকজন মানুষের মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অসাম্য ও একটি শ্রেণীর অবর্ণনীয় দুর্দশার পরিবেশ বর্ণনা করে এখানকার রাজনৈতিক থিয়েটারকে তিনি বুঝে নিতে চেয়েছেন। সাধারণভাবে ব্যাপারটা ভালোই, কেননা থিয়েটার তো এখানকার সংক্ষোভেরই প্রতিফলন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এখন সরকারে রয়েছে বামফ্রন্ট। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য সরিয়ে দেবার জন্য এ সরকার সাংবিধানিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সফল হয়তো হতে পারে নি তেমন, কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক চেতনা ছড়িয়ে দেবার জন্য এ সরকার অবশ্যই কৃতিত্ব পেতে পারে। কিন্তু সে-কথা পুরোপুরি চেপে গিয়ে তিনি যখন লেখেন, '...কলকাতার জনগণের কাছে দারিদ্র্য ও শোষণ প্রতিদিনকার ব্যাপার।

আমরা তার মধ্যেই বাঁচতে শিখেছি'—তখন লেখকের শ্রেণীগত অবস্থান নিয়েই সংশয় জাগে।

এ সংশয় ক্রমে বাড়তেই থাকে বইটির মধ্য দিয়ে এগোবার পর। অবশ্য ভারতীয় নাটক নিয়ে বেশির ভাগ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ধারণার সীমাবদ্ধতার কথা ও তার কারণ তিনি বিশ্লেষণ করেন বেশ দক্ষতার সঙ্গেই, কিন্তু সংস্কৃত নাটক ও যাত্রার অধ্যায় পেরিয়ে যান দ্রুততা নিয়ে এবং ধ্রুপদী ও লোকনাট্যের উত্তরাধিকার আধুনিক বাংলা নাটকে কতটা বর্তেছে বা আদৌ বর্তেছে কিনা সে সম্পর্কে প্রায় কোনো কথাই বলেন না। ব্রিটিশ আমলের বাংলা নাটকের বিবরণও শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় কিছু মন্তব্যের সমাহার। সিপাই বিদ্রোহ যখন ভারতে সংঘটিত হচ্ছিল তার সমকালে সাতুবাবুর বাড়িতে নাট্যাভিনয় হচ্ছিল শকুন্তলা, এ নিয়ে তাঁর মন্তব্য সঠিক সন্দেহ নেই, 'শকুন্তলা' যে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর 'হিংস্রতা ও বেপরোয়াভাব' থেকে বহু দূরে স্থিত ছিল তা যথার্থ কিন্তু আমাদের উনিশ শতকী বাবুদের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করে এমন মানসিকতার উৎসে যাবার শ্রম তিনি স্বীকার করেন নি। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বৈশিষ্ট্য, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং তার ফলে উদ্ভূত জমিদার ও মধ্যবিত্তদের মানসিকতা না বুঝলে আমাদের নাটক ও থিয়েটারের মূলকথা বোঝা যাবে না। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনায় সিপাই বিদ্রোহ কেন নাড়া দিতে পারে নি তার ঐতিহাসিক কারণ আছে। বরং তাঁরা যে অনেক বেশি ভাবনাচিন্তা করেছিলেন প্রায় সমকালীন নীলবিদ্রোহ নিয়ে তার বৈশিষ্ট্য ভারুচার নজর এড়িয়ে গেছে। শ্রেণীস্বার্থের দিক থেকে বাঙালি জমিদার ও মধ্যবিত্ত ছিল মূলত ব্রিটিশদের সঙ্গে বাঁধা, তাই ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের জন্য সিপাইদের সংগ্রাম বাঙালি 'ভদ্রলোক' ভালো চোখে দেখেন নি। আবার নীলকর সাহেবদের কীর্তি কিছু বাঙালি জমিদারের স্বার্থে ঘা দিয়েছিল তাই তাঁরা এ নিয়ে একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং বেশ খানিকটা সফলও হয়েছিলেন। তাই এ পরিস্থিতিতে নীলদর্পণের মতো নাটক লেখা সম্ভব হয়েছিল। নীলদর্পণ হয়তো বাঙালির রাজনৈতিক বোধ তেমন বাড়াতে পারে নি, কিন্তু সংগ্রামী চেতনা উসকে দিতে যে খানিক সাহায্য করেছিল এ কথা ঐতিহাসিক সত্য।

কিন্তু ভারুচা নীলদর্পণকে এ গুরুত্ব দিতে নারাজ। এ ব্যাপারে তিনি যে শুধু নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের ব্রিটিশের কাছ থেকে রায়বাহাদুর খেতাব পাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করেছেন তাই নয়, ন্যাশনাল থিয়েটারে এ নাটক অভিনয়

নিয়ে মন্তব্য করতেও ছাড়েন নি। তাঁর মতে, নীলদর্পণের রাজনৈতিক অভিঘাত মিলিয়ে যাবার পরই এ নাটক অভিনয়ের কথা ভাবা হয়েছিল, তাই লেখার বারো বছর পর এটি মঞ্চস্থ হতে পেরেছিল। তাঁর যুক্তি মেনে নিলে তো দুনিয়ার বহু নাটকই এমন গুরুত্বহীন বলে মনে হতে পারে। চ্যাপলিনের গ্রেট ডিক্টেটর এখনো দর্শককে ভাবায় কেন? হিটলারের রবরবা তো প্রায় অর্ধশতাব্দীর পুরনো ব্যাপার। হাউপ্টম্যানের 'উইভারস'কেও তো তাহলে প্রত্নতত্ত্বের জিম্মায় দিয়ে বাতিল করতে হয়। কিন্তু তা তো করা হয় না। আসলে নীলদর্পণকে কেন্দ্র করে শাসক ইংরেজদেরও শ্রেণীদ্বন্দ্ব বেশ খানিকটা প্রকাশ পেয়েছিল এ কথা বিস্মৃত হলে চলবে না।

নীলদর্পণের গুরুত্ব কমাতে গিয়ে ভারুচা আরো যে গুটিদুয়েক মন্তব্য করেছেন সে বিষয়েও কিছু বলার দরকার আছে। লক্ষ্ণৌতে নীলদর্পণের অভিনয় করতে গিয়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার যে গোরা সৈন্যদের বিক্ষোভের মুখোমুখি হয়েছিল; ভারুচার মতে তার মধ্যে মোটেই কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। এ বিষয়ে বিনোদিনী দাসীর স্মৃতিকথায় যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে, ভারুচা তাকে অতিরঞ্জিত বলে অভিহিত করেছেন। এ বিক্ষোভ আসলে কিছু মোদো মাতালের কীর্তি এমন মন্তব্য তিনি করেছেন। বরং সেখানকার সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট যে থিয়েটার দলটির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন তার মধ্য দিয়ে তিনি এ নাটকের প্রতি ইংরেজ রাজশক্তির আনুকূল্যের প্রকাশ দেখেছেন। এ ঘটনা নাকি প্রমাণ করে নীলদর্পণ 'রাজনৈতিকভাবে আক্রমণাত্মক' ছিল না। বিনোদিনী দাসীর স্মৃতিকথা ও ইতিহাস কিন্তু ভিন্ন কথাই বলে।

১৮৭৬ সালের নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল চালু করার ব্যাপারেও নীলদর্পণের ভূমিকা ভারুচার কাছে গুরুত্ব পায় নি। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন এ বিল চালু হবার জন্য 'ভারত বিলাপ' ধরনের স্বদেশী নাটক অথবা 'মুস্তাফী সাহেব কা পাক্কা তামাশা' দায়ী ছিল না (যেন অর্ধেন্দুশেখরের এ তামাশাকে এ ব্যাপারে মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে), যুবরাজের ভারত ভ্রমণ নিয়ে লেখা 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' শ্রেণীর ব্যঙ্গ নাটক এ আইন প্রণয়নে ইংরেজ সরকারকে উত্তেজিত করেছিল। এ ব্যাপারে নীলদর্পণের নাকি কোনো ভূমিকাই নেই।

ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছেলে প্রিন্স অব ওয়েলস্ (ভবিষ্যতের ভারতসম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) কলকাতায় এসেছিলেন

১৮৭৬-এর জানুয়ারি মাসে। উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁর সম্বর্ধনা উপলক্ষে কলকাতায় ঝড় বয়ে যায়। এ প্রতিবাদেরই প্রতিফলন ঘটে 'গজদানন্দ' নাটকে। সরকার তাতে ক্ষেপে যায়। পুলিশের হস্তক্ষেপে এর অভিনয় বন্ধ হলে কর্তৃপক্ষ নাটকটির নাম পাল্টে ফের মঞ্চস্থ করেন। তার পর সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর অভিনয় চলা কালে কী ভাবে তা বন্ধ করে দেওয়া হয় তা এখন ইতিহাসের অঙ্গ। এ নিয়ে মামলার ব্যাপারও সকলের জানা। অনেকের মতো ভারুচারও ধারণা এ ঘটনার অভিঘাতেই নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন চালু হয়েছিল সে বছরের মার্চ মাসে। কিন্তু সরকার এ ঘটনার বহু আগে থেকেই এমন আইন চালু করবার কথা ভাবছিলেন তার প্রমাণ আছে। সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে এ ব্যাপারে যে ভাবনাচিন্তা করা হয়েছিল ১৮৭৫ সালেই, তার নথিপত্রে দেখা যায়, যে-গুটিকয়েক নাটক ইংরেজকে উত্তেজিত করেছে তার মধ্যে রয়েছে নীলদর্পণ, হীরকচূর্ণ বা গাইকোয়াড় দর্পণ ও চাকর দর্পণ। এদের মধ্যে সরকার সব চাইতে বেশি ভাবিত হয়েছিলেন চাকর দর্পণ নিয়ে। অথচ নীলদর্পণ বা হীরকচূর্ণ মঞ্চস্থ হলেও চাকর দর্পণ কিন্তু কখনো পাদপ্রদীপের আলো দেখে নি। তবু ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল এবং তড়িঘড়ি আইন তৈরির জন্য ছুতো খুঁজছিল। সুরেন্দ্র-বিনোদিনী ও গজদানন্দ কর্তৃপক্ষকে সে ছুতো জুগিয়ে দিয়েছিল। চাকর দর্পণে সরাসরি চা-বাগানের শ্রমিকদের প্রতি মালিকের অত্যাচার ও শোষণের কথা এসেছে বলেই সরকার শঙ্কিত হয়েছিল। ১৮৭৫-এর নভেম্বরেই স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে এ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ সরকারি কর্তাদের কাছে বিলি করা হয়েছিল। আসলে ইংরেজ সরকার চান নি কোনো শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্বের চেহারা নাটকে প্রতিফলিত দেখে দর্শক সচেতন হয়ে উঠুক। নীলদর্পণ, অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বলভাবে হলেও, শাসক ইংরেজের মনে একটি অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। তাই যাঁরা ভারুচার মতো ভাবেন যুবরাজের বঙ্গদর্শন অথবা সুরেন্দ্র-বিনোদিনী ও গজদানন্দের মতো কোনো আকস্মিক ঘটনা সরকারকে আইন তৈরিতে উত্তেজিত করেছিল, তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের চরিত্র ও অভিসন্ধি বুঝতে ভুল করেন।

বাংলা রাজনৈতিক নাটকের ক্ষেত্রে গণনাট্য সংঘের ভূমিকাও ভারুচা তেমন তলিয়ে দেখেন নি। খুবই অল্পকথায় এ দেশে গণনাট্য আন্দোলনের পটভূমি ও ইতিহাস বিবৃত করে তিনি বিজন ভট্টাচার্য-প্রসঙ্গে চলে এসেছেন। গণনাট্য সম্পর্কে চালু কথাগুলোই তিনি সংক্ষেপে আউড়ে গেছেন মাত্র।

কিন্তু বাংলা রাজনৈতিক থিয়েটারে গণনাট্যের গুরুত্ব শুধু গুটিকতক নাট্য প্রযোজনার অভিনবত্ব অথবা লোকনাট্যের আঙ্গিকের প্রতি মনস্কতার মাপকাঠিতে বিচার করলে চলে না। ঐতিহাসিক বিচারে গণনাট্য সংঘ কতটা সার্থক ও ব্যর্থ তাই নিয়ে বিতর্কও চলতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই বাঙালি দর্শককে মূলত রাজনীতিমনস্ক করে তুলতে তার ভূমিকা অসাধারণ। গণনাট্যই প্রথম গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলালের তৈরি পৌরাণিক-ঐতিহাসিক-সামাজিক নাটকের মধ্যবিত্ত ভাবালুতা থেকে বাঙালি দর্শককে ছিনিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিল এবং অনেকটা সফলও হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো করে এ ভাবালুতার দেয়ালে ধাক্কা মারতে চেয়েছিলেন। সমাজের মূল চালকশক্তি হল অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক চেতনার স্তর এ বোধের তারতম্যের উপরে নির্ভর করেই শক্তিমান বা দুর্বল হতে পারে। গণনাট্য সংঘ এ চেতনার বিস্তারে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। যথার্থ রাজনৈতিক থিয়েটারের গুরুত্ব প্রকাশ পায় দর্শকমনে এ চেতনার বিস্তারে। রাজনৈতিক ঘটনার নেপথ্যে যদি অর্থনৈতিক অভিঘাতের যথার্থ স্বরূপটিকে চিনে না নেওয়া যায় তাহলে মঞ্চে তার উপস্থাপনা দর্শকদের মাতায়, কিন্তু ভাবাতে পারে না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে এজন্য বাংলা নাটকের বিস্তীর্ণ ভূভাগ হয়তো ভরে উঠেছে শ্লোগান-সর্বস্বতায়, শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্থূল প্রতিফলন আবহাওয়াকে করে তুলেছে ক্লিষ্ট, তবু তার মধ্যেও আর্থ-রাজনীতিক পারস্পরিক সম্পর্কের চেহারাটিকে চিনে নেবার চেষ্টায় বাংলা নাট্যজগৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

এবং এ কারণেই হাল আমলের বাঙালি নাট্যকার রাজনীতিমনস্ক হতে বাধ্য হয়েছেন। দর্শকের চেতনায় রাজনীতি চারিয়ে গেছে বলেই নাট্যকার কোনো বিকল্প বোধের আশ্রয় নিতে পারেন না। কিছুটা স্থূলভাবেই হয়তো বলা যায় সাহিত্য-শিল্পের এলাকা দখলের লড়াইয়ে নাট্য ও মঞ্চজগৎ অধিকার করে নিয়েছে বামপন্থীরা। হয়তো এখানেই তার শক্তি, এখানেই তার দুর্বলতা। তাই বুদ্ধদেব বসু বা বিমল কর ভালো নাটক লিখেও নাট্যকার বলে স্বীকৃত হন না, বাদল সরকারকেও অ্যাবসার্ড পথ পরিক্রমা করে আশ্রয় নিতে হয় শেষ পর্যন্ত বামপন্থী রাজনীতিতেই।

গণনাট্য সংঘের এ ভূমিকা ভারুচার মনোযোগ তেমন আকর্ষণ করতে পারে নি বলেই বিজন ভট্টাচার্য ও গণনাট্যের অন্যান্য নাট্যকারেরা এ বইতে বেশ অবহেলিত থেকে গেছেন। বিজন ভট্টাচার্য তবু খানিক আলোচনার পরিধিতে আসতে পেরেছেন, সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে তাঁর গুটিচারেক

নাটক, কিন্তু একেবারেই বাদ পড়ে গেছেন তুলসী লাহিড়ী বা দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কিছু নাট্যকার। দুর্বলভাবে হলেও পথিক বা ছেঁড়া তার রাজনৈতিক নাটকের ভূগোলকে বিস্তৃত করেছিল, এবং তরঙ্গ, দীপশিখা প্রভৃতি নাটক রাজরোষে পড়েছিল। বাংলায় রাজনৈতিক থিয়েটার নিয়ে আলোচনায় এ তথ্য বিস্মৃত হলে চলে না।

বিজন ভট্টাচার্যকে নিয়ে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক নাট্যকার হিসেবে তাঁর শক্তি ও দুর্বলতার সামগ্রিক চেহারাটা লেখক আবিষ্কার করতে চান নি। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি নাটক, সেগুলো অবশ্য তাঁর প্রধান লেখা বটে, অবলম্বন করে ভারুচা কিছু ইতঃস্তত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেয়েছেন। নবান্ন থেকে শুরু করে দেবীগর্জন পেরিয়ে হাঁসখালির হাঁসে পৌঁছতে বিজন ভট্টাচার্যকে বাংলার কৃষি অর্থনীতির অনেক ওঠাপড়াকে আত্মস্থ করতে হয়েছে। নবান্নের অস্ফুট স্বরলিপির তুলনায় দেবীগর্জন বা হাঁসখালির হাঁসের প্রত্যয় অনেক গভীরে প্রোথিত। এ প্রত্যয় শুধু যে নতুন মিথ্ রচনায় মৌলিক তাই নয়, বোধের এ রূপান্তর সূচিত করে একজন দায়বদ্ধ নাট্যকারের নিরন্তর সময়কে চিনে নেবার চেষ্টা। তাই বিজন ভট্টাচার্যের তত্ত্ব বিশ্ব ও রূপগত পালাবদলের প্রতি স্তরকে সঠিক স্বরূপে উপলব্ধি করতে না পারলে বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারের একটি বিশেষ পর্যায় যথাযথ গুরুত্ব পায় না। কেন বিজন ভট্টাচার্য বার বার নিজেকে ছড়িয়ে দেন শ্রেণীসংঘাতের বিভিন্ন অলিগলিতে, আবার ফিরে ফিরে আসেন নিজস্ব মাতৃ-মিথ্-এ, এ ব্যাপারটি তার ফলে ভারুচার নজর এড়িয়ে যায়। সময় থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বিজন ভট্টাচার্যকে এবং সেইসঙ্গে রাজনৈতিক থিয়েটারকে বোধ হয় দেখা চলে না।

বহুরূপীকে বাদ দেবার যুক্তিটিও বিস্ময়কর। ভারুচা জানান যেহেতু তাঁর আলোচনার বৃত্তে রবীন্দ্রনাথ আসেন না তাই বহুরূপীকে তিনি বর্জন করেছেন। শিল্পী হিসেবে শম্ভু মিত্র নাকি অতিশয় বায়বীয় ও কাব্যময় (এথেরিয়েল অ্যাণ্ড পোয়েটিক), গভীরভাবে আত্মময়, তাই তাঁর প্রযোজনাকে 'পলিটিক্যাল' শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। যুক্তি হিসেবে তিনি শম্ভু মিত্রের রবীন্দ্রনাথে আসক্তির কথা বলেছেন। তাহলে ভারুচাকে জিজ্ঞাসা করতে হয় বহুরূপীর প্রযোজনা পথিক, ছেঁড়া তার বা চার অধ্যায় কি তাঁর যুক্তিকে সমর্থন করে? অতিনাটকীয়তা ও কিছু ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়েও কি পথিক বা ছেঁড়া তার একটি বিশেষ সময়ের রাজনৈতিক মনোভাবকে প্রকাশ করে নি? এবং বাংলা নাটকে ভাবালুতা ও অতিনাটকীয়তা কি অপরিচিত ব্যাপার? চার

অধ্যায়ের রাজনৈতিক অভিঘাত কি সেকালের (এবং একালেরও) দর্শক-মনকে চঞ্চল করে তোলে নি? ভারুচা কি বলতে চান চার অধ্যায় রাজনৈতিক নাটক নয়? প্রকাশিত হবার পর থেকে অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত চার অধ্যায় যে বার বার বিতর্কের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে তার কারণ তো পুরোপুরি রাজনৈতিকই। তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করা হোক বা না হোক, চার অধ্যায় কিন্তু বাঙালির মনে ঘুরে ফিরে ঝড় তোলে রাজনীতির জন্যেই। দেশের নানাবিধ উগ্রপন্থী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে চার অধ্যায়ের বক্তব্য বোধ হয় হাল আমলেও প্রাসঙ্গিকতা হারায় না। বিদেশী থেকে নেওয়া বলে নাহয় দশচক্রের কথা না-ই বা তোলা হল।

বহুরূপীর তুলনায় আরো বিস্ময়কর রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেবার যুক্তিটি। ভারুচার মতে, রবীন্দ্রনাথকে যেহেতু বাংলা পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা চলে না এবং তাঁর সাংকেতিক নাটকগুলোর কোনো পূর্বাপর নেই, তাই তিনি তাঁকে ইচ্ছে করেই বাদ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাটককে কোনো প্রবণতার সঙ্গে বিশেষ করে রাজনীতির সঙ্গে অবশ্যই মেলানো চলে না। ভারুচা স্বীকার করেন যদিও আপাত-মার্কসীয় পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করে রক্তকরবীকে ঔপনিবেশিক স্বৈরাচারের নমুনা হিসেবে নেওয়া হয় তবু তাঁর নাটক শেষ পর্যন্ত 'রাজনীতিকে ছাপিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাটকে নাকি অধিবিদ্যার 'আত্মা' ভীষণভাবে জড়িয়ে আছে।

এখন মুশকিল হল 'আত্মা' (soul) দিয়ে রবীন্দ্রনাটককে ব্যাখ্যা করার ধারাটি এত পুরনো যে অধুনা এ নিয়ে যে-কোনো আলোচনাই বস্তাপচা বলে মনে হয়। টমসনের মতো বিদেশী পণ্ডিতরা দীর্ঘকাল আগে রবীন্দ্রনাটক সম্পর্কে এ ধরনের একটি 'মিথ্' প্রচার করেছিলেন। ভারতীয় নাটক নিয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মিথ্ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা নিয়ে ভারুচা এ বইয়ের গোড়াতেই আপত্তি তুলেছিলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথে এসে একই চক্রে ঠেকে গেলেন! এত অভিজ্ঞতা পেরিয়েও যদি এখন অচলায়তন বা মুক্তধারা, রক্তকরবী ও রথের রশির রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে নতুন করে আলোচনায় বসতে হয় তাহলে সেটা বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তা ছাড়া, পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না বলে রাজনৈতিক থিয়েটারের আওতায় তাঁকে আনা যাবে না এমন যুক্তি তো হাস্যকর। তাহলে এ যুক্তিতে তো এ সিদ্ধান্তই দাঁড়ায় যে ব্রিটিশ আমলে বাংলা মঞ্চে রাজনীতি এসেছে শুধু পেশাদারী নাট্যকারদের মারফত।

ভারুচা আসলে গোড়াতেই ভুল করেছেন। রবীন্দ্রনাটককে তাঁর সমকালীন মঞ্চের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত রেখে দেখলে বোধ হয় চলবে না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই মার্কসিস্ট ছিলেন না, কিন্তু তিনি নিজের মতো করে সভ্যতার শ্রেণীদ্বন্দ্বের গভীরে এমন প্রাঞ্জলভাবে ঢুকে যেতে পেরেছিলেন এবং তাঁর সেই অভিজ্ঞতার উপযোগী কাব্যময় নাট্যভাষা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন যা সেকালের গিরিশ-দ্বিজেন্দ্র অধিকৃত বাংলা থিয়েটারের দর্শকের কাছে তা পুরোপুরি অপরিচিত ছিল। কিন্তু যুদ্ধ মন্বন্তর দেশভাগ স্বাধীনতা-উত্তরকালের আর্থিক ও নৈতিক সংকট এ প্রজন্মের মানসিকতাকে রবীন্দ্রনাটকের সমীপে নিয়ে যেতে প্রবলভাবে সাহায্য করেছে। তার অভিঘাত রাজনৈতিক শিল্প-চেতনার স্তরে যে তরঙ্গ তুলেছে তাকে স্বীকরণ করেই গড়ে উঠেছে অমোদের আধুনিক থিয়েটার। এ বিষয়টি অস্বীকার করলে বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারের মূল কথাটিকেই এড়িয়ে যাওয়া হয়। আমাদের থিয়েটার দলগুলো শুধুমাত্র অভ্যাস দিয়ে পরিচালিত হয়েই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেন না, এ উচ্চারণের মধ্যে থাকে ঐতিহ্যের শিকড়ে আত্মানুসন্ধানের তাড়না।

দুই

ভারুচা সংগত ও স্বাভাবিকভাবেই মনোনিবেশ বেশি করেছেন উৎপল দত্ত ও বাদল সরকারের প্রতি। একটি বিশেষ পর্যায়ের রাজনৈতিক থিয়েটার বলতে এ দুজনের কর্মকাণ্ডকেই বোঝায়। বাংলার থিয়েটার জগতে এ দুজনের গ্ল্যামারও বেশি।

অবশ্য এটা ঠিক বলা যায় না, বিদেশী কিছু পত্রিকায় এ দুজনকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা ভারুচাকে প্রভাবিত করেছিল কিনা, তবু তিনি প্রকৃত জিজ্ঞাসুর মতো এ দুজনের থিয়েটারের মধ্যে ঢুকে যেতে চেয়েছেন।

উৎপল দত্ত অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি। অফুরন্ত তাঁর প্রাণশক্তি ও কর্মচাঞ্চল্য। তিনি একই সঙ্গে প্রথিতযশা নাট্যকার ও পরিচালক, দুর্দান্ত স্কলার, প্রতিষ্ঠিত পালাকার এবং বাংলা ও হিন্দী সিনেমার পরিচিত ভাঁড় ও ভিলেন। তবে তাঁর প্রথম ও প্রধান পরিচয় রাজনৈতিক থিয়েটারের একজন অক্লান্ত কর্মী বলে। ভারুচা সেই পরিচিতির উৎস থেকে যাত্রা করে উৎপলকে বুঝে নিতে চেয়েছেন। তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এ দেশের মার্কসীয় চিন্তাধারার সঙ্গে টানাপোড়েনে গড়ে উঠেছে তাঁর থিয়েটার ও রাজনীতি। দেশী বিদেশী ধ্রুপদী নাটক প্রযোজনা দিয়ে তাঁর থিয়েটারে প্রবেশ, গণনাট্যের সঙ্গে

তাঁর সংক্ষিপ্ত সম্পর্ক ও ত্বরিত বিচ্ছেদ, নিজস্ব নাট্যদল সৃষ্টি—এ সব তরঙ্গিত তথ্য ভারুচা বেশ সাবলীলভাবেই বলে গেছেন। উৎপল-প্রযোজিত নয়টি নাটক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন তিনি। সময়-সীমা পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, যার এক প্রান্তে রয়েছে অঙ্গার ও অন্য প্রান্তে দুঃস্বপ্নের নগরী। প্রায় দু দশকে ব্যাপ্ত উৎপলের নাটকগুলোর মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটারের রাজনৈতিক ভূগোলকে চিনে নিতে চেয়েছেন ভারুচা। তিনি অবশ্য উৎপলের প্রযোজনায় অতিরিক্ত যন্ত্রনির্ভরতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, সংশয় প্রকাশ করেছেন এর ফলে দেশের বেশির ভাগ মানুষের কাছে পৌঁছনো কতটা সম্ভব তাই নিয়ে, তবু নাটকগুলো বিশ্লেষণের মধ্যে রয়ে গেছে আমাদের থিয়েটারের ডায়ালেকটিক্‌সকে বুঝে নেবার চেষ্টা। এ আলোচনার মধ্যে টিনের তলোয়ারকে একটু প্রক্ষিপ্ত মনে হতে পারে, ভারুচা এ কথা স্বীকার করে নিয়েও তার প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

টিনের তলোয়ার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভারুচা জানিয়েছেন এ নাটকের বিপ্লবী বার্তা ব্যক্ত হয়েছে নাটকের অন্তর্বর্তী নাটক তিতুমীরের মধ্য দিয়ে। কথাটি ঠিকই তাই প্রশ্ন ওঠে সধবার একাদশীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তিতুমীরকে দাঁড় করিয়ে উৎপল কোন্‌ উদ্দেশ্য মেটাতে চেয়েছেন? সধবার একাদশী দীনবন্ধুর লেখা একটি পরিচিত প্রহসন, তিতুমীর উৎপল-রচিত একটি কল্পনা। পরে অবশ্য উৎপল নিজেই এ নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। বাংলার জাতীয় চেতনার জাগরণে গত শতকে দীনবন্ধুর প্রহসনটির একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল, একটি কল্পিত বিপ্লবী নাটকের প্রতিতুলনায় তাঁর গুরুত্বকে খাটো করে দেখার মধ্যে যথার্থ রজনীতি থাকে কি না সন্দেহ। উৎপল অবশ্য মার্কস ও এঙ্গেলসের চিঠি থেকে উদ্ধৃতি তুলে ঐতিহাসিক নাটক লেখার ব্যাপারে স্বাধীনতা বেচার কথায় নিজের সমর্থন খুঁজতে পারেন, কিন্তু তাতে মূল প্রশ্নটা বিলীন হয়ে যায় না। কোনো রচনায় যদি একটি বিশেষ যুগের প্রগতিশীল প্রবণতা প্রকাশ পায় তবে তাকে তার যথার্থ স্বরূপে স্বীকার করে নেওয়াই বোধ হয় যথার্থ মার্কসবাদ।

তা ছাড়া টিনের তলোয়ারে আরো একটি সমস্যা আছে। উৎপল নাটকের গোড়ায় জনৈক মেথরকে স্থাপন করে তার মারফত মধুসূদনের কাব্য ও সমকালীন থিয়েটারের প্রতি বাঁকা কথা শুনিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে উৎপল হয়তো বলতে চান আমাদের উনিশ শতকী ভদ্রলোকী সংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনচর্যার কোনো যোগ ছিল না। এ তো প্রায়, রবীন্দ্রনাথের

ভাষায়, ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজতে যাওয়ার মতো। ভারুচা অবশ্য টিনের তলোয়ারের রাজনীতিকে 'অগ্রাহ্য' করার কথাই বলেছেন, কিন্তু নাটকটিকে তার যথার্থ প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে পারেন নি।

ভারুচার উৎপল নিয়ে আলোচনায় অপেক্ষাকৃত বেশি মনোযোগ পেয়েছে অঙ্গার, কল্লোল, অজেয় ভিয়েতনাম, ব্যারিকেড ও দুঃস্বপ্নের নগরী। এদের মধ্যে অজেয় ভিয়েতনামই সম্ভবত অভিনীত হয়েছে সব চাইতে কম। এ সবগুলো নাটকের মধ্যে শ্রেণীসংঘাতের চেহারাটি উৎপল প্রখরভাবেই তুলে ধরেছেন এবং শিল্পী-হিসেবে তাঁর অবস্থানটিও অস্পষ্ট রাখেন নি। বস্তুত এ নাটকগুলো অনুসরণ করলে বাংলার বামপন্থী রাজনীতির তরঙ্গকে ভালোভাবেই বুঝে নেওয়া চলে। ভারুচাও তাই করেছেন। কল্লোলের ঐতিহাসিক অবস্থান, ব্যারিকেডে সত্তরের সন্ত্রাস ও হেমন্ত বসু হত্যার প্রেক্ষিত এবং দুঃস্বপ্নের নগরীতে তারই বিস্তার ভারুচার নজর এড়ায় নি। এ-সব নাটক প্রযোজনায় দর্শকমনে প্রতিক্রিয়ার স্বরূপটিও তিনি বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। অবশ্য তিনি উৎপলের নাটকের নায়ক ও দর্শকের সঙ্গে হিন্দী সিনেমার প্রতিতুলনা করেছেন, তাঁর থিয়েটারে যে ক্রোধ বেশি এ কথাও জানাতে ভোলেন নি। কিন্তু এ সব সরলীকরণের মধ্যে উৎপলের রাজনৈতিক থিয়েটারের পুরো চেহারাটা ফুটে ওঠে কিনা সন্দেহ। উৎপলের থিয়েটার যে মূলত শহরের দর্শকদের কাছেই সীমাবদ্ধ এ সত্য লক্ষ্য করেছেন তিনি, কিন্তু উৎপল যে কতখানি মধ্যবিত্ত মানসিকতার কাছে দায়বদ্ধ তার ক্রম নির্ণয়ে ভারুচা যত্ন নেন নি। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বাংলার বামপন্থী রাজনীতির প্রতিটি স্তরকে উৎপল নিয়ে আসতে চেয়েছেন তাঁর নাটকে। কখনো সি. পি. এম., কখনো নকশাল রাজনীতির তরঙ্গে আসা যাওয়া চলেছে তাঁর। অঙ্গারে কোনো বিশেষ পার্টি লাইন ছিল না, কেননা কম্যুনিস্ট পার্টিতে তখনো ভাঙন ধরে নি, কিন্তু কল্লোলে সি. পি. এম. মানসিকতার সঙ্গে পেটি-বুর্জোয়া সেন্টিমেণ্ট—যে বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়েছিল সেকালে দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে—তীর বা তিতুমীরে নকশালী রাজনীতি, ব্যারিকেডে দুটি ধারার মধ্যে আপসের চেষ্টা, এবং দুঃস্বপ্নের নগরীতে পুরোপুরি সি. পি. এম.-এর সমর্থন উৎপলের দৃষ্টিভঙ্গির বিচিত্র টানাপোড়েনকে স্পষ্ট করে তোলে। এ টানাপোড়েনের মধ্যে অবশ্যই প্রকাশ পেয়েছিল উৎপলের নিজস্ব দ্বন্দ্বের সংকট, তবু বাঙালি দর্শকের নাড়ির গতি অনুসরণ করার চেষ্টাও যে তার মধ্যে একেবারে ছিল না এমন হয়তো নয়। উৎপলও তাঁর উপাস্য গিরিশচন্দ্রের

মতো মধ্যবিত্ত দর্শকদের মানসিক চাহিদা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারেন। তাই সময়ের সঙ্গে সাড়া দিয়ে নাটক লেখা ও প্রযোজনায় তিনি সতর্ক। ভারুচা ঠিকই বলেছেন সাম্প্রতিক প্রেক্ষিতে ব্যারিকেড বা দুঃস্বপ্নের নগরী তাৎপর্য হারিয়েছে, কিন্তু তার কারণটা বিশেষ তলিয়ে দেখেন নি। উৎপলের নাটকে অবশ্য আছে সংগ্রামের কথা ও তার প্রকাশ, কিন্তু রাজনীতি বোঝানোর দায় তিনি তেমন নিতে চান না। তাই তাঁর নাটক যতটা মাতায়, ততটা ভাবায় না। এ বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় উৎপলের একেবারে হাল আমলের প্রযোজনাগুলোর মধ্য দিয়ে। সাতাত্তরের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের শাসন তাঁর সংগ্রামের তীব্রতাকে যেন অনেকটাই নমিত করে দিয়েছে। এখন যেন তাঁর সামনে নেই এমন কোনো প্রবল প্রতিপক্ষ যার বিরুদ্ধে তিনি চালনা করতে পারেন তাঁর পরিচিত আয়ুধ। তাই বিগত কয়েক বছরে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হল 'দাঁড়াও পথিকবর' ও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই যে এ নাটক দুটো উৎপলের বিচরণের স্বক্ষেত্র নয়। এ দুটো নাটকের রাজনীতিও অনেকটাই আরোপিত। অথচ তাঁর প্রতিভা যদি থিয়েটারের মারফত দ্বান্দ্বিক রাজনীতি বোঝানোর দায় তুলে নিতে চাইত, তাহলে তাঁর বিষয়ের অভাব হত না এখনো। কেননা আমাদের দেশে, এমন-কি পশ্চিমবঙ্গেও, শ্রেণীসংগ্রাম শেষ হয়ে যায় নি এখনো।

রাজনৈতিক নাটক লিখতে গিয়ে উৎপল যে কী বিপর্যয় বাধিয়ে বসেন তার প্রমাণ মেলে এবার রাজার পালায়। ভারুচা কেন যে তাঁর আলোচনার বৃত্ত থেকে এ নাটকটিকে শুধু পাদটীকায় আনলেন তা বোঝা গেল না। এবার রাজার পালায় আছে ডিক্টেটর শাসনের উদ্ভব ও পতনের ইতিহাসের উৎপলী ভাষ্য। এ নাটকের সমান্তরে ইন্দিরা গান্ধী ও জরুরি ব্যবস্থার কথা মনে আসবেই। কিন্তু নাটকটিতে যেন সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে ডিক্টেটর তৈরির অর্থনৈতিক কার্যকারণ। কোন্ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের ক্রম মেনে কোনো দেশে আবির্ভূত হয় তানাশাহী তা বুঝিয়ে দেবার দায় উৎপল অনায়াসে এড়িয়ে গেছেন। নাটকটি বরং দর্শক-মনে এমন অভিজ্ঞতাই এনে দিতে চায় যেন তানাশাহীর আবির্ভাব ঘটে একেবারেই আকস্মিকভাবে। চামারিয়ার মতো মূর্খ ব্যবসায়ী ও বর্মনের মতো মাথামোটা মিলিটারী হল এমন তানাশাহীর শক্তির উৎস, ডিক্টেটরের কাজকর্মের মধ্যে থাকে না কোনো রাজনীতির লজিক এবং তার পতনও ঘটে নেহাতই হঠাৎ। তার জন্য দরকার

হয় না শ্রমিকশ্রেণীর সংঘবদ্ধ সংগ্রাম। এমন সব রূপকথার ধাঁচের কাহিনী প্রশ্রয় পেয়েছে 'এবার রাজার পালা'য়। সত্তরের বাঙালি দর্শক অবশ্য কলামন্দিরে বসে এ নাটক উপভোগ করেছিল বেশ তারিয়ে তারিয়েই। বিজয় তেণ্ডুলকার কিন্তু তাঁর 'দম্বদ্বীপের মোকাবিলা' নাটকে এমন মানসিকতায় আক্রান্ত হন নি, যদিও সে-নাটকখানিও ইন্দিরা গান্ধীর তানাশাহীকে আক্রমণ করেই লেখা। উৎপলের রাজনৈতিক থিয়েটার আসলে বাঙালি মধ্যবিত্তের, বিশেষ করে, কলকাতার দর্শকের নিজেকে দেখার দর্পণ।

তিন

এ বইতে বাদল সরকারের উপস্থিতি বহু বামপন্থীকে খুশি করবে না। ভারুচাও এ কথা জানেন। এ প্রসঙ্গে তিনি অশোক মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত থিয়েটার বুলেটিনে প্রকাশিত বাদল সরকারের 'রাজনৈতিক বিভ্রান্তি, প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শ ও মৌলিকতার অভাবের' বিরুদ্ধে একটি আক্রমণাত্মক লেখার কথা উল্লেখ করেছেন। এরই প্রতিবাদে বিজনেস স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় এলা দত্তের লেখা থেকে ভারুচা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এলা দত্তের মতে থার্ড থিয়েটারের বিরুদ্ধে এ আক্রমণের কারণ হল প্রতিষ্ঠিত নাট্যদলগুলোর একটি 'অলটারনেটিভ ফর্মে'র আবির্ভাবে শংকিত হয়ে ওঠা। ভারুচা এ মতটিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন। তিনি লিখছেন, 'আমার মনে হয় থিয়েটার ওয়ার্কশপের মতো প্রতিষ্ঠিত নাট্যদলগুলো স্পষ্টতই থার্ড থিয়েটার আন্দোলনে ভীত হয়ে পড়েছে, কেননা এ দলগুলোর মধ্যে মৌলিকতা, দায়বদ্ধতা ও সুসঙ্গতি নেই।'

গ্রুপ থিয়েটারগুলোর সাম্প্রতিক প্রযোজনায় কিছু ভাঁটার টান দেখা দিয়েছে বটে কিন্তু তার মূলে রয়েছে থার্ড থিয়েটারের আবির্ভাব এ সিদ্ধান্ত খুবই সরল। গ্রুপ থিয়েটারগুলোর মধ্যে অবসাদের কারণ নিহিত রয়েছে অন্যত্র এবং তা নিয়ে আলাদা লেখা তৈরি করা যায় কিন্তু ভারুচা সেদিকে না গিয়ে একটি সহজ সমীকরণের আশ্রয় নিয়েছেন। আসলে থার্ড থিয়েটারের রাজনীতি নিয়েই গ্রুপ থিয়েটারগুলোর সংশয় রয়ে গেছে। স্বয়ং উৎপল দত্তই তো থার্ড থিয়েটার ও তার অনুকারী খড়দার লিভিং থিয়েটারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন তাদের 'শৌখিন' রাজনীতির জন্য।

বাদল সরকার তাঁর নাট্যজীবনের গোড়ায় থিয়েটারে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কিছু ঝরঝরে হাসির নাটক নিয়ে তাঁর আবির্ভাব। নাটক

রচনা-কৌশলের উপর তাঁর দখল বিস্ময়কর। তিনি জানেন কোন নাটকীয় সিচুয়েশনকে কতটা নিংড়ে নেওয়া যায়। ক্রমে তিনি হাসি ছেড়ে এলেন অ্যাবসার্ডে। 'এবং ইন্দ্রজিত' প্রথম প্রযোজিত হয়ে থিয়েটারমনস্ক মানুষদের চকিত করে তুলেছিল। বক্তব্যের উপস্থাপনায় অভিনবত্ব একটি ছাপ ফেলেছিল। কিন্তু অ্যাবসার্ড থিয়েটারেরও একটি রাজনীতি আছে এবং তা হল রাজনীতি-না-করার রাজনীতি। এক্ষেত্রেও বাদল সরকার নাটকের ক্র্যাফটের উপর বিস্ময়কর দখলের প্রমাণ রেখেছেন। অতঃপর তিনি আশ্রয় নিয়েছেন অঙ্গনমঞ্চের, থিয়োরি তাঁর থার্ড থিয়েটার।

ভারুচা থার্ড থিয়েটারকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—থার্ড থিয়েটার এক পার্টির বিরুদ্ধে অন্য পার্টির পক্ষ নেয় না, বরং রাজনীতির বৈপরীত্যকে নাটকে ফুটিয়ে তুলে মানুষের জীবনের উপর তার প্রভাব দেখতে চায়। বাদল সরকার কোনো নির্দিষ্ট পার্টির 'প্রতিক্রিয়াশীল' অংশকে সরিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হন না, হরতাল লক আউট বা সরকারি সম্পত্তির বিনষ্টির সপক্ষেও কিছু বলেন না, থার্ড থিয়েটার শুধু দর্শকদের বিবেককে কিছু বিব্রত করতে চায়। তিনি জোর দেন এ তত্ত্বের উপর যে দর্শকরাই তাঁদের পারিপার্শ্বিকের জন্য দায়ী। তিনি উৎপল দত্তের মতো শোষকদের অত্যাচার ও রাজনৈতিক নেতাদের ক্যালাসনেসকে বাড়িয়ে না দেখিয়ে মধ্যবিত্তের 'ক্যালাসনেসে' ধাক্কা দিতে চান যাতে তাঁরা মানুষের যন্ত্রণার শুধু নীরব দর্শক না হয়ে থাকেন। অর্থাৎ বাদল সরকার, ভারুচা অন্যত্রও বলেছেন, বোধকে জাগাতে চান। বাদল সরকার জানিয়েছেন তাঁর এই উপস্থাপনারীতি গ্রামে গঞ্জেও অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে।

বাদল সরকারের অঙ্গনমঞ্চ ও থার্ড থিয়োরিতে গভীর প্রভাব ফেলেছেন পোলিশ প্রযোজক গ্রটোভস্কি। তিনিও তাঁর পুয়োর থিয়েটারে প্রায় অনুরূপ তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। গ্রটোভস্কির পুয়োর থিয়েটার যে কতটা 'পুয়োর'-দের জন্য, তাঁর একেকটি প্রযোজনায় যে কী প্রচণ্ড খরচ এবং এডিনবরা ফেস্টিভ্যালয়ে তাঁর গরিবীয়ানার জন্য যে কত মাশুল লেগেছিল তা নিয়ে বিতর্ক তো ইতিহাস হয়ে আছে। গ্রটোভস্কি সরকারি খরচে বিদেশের নানা স্থানে নাট্যরীতি অধ্যয়ন করে ফিরে এসে তাঁর তত্ত্ব দাঁড় করালেন। নাট্যদলও তৈরি হল সরকারি খরচে। সমাজতান্ত্রিক দেশে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দর্শক কখনো একেক বারের অভিনয়ে একশো ছাড়ালে চলবে না—কেননা সংখ্যা বাড়লে তাদের সঙ্গে অভিনেতাদেব সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা নাকি কঠিন হয়ে পড়ে। অভিনেতাসহ কর্মীদের মাইনে জুগিয়ে, প্রযোজনার খরচ মিটিয়ে

শেষ পর্যন্ত এ থিয়েটার কতটা গরিবদের জন্য মাথা ঘামাতে পারে তাই নিয়েই বিভিন্ন মহলে সংশয় রয়েছে।

থিয়োরি হিসেবে থার্ড থিয়েটার গ্রটোভস্কির তুলনায় বেশ সরল সন্দেহ নেই। বাদল সরকার অঙ্গনমঞ্চের ছোট পরিসরে অভিনেতাদের ফিজিক্যাল অ্যাকশন দিয়ে পৌঁছে যেতে চান দর্শকদের বোধের অভ্যন্তরে। উৎপল দত্ত বা অন্যান্য গ্রুপ থিয়েটারের তুলনায় তাঁর একেকটি প্রযোজনার ব্যয় অতি সামান্য। প্রায় শ-খানেক দর্শক একটাকার টিকেট কেটে (সম্প্রতি দাম বেড়েছে কিনা জানি না) মিছিলে অংশ নেন, সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস পড়েন। বাদলবাবু ও তাঁর অনুগামীদের নিষ্ঠা ও শ্রম সকলকে বিস্মিত করে তোলে।

তবু বাংলার থিয়েটার জগতে বাদলবাবু প্রায় নিঃসঙ্গ। এর কারণ শুধু যে গ্রুপ থিয়েটারগুলোর তথাকথিত কূপমণ্ডুকতা তা হয়তো নয়। আসলে বাদলবাবু যে পদ্ধতিতে তাঁর কথা কম্যুনিকেট করতে চান তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়েই প্রশ্ন আছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই বাদলবাবুর থিয়েটার-ভাবনার বেশ গুরুত্ব আছে, তাঁর প্রয়োগপদ্ধতিও মৌলিক, অঙ্গনমঞ্চের অভিনেতাদের শারীরিক অভিনয় ক্ষমতা অসাধারণ, প্রয়োজনার প্রতিটি স্তরে প্রকাশ পায় পরিচালকের গভীর সচেতনতা, তবু শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রচেষ্টার প্রভাব নিয়ে সংশয় থেকে যায়। কেননা বাদলবাবুর দর্শক তো কলকাতারই এলিট শ্রেণী। যদিও তিনি জানিয়েছেন তাঁর প্রযোজনা গ্রামের দর্শকদের মধ্যেও সাড়া ফেলেছিল প্রচুর, তথাপি তার অভিঘাত সীমাবদ্ধ বলেই মনে হয়। ভারুচা তাঁর বইতে বাদলবাবুর যে কটি নাটক নিয়ে আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে সব চাইতে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে মিছিল, 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস' ও 'ভোমা'। মিছিল দেখা হয় নি তাই এ নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করা যাচ্ছে না কিন্তু সুখপাঠ্য ও ভোমা বাদলবাবুর দাবি বা উদ্দেশ্যকে কতটা প্রতিষ্ঠিত করে, তা সন্দেহের বিষয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসন ঔপনিবেশিক শোষণের অভিব্যক্তি, মার্কেন্টাইল ক্যাপিটাল কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালে, আমাদের তথাকথিত উন্নতির মূলে ছিল ইংরেজদের লোভ, শতাব্দীব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু এ অপশাসনের ফল, যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্রিটিশ ক্যাপিটাল ভারত ছেড়ে যাবার আগে এদেশী পুঁজির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে গিয়েছিল—ইতিহাসের এসব আলগা কথা বোধ হয় সকলেই জানেন। এ সহজ বক্তব্যকে পরিবেশনের জটিলতা ও

অভিনবত্বে এমন ভঙ্গিসর্বস্ব করে তোলা হয়েছিল যে তার ফলে দর্শকমনে প্রত্যাশিত অভিঘাত কতখানি গভীরভাবে পড়েছিল তা বলা যায় না। ভোমা সম্পর্কেও প্রায় একই কথা বলা যায়। পুঁজিবাদী দেশে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করলেই সমাজতন্ত্র আসে না, কেননা ঋণ মারফত ব্যাঙ্কের পুঁজিকে কাজে লাগাতে পারে একটি বিশেষ শ্রেণী, অল্পবিত্ত মালিক তা থেকে আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে হয় অন্যায়ভাবে বঞ্চিত, এ তত্ত্বটি বোঝাবার জন্য বাদলবাবু এক জটিল ইডিয়মের আশ্রয় নিয়ে ফেলেন। যাঁরা বাদলবাবুর দর্শক তাঁদের কাছে এ সব কথা কি অপরিচিত? তাহলে কি শেষ অব্দি প্রয়োগরীতিটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় না? তখন কি এ জরুরি প্রশ্নটাও চলে আসে না যে জটিলতর রাজনৈতিক সমস্যার সচেতনতা ও বহুস্তরতা প্রকাশে এ পদ্ধতিটি কি যথার্থ উপযোগী? এর সমাধান, অন্তত, এখনো থার্ড থিয়েটারে মেলে নি।

চার

চতুর্থ অধ্যায়ে ভারুচা কলকাতার কয়েকটি গ্রুপ থিয়েটার ও খড়দার লিভিং থিয়েটার নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। লিভিং থিয়েটার তাঁর আলোচনার পরিধির মধ্যে এসেছে সম্ভবত গ্রটোভস্কির সঙ্গে এ দলের যোগাযোগের সূত্র ধরে। লিভিং থিয়েটারের কোনো প্রযোজনা দেখি নি তাই এ ব্যাপারে কিছু বলা চলে না। বাকি দলগুলো নিয়ে ভারুচা যা বলেছেন তার সীমাবদ্ধতা নিয়ে হয়তো আলোচনা করা চলত কিন্তু আপাতত তার থেকে বিরত থাকা গেল।

এবার ভারুচার বইতে কিছু তথ্যগত বিপর্যয়ের দিকে নজর দেওয়া যাক। লেবেদেভকে শুধুমাত্র একজন 'অ্যাডভেঞ্চারার' (পৃ. ৭) বললে সম্পূর্ণ বলা হয় না। তাঁর সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তা লেখকের এ আলগা মন্তব্যের পরিপন্থী। জেমস লঙের জরিমানা দিয়েছিলেন যে ব্যক্তি তাঁর নাম কালীপ্রসাদ নয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ (পৃ. ১৭)। বাংলার যে কোনো প্রলেটারিয়ান থিয়েটার ধর্ষণ একটি আবশ্যিক উপাদান (পৃ. ১৮) এ কথা অত্যন্ত আপত্তিকর। 'নীলদর্পণ' বা 'অজেয় ভিয়েতনামে' ধর্ষণ দৃশ্য আছে বলে এমন সাধারণীকরণ খুব স্বস্থ চিন্তার পরিচয় দেয় না। যে বিখ্যাত অভিনেত্রী আত্মকথা লিখেছিলেন তাঁর নাম বিনোদিনী দাস নয়, বিনোদিনী দাসী (পৃ. ১৯)। গিরিশচন্দ্র স্টার মিনার্ভা প্রভৃতি মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না (পৃ. ২৪), যদিও এসব মঞ্চ প্রতিষ্ঠায় তাঁর সক্রিয় সহযোগ ও সমর্থন ছিল। ব্রেখট নিয়ে শিশির ভাদুড়ীর ভাবনা

কতটা কিংবদন্তী ও কতটা সত্য তা এখনো প্রতিষ্ঠিত নয় (পৃ. ৩৩)। দুর্ভিক্ষ নিয়ে বিজন ভট্টাচার্যের অভিজ্ঞতার প্রকাশের দলিলটিকে কি অপ্রকাশিত বলা যায় (পৃ. ৪৯)? এটি তো ১৯৭৮ সালেই বেরিয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকাতেই বিজন ভট্টাচার্য স্মরণ সংখ্যায়।

গিরিশচন্দ্র সামাজিক নাট্যরচনায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভারতীয় ইতিহাসের বীর ও মহাপুরুষদের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন (পৃ. ২৪), এ তথ্য ঠিক নয়। সিরাজদ্দৌল্লা মীরকাশিম অথবা অশোক লেখার পরও সামাজিক নাটক তাঁর মনোযোগ থেকে প্রস্থান করে নি। চৈতন্যলীলা প্রভৃতি তো অনেক আগের ব্যাপার।

এ ছাড়া ভারুচার বহু মন্তব্য যেন অত্যন্ত দ্রুত সিদ্ধান্তের ফসল। 'চাকভাঙা মধু'র পরবর্তী মনোজের নাটক নিয়ে তাঁর বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না। ব্রেখট প্রসঙ্গে বহুরূপীর গ্যালিলিও-র অনুপস্থিতি পীড়া দেয়। অবশ্য এসব অনুপপত্তি বইখানির মূল বক্তব্যকে বিচলিত করে না। সব মিলিয়ে ভারুচার এ বই বাংলার নাট্য আন্দোলনের একটি দরকারী দলিল হয়ে রইল।

কথার ছবি, ছবির নেপথ্য

পূর্ণেন্দু পত্রী

আলো-আঁধারের সেতু রবীন্দ্র-চিত্রকল্প সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় দেজ পাবলিশিং ১৯৮৩

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এখনকার কালে বেশ বিস্ময়কররূপে ঘটে চলেছে দুটি ঘটনা, পাশাপাশি, আগাগোড়া সমান্তরাল নয় যদিও। প্রাবন্ধিকেরা ক্রমাগতই হয়ে উঠছেন মনোযোগী, রবীন্দ্রনাথের নির্মাণ ও সৃষ্টির নানা ভিন্ন ভিন্ন স্তর-এর তন্ন তন্ন পর্যবেক্ষণে। আর কবি-সাহিত্যিকই যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশই দায়সারা সেলাম ঠুকে রবীন্দ্রনাথকে ক্রমশই সরিয়ে রাখছেন নিজেদের অধ্যয়নের-অনুভবের-অনুসন্ধিৎসার থেকে দূরে, যেন রবীন্দ্রনাথ এমন একটা পড়ে-পাওয়া পাথরের চাঁই, যাকে যেখানে খুশি রাখা চলে নিঃসঙ্কোচে। আবার এমনও নয় যে ঐ সব কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা রবীন্দ্র-বিরোধী পুরোপুরি, তাঁদের আলোচনা থেকে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা বা জানা যাচ্ছে অন্যভাবে, উল্টোদিকের কোনো আলোর প্রক্ষেপণে, স্যাডো প্লেতে ঘটে থাকে যেমন। এঁদের রবীন্দ্র-প্রত্যাখ্যানকে আমরা যে ওজন করার বাটখারার মতো ব্যবহার করতে পারি না, তার কারণ শুধু এই নয় যে এঁদের মন্তব্য-মতামতে ঠিকরে বেরোয় না এমন কোনো দীপ্ত ঝলক যা থেকে বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বীতস্পৃহ অথবা অনাগ্রহী হওয়ার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ; তার আরও একটা বড় কারণ এঁদের এলোমেলো, নিতান্তই হালকা, স্মৃতিকথামূলক, খবরের কাগজে ফিচারমার্কা চটুলতায় কখনোই ধরা পড়ে না রবীন্দ্রনাথকে অনাধুনিক কিংবা অপ্রয়োজনীয় ঘোষণার ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যবহার করছেন আধুনিকতার কি-জাতীয় সংজ্ঞা, তুলনা করছেন বড়ো-মাপের কোনো আধুনিকের সঙ্গে, এবং এখন তাঁরা কি জাতীয় আধুনিক-স্রষ্টার রচনাবলী পাঠে আগ্রহী, অভ্যস্ত এবং অবহিত।

মিলটন গ্রেট পোয়েট হওয়া সত্ত্বেও 'ডান ড্যামেজ টু দা ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ফ্রম হুইচ ইট হ্যাজ নট হোল্‌লি রি-কভার্ড', ১৯৩৬-এ এ-রকম নির্দয় সমালোচনার পরও এলিয়টকে বারো বছর অধ্যয়ন-অনুবীক্ষণ করে যেতে হয় ঐ মিলটনকে। এবং বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজের বিবেকবানতা প্রমাণের গরজেই দীর্ঘ বারো বছর পরে তিনি লজ্জিত হন না নিজের পূর্ব-মন্তব্যের বিরোধিতায়। একজন চরিত্রবান বুদ্ধিজীবীর দায়িত্বশীলতা এইভাবেই জুড়ে থাকে তাঁর সমগ্র জীবনের পরিধি, বিরতিহীন জিজ্ঞাসায়, মননের নিরন্তর ঘষা-মাজায়।

যে-দেশে সৃষ্টিশীল লেখকদের অধিকাংশই অধুনা প্রাবন্ধিক হওয়ার পরিশ্রমে বোধ-বুদ্ধি ঘামাতে নারাজ, সে-দেশে জাত-প্রাবন্ধিকের সংখ্যা স্বল্প হতে বাধ্য। জাত-প্রাবন্ধিক কথাটা তুলতে হল এই কারণে যে এদেশে প্রবন্ধের নামে অবিরত যা প্রকাশিত হয়ে যায়, তার সিংহভাগই গবেষণা নয়, সম্পাদনা। রবীন্দ্র-চর্চায় আগ্রহী প্রাবন্ধিকদেরও আমরা ভাগ করে নিতে পারি দু ভাবে, সংকলক আর গবেষক। বলা বাহুল্য গবেষক-চরিত্রের প্রাবন্ধিক বা সমালোচকদের জন্যেই আমাদের আন্তরিক উন্মুখতা, যেহেতু তাঁদের রবীন্দ্র-চর্চায় রবীন্দ্রনাথই নন শুধু, এদেশের সাহিত্যের পতন-অভ্যুদয়ের মূল্যায়নও হতে থাকে সেইসঙ্গে, ব্যাপ্ত বিশ্ব-পটভূমিকায়।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাবন্ধিক হিসেবে পূর্বকথিত সংখ্যালঘুদেরই একজন, অর্থাৎ গবেষক। রিটেলার নন, ইন্টারপ্রেটার। রবীন্দ্র-চর্চায় তাঁর নিমগ্নতা বহুদিনের, অসংখ্য প্রবন্ধে যার প্রমাণ। রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে সম্ভবত এটাই তাঁর প্রথম বই। দশটি প্রবন্ধের গুচ্ছে সাজানো এ-বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের নির্দিষ্টতা বইটির নামকরণেই স্পষ্ট। প্রাথমিকভাবে দশটি প্রবন্ধের মিল যেখানে, তাকে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে কেন্দ্রাভিগ, যেহেতু সব কটি প্রবন্ধই, যে-যার নিজস্ব সংকোচন-বিবর্ধন-এর স্পন্দনশীলতা সত্ত্বেও একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্র-বিন্দুর অভিমুখী, এবং সেখানে পৌছনোতেই তাদের সার্থকতা। সে কেন্দ্রবিন্দুর নাম, রবীন্দ্র-চিত্রকল্প।

উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় যদিও দশটি প্রবন্ধের একই, তবুও তাদের মধ্যে রয়েছে চরিত্র বিভাগ। কবিতার চিত্রকল্প নিয়ে এখানে প্রবন্ধের সংখ্যা তিন। গানের চিত্রকল্প নিয়ে প্রবন্ধের সংখ্যা পাঁচ। গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের চিত্রকল্প নিয়ে প্রবন্ধ একটাই। আর বইয়ের শেষ প্রবন্ধটিতে মিলেমিশে একাকার তাঁর গান-কবিতা-নাটক-ছবি।

বিদেশী ভাষায়, আমরা জানি, মহৎ কবিদের চিত্রকল্প নিয়ে গবেষণায় কী অখণ্ড ধারাবাহিকতা। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি বই এইই বোধ হয় প্রথম। সরোজবাবুকে ধন্যবাদ জানাতে হয় সানন্দে, কারণ তিনি হাত লাগিয়েছেন এমন একটি কাজে, যা ছিল বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত। অল্প কিছুদিন আগে, অরুণ মিত্রের অনুবাদে আমরা পড়েছি পল ভালেরির 'কাব্যতত্ত্বের শিক্ষাদান' নামের একটা মূল্যবান প্রবন্ধ। সেখানে তাঁর খেদ "আমাদের কালে সাহিত্যের ইতিহাস প্রভূত বিকাশলাভ করেছে এবং তা শেখাবার জন্যে অনেক অধ্যাপক-পদের সৃষ্টি হয়েছে। তার বিপরীতে এটাও

আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করার মতো যে, যে-মননক্রিয়ার রূপ স্বজনশীল রচনার জন্ম দেয় তার পর্যালোচনা খুব কমই করা হয়, কিংবা শুধু আপতিকভাবে করা হয় এবং তাতে নির্দিষ্টতার যথেষ্ট অভাব থাকে। এও কম লক্ষণীয় নয় যে, পঠন-বস্তুর সমালোচনায় এবং তার ভাষাভিত্তিক ব্যাখ্যায় যে কড়াকড়ির প্রয়োজন হয়, মনন-বস্তুর উৎপাদন ও উপভোগের লক্ষণ বিশ্লেষণে তার সাক্ষাৎ সচরাচর পাওয়া যায় না।"

পরে আরো নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন সমালোচকের দায়।

"ভাষায় প্রকৃত সাহিত্যিক ক্রিয়া-সংক্রান্ত গবেষণাকে সুনির্দিষ্ট করা এবং পুষ্ট করা, বচনের শক্তি ও অনুপ্রবেশ-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে প্রকাশন ও ব্যঞ্জনার ব্যাপারে যে-সব আবিষ্কার হয়েছে সেগুলোকে পরীক্ষা করা এবং কল্পনার ভাষা ও নিত্য ব্যবহারের ভাষার মধ্যে ভালোভাবে স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের জন্যে মাঝে মাঝে যে-সব বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে সেগুলোকে পরীক্ষা করা, ইত্যাদি।"

'কলেজ দ্য ফ্রাঁস'-এর অধ্যাপক মনোনীত হয়ে ভালেরি এ ভাষণ দিয়েছিলেন ১৯৩৬-এ। সে-ঘটনার পর প্রায় পঞ্চাশ বছর পার হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছেও আমরা দেখছি আমাদের দেশে সাহিত্যের ভাষা, কবিতার বেলায় যা প্রধানত চিত্রকল্প, সাহিত্যের মনন-ক্রিয়া, সাহিত্যের মেকানিজম সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহের কি অসম্ভব দৈন্য। আদৌ অসঙ্গত নয় এই অনুমান যে, এই দৈন্যের সুযোগে এদেশে প্রায় বুক-ফুলিয়েই গজিয়ে ওঠার সাহস পেয়ে গেছে সেই ধরনের সাহিত্য, যা সাহিত্যের যথার্থ স্বজনশীল স্বাদ থেকে পাঠকদের শুধু বঞ্চিতই করছে না, পণ্য-ধর্মী প্রচার মাধ্যমের তূরী-ভেরীর আস্ফালনে ক্রমশই বিস্তৃত হয়ে চলেছে বিকৃত-সাহিত্যের এমন এক স্বশসিত মুক্তাঞ্চল, যেখানে পাঠক অন্তঃসারশূন্য আপাত-চমকের শিকার হতে বাধ্য। এই হল সেই সময়, যখন আমাদের প্রয়োজন সমালোচকের প্রজ্ঞাই নয় শুধু, সমালোচকের উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত শ্রম। আলোচ্য বইয়ে সরোজবাবুর শ্রমের ছাপ স্বতপ্রকাশিত। আর সে শ্রমের উদ্দেশ্য একটাই, চিত্রকল্পের আলোয়, আবার চিত্রকল্পকের শরীরে নতুন আলো ফেলে, কবি-সত্তার দ্বান্দ্বিক সামগ্রিকতার উন্মোচন, এমন-কি কবি-জীবনকেও নতুন করে আবিষ্কার। লেখকের নিজের ভাষায়—"কবির ব্যবহৃত ইমেজ, এপিথেট—সংক্ষেপে কাব্যের বহিরঙ্গ বিচারের মাধ্যমেও কবির মানস-ইতিহাস-বিরচন সম্ভবপর। যেহেতু তা যুক্তি ও তথ্যের উপর নির্ভরশীল, এবং তা কবিজীবনীর অনুমোদন প্রাপ্ত, তাই এই বিচারের মধ্যেই কবির অন্তরঙ্গ পরিচয় অপেক্ষা করে আছে।...এবং তা সম্ভব হলে আমরা কবির কাব্যের

নতুন আলোকের সন্ধান তো পাবই, উপরন্তু কবির জীবনের উপরেও নব আলোকসম্পাত করতে পারব। সেই পথেই কবির কবিজীবনী রচিত হবে—কবির আবেদনও সার্থক হবে : কবিরে খুঁজোনা কবির জীবনচরিতে, শব্দচিত্রে, রূপকে, উপমায়—কাব্যের শরীরিনী লীলার সর্বত্রই কবির জীবনই ছায়া ফেলেছে। সে-পথেই আমরা কবিজীবনীর সন্ধান করবো।"

যে-বইয়ের বিষয় চিত্রকল্প; সেখানে কাকে বলে চিত্রকল্প, অথবা চিত্রকল্পের সাম্রাজ্য কতদূর পর্যন্ত ছড়ানো, তার একটা সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ত তিনি পেশ করেছেন 'কথারম্ভ'-য়। ছড়ানো উত্তর দিতে দিতে, সেগুলোকে গুছিয়েছেন এই ভাবে—

"কবিতার কাজ বলা নয়, হওয়া। কবিতা হয়ে ওঠে তার অন্তর্গত ও প্রেরণাগত সমগ্র সজীবতার টানে। কবিতার চিত্রকল্প—যথাযথতার অভিপ্রায়ী নয়—আনুরূপ্য সেখানে মোটেই বড় কথা নয়। বরঞ্চ সে বিপরীতকে বাঁধতে চায় সম্বন্ধে। তখনই সে অথবা তারা সমগ্র সজীবতার অভিব্যক্তি। অভিজ্ঞতা বা স্মৃতি মাত্র তথ্য। যখন চিত্রকল্পের ভিতর দিয়ে কবির অভিজ্ঞতা প্রতিমা হয়ে ওঠে তখনই তারা আর কেবল তথ্য নয়—সত্য।"

এ বইয়ের দশটি প্রবন্ধে সত্যিই যে কবির ভিন্ন কোনো জীবনচরিত গড়ে উঠেছে তা হয়তো নয়, কিন্তু ফসলের গঠন ও ফলনের বৈচিত্র্য থেকে কৃষকের শ্রমের ও সদিচ্ছার মানসিকতা পরিমাপের মতো, কবির মানস চরিত্রের অনেক ছোট গলি বা বড় রাজপথের খোঁজ-খবর পেয়ে যাই যেন, তাঁর এক লেখা থেকে অন্য লেখায়, এক বই থেকে অন্য বইয়ে উত্তরণের-অভিযানের-বিবর্তনের ক্রিয়া-পদ্ধতির নজির মারফত। সরোজবাবুর এ বই থেকে পাওয়া তথ্যের-তত্ত্বের উপর নির্ভর করে কবির ভিন্ন-জীবনচরিত অর্থাৎ তাঁর মনন-চরিতের একটা খসড়া গড়তে চান যদি কেউ, সেটা হতে পারে এই রকম—

১। 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত তাঁর কাব্য-প্রয়াসে খঞ্জতা, কারণ কল্পনার অপ্রস্তুতি।

২। 'সোনার তরী' এবং 'ছিন্নপত্র'-র কাল থেকেই অভিজ্ঞতার আত্মী-করণের সূত্রপাত। 'সোনার তরী'-র প্রকৃতি-চেতনায় সংক্রামিত হয়নি নগর-চেতনার নেতি।

৩। 'সোনার তরী' আর 'চিত্রা' পর্বে কবির মধ্যে দুটো ভিন্ন ধরনের কল্পনা-পদ্ধতি। এক ধরনের কবিতায় কল্পনা মূর্তি পাচ্ছে প্রত্যক্ষ-বাস্তবার উষ্ণ স্পর্শে। অন্য ধরনের কবিতা ধর্না দিচ্ছে কাব্য-স্মৃতির দরজায়।

৪। 'খেয়া'-'উৎসর্গ' অধ্যায়ে নতুন বাঁক। বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানব-চিত্তের ঘাত-প্রতিঘাত। জীবনের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার উপলব্ধি।

৫। 'কল্পনা'য় কবিকে অধিকার করেছিল দুঃসময়-অসময়ের সংকট-চেতনা।

৬। 'ক্ষণিকা'-র কবিতায় কবির মুক্তির নিশ্বাস, জীবন ও প্রকৃতির খোলা পালে হাওয়া লাগিয়ে।

৭। 'বলাকা'-র কোথাও কোথাও 'ক্ষণিকা'-র ছায়া পড়লেও, 'বলাকা'-তেই প্রথম বিস্তৃত জীবন-স্মৃতি সঞ্জাত আবেগের সংহতি।

৮। 'বলাকা' 'পূরবী'-র কালেই উপমা-রূপকের হাত ছেড়ে তাঁর চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে জীবনের ভাবনাগত জটিল গভীরের ধ্বনি।

৯। 'পূরবী'-তেই কবির নতুন ও শেষ অধ্যায়ের সূচনা। 'কেননা, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রথানুগত নয় এমন সব আপাত গদ্যস্বভাব বিষয় কাব্যের বিষয়ীভূত হচ্ছে এখানে। 'পূরবী'-তে আকাশের আদিগন্ত জুড়ে শূন্যতার বোধ। "সমগ্র 'চিত্রা' বা 'কল্পনা' বা 'বলাকা' কাব্য গ্রন্থে যতবার 'শূন্য' শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে 'পূরবী'-কাব্যের প্রথম এক শত পৃষ্ঠার মধ্যে তার চেয়ে অনেক বেশিবার এর আবির্ভাব।" অসম্পূর্ণ শূন্যতার বোধনেই 'পূরবী'-র পূর্ণতা। বিশিষ্ট মৃত্যু-চেতনাই এখানে চিত্রকল্পের নিয়ন্ত্রক। 'পূরবী' থেকেই প্রহর শেষ হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে গেছে উচ্চ থেকে উচ্চতম সুরে পরবর্তী 'পরিশেষ', 'আকাশ-প্রদীপ', 'সেঁজুতি', 'প্রান্তিক'-এ। "'পূরবীর' কাল বিষণ্ণ বার্ধক্যের কাল।"

১০। 'পরিশেষ'-এর একদিকে কবির নিজস্ব নিভৃত মৃত্যুচিন্তা, অন্য দিকে তারই সঙ্গে ওতপ্রোত নিজস্ব ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে বিশ্ব-ইতিহাসের সাদৃশ্যের সম্বন্ধ।

১১। 'সোনার তরী'-'চিত্রা'-র যুগে তাঁর কবিতায় বেশি প্রাধান্য লাল-সোনালী রঙের। 'পূরবী'-তে সাদা ও নীলের। "'পরিশেষ'-এর স্থায়ী রঙ কালো।"

১২। 'বলাকা' 'পূরবী'-তে কবির ঝোঁক বড় কবিতার দিকে এবং তা সূচনাপর্বের বড় কবিতার চেয়ে সংহত।

১৩। 'লিপিকা' ও 'পুনশ্চ'-য় কবির দুর্ভাবনার স্পর্শ মেলে না আর।

১৪। "রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পচারিতা 'পুনশ্চ' ও 'শেষসপ্তক'-এ স্তিমিত।"

১৫। "'জন্মদিন', 'আরোগ্য', 'শেষলেখা'য় কবির নিরলংকার রিক্ততাই বাঙ্ময়।" উপরের অনুসন্ধানী সিদ্ধান্তগুলো এ-বইয়ের শুধুমাত্র প্রথম প্রবন্ধটি থেকেই খুঁটে খুঁটে জড়ো করা, যার নাম—'রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প ও প্রতীক'।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি কবির দীর্ঘ কবিতার চিত্রকল্প বিষয়ে। আলোচনার জন্যে তিনি প্রধানত বেছে নিয়েছেন 'দেবতার গ্রাস'। খানিকটা 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'। পরে 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য। দীর্ঘ কবিতার আলোচনায় কেন তিনি অতটা পিছিয়ে থাকলেন, কেন এগিয়ে এলেন না এমন কবিতার দিকে যা পাঠকের সর্বাধুনিক অগ্রসর মানসিকতারও অনেক ঘনিষ্ঠ কাছাকাছির, প্রবন্ধটা শেষ করার পর সে প্রশ্ন এড়ানো যায় না কিছুতেই। তাঁর শেষ পর্বের দীর্ঘ কবিতার সঙ্গে মধ্য পর্বের দীর্ঘ কবিতার চরিত্রগত তফাত অনেকখানিই। মধ্য পর্বের দীর্ঘ কবিতা কাহিনীপ্রধান, উত্থান-পতনের নাটকীয় উপাদানে ভরপুর। আর সমস্ত নাটকীয়তা সত্ত্বেও তারা আটকে থাকে বিশেষ স্থান-কালের ঘটনায়। ঘটনার সুনির্দিষ্ট চৌহদ্দির বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না তারা। বিমূর্ততার সূত্রে হয়ে উঠতে পারে না সব-সময়ের প্রতিনিধিস্থানীয়, যেমন পারে তাঁর 'বাঁশিওয়ালা' কিংবা 'শিশুতীর্থে'রা। বিস্ময়বিমূঢ়তার দিকে চলে, যখন দেখি 'দুই বিঘা জমি'-র মতো কবিতার, যাকে উপেক্ষা করলে রবীন্দ্রনাথের ক্ষয় হয় না এতটুকুও, চিত্রকল্পের পরিণতির ফসল মাপবার জন্যে তিনি সাজাচ্ছেন বাইশ চব্বিশটা পঙক্তি, অথচ 'শিশুতীর্থ'-র উল্লেখ শুধুমাত্র দু-বার, তাও অনেকটা নেম ড্রপিং-এর ভঙ্গিতে। ফলে এ প্রবন্ধটা যেন অনেকটাই ছাত্র-পাঠ্য অ্যাকাডেমিক মেড-ইজি-র মতো। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের পক্ষে যতটুকু প্রয়োজনীয় ততটুকুই বলা যেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত যশস্বী অধ্যাপকেরা আধুনিক সাহিত্যের রূপরেখা নির্মাণের সময় যেভাবে এড়িয়ে যান অগ্রগামী-আধুনিকতাকে, এ দুটি প্রবন্ধ যেন সেই ছাঁচেরই রকমফের। ১৯-এ লেখা চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যের

> তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
> যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
> যোগনিদ্রা-অন্ধকার

পড়ে হয়তো কোনো কোনো পাঠক নিজের আকণ্ঠ পরিতৃপ্তি দিয়ে মেপেও ফেলতে পারেন রবীন্দ্র-প্রতিভার আর সেইসঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্রকল্পের অপরিসীম উচ্চতা ও ব্যাপ্তি কিন্তু ঐ একই কবিই যে ১৯-এ নিজেকে আমূল বদলে, বাক্যের প্রতিমা ও শ্রাব্যের প্রতিমার এক অসামান্য যোগফল ঘটিয়ে লিখতে পারেন।

> এক ভীষণ কোলাহলের তলে তলে একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত
> যেন অগ্নিগিরি নিঃসৃত গদগদকলমুখর পঙ্কস্রোত ;
> তাতে একত্রে মিলেছে পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি
> অবজ্ঞার কলহাস্য।

সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে—
মশালের আলোয় ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো।

এটা জানতে পারলে অল্পে-পরিতৃপ্ত ঐ পাঠকের পক্ষে উপকারী হয়ে উঠত এই বোধ যে, রবীন্দ্রনাথের মননের জীবনচরিত হাল-আমলের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীদের মতো একটা দেড়টা দশকেই যা পাকার পেকে মাটিতে খসে পড়ার নয়, বর্ষে বর্ষে ক্রমাগত জিজ্ঞাসায়, অভিজ্ঞতার ক্রমার্জিত সম্পদে ক্রমবর্ধমান। আর সত্যি সত্যি এটাই তো ছিল সরোজবাবুর অন্বিষ্ট ও অভীষ্ট।

সরোজবাবু যদি তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধে, বিশেষ করে গান-সম্পর্কিত যেগুলো, আমাদের ভাবনাচিন্তায় নতুন কোনো বোধের মান না জোগাতেন, তাহলে হয়তো তাঁর ঐ তুটো প্রবন্ধ সম্পর্কে আমাদের প্রত্যাশা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠত না জিরাফের লম্বা গলায়। আর সেই কারণেই ঐ তুটো প্রবন্ধ পড়ার পর এটা মনে না হয়ে পারে না যে, একটা জরুরি আলোচ্য বিষয়কে তিনি এড়িয়ে গেলেন দায়হীনের মতো। রবীন্দ্রনাথের অন্ত-পর্বের গদ্য কবিতার দীর্ঘ অথবা ক্ষুদ্র মিলিয়ে, নিবিড় বিশ্লেষণ ছাড়া আধুনিক-রবীন্দ্রনাথের পুরুষার্থ নির্ণয় ঠিক যতখানি অসম্ভব, আধুনিক বাংলা-কবিতার প্রতিষ্ঠার বেদী গড়ে তোলাটাও ঠিক ততখানি অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য।

সরোজবাবু তাঁর বইয়ের শেষ প্রবন্ধ 'সান্ধ্যরবিচ্ছায়া'-র এক জায়গায় লিখেছেন "যে-ভাষা এক হিসাবে তাঁর নিজেরই সৃষ্টি, সেই ভাষায় সেই প্রকরণে যে বিংশ-শতাব্দীর জটিল সাবালকত্বকে মূর্ত করা যাচ্ছে না, এ বিষয়ে ভুল হোক সত্যি হোক একটা ধারণা তাঁর জন্মেছিল। সেই সীমাবদ্ধতাকে অনুভব করেই তাঁর কাব্যের কর্মের ভাঁড়াচোরা শুরু হয়েছে।"

এই মন্তব্যের একটু পরেই তিনি উদ্ধৃত করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি "বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে।"

এ সংশয়েরও রয়েছে এক বিশ্ব প্রেক্ষাপট। একলা রবীন্দ্রনাথ নন, পৃথিবীর সেই সব কবি, যাঁরা নিজের প্রয়োজনে বিশ্বকে অথবা বিশ্বের প্রয়োজনে নিজেকে প্রথমে চান বুঝতে এবং পরে ভাষার মাধ্যমে সেই অনুভব-উপলব্ধির শরীরে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে, তাঁরা সকলেই জীবনের কোনো না কোনো পর্বে ভাষার সমস্যায় আক্রান্ত। ১৯০৮-এ 'নিউ পোয়েম' বা 'নতুন কবিতা' শেষ করার পর প্রায় একটা গোটা যুগ রিলকের কলম রক্তহীন। পরের বই

'ডুয়িনো এলিজি'-র প্রথম দুটো লেখা ১৯১২-য়। তৃতীয়টা ১৯১২-১৩-য়। চতুর্থটা ১৯১৫-য়। তার পর মহাযুদ্ধ। বাকি এলিজিগুলো ১৯২২-এ। যে ডুয়িনো দুর্গে এলিজি-র শুরু, মহাযুদ্ধের পর সেখানে ফিরে যেতে পারেন নি আর। সে দুর্গ তখন মহাযুদ্ধের নির্দয় থাঁড়ার ঘায়ে ভেঙে-চুরে ধ্বংসাবশেষ। রিলকে তখন প্রত্যক্ষ করছিলেন অভিজাত ও মানবিক এক বিশ্বেরও ধ্বংসাবশেষ মহাযুদ্ধ যাকে এক নিমেষে ঠেলে দিয়েছে অতীতকালের কোঠায়। কবিতার বদলে টুকরো টুকরো চিঠিতে কেবল বিলাপ, মহাবিশ্ব থেকে নির্বাসিতের বিলাপ যেন সে-সব।

"রিলকে যাতে বিশেষভাবে কষ্ট পেয়েছিলেন, যা তাঁর লেখাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল, তা ১৯২০-র একটা চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি—তা বহির্বিশ্ব থেকে নির্বাসন, তিনি যাকে বলতেন 'খোলা জগৎ'—অর্থাৎ সেই অবাধ ও নির্দোষ জগৎ, সব মানুষ ও প্রাণীর যা স্বাধিকার তার সাময়িক অবলুপ্তি। এ কি সম্ভব যে তাঁর গতিবিধির আজ স্বাধীনতা নেই? এ কি সম্ভব যে তাঁর প্রিয়তম দেশ দুটি আজ 'শত্রুপক্ষ'? 'যুদ্ধের বছরগুলি ধরে আমি ছিলাম···ম্যুনিখে অপেক্ষমান, সব সময় ভাবছি যে এর শেষ হ'তেই হবে, কিন্তু কিছুই বুঝিনি, কিছুই বুঝিনি! কিছু না বোঝা: তা ই ছিলো ঐ বছর-গুলোতে আমার অনন্ত কাজ—নিশ্চিত জেনো, সহজ কাজ নয়। আমার পক্ষে একমাত্র সম্ভবপর ছিলো খোলা জগৎ, অন্য কোনো জগৎ আমি জানতাম না; কত না ঋণ আমার রাশিয়ার কাছে...কত না ঋণ প্যারিসের কাছে···! আর অন্য সব দেশের কাছেও! কিছু ফিরিয়ে নিতে আমি পারি না, পারতাম না—কোনো দিকে, মুহূর্তের জন্যও, আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না ঘৃণা বা প্রত্যাখ্যান'।" (বুদ্ধদেব বসু)

নিজেকে 'চিত্রকল্পের শিকারী' বলেন যিনি, তিনি ঐ যুদ্ধ-ক্ষত বিশ্বে কোথাও আর খুঁজে পান না আলোকিত হওয়ার চিত্র, আলোড়নকে চিত্রায়িত করার যোগ্য ভাষা। যখন পেলেন তখন Witolo Hulewicz-কে চিঠিতে জানাচ্ছেন তাঁর 'ডুয়িনো এলিজি' আর 'অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেটগুচ্ছ' হল 'an attempt to discover what flower might grow amid the ruins of language.'

হ্যাঁ, ভাষারও ধ্বংস। কিন্তু শুধু কি ভাষারই ধ্বংস? ধ্বংস বুঝি বা ভাষা-ভাবনারও। কাফকা তাঁর বন্ধুকে লিখছেন,

"আমি যা লিখি তার থেকে আলাদা হয়ে যায় আমি যা বলি, আমি যা

বলি তার থেকে আলাদা আমি যা ভাবি, আমি যা ভাবি তা আমার যা-ভাবা-উচিত-এর থেকে আলাদা, আর এইভাবে তারা ক্রমাগত এগিয়ে যায় গভীরতর অন্ধকারের দিকে।"

ইয়েটস তাঁর 'দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী অ্যাণ্ড আফটার' কবিতায় জানালেন

যদিও ফিরে আসবে না আর মহান সব গীত
তবুও রয়েছে যেটুকু তাতেই আমাদের আহ্লাদ;
তীরে তীরে নুড়িদের ঘর্ঘর
পিছু হটে যাওয়া ঢেউয়ের তলায় তলায়।

ইয়েটস, এলিয়ট, পাউণ্ড, রিলকে সকলের কাছেই অতীত তখন রেখে গেছে অল্প কিছু নুড়ি-পাথর, অনন্তের অথবা চিরকালের প্রতীক হতে পারে যারা। সেইটুকুই যেন মহাসম্বল সেটুকুও চলে গেলে সবটাই হতাশা, অবসাদ আর দুকূল-ভাসানো অন্ধকার।

'ভাষার ধ্বংসাবশেষ' থেকে চিরন্তন কিছু নুড়ি-পাথর কুড়িয়ে রিলকে যখন অবশেষে আবার পারলেন ডুয়িনো এলিজি শেষ করতে, তখন আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছে তাঁর ভাষাই নয় শুধু, শুধু চিত্রকল্প নয়, কবিতার পংক্তিরও গড়ন। "এলিজিগুচ্ছের দ্রুত-ধাবমান বিসর্পিত অমিত্রাক্ষর, যাতে আবেগের চাপে মাঝে মাঝে কথাগুলো যেন কেটে যাচ্ছে, আর অনির্বচনীয়কে ভাষায় ধরার চেষ্টায় দীর্ঘায়ত বাক্যগুলি যেন রুদ্ধশ্বাস;... ভাস্কর্যোচিত কাঠিন্য ও ঘনত্ব—এ-ই ছিলো 'নতুন কবিতা'র রীতিলক্ষণ; কিন্তু 'ডুয়িনো এলিজি'তে তার চিহ্ন আর দেখি না, ভাষা এখানে বেগান্বিত ও প্রবহমাণ, গঠন শিল্পের নির্ভর এখানে চিত্রকল্প নয়—বিতর্ক, বাদানুবাদ।" (বুদ্ধদেব বসু)

আসলে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কবিতাকে যেন বাধ্যতই হতে হল আরো বহু কিছুর কাছে দায়বদ্ধ। ধ্বংসে খান্ খান্ হবে দেখে বাস্তবতার সম্পর্কে আগের চেয়ে আরো বেশি মমতাময় হয়ে উঠলেন কবিরা। আবার অতিরিক্ত-মমতাই তাঁদের বানিয়ে দিল বাস্তবতার কঠিনতম সমালোচক। কবিতা হয়ে উঠছে 'growing traffic between poetry and prose। কবিতা থেকে সরে যাচ্ছে বর্ণনার ধারাবাহিকতা। সমাজের বিচ্ছিন্নতা, সময়ের অসঙ্গতিময় অগ্রগতি, ব্যক্তির খণ্ড চৈতন্যকে মনে রেখেই যেন অনেকটা। অথবা মহাযুদ্ধ যেভাবে একটা গোটা বাড়ির গা থেকে খুবলে নেয় এখান-ওখানের অংশ-বিশেষ, এমনকি একটা পুরো মানুষের বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কবিতা অনেকটা

সেইভাবেই হয়ে উঠছে—'like heavily cut film, a selection of briefly held frames that threaten not to be sequential.'

আমাদের দেশেও একটু পরে ঐ একই আতুরতা, ভাষা নিয়ে। তিরিশের দশকে আমাদের দেশের কবি গদ্য ও পদ্যের মধ্যে স্বচ্ছন্দ যাতায়াতেই সন্তুষ্ট হতে পারেন না আর, চান স্থায়ী সহাবস্থান।

"এবং যতদিন না গদ্য ও পদ্যের পাশাপাশি থাকবার ব্যবস্থা বাংলা কবিতায় হচ্ছে, ততদিন সামাজিক জীবনের অলিগলিতে বাংলা কবিতার যাতায়াত রুদ্ধ।" বিষ্ণু দে আবার 'এলিঅট প্রসঙ্গে' নামের গোড়াতেও বিষ্ণু দে-কে তুলতে দেখি ঐ একই প্রশ্নময় প্রসঙ্গ।

"ধনতান্ত্রিক শিক্ষা প্রসারে নাট্যশালা ও সিনেমার অজ্ঞরুচি সম্পাদক সহ-সম্পাদক তথা বিজ্ঞাপনদাতাদের হাতে ভাষার অপব্যবহার প্রভৃতি কারণে ভাষা হয়েছে বাজারের ঘষা পয়সা, কথাগুলো হয় যেন শেওলা ধরা, ধরলে পিছলে পড়ে যায়। কাব্যের আবেদনে তাই আজ কবিকে ও পাঠককে ভাবিত করার প্রয়োজন। এলিঅট-এর মতো সত্য কবিকে তাই বিশেষজ্ঞ কবি হতে হয়েছে। দোষটা পণ্য সভ্যতার, অমানুষিকতার, সংস্কৃতির যা বিরাট শত্রু।"

ভাষা-সমস্যা সমাধানে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো শক্ত শিরদাঁড়া জোগাতেই তিনি শরণাপন্ন হন ফরাসী আরার্গঁ-র। সেই সুবাদে আরার্গঁ-র মুখ থেকে আমাদের শোনা হয়ে যায়—"কাব্যের ইতিহাস তার টেকনিকের ইতিহাস।" শোনা হয়ে যায়—

"তাই বলি যে ভাষার গভীর চর্চা ছাড়া, প্রতিপদে ভাষার পুনর্নির্মাণ ছাড়া কাব্য অসম্ভব। তার জন্যে ভাষার নির্ধারিত সীমা, ব্যাকরণের নিয়ম, বাক্যের কানুন বারবার ভাঙতে হয়। কবিদের পক্ষে এইই তো মুক্তির পথে দীর্ঘ উত্তরণ।"

বাংলার ও বিশ্বের সাহিত্যে যখন ঘটে চলেছে এই সব ওলট-পালট, তখনো রবীন্দ্রনাথ যেহেতু অত্যন্ত সজাগরূপেই জীবিত সুতরাং এই ব্যস্ত পরিপ্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথের অন্ত-পর্বের গদ্য-কবিতার দিকে তাকিয়ে দেখার দরকার। আর সেভাবে দেখলে আমরা হয়তো বুঝতে পারব কেন তিনি চেয়েছিলেন বিষ্ণু দে-র অনূদিত এলিঅটের 'জার্নি টু মেজাই' থেকে 'পদ্যের আবেশটাকে ঠেলা দিয়ে কাটিয়ে' দিতে, কেন নিজের প্রথমবারের অনুবাদকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে দ্বিতীয় অনুবাদ করেন আবার, প্রথমবারের 'শীত-রুক্ষ'কে

দ্বিতীয়বারে করেন 'কনকনে ঠাণ্ডা', কিংবা 'পরিতৃপ্তি পেলাম'-কে বদলে 'ব্যাপারটা তৃপ্তি পাবার মতো বটে', হয়তো বুঝতে পারব কেন ইংরেজি 'শিশুতীর্থ'-কে সম্পূর্ণ করতে তাঁর লেগে যায় পাঁচটা খসড়া। বুঝতে পারব কেন তাঁর কোনো কোনো কবিতার পংক্তি হয়ে যায় গদ্যের মতো দীর্ঘ, আর রিলকে প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন বুদ্ধদেব সেইভাবেই তাঁর কবিতায় মাঝে মাঝে কথা যেন ফেটে যাচ্ছে আবেগের চাপে, তিনি কবিতায় টেনে আনছেন রুক্ষ কর্কশ, কখনো বা বীভৎস রসের চিত্রকল্পই নয় শুধু, টেনে আনছেন গদ্যের বিতর্ক। আবার কোনো কোনো কবিতা যেমন মূলত প্রবন্ধ, তেমনি কেউ কেউ প্রধানত গল্প। কতটা সইতে পারে কবিতার শরীর, যেন তারই নিস্তারহীন পরীক্ষা। আর যত এগিয়ে চলেছিল তাঁর অন্তপর্বের কবিতা তাঁর জীবনের অন্তপর্বের দিকে, ততই তা হয়ে উঠছিল—'a selection of briefly held frames that threaten not to be sequential—'

দ্বিতীয় সংস্করণে, আমরা আশা করব, সরোজবাবু নিশ্চয়ই পূর্ব-কথিত প্রবন্ধ দুটিকে সম্পূর্ণ করবেন রবীন্দ্রনাথের শেষতম কবিতার আলো-আঁধারকে ছুঁয়ে, ব্যাপ্ত পটভূমিকায়। সেইসঙ্গে এও আশা করব, বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে ছেপে-বেরনো এ-বইয়ের স্বতন্ত্র প্রবন্ধগুলোর মধ্যে একটা বিশেষ বক্তব্যের বা দৃষ্টিভঙ্গির ঐকতান গড়ে তোলার তাগিদেই তিনি পরিমার্জনা বা পরিশুদ্ধির প্রতি মনোযোগ দেবেন নিজের স্বার্থে, নিজের সিদ্ধির সমৃদ্ধকরণে!

শেষ কথাটা বলতে হল সরোজবাবুর প্রতি শ্রদ্ধায় এবং একই সঙ্গে তাঁর অমনোযোগিতার প্রতি ক্ষমাহীন হয়ে উঠতে পারার মতো ভালোবাসায়। এ-আলোচনার সূচনায় যাঁকে সম্মানিত করেছি পরিশ্রমী হিসেবে, এখন তাঁকে অমনোযোগিতার দায়ে সমালোচনা-নামক আদালতে সোপর্দ করতে চাইলে বিস্মিত হবেন অনেকেই। যেমন আমি নিজেও। কেননা প্রথম পাঠে আমারও মুগ্ধতা ছিল নিশ্ছিদ্র। কিন্তু দ্বিতীয়বারের পাঠেই চোখে বা মনে ঠোক্কর মারে কিছু বিসদৃশ্যতা। এমনকি কোনো সচেতন পাঠক যদি তাঁর অতি-সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটুকু আগে পড়ে নিয়ে পরে বইয়ের ভিতরে ঢোকেন, বহুতল প্রাসাদ-ভ্রমণের ভঙ্গিতে ওঠা-নামা করেন দশটি প্রবন্ধের অভ্যন্তরে, চূড়ান্ত প্রদক্ষিণের পর, আমার ধারণা, তাঁর মনে হতে পারে লেখক যা বলেছেন ভূমিকায়, তার বিপরীতকে প্রমাণ করারই প্রাণপণ প্রয়াস যেন বাকি গোটা বইটিতে। তিনি ভূমিকায় বলেছেন—

"হার্বার্ট রীড 'ফোর্স' এবং 'ওরিজিন্যালিটি' দাবি করেছিলেন মেটাফোরের

কাছে—মেটাফোর অর্থেও আমরা এখানে চিত্রকল্পকেই বুঝতে চাই। রবীন্দ্র-চিত্রকল্পে 'ফোর্স' ও 'ওরিজিন্যালিটি'-র অভাব আছে এমন নয়, কিন্তু এজন্য সে চিত্রকল্প বিখ্যাত নয়। রবীন্দ্র-চিত্রকল্পের প্রধান গুণ ন্যূনতম আন্দোলন ঘটিয়ে গোটা কবিতার রূপান্তর বা ট্রান্সফরমেশন। সুতরাং উপমান-বিস্ময় সৃষ্টি করা এ কবিতার স্বভাব নয়।"

প্রমাণ হিসেবে—

" 'বলাকা' কবিতাটির প্রথম স্তবকে সে উপমান-বিস্ময় নিশ্চয় আছে—কিন্তু দেখতে দেখতে ঐ কবিতাতেই আমরা পৌঁছে যাই কবিতার বিস্ময়ে যখন 'নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে/চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে'। এটাই রবীন্দ্র-স্বভাবী চিত্রকল্প। একটি বা দুটি মৌমাছি বসন্তের বিপুল বনস্থলীর বার্তা বহে আনে—এখানে তেমনি একটি বা দুটি চিত্রকল্পের কারণে আমরা সমগ্র কবিতাটিকে বলতে পারি 'সহসা বেয়ে নিয়েছে তরী অপূর্বেরই কূলে'।"

যদি 'ফোর্স' এবং 'ওরিজিন্যালিটি'-র চেয়ে, উপমান-বিস্ময় উদ্ভাবনের ক্রমান্বয় দক্ষতার চেয়ে, শুধু একটি-দুটি চিত্রকল্পের নৈপুণ্যময় ব্যবহারে ন্যূনতম আন্দোলন ঘটিয়ে তিনি রূপান্তর ঘটাতে পারেন কবিতার, কবিতাকে পৌঁছে দিতে পারেন অপূর্বতার মূলে, তাহলে সে-জাতীয় কবিতাবলীর আলোচনাকে এ বইয়ে ঠাঁই না দিয়ে তিনি কেন বেছে নেন এমন-সব কবিতা যেখানে চিত্রকল্পকে গুনতে গেলে লেগে যায় দু হাতের সব কটা আঙুল, কখনো কখনো তার অনেকগুলো গাঁট। তাহলে কোন্ সত্য প্রমাণের গরজে তিনি তালিকা তৈরি করেন 'পূরবী'-তে কত অসংখ্যবার ব্যবহৃত হয়েছে কবির পক্ষপাতময় শূন্যতাবাচক শব্দ, শূন্যতাবোধের সমর্থনে নঞর্থক শব্দরাজি, বিশেষণ হিসেবে শূন্য শব্দের ব্যবহার। 'পুনশ্চ' এবং 'শেষসপ্তক'-এর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চিত্রকল্পের আধিক্য, চিত্রকল্পের ব্যাপ্তি, কবিতার কেন্দ্রীয় ভাবের উপযোগী চিত্রকল্পের প্রয়োগ ইত্যাদিতে ইতিপূর্বে মুগ্ধ, আকৃষ্ট এবং আপ্লুত হতে পেরেছেন বলেই তো তিনি জানিয়ে দেন তাঁর ক্ষোভ—

"কিন্তু আশ্চর্য 'লিপিকা' এবং 'পুনশ্চ' উভয়ক্ষেত্রেই কবির দুর্ভাবনার কোনো স্পর্শ নেই। ঐতিহাসিক কারণে এই শিল্প-নিরীক্ষা যত মূল্যবানই হোক, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পচারিতা 'পুনশ্চ'-এ, 'শেষসপ্তক'-এ স্তিমিত। প্রথম জীবনে নিজের ভাষার প্রেমে পড়েছিলেন কবি, শেষ জীবনে নিজের ছন্দের। পল্লবতা দুই ক্ষেত্রেই চিত্রলতার ক্ষতি করেছে।"

এ-মন্তব্যে কি গড়ে ওঠে না লেখকের একটা বিশেষ প্রত্যাশা? এবং

তা থেকে কি প্রমাণিত হয় না এই সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তিনি মূলত যা খোঁজেন তা ন্যূনতম আন্দোলন নয়, চিত্রকল্পই। ন্যূনতম আন্দোলন ঘটিয়ে কবিতার রূপান্তর ঘটানোর ক্রিয়াপদ্ধতি 'লিপিকা' 'পুনশ্চ' আর 'শেষসপ্তক'-এ কি তাহলে পুরোপুরি অনুপস্থিত ? যদি থাকে, তাহলে স্তিমিত কেন ?

আবার অন্যভাবেও উঠতে পারে আর এক প্রশ্ন। যে বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য চিত্রকল্পের চরিত্র এবং মূল্যবিচার, চিত্রকল্পের বাস্তবতা বিশ্লেষণ, চিত্রকল্পের সংখ্যা গণনা, চিত্রকল্পের ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তনের দিকনির্ণয়, এমনকি চিত্রকল্পের গুরুত্বেই কবিতার ভালো-মন্দের সার্থকতা-অসার্থকতার সিদ্ধান্ত, সেখানে ভূমিকায় 'বলাকা' থেকে উদ্ধৃত রবীন্দ্র-স্বভাবী ঐ উদাহরণ কি সত্যিই বিস্ময়কর নয় ? আর এও কি সম্ভব যে, যে-কবি প্রধানত ন্যূনতম আন্দোলন ঘটিয়ে রূপান্তর ঘটান নিজের কবিতার এবং কবিতাকে টেনে নিয়ে যান অপূর্বতার কূলে, সেই ন্যূনতম আন্দোলন থেকে সংগ্রহ করা যাবে কবির ভিন্নতর এবং যথার্থ জীবনচরিতের পর্যাপ্ত উপকরণ ?

তাঁর আরো কয়েকটি অসাবধানী মন্তব্যের দিকেও চোখ পড়তে পারে কোনো কোনো সচেতন পাঠকের। এ বইয়ের প্রথম প্রবন্ধে 'লিপিকা'-র প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন—

" 'বলাকা' থেকে 'পূরবী'-'পরিশেষ'-এ কবিকল্পনার পূর্ণ পরিণত অবস্থায় ধীরে ধীরে যে টানাপোড়েন প্রভাব বিস্তার করছিল—কিছু তার ব্যক্তিগত কিছু তার বিশ্বগত, এর প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল 'পরিশেষ'-এর নানা ধরনের কবিতাগুলির মধ্যে। 'প্রশ্ন' যেমন বৃহত্তর জীবনের যন্ত্রণায় বলিষ্ঠ, 'আতঙ্ক' তেমনি ব্যক্তিগত শঙ্কায় পিঙ্গল। এই নানা টানাপোড়েন থেকে কবি পৌঁচেছেন 'পুনশ্চ'-র গদ্য ছন্দের প্রবর্তনায়। হয়তো প্রচণ্ড দুর্ভাবনার দায় এড়ানোর জন্যেই তাঁর এই শিল্পলীলা, কেননা অনুরূপভাবে একদিন জন্মলাভ করেছিল 'লিপিকা'। কিন্তু আশ্চর্য 'লিপিকা' এবং 'পুনশ্চ' উভয় ক্ষেত্রেই কবির দুর্ভাবনার কোনো স্পর্শ নেই।"

এ বইয়ের শেষ প্রবন্ধে ঐ 'লিপিকা' প্রসঙ্গেই তাঁর আর-এক দফা বিশ্লেষণে উপরের মন্তব্যের প্রায় পুরোপুরি বিরুদ্ধাচারণ। যেন লেখা দুটো এক বইয়ের অন্তর্গত হলেও দুজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির রচনা। এ বইয়ের শেষ রচনার নাম 'সান্ধ্যরবিচ্ছায়া'। 'লিপিকা'-র প্রসঙ্গ দিয়েই প্রবন্ধের সূচনা।

" 'লিপিকা'-র 'একটি চাউনি' কবিতায় গানের সুর বলেছিল 'আমি রাজার

প্রতাপকে স্পর্শ করিনে, ধনীর ঐশ্বর্যকেও না, কিন্তু ওই ছোট জিনিসগুলিই আমার চিরকালের ধন ; ওইগুলি দিয়েই আমি অসীমের গলার হার গাঁথি'। সমস্ত লিপিকা-তেই এক এক শিল্পাত্মা ক্রিয়াশীল। সে যদিও আকারে গদ্য কিন্তু মূলত সে এমনকি কবিতার চেয়ে গভীরভাষী হতে চায়।...লিপিকা-র বিষয় দূরে রেখেছে জীবনের মহাকাব্যমন্দ্রিত রাজপথকে, এড়িয়ে গেছে আধুনিক সভ্যতার সাফল্যগর্বিত অহংকারকে—লিপিকায় প্রাধান্য পেয়েছে ধূলির ধন।...যা তথাকথিত বৃহতের দ্বারা সংস্পৃষ্ট নয়, নয় কোনো মহত্ত্বের অভিমানে তরঙ্গিত, সেই সব সামান্যের মোড়কে বন্দী অসামান্যকে আবিষ্কার করাই লিপিকার উদ্দেশ্য। বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা আছে এই বইয়ে, যেখানে ফুটে উঠেছে প্রাসাদবিরোধী মনোভাব। আরো বেশি হচ্ছে সেই সব কবিতা যেখানে ধনের বিবর্ণতা ও ঐশ্বর্যের বদ্ধতার বিকারকে অঙ্গুলিনির্দেশ না করেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। কমপক্ষে একটি কবিতায় গল্পের ছলে হলেও প্রাচুর্য-তোষিত যন্ত্রকল্পতরু য়ুরোপীয় সমাজের বিচ্ছিন্নতাবোধকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।...নিরুদ্বিগ্ন সন্তুষ্ট জীবনের শেষ সঙ্কট এইখানে যে তা হয়ে পড়ে লক্ষ্যহীন। অভ্যাসের ছকে বাঁধা জীবনে বাঁচার আনন্দ থাকে না। কৃত্রিম আলো আলেয়ার মতোই জ্বলে বটে, কিন্তু আলোকিত করে না। লিপিকাতেই এসব কথা জ্বলে উঠেছে দীপের মতো।"

এর পরেই লিপিকা-র সুরের ও স্বরের বৈশিষ্ট্য, লিপিকার আঙ্গিকরীতির আলোচনা। লিপিকার 'প্রশ্ন' কবিতার দুঃসহ মিতবাক্ তীব্রতা, যাকে তিনি মনে করেন 'রবীন্দ্র কাব্যে নোতুন ব্যাপার'।

এই সব কিছুকে মিলিয়ে লিপিকা হয়ে ওঠে যা, তাকে কি মেলাতে পারি তাঁর প্রথম প্রবন্ধের সিদ্ধান্তের সঙ্গে ? দুর্ভাবনার দায় এড়ানোর তাগিদে যার জন্ম, সেও কি হতে পারে এতখানি বহুগুণান্বিত ? ঐ 'প্রশ্ন' কবিতার প্রসঙ্গেই তিনি যখন আবার বলেন—

"অস্তিত্বের রহস্যময় নিষ্ঠুরতা ও একটি বালককে পরস্পরের প্রতিমুখে স্থাপিত করে কবি এই কবিতায় যে অনুভূতি ফুটিয়ে তুলেছেন তা ইতিপূর্বে তাঁর কবিতায় আমরা পাইনি।"

তখন কি 'চিত্রলতাহীন পল্লবতার' অভিযোগটা হয়ে দাঁড়ায় না নিতান্তই ঠুনকো।

শেষ প্রবন্ধে 'লিপিকা'-কে এত ভালো লাগে তাঁর যে, তিনি এর মধ্যে পেয়ে যান রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের ছবির পূর্বাভাসও। 'লিপিকা'-য় 'বর্ণের

বিরলতায় ব্যঞ্জনার প্রগাঢ়তা সঞ্চার, অপর দিকে ভাবাতিশয্যকে নির্মম বর্জনে তথাকথিত মনোহারিতাকে বিদায়'-এর তাৎপর্যে এবং 'দিগন্তের মুখ বিবর্ণ; গাছের পাতাগুলো শুকনো হলদে, হতাশ্বাস' জাতীয় চিত্রকল্পের মধ্যে তিনি পেয়ে যান ঐ সিদ্ধান্তের সমর্থন।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার সূচনাকালের হিসেব দেন ১৯২০ থেকে ১৯৩০। বিনোদবাবুর মতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার নতুন যুগ আর তাঁর ছবি-আঁকার কাল সমান্তরাল। ঐ সময়ে তাঁর মনের গতি ছিল অর্থের চেয়ে ভঙ্গির দিকে, ভাবের চেয়ে রূপের দিকে, গতির চেয়ে স্থিতির দিকে। এর পক্ষে বড় প্রমাণ, পুরনো নাটকের সংশোধন। ১৯৩০-এ থেকে তাঁর ছবি পৌঁছে যায় বিবর্তনের শেষ সীমায়। ১৯৩২-এ 'পুনশ্চ', তাঁর প্রথম গদ্য কাব্য। এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ মুখ ফেরান ভঙ্গিকে ছেড়ে ভাবের দিকে। এই বৈপরীত্যের দৃষ্টান্তে তিনি জানান—

"আশ্চর্য এই যে, যে-সময়ে তাঁর চিত্র অলঙ্কারে ভূষিত হতে চলেছে, সে-সময়ে তাঁর কাব্য নিরলঙ্কার হয়ে আসছে।"

ঐ প্রবন্ধের উপসংহারে আরো নতুন অনুভব। সাহিত্যে যখন তিনি বস্তুর দিকে, ছবি অতীত স্মৃতির দিকে। ছবি থেকে পাওয়া নতুন সত্য একদিন ঢেলে দিয়েছেন কবিতায়, পরে কবিতায় যতই সম্পূর্ণতা পেয়েছে সে সত্য, ছবির ক্ষেত্রে কমে এসেছে নতুন বিবর্তন বা অনুসন্ধান। ছবি হয়ে উঠেছে অবসর, বিনোদনের সঙ্গী।

"প্রথম জীবনের কাব্যে যেমন বাক্যালঙ্কার সকল অভাব পূরণ করেছে, এবং সকল দুর্বলতা ঢেকেছে, শেষ জীবনের ছবিতে বর্ণের স্থান সেই রকম।"

এ থেকে আমরা ধারণা করে নিতে পারি যে তাঁর ছবির ক্রম-বিকাশে তাঁর কবিতার ভূমিকা ফার্টিলাইজারের নয়। তাছাড়া স্বভাবতই অন্য একটা প্রশ্নও ঝাঁকুনি দেয় এখানে, তাঁর ছবির বেলায় কবিতার প্রশ্নই বা ওঠে কেন শুধু? রবীন্দ্রনাথ কি শুধুই কবি। বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ-তেই শুধু বদলাচ্ছেন তিনি? আর তাঁর গদ্য বসে আছে এক ঠাঁই চিরস্থির? কেন ভাবব যে কবিতার রবীন্দ্রনাথই চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাদাতা ও পৃষ্ঠপোষক। কেন ভাবব না যে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের জনক সমগ্র রবীন্দ্রনাথ, যাঁর সৃষ্টির বৃহত্তম অংশটাই গদ্যের রবীন্দ্রনাথের দখলে।

এই প্রসঙ্গে, আমাদের মনে রাখা ভালো যে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীতে 'লিপিকা' কবিতা নয়, গদ্য। শুধু গদ্য নয়, গল্প। যে

ষড়বিংশ খণ্ডে তার ঠাঁই সেখানে গোত্রবিচারে সে উপন্যাস-গল্পের সারিতে, 'সে' আর 'গল্পসল্প'-র গায়ে গা লাগিয়ে। আসলে যখন তিনি হাতে তুলে নিয়েছেন আঁকিবুকির কলম, আমাদের স্বভাব, তার অব্যবহিত আগের রচনাকেই ঐ আঁকার প্রেরণা হিসেবে বেছে নেওয়া। অথচ আমরা জানি ছবির কথা, সরাসরি ছবি আঁকার কথা, তাঁর চিঠিপত্রে, আদিপর্বের নানান বইয়ের ভূমিকায়, কবে থেকে অনর্গল বলে আসছেন তিনি, ভাবছেন, অন্যকে ভাবাতে চাইছেন। তাঁর সমগ্র চিঠিপত্র থেকে, নিজে ছবি আঁকায় হাত লাগানোর আগে পর্যন্ত, ছবি নিয়ে যা বলেছেন, তার সংকলন করলে চেহারা পেয়ে যাবে একটা বড় মাপের বইয়ের। এ রকম ক্ষেত্রে হিসেব কষে ছবি আঁকার পূর্বাভাসের দিন-ক্ষণ বা জন্ম-লগন নির্বাচন সম্ভব কতখানির চেয়ে প্রশ্ন জাগায়, সঙ্গত কতখানি। আর যদি এমন হয় যে কবিতা থেকে পাওয়া চিত্রকল্পই, যেমন 'লিপিকা'র 'দিগন্তের মুখ বিবর্ণ-ইত্যাদি', হয়ে দাঁড়ায় অনুমানের একান্ত নির্ভর, তাহলে তো তোলা যায় পাল্টা প্রশ্ন, ঐ জাতীয় চিত্রকল্প কি আগে পড়ি নি কখনো তাঁর গদ্যে অর্থাৎ গদ্যে লেখেন নি কখনো তিনি? যদি লেখেন তাহলে কি প্রমাণ হবে? রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই যে আগে গদ্য, পরে রূপান্তরে কবিতা, সে তথ্যটাও যদি মনে পড়ে যায় এই প্রসঙ্গে? লিপিকার সমসাময়িক বা এক-আধ বছর আগের দুটো গদ্য রচনা, 'মুক্তধারা' আর 'জাপান-যাত্রী', তদন্তের জন্যে বেছে নিলেই আমরা দেখতে পাব তাঁর ছবির পূর্বাভাসের লগ্ন পিছিয়ে গেছে কতটা।

১। ওটাকে অসুরের মাথার মতন দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা।

২। গৌরীশিখরের উপর সূর্যাস্তের মূর্তি ; কোন্ আগুনের পাখি মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে।

৩। যেন একটা মস্ত লোহার ফড়িং, আকাশে লাফ্ মারতে যাচ্ছে।

'মুক্তধারা' থেকে এই কটি আর 'জাপান-যাত্রী' থেকে

১। দুর্গমতার একটা প্রকাণ্ড মূর্তি চোখে দেখতে পাচ্ছি।

২। এক একটা পাহাড়…যেন দানব লোকের প্রকাণ্ড জন্তু…।

৩। জল থেকে একটা বাষ্পরেখা সাপের মতো ফোঁস করে উঠল।

এই কটি উদাহরণই আমার বক্তব্যের পক্ষে যথেষ্ট। 'চতুরঙ্গ' ইত্যাদির দিকে পিছিয়ে গেলাম না আর।

সরোজবাবুর আরও একটা মন্তব্যে, রবীন্দ্রনাথের ছবির বিষয়েই, ঈষৎ বিভ্রান্ত। এটা কি সত্যি যে রবীন্দ্রনাথের ছবির অন্যতম একটা গুণ তার 'বর্ণের

বিরলতা', যা তিনি জানিয়েছেন লিপিকা বনাম ছবি-আঁকার পূর্বাভাস প্রসঙ্গে? নাকি এর উল্টোটাই সত্যি? অর্থাৎ উজ্জ্বলতম বর্ণের বিস্ময়কর ও প্রথাবিরুদ্ধ প্রয়োগকুশলতা? বর্ণোজ্জ্বলতাই তাঁর ছবির প্রধান গুণ। ছবি আঁকার বেলায় তাঁর প্রধান শ্লোগান 'জোরালো রঙ'। বর্ণের অলৌকিকত্বই বরং তাঁর ভাবনার রহস্য এবং কল্পনার অগ্নিতাপের সবচেয়ে বড় সহায়ক। ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ যে কাকার ছবি সম্বন্ধে ব্যবহার করেছিলেন আগ্নেয়গিরির উপমা, সেটা শুধু ইরাপসন অর্থাৎ ছবির সংখ্যাকে মনে রেখে নয়, সমগ্র চিত্ররচনার মধ্যে থেকে বিচ্ছুরিত রক্তিমাভাকে মনে রেখেও।

রবীন্দ্রনাথের ছবির বর্ণ-সম্ভার, বর্ণ-বৈচিত্র্য, বর্ণ-নির্মাণের উপকরণ ইত্যাদি নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক কম। তার চেয়েও কম আমাদের চোখে-দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, আর এ-বই সে-বইয়ে যে-সব প্রিণ্ট দেখতে আমরা অভ্যস্ত, সেগুলো কদাচিৎ আসল ছবির সার্থক প্রতিরূপ। আসল ছবিতে বর্ণ-ব্যবহারের যে সযত্ন-স্বেচ্ছাচার, সে-মাধুর্যকে পুরোপুরি ফিরিয়ে দেওয়ার মতো বুকের পাটাওয়ালা ছাপাখানা ভারতবর্ষে বিরল, বিশ্বেও অগণিত নয়।

এ পর্যন্ত পড়ে কোনো কোনো পাঠকের মনে হতে পারে যেন আস্তিন গুটিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জবর লড়াই জমিয়ে তোলাই এ-সমালোচনার আসল অভিপ্রায়। তাহলে তর্কের খাতিরে পাঠকের সে ভুল ধারণাকে স্বীকার করে নিয়েই মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, শত্রুরূপে শ্রেয়-আরাধনাটাও আমাদের দেশে শাস্ত্রসম্মত। যদিও এই মুহূর্তে ঐ উপমার ব্যবহার হাল্‌কা রসিকতার চালেই, রেশনের চাল কাঁড়া-আকাঁড়া জানি বলেই তার গণনাতীত কাঁকরে অভ্যস্ত হয়ে যায় দাঁতের পাটি এবং মনের বিরক্তি! কিন্তু চড়া দামে কেনা নির্ভরযোগ্য গোপালভোগ বা বাসমতীর ভিতরের এক-কণা কাঁকরেই মনের ঝাঁঝ মুখর হয়ে ওঠে মুখে। এ-সমালোচনা অনেকটা সেই ধাঁচের। আলোচ্য বইয়ের একাধিক রচনা আমাদের ভাবনার স্তরে নানা নতুন বোধের বীজবপন করে যায় বলেই ঈষৎ-অসামঞ্জস্যে এতখানি বিতর্ক।

যে-পাঠক এখনো পড়েন নি, তাঁর জেনে রাখা ভালো যে, এ-বইটি আমি তৃতীয়বার পড়ব এবং তার পরও।

‘আমার একমাত্র ভালোবাসা—ভারতবর্ষ’

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়ার্সন। প্রণতি মুখোপাধ্যায়। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, রবীন্দ্রচর্চাভবন, কলকাতা ২৬। ১০০ টাকা।

পিয়র্সন প্রথমবার ভারতে এসেছিলেন ১৯০৭ সালে, কলকাতায় ভবানী-পুরের লণ্ডন মিশন সোসাইটির কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপনা নিয়ে, কিন্তু অল্পকাল পরে মিশনের ভাবনাচিন্তার মধ্যে সংকীর্ণতা দেখে বিরূপ হয়ে মিশন ত্যাগ করে ফিরে গিয়েছিলেন দেশে।

চার্লস ফ্রিয়র অ্যাণ্ডরুজের চেয়ে উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়র্সন ১০ বছরের ছোট। অ্যাণ্ডরুজের জন্ম ১৮৭১ সালে, পিয়র্সনের ১৮৮১ সালে। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দুজনে যথাক্রমে ১০ ও ২০ বছরের ছোট। দুজনেই ইংরেজ। প্রথম জীবনে মিশনারি—পরে ভারতপ্রেমিক মানবতাবাদী। বিশ্বের সকল মানুষের জন্য হৃদয়ভরা প্রেম এঁদের। রবীন্দ্রনাথের টানে টানে দুজনেই হাজির হয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। আবার মানবতার টানে দুজনেই ছুটেছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে বহির্বিশ্বে—কখনও Indentured Labour বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমপ্রথা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন তৈরি করতে ফিজিতে, কখনও বা দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির সঙ্গে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিতে।

দুজনে সর্বদাই একসঙ্গে ছিলেন না, কিন্তু যোগ ছিল দুজনের মধ্যে সব সময়। যখন সাক্ষাৎ দেখা নেই তখন চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগস্থাপন করেছেন দুজন। দুজনেরই সামনে সাধারণ ভালোবাসার মানুষ রবীন্দ্রনাথ।

১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বরে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় গ্রেপ্তার হবার পর গোখলেকে অ্যাণ্ডরুজ বললেন, যদি কোনও কাজের জন্য তাঁকে প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে রাজি আছেন। কথা ছিল তিনি যাবেন অসুস্থ মাকে দেখতে ইংল্যাণ্ডে—কিন্তু গোখলে যখন সত্যিই প্রস্তাব পাঠালেন দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার জন্য তখন অ্যাণ্ডরুজ আগের পরিকল্পনা বাতিল করে চললেন সেখানে। আর পিয়র্সন? অ্যাণ্ডরুজের জবানিতেই শোনা যাক:

Willie Pearson, the son of late Dr. Samuel Pearson, a celebrated congregrational Minister of Manchester, accompanied me to Natal. His mother was a Quaker. He had been one of my closest friends in Delhi, and he gave me a glorious surprise. Everything had to be arranged hurriedly, and I had to leave that very midnight by train from Delhi in order to catch the steamer. Willie came to me and said, "I have a little present to give you before you go." When I looked enquiringly and asked what it was, he cried out, "Myself" and burst into a peal of happy laughter.

নিজেকেই উপহার দিলেন পিয়র্সন। এমন আশ্চর্য উপহার পৃথিবীতে কবার পায় মানুষ ?

১৯২২ সালের ডিসেম্বরে দিল্লি থেকে শান্তিনিকেতন এসে ঘুরে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল এই বছরেরই জুন মাসে ইংল্যাণ্ডে। তখনই ঠিক করেছিলেন চলে আসবেন ভারতবর্ষে। শরীর তাঁর খুব ভালো ছিল না ; ভুগছিলেন। কিন্তু অ্যাণ্ডরুজ তাঁর মনটাকে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর একটি কাজ যোগাড় করে দিয়েছিলেন দিল্লিতে। রবীন্দ্রনাথের কাছে শান্তিনিকেতনে এসে যোগ দেওয়ার কথা বলছেন—এমন সময় গেলেন আফ্রিকা—অ্যাণ্ডরুজের সঙ্গে।

শান্তিনিকেতনে আসতে পেরেছিলেন ১৯১৪ সালের মার্চ মাস নাগাদ। সেবার ছিলেন ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এবার আবার চুক্তিবদ্ধ শ্রমপ্রথা সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের জন্য গেলেন ফিজি দ্বীপে।

ফিজিতে পাঁচ সপ্তাহ ধরে চলেছিল অ্যাণ্ডরুজের তথ্য সংগ্রহ। তৈরি হল মানুষের যে অপমান মানুষ করে চলেছে তার একটি যথার্থ দলিল। তুলে ধরলেন বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের 'মনুষ্যত্ববোধবর্জিত হতাশ্বাস জীবনের' সেই ছবি যে ছবির করুণ মর্মান্তিক সত্য বিশ্বের মানুষকে নাড়া দিল—শাসকগোষ্ঠীও যা অস্বীকার করতে পারেন নি।

অ্যাণ্ডরুজের সঙ্গী এই পিয়র্সন। কী ছিল তাঁর আদর্শ যার টানে ভারতবর্ষ থেকে ধরাবাঁধা মিশনারী কাজ পরিত্যাগ করে একবার ফিরে যান

স্বদেশে—আবার ভারতবর্ষের টানে চলে আসেন। মুহূর্তে শ্রমজীবী মানুষের দুঃখের বঞ্চনার জীবনের তথ্য তুলে ধরার কাজে অ্যাণ্ডরুজকে সাহায্য করতে চলে যান ফিজি—কখনও যান দক্ষিণ আফ্রিকা।

এর উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন:

> এই বন্ধুটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ইংলণ্ডে। যেদিন তাঁর বাড়িতে প্রথম যাই সেদিন গিয়ে দেখি যে দরজার কাছে সেই সৌম্যমূর্তি প্রিয়দর্শন যুবক দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে দেখে অবনত হয়ে পায়ের ধুলা নিলেন। আমি এমন কখনো প্রত্যাশা করি নি, তাই চমকে গেলুম। আমি তাঁর সেই নতি-স্বীকারের যোগ্য নাও হতে পারি, অর্থাৎ এর দ্বারা আমার কোনো পরিচয় আমি দাবি করি নে কিন্তু এর দ্বারা তাঁরই একটি উদার পরিচয় পাওয়া যায়—সেটি হচ্ছে এই যে, তাঁর আত্মা ইংরাজের রাষ্ট্রীয় প্রতাপের বেড়াটুকুর মধ্যে বাঁধা ছিল না, ন্যাশনালিজমের বিরাট অহমিকায় তাঁকে পেয়ে বসে নি, নিখিল মানবের পৃথিবীতে তাঁর স্বদেশ ছিল।

যাঁর স্বদেশ 'নিখিল মানবের পৃথিবী' তিনি কি ধরাবাঁধা কাজে 'মিশনারী' হয়ে থাকতে পারেন। অ্যাণ্ডরুজ পিয়র্সনের অন্তরটি ভালোভাবে বুঝেছিলেন—তাই পিয়র্সনের ভারতবর্ষে এসে সেবা করার আদর্শটি সম্বন্ধে বলছেন:

> His own peculiar gifts could not find scope amid routine work of an established mission whose conventional lines had been laid down long ago. He did not feel there that spirit of freedom, which was the breath of his life. It was clear, I think to everyone—as it became clear to himself—that his own work in India and for India—could only be done, when he was entirely the master of his own time and his own method. It was here that the school of the poet, Rabindranath Tagore, so exactly fulfilled this ideal of freedom. It was poet's school, not a

conventional educational institution. The poet's genius was written all over it, and freedom was its watchword.

এমন মানুষটি শান্তিনিকেতনে এসে সকলেরই মন কেড়ে নিয়েছিলেন। পরিধানে তাঁর বাঙালি পোশাক, হৃদয়ে বাঙালি মায়ের স্নেহ। কে অসুস্থ হয়েছে—পিয়র্সন তাঁর শয্যাপার্শ্বে জেগে বসে আছেন, তাঁর সেবা করছেন। কারও অসুখ হয়েছে শুনলে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতেন। "জিতেন বলে একটি ছেলে অসুস্থ হয়ে বাড়ি গেল—চিন্তিত পিয়র্সন তার মাকে একগোছা টেলিগ্রাম ফর্ম পাঠিয়ে দিলেন। ফর্মগুলিতে ডাকটিকিট লাগানো। ঠিকানায় লেখা আছে 'পিয়র্সন, শান্তিনিকেতন'। সেইসঙ্গে দু ছত্র অনুরোধজ্ঞাপক চিঠি—মা যেন দয়া করে রোজ একখানি টেলিগ্রাম পাঠান ছেলেটি কেমন আছে জানিয়ে। সুস্থ হয়ে এই ছেলে আশ্রমে ফিরে আসবার পর পিয়র্সন বড় ভাইয়ের মতো স্নেহ ও সতর্কতায় তার উপর নজর রাখলেন, তাঁর কাছে থেকে সে আবার ইস্কুলে যেতে আরম্ভ করল। তার মা যখন ছেলেকে দেখতে আসতেন, পিয়র্সনের বাড়িতে তিনি একান্ত ঘরের লোকের মতো থাকতেন। প্রবাসী পুত্রের সংসারে মা কিছুদিনের জন্য থাকতে এলে তখন তিনিই যেমন আধিপত্য করেন তেমন করেই থাকতেন।"

এসব বর্ণনা তাঁর জীবনী থেকে সংগৃহীত নমুনা মাত্র। কতভাবে যে এই মানুষটি সাঁওতাল পল্লী থেকে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত সব মানুষের সেবায় নিরত থাকতেন তা বলে শেষ করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পিয়র্সন গিয়েছিলেন জাপান এবং আমেরিকা। আমেরিকার পণ্ডলিসিয়াম কোম্পানি বক্তৃতাসফরের আয়োজন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জাপান ঘুরে আমেরিকা যাবেন ঠিক করলেন। সঙ্গী হলেন অ্যাণ্ড্রুজ, মুকুল দে এবং পিয়র্সন। যাবার পথে রেঙ্গুনে জাহাজ পৌঁছেছিল ৭ই মে (১৯১৬)। সেদিন পিয়র্সনের জন্মদিন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মদিন স্মরণ করে 'বলাকা' কাব্যটি উৎসর্গ করলেন পিয়র্সনকে। উৎসর্গের কবিতাপত্রটি সকলের মনে আছে নিশ্চয়ই ঃ

আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক,
আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
সবার পিছনে নিজেরে গোপন রাখ,
আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।

ছোটোরে কখনো ছোটো নাহি কর মনে
আদর করিতে জান অনাদৃত জনে,
প্রীতি তব কিছু না চাহে নিজের জন্য
তোমারে আদরি' আপনারে করি ধন্য।

রেঙ্গুন হয়ে জাপান, জাপানে কোথাও হাজার হাজার মানুষের ভিড়, রবীন্দ্রনাথের কাছে আসার জন্য উত্তেজনা, কোথাও শ্রমণদের নীরব শ্রদ্ধা-নিবেদন, কোথাও সাংবাদিকদের অসহ কৌতূহল যা হাস্যকর, কখনও বিরক্তিকর। কখনও বা বীভৎসরসও সঞ্চার করে ফেলে তারা। এমন অবস্থায় পিয়র্সন সযত্নে রবীন্দ্রনাথের কাজ করে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথও খুব খুশি। তিনি রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন ঃ

> পিয়র্সন খুব গুছিয়ে কাজ করে। অ্যাণ্ডরুজ যত্ন করতে মজবুত কিন্তু পিয়র্সন না এলে অ্যাণ্ডরুজের হাতে সমস্ত বিষম এলোমেলো হয়ে উঠত—সে আমি সইতে পারতুম না।

জাপানে রবীন্দ্রনাথের অনেক কিছু ভালো লেগেছিল। ভালো লেগেছিল জাপানি মেয়েদের সাজসজ্জা, আচার-আচরণ, নিপুণ হাতের নিরলস সেবায় ঘরকে যারা শ্রীমণ্ডিত করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন ঃ

> পিয়র্সন যদি একটি জাপানি মেয়ে বিয়ে করতে পারত তাহলে আমি খুব খুশি হতুম—

ভাবখানা এই, পিয়র্সনের যত্ন তো পাচ্ছেনই—কিন্তু পিয়র্সন যদি জাপানি মেয়ে বিয়ে করতেন তো সে মেয়েটির যত্ন করার শিল্প ও সৌন্দর্য চিরদিন অনুভব করতে পারতেন। আসল কথা পিয়র্সনের প্রতি স্নেহ।

জাপান থেকে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বরে গেলেন আমেরিকা। অ্যাণ্ডরুজ ফিরে গেলেন ভারতবর্ষে। আমেরিকাতে সবাই ধীরে ধীরে ক্লান্তি অনুভব করতে লাগলেন। বক্তৃতার চাকায় বাঁধা জীবনের জন্য শুধু নয়। দর্শনার্থীদের ভিড়—খবরের কাগজের যথেচ্ছা মিথ্যাপ্রচার—কোনোদিনই নেওয়া হয়নি এমন সাক্ষাৎকার প্রকাশ—এসব সামলে ১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁরা আবার যখন জাপানে ফিরে এলেন তখন ঘটল সেই ঘটনা যা দিয়ে আমরা বুঝি মানুষ কত রহস্যময়।

জাপানে গিয়ে পিয়র্সন রবীন্দ্রনাথকে জানালেন তিনি এখন কিছুদিন জাপানে থাকতে চান—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ফিরতে চান না। এই ঘটনায়

রবীন্দ্রনাথ দারুণ এক আঘাত পেলেন। এই মায়ায় ঘেরা মানুষটি কী করে বিদায় চাইলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সংযমে এই আচম্বিত আঘাতের বেদনাকে সহ্য করে বিদায় দিলেন, কিন্তু কী ঘটেছিল? প্রায় এক বছর চার মাস তিনি রইলেন একাকী। Paul Richard ও তাঁর স্ত্রী Mira Richard এঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। এই বিশারদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি অরবিন্দের অধ্যাত্মসাধনার প্রতি ঝুঁকেছিলেন? অ্যাণ্ডরুজ অনেক পরে জানিয়েছিলেন পিয়র্সনের সঙ্গে পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল। এ সম্পর্কে পুলিশ রিপোর্ট এইটুকু মাত্র যে পিয়র্সন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গছাড়া হয়ে আনুমানিক ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ সালে ভারতে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং মাস তিনেক পরে সিংহল হয়ে জাপানে ফিরে আসেন। রমঁ্যা রলাঁকেও যে পিয়র্সন এ তথ্য জানিয়েছিলেন তার উল্লেখ তাঁর L'Inde Journal বইতে আছে।— সম্ভবত একটা আত্মানুসন্ধানের পর্ব চলছিল তখন।

অথচ এই পর্বের মধ্যে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর লেখা For India বইটি প্রকাশিত হল। এ বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন পল রিশার। পুলিশ বরাবরই নজর রাখছিল রবীন্দ্রনাথ, অ্যাণ্ডরুজ, পিয়র্সন এঁদের সকলের উপর। For India প্রকাশিত হতে এই নজরদারি তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল। পরে ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে পিয়র্সন তাঁর এক বন্ধু রেভারেণ্ড ইভানসের আমন্ত্রণে পিকিঙ আসতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিল।

কিন্তু ব্রিটিশ পুলিশ ও ইনটেলিজেন্সের এই ব্যবস্থা কিসের জন্য? পিয়র্সনের কি কোনও শক্তি ছিল? জীবনীলেখিকা বলছেন: 'মানুষের প্রতি ভালোবাসা যদি কোনো শক্তি যোগাতে পারে তবে সেইটুকুই ছিল। তারই ভয়ে ভীত হয়ে উঠেছিল তাঁর স্বজাতীয়ের দল।'

এই সময়কার চিঠিপত্র ও পুলিশ রিপোর্ট ইত্যাদি একসঙ্গে নিয়ে পড়লেই মানুষটির সম্পর্কে ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে। পুলিশ যখন তাঁকে পাঠাচ্ছে বন্দী করে তখন জাহাজে বসে তিনি ভাবছেন:

> I am at least happy in the thought that I have been given an opportunity of sharing sufferings and enduring suspicious which only my love for India has brought upon me.

পিয়র্সনকে ম্যানচেস্টারে অন্তরীণ রাখা হয়েছিল। ভগ্নস্বাস্থ্য তাঁর এ সময়

আরও ভেঙে পড়েছিল। ইতোমধ্যে সরকারের আহ্বানে তিনি সৈন্যদলে আর্মি মেডিক্যাল কোরে যোগ দিলেন। তাঁর স্বভাবের ও জীবনদর্শনের সঙ্গে এ অসংগতির ব্যাখ্যা কী? এমন হতে পারে রাস্তায় যে বিকলাঙ্গ তরুণ সৈন্যদের দেখছেন তাঁদের সঙ্গে তাঁকেও যুদ্ধে যোগ না দিলে নয়—এমন ভাবছিলেন তিনি। যুদ্ধে অবশ্য যেতে হয় নি তাঁকে। কিন্তু দ্বিধা দ্বন্দ্ব অনেক কিছু তাঁর ছিল সৈন্যদলে যোগ দেবার পর থেকে। এদিকে কিন্তু নিরন্তর ভেবে চলেছেন ভারতবর্ষের কথা, শান্তিনিকেতনের কথা।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা, রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগ এসব ঘটে গেল। এর পর ১৯২০ সালের জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ডে এলে আবার তাঁর একান্ত সচিবরূপে পিয়র্সন গেলেন ইউরোপ এবং আমেরিকা। সেখানে আবার পিয়র্সনের ক্লান্তি অনুভব—চলে যাওয়া—রবীন্দ্রনাথের আঘাত পাওয়া—আবার শান্তিনিকতনে চলে আসার বাসনা ইত্যাদি পর্ব শেষ হলে তিনি আসতে যখন পারলেন ১৯২১-এ। শান্তিনিকেতনে এসে তিনি সেই পুরনো আসনে বসলেন; মনেই হল না কারও যে নতুন কিছু ঘটেছে। এ অবস্থা চলেছিল ১৯২২-এর মে পর্যন্ত। আবার অসুস্থ হয়ে ছ মাস ছুটি নিয়ে রইলেন কোঠগড়।

কোঠগড় পাহাড়ি জায়গা। অসুস্থ শরীর নিয়ে সেখানে নিরুপায় হয়ে বসে থাকার সময় অনুবাদ করলেন 'গোরা'। শান্তিনিকেতনে ফিরেও এলেন কিন্তু শরীর আর এদেশে কিছুতেই টিঁকছিল না—সুতরাং যেতে হল দেশে ফিরে ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে।

দেশে গিয়ে শরীর সারিয়ে তুলে আবার ফিরে আসতে চাইছিলেন শান্তি-নিকেতনে—কিন্তু জীবন তো আর পরিকল্পনামতো চলে না। রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হওয়ার দু-তিন দিন পর ১৮ই সেপ্টেম্বর (১৯২৩) মিলান থেকে ফ্লোরেন্স যাবার পথে ট্রেনে ঝুঁকে বাইরের দৃশ্য দেখছিলেন পিয়র্সন। দরজার ছিটকিনি লাগানো ছিল না নিশ্চয়ই। আচম্বিতে পিয়র্সন ট্রেন থেকে পড়ে গেলেন। বন্ধু বেটম্যান চলন্ত ট্রেনে কাউকে কিছু বোঝাতে পারেন নি। ট্রেন চলে গিয়েছিল। কয়েকজন প্রেমিক অবশ্য তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিয়ে একটি বাড়িতে নিয়ে যান। সেখান থেকে অ্যাম্বুলেন্সে ছোট হাসপাতালে। সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করে পিয়র্সন সাতদিন বাদে ঘুমের মধ্যেই চলে গেলেন। জ্ঞান হারাবার পর একদিনই কেবল একটি কথা অস্ফুট উচ্চারণ করেছিলেন পিয়র্সন—যার মানে তাঁকে যিনি সেবা করছিলেন

তিনি বুঝতে পারেন নি। বোন ডরোথি পিয়র্সনের চিঠিতে সে কথা আছেঃ

> His nurse tells us that one night he said: My one and only love—India. At that time, she knew so little about him that she did not understand the significance of the remark.

পিয়র্সনের মৃত্যুশয্যায় শেষ উক্তিঃ 'আমার একমাত্র ভালোবাসা—ভারতবর্ষ—এ কথার তাৎপর্য অচেনা সেবিকা বোঝেন নি, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরাই কি এতদিনে বুঝেছি?

যদি বুঝতাম তাহলে পিয়র্সনের জীবনকথা তাঁর কর্ম ও চিন্তা, তাঁর ভালোবাসা ও সেবা, তাঁর চরিত্রমাধুর্যের স্বরূপ অনুসন্ধান আগেই করতাম। আমাদের অজ্ঞতা, শ্রদ্ধাহীনতা ও মূঢ়তার অন্ত নেই। সীমাহীন এই মূঢ়তা এবং অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে আমাদের বাঁচিয়েছেন পিয়র্সন-জীবনীকার শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায়।

বস্তুত এই জীবনীগ্রন্থ তাঁর দশ বছরের গবেষণার ও নিরন্তর অনুসন্ধানের ফসল। শুদ্ধ কৌতূহল নিবৃত্তি নয়, শুষ্ক অনুসন্ধান মাত্র নয়—এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় গুণ মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধা। এই দুই গুণ যুক্ত হয়ে পিয়র্সনের জীবনী শুধু তথ্যসংকলন ও বিন্যাসে গিয়ে শেষ হয় নি—তাঁর সেই ব্যক্তিস্বরূপকে অপরিসীম যত্নে ও সহানুভূতিতে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে—যে ব্যক্তিস্বরূপ নিজেকে আড়াল করে তার মাধুর্যসৌরভ ছড়িয়ে দেয় চারি দিকে—অজানা কুসুমের সৌরভের মতো।

ফলে একদিকে যেমন চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা এবং প্রাপ্ত উপকরণবিন্যাস, অন্য দিকে পুলিশ রিপোর্ট, ছবি। এ গ্রন্থে সবিনয়ে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ করা হয়েছে Hugh Tinker-এর কিংবা Romain Rolland-র মূল্যায়নের বিরুদ্ধে। এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের করা পিয়র্সন স্মৃতিচারণ; অ্যাণ্ডরুজের স্মৃতিচারণ, অ্যাণ্ডরুজ যখন Letters to a Friend ছাপালেন তখন যে উৎসর্গপত্রটি লিখেছিলেন সেই উৎসর্গপত্র; অ্যাণ্ডরুজের লেখা থেকে উদ্ধৃতি; রোটেনস্টাইনকে, রম্যাঁ রলাঁ ও ডরোথি পিয়র্সনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। এ ছাড়া আছে ডরোথি পিয়র্সনের লেখা Willie Pearson's last days; পিয়র্সনের বাংলা ও ইংরেজি রচনা Modern Review

এবং প্রবাসীতে প্রকাশিত পিয়র্সনের সমস্ত রচনার তালিকা; পিয়র্সন, রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র; তত্ত্ববোধিনী, প্রবাসী, শান্তিনিকেতন, Bengalee ও Modern Reviw পত্রিকায় প্রকাশিত পিয়র্সন সংবাদ, পিয়র্সন-সংক্রান্ত পুলিশকৃত পোলিটিকাল ফাইল। শুধু তাই নয়, এই গ্রন্থে যে সব ব্যক্তির নাম উল্লিখিত আছে, বর্ণানুক্রমে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে আর দেওয়া হয়েছে নির্দেশিকা বা index। ফলে এটি একটি সম্পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ যার প্রামাণিকতা বেড়েছে প্রচুর প্রতিলিপি ও প্রচুরতর ছবির জন্য। আর যাকে বলে গ্রন্থসজ্জা তারও তুলনা নেই।

'ভালো হত আরো ভালো হলে'-র খোঁটাটি মনে রেখেও বলি বইয়ের তথ্যপঞ্জি যদি বইয়ের শেষে দেওয়া হয় তাহলে সিরিয়াস পাঠকের খুব অসুবিধা হয়। ওটা পাতায় পাতায় চারিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে ভালো কাজ হত। প্রতি পৃষ্ঠাতে সন তারিখের উল্লেখ থাকলে সবচেয়ে ভালো হত। অন্য দিকে জীবনীটি স্বচ্ছন্দভাবে বলার টানে সন তারিখের পৌনঃপুনিক উল্লেখ যে বর্জন করা হয়েছে তাতেও কিন্তু বেশ অসুবিধা হয়।

কিন্তু এসব কোনও ত্রুটির মধ্যে গণ্য হতে পারে না। কারণ এগুলিতে 'আরো ভালো হলে'র কথা বলা হয়েছে। বইটি শুধু ভালো বইমাত্র নয়—এ বইয়ের দ্বারা লেখিকা সমগ্র বাঙালি জাতির হয়ে ঋণশোধ করেছেন তাঁর কাছে যিনি বিপুল উল্লেখযোগ্য কীর্তিস্থাপন করেন নি, কিন্তু মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় পবিত্র ও মাধুর্যমণ্ডিত আত্মদান করে গেছেন। সেজন্য বাঙালি জাতি কৃতজ্ঞ থাকবে লেখিকার কাছে।

প্রবাহের দিকে

অমিতাভ গুপ্ত

ভারতশিল্পী নন্দলাল প্রথম খণ্ড পঞ্চানন মণ্ডল রাঢ় গবেষণা পর্ষদ ১৯৮২ দাম একশত টাকা

শিল্পী হিসেবে নন্দলাল বসুর আসল মর্যাদা এইখানেই যে তিনি তাঁর চিত্রকর্মকে যুক্ত করতে পেরেছিলেন লোকশিল্পের শিকড় থেকে উঠে আসা আধুনিক ভারতশিল্পের সঙ্গে। অর্থাৎ, আচার্য নন্দলাল একজন যথার্থ আধুনিক, একজন প্রকৃত শিল্পী। ইদানীং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধুনিকতার দোহাই দিয়ে যে অবক্ষয়ী—এবং অবক্ষয়ী বলেই অসুন্দর, কিম্ভূতকিমাকার—চিত্রচর্চাকে শিল্প ব'লে চালানো হচ্ছে, পশ্চিমের অবক্ষয়ী বুর্জোয়া শিল্পকে নকল ক'রে আঁকা যে ছবির প্রচারে ভাড়াটে কাগজগুলি সবসময়েই তৎপর, তাকে প্রতিরোধ করতে গেলে নন্দলালের মতো শিল্পীর কথা মনে রাখা বিশেষ দরকার। ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডলকে ধন্যবাদ, তিনি তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থ উদ্যোগের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করে, পচাগলা আধুনিকতার সঙ্গে লড়াইয়ের প্রেরণা দান করেছেন। তাঁর গ্রন্থ-নামটিও ('ভারতশিল্পী নন্দলাল') অনবদ্য। এই নামকরণই ইঙ্গিতে আমাদের বুঝিয়ে দেয়, বিদেশী ছবির নকল ক'রে ইদানীং যাঁরা তোতাপাখির প্রতিভা দেখাচ্ছেন তাঁরা ভারতশিল্পী নন—অর্থাৎ, তাঁরা কেউ শিল্পীই নন।

নন্দলালের ছবি কালোত্তীর্ণ হওয়ার আরেকটি কারণ এই যে, তিনি বিশ্বাস করতেন, 'সাধারণের সঙ্গে একটা মনের যোগ থাকা দরকার তবেই শিল্পীর শিল্প সকলে বুঝতে পারবে'। শিল্পের সঙ্গে জীবনের যে বিশাল ও সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে, জনসাধারণের সঙ্গে শিল্পীকে যেভাবে মিশে যেতে হয়, র‍্যালফ ফক্স যাকে বলেছেন 'সৃষ্টিশীল সংযোগ'—তার আভাস ছিল নন্দলালের জীবনচর্যায়। নন্দলালের নিজের কথায়, 'শান্তিনিকেতনে···আশেপাশের গ্রামের লোকদের সঙ্গে, বিশেষ করে সাঁওতালদের সঙ্গে যেন আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। তাদেরই লোক বলে জানে আমাকে সাঁওতালেরা।' শ্রীমতী রানী চন্দ অথবা শান্তি-নিকেতন-আশ্রমের অন্যান্য ঘনিষ্ঠজনের রচনায়, এর আগেও, আমরা জেনেছি সাধারণ মানুষের কতটা কাছাকাছি থাকতেন নন্দলাল।

একজন প্রকৃতশিল্পীর সেই মানবিক জীবনচর্যার আরো কিছু অন্তরঙ্গ পরিচয় এখানে পাওয়া গেল। আরো কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়তো ছিল, হয়তো সব

সম্ভাবনাই পূর্ণতা পায়নি এই বইটিতে : তবু যা পেয়েছি তা-ই অনেক। এই বইটি পড়ে আমরা আবার উপলব্ধি করি, একজন সত্যিকারের শিল্পী অথবা একটি সৎ শিল্প-আন্দোলন কখনো আকাশ থেকে পড়ে না। স্বদেশের সামাজিক-ঐতিহাসিক পটভূমিকাই তাকে গড়ে তোলে, যেভাবে, মার্কসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, নির্ধারিত হয়েছিল রাফায়েলের ছবির মেজাজ তাঁর সময়ের রোমের অবস্থার দ্বারা, রূপ পেয়েছিল লিওনার্দোর প্রতিভা সেকালের ফ্লোরেন্সের সামাজিক প্রেক্ষিতে।

আচার্য নন্দলালকে প্রস্তুত করেছিল যে সামাজিক-ঐতিহাসিক সন্ধিলগ্ন তার বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে, 'আধুনিক ভারত-শিল্পের রেনেসাঁ (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ২১০)', আরম্ভ হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালে : এই তথ্যটি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ডক্টর মণ্ডলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করি। তখন অবনীন্দ্রনাথ, কুমারস্বামী এবং সমধর্মী আরো কয়েকজন একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন; দেড়শ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পরে তখন 'ইণ্ডিয়ান আর্ট বলে কিছু ছিল না। বিলিতি আর্টের কদর সবখানে'। জাতীয় গণচেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলন স্ফূর্ত হয় এবং কালক্রমে আন্দোলনের উত্তরাধিকার ন্যস্ত হয় নন্দলালের মতো শিল্পীদের সক্ষম, সৃজনশীল হাতে। এই ইতিহাসকে ডক্টর মণ্ডল বিশ্লেষণ করেন নি, কিছু তথ্য দান করে সমৃদ্ধ করেছেন : সেইজন্যই 'রূপমাকা'র পুরোনো পুঁথিটির বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান গ্রন্থে যথার্থ হয়েছে।

নতুন শিল্প-আন্দোলনটির প্রেরণা নন্দলালের রক্তে মিলেছিল : সমর্থক তথ্য হিসেবে ৩৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ঘটনাটির উল্লেখও করা যায় (যদিও ডক্টর মণ্ডল ঘটনাটিকে ঠিক সেভাবে সাজান নি)। অজন্তা যাবার আগে নন্দলাল 'কালীঘাটের পটে প্রথম হাত-মক্স' করেছিলেন। নন্দলালের করা অজন্তা-গুহচিত্রের প্রতিকৃতি এবং হরিপুরা কংগ্রেস উপলক্ষে করা তাঁর ছবিতে অজন্তা-চিত্রের অনুশীলনের প্রভাব তো সুবিদিত। তাঁর মানসিক গঠনে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের শিল্পকর্মের প্রভাবের কথা উল্লেখ করতেও ডক্টর মণ্ডল ভোলেন নি। তবে, নন্দলালের শিল্পকর্মে জাপানি আঙ্গিকের প্রভাব, অন্যত্র শ্রীসত্যজিৎ চৌধুরী যার বিশ্লেষণ করেছেন, সে সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থে যথেষ্ট তথ্যাদি নেই। ওকাকুরার ভারত ভ্রমণের প্রসঙ্গ অবশ্য এসেছে, কিন্তু সেই প্রসঙ্গের প্রত্যাশিত বিস্তার নেই। মনে রাখা দরকার, নন্দলাল বিশ্বাস করতেন, 'অ্যাব্‌সট্রাক্ট্ আর্টের সন্ধানেও পিকাসো, নেজান বা ব্রাঁকুসির

দ্বারস্থ না হয়ে আমরা অতীত দিনের প্রাচ্যে ভারতে বা চীনে যেতে পারি। বুদ্ধ অথবা নটরাজ মূর্তি কিংবা পাঁচটি পার্শিমন ফলের ছবিটি স্মরণ করতে পারি (দ্রষ্টব্য কানাই সামন্ত প্রণীত 'শ্রীনন্দলাল বসু '১৯৬২)।' অর্থাৎ, নন্দলাল বসুর চিত্রকর্মে তথা নতুন শিল্প-আন্দোলনে অজন্তা ও বাঘের গুহাচিত্র, কালীঘাটের পট এবং চীন-জাপানের চিত্রশিল্প সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

নন্দলালের মানসিক গঠনে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রেরণা হয়ত এসেছে একটু দেরিতেই, কিন্তু যেভাবে যতটুকু এসেছে সেই প্রেরণা তার সম্পূর্ণ আদল ডক্টর মণ্ডলের বইটিতে ধরা পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকেই জেনেছি, নতুন শিল্প-আন্দোলনের প্রচার তাঁকে উৎসাহিত করত। বোম্বাইয়ের স্কুল অব আর্টস্ তখন এদিককার ছবির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করতেন, তাঁদের নালিশ ছিল, 'আমাদের শিল্পসৃষ্টিতে আমরা একটা পুরোনো চালের ভঙ্গিমা সৃষ্টি করেছি'; রবীন্দ্রনাথ বিজয়ীর উল্লাসে আরো জানাচ্ছেন, নন্দলাল ও তাঁর ছাত্রদের প্রদর্শনী হওয়ায় বোম্বাইয়ের সেই উন্নাসিকেরা দেখলেন 'বিচিত্র ছবি ...তাতে না আছে সাবেককালের নকল না আছে আধুনিকের; তা ছাড়া কোনো ছবিতেই চলতি বাজার-দরের প্রতি লক্ষ মাত্র নেই।' রবীন্দ্রনাথের এই উল্লাস—সত্যিকারের আধুনিক শিল্পবোধের স্বীকৃতিলাভের উল্লাস—নন্দলালকে কি অনুপ্রাণিত করে নি। কিংবা, নন্দলালের মানসিক গঠনের কথা মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া থেকে যে নতুন খবর পাঠিয়েছিলেন, শিল্পীকে কি তা উদ্বুদ্ধ করে নি। ৫ অক্টোবর, ১৯৩০, রাশিয়া থেকে নন্দলালকে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, 'বিপ্লবীরা ধর্মমন্দিরের সম্পত্তির বেড়া ভেঙে দিয়ে সমস্তকেই সাধারণের সম্পত্তি করে দিয়েছে...দেশের সাধারণ চাষীদের কর্মিকদের কৃত শিল্পসামগ্রী, পূর্বতন কালে যা অবজ্ঞাভাজন ছিল, তার মূল্য নিরূপণ করার দিকেও দৃষ্টি পড়েছে।' ভাবতে ভালো লাগে, সেদিন এদেশের শিল্প-আন্দোলনের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে বিপ্লবী রাশিয়ার মূল সুরের সমন্বয় ঘটেছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বর্তমান গ্রন্থের নামপত্রে যখন '—যেমনটি বলেছেন (১৯৪২—১৯৬৬)' চিহ্নিত আছে, তখন কোনো কোনো তথ্যের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নিয়ে গ্রন্থটিকে সমালোচনা করা যায় কিনা। কিন্তু, আমরা লক্ষ্য না করে পারি না, ডক্টর মণ্ডল সর্বত্র কেবলমাত্র অনুলেখকের কাজ করেন নি। যেমন, বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ থেকে হঠাৎ ৬ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'বলেন্দ্রনাথের এই সকল উক্তি যেন নব্যভারত শিল্প-জগতে

নন্দলালের পুণ্য আবির্ভাবের শুভ শঙ্খধ্বনি।' এতো আর নন্দলার বস্থর ভাষা নয়! সবচেয়ে অস্থবিধে হয় যখন গ্রন্থকারের ভাষা ব্যবহার ও নন্দলালের মুখের ভাষার সীমারেখাটি বোঝা যায় না। 'মাংসের হাঁড়ি কাবাব রাঁধতেন নন্দলাল…বাজার থেকে হিং-এর কচুরি-টচুরি কিনে আনা হতো…মহিমবাবু ফল-টল খেতে পছন্দ করতেন না (পৃষ্ঠা-৮৬-৮৭)।' 'কচুরি-টচুরি' 'ফল-টল' যদি নন্দলালের মুখের কথা হয় তাহ'লে তার আলাদা আকর্ষণ আছে, লেখকের ভাষা হলে এ দুর্বল ভাষাব্যবহার। এই শিথিল ভাষাব্যবহারের জন্যই, অসিতকুমার ও নন্দলালের পত্রবিনিময়ের বিবরণটি আকর্ষক হয়েও, অস্পষ্ট। সর্বোপরি, 'হতো', পীড়াদায়ক বলেই মনে হয়। বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত বিদ্বৎজনের এ ধরনের বিকৃত বানানব্যবহার এখন একটু অসঙ্গত লাগে।

ফরাসী প্রশস্তির সুদীর্ঘ উল্লেখ সম্পর্কেও একই অভিযোগ করা চলে। কোন্ অংশটি ফরাসী থেকে উদ্ধৃতি, কোন্টি লেখকের কথা, বোঝা দায়। অর্থাৎ, শিল্পীর কাছ থেকে দিনের পর দিন তাঁরই জীবনকথা শোনার যে অসামান্য সুযোগ ডক্টর মণ্ডল পেয়েছেন তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়ত হয় নি। বইটির প্রকাশনায় ঈষৎ বাণিজ্যিক উৎসাহও আছে সন্দেহ হয়। একশ টাকা দামের বই সাধারণ ক্রেতার নাগালের বাইরেই থাকে, দাম হয়ত একটু কমানো যেত। ৩৮টি ছাপা ছবির মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত অযত্নে ছাপা, না ছাপালেই হত। তবে, একটু নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বর্তমান বইটি আগামী কোনো সুলেখকের রচনার উৎস এবং ভিত্তি হয়ে রইল। এ-ও তো খুব সামান্য কৃতিত্ব নয়। মানুষের কৃষ্টি-সভ্যতা-জ্ঞানচর্চার ধারাবাহিকতা এভাবেই তো অক্ষুণ্ণ থাকে।

বিনয় রায়

অমিতাভ দাশগুপ্ত

বিনয় রায়—এ ট্রিবিউট, পিপলস পাবলিশিং হাউস, নিউ দিল্লি, ১৫ টাকা

বছর তিনেক আগে কলকাতার রবীন্দ্রসদন মঞ্চে একটি গণসঙ্গীত সম্মেলনে উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল। বেশ কয়েকটি সম্মেলনক সঙ্গীত ও একক কণ্ঠের গান সেদিন শ্রোতারা শুনতে পেয়েছিলেন। অধিকাংশ গায়কের চুলের বিন্যাসে, পোশাকে, শরীরের তুমুল সঞ্চালনে ছিল পপ্-গাইয়ে ও মার্কিনি বয়াটে রাখালিয়াদের ভঙ্গি। আর গানের সুর ও শব্দকে ডুবিয়ে ব্রাস, চেলো, ট্রামপেট, হর্ন, ম্যারাকাস, স্যাক্সোফোন, অ্যাকর্ডিয়নের দলোন্মত্ত দাপাদাপি। একসঙ্গে এত খুদে রিঙ্গো বা প্রিস্লে-কে আমি জীবনে দেখি নি।

এ-সবের ফাঁকে, এক দুর্লভ মুহূর্তে একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক সম্পূর্ণ খালি গলায় হঠাৎ গান ধরলেন—'কেক্‌রা কেক্‌রা নাম বাতাউ, জগ মেঁ বরা লুঠেরা হো' (কার কার নাম বলব, দুনিয়ায় লুঠেরা তো খুব কম নেই)। অনাবৃষ্টির মাঠে এক দমক ঠাণ্ডা বাতাস বহে গেল। কণ্ঠ, কথা, সুর—সব কিছু মিলে মিশে এমন-এক নিরাভরণ অথচ সরাসরি ও অপ্রতিরোধ্য আবেদন নিয়ে এল, যা সেই পীড়িত সন্ধ্যার একমাত্র প্রাপ্তি।

এই গান বিনয় রায়ের গান। এই গায়কী বিনয় রায়ের গায়কী। প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের উজ্জ্বলতম দিনগুলি এ-ধরনের গানের মধ্য দিয়েই গণ-সংগীতের পরমার্থ খুঁজে পেয়েছিল। অনায়াস সেতুবন্ধন ঘটেছিল সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে গ্রাম-শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষের। শিল্পের নবজন্মের আবেগ সুর ও কথা পেয়েছিল বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, দেবব্রত বিশ্বাস, প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়-দের গলায়। অমর শেখের অবিস্মরণীয় 'ভাই সাবধান বড়ি আ তুফান' বা 'নয়া তরানা'-র অগ্নিভ উপস্থাপনে। দক্ষিণী লোকগানে। পাঞ্জাবের গণনৃত্য-গীতের পৌরুষ ও সামর্থে। সরল ফ্লুটের সহযোগে পাহাড়ি সুরের বিস্তারে। বৈঠা, হাল আর হাতুড়ির ধাতব সংগীতে।

আন্দোলনের পিঠে আন্দোলন। গানের পিঠে গান বেঁধেছিলেন, সুর দিয়েছিলেন বিনয় রায়। মানুষের তৈরি তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রতিবাদে

'ভূখা হায় বাঙাল', 'আজ বাঙলার বুকে দারুণ হাহাকার', 'ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়ে নয়া বাঙলা গড়ব'। তেভাগার লড়াই-এ 'কাস্তেটা দাও শান হো'। নৌ সেনাদের অমর সংগ্রামের পটভূমিতে 'ইয়ে জেঙ্ হায় জঙ্গে আজাদি'। ক্রীপস মিশনের স্বরূপ-উন্মোচনে 'আয়ে তিন মাদারি'। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ফাঁসিকাঠে শহীদ চার কায়ুর কিষানের বন্দনায়, 'শুনো শুনো', 'ফিরাইয়া দে দে দে মোদের কায়ুর বন্ধুদের'। জাপানি ফ্যাসিস্তদের আক্রমণের প্রতিরোধে গেরিলা কৃষক যোদ্ধার 'হোই হোই হোই জাপান ঐ'। স্বাধীনতার স্বপ্নে উত্তাল 'অব নভমে পতাকা নাচতে হায়'—এ-রকম আরও অসংখ্য ও অনিবার্য গান।

কে এই বিনয় রায়—যাঁকে নতুন প্রজন্মের যুবক-যুবতীরা চেনেন না এবং গণসংগীতের ক্ষেত্রে যাঁর বিপুল অবদানের কথা আমাদের-মতো মধ্যবয়সীরা ইতিমধ্যেই বেমালুম বিস্মৃত হয়েছেন ?

উত্তর বাংলার রংপুরের ছেলে বিনয় রায়ের রাজনীতির হাতে খড়ি হয়েছিল যুগান্তর পার্টিতে। পরবর্তীকালে, আমেদাবাদে সুতাকলে শিক্ষানবিশির সময় শ্রমিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন ও কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। পার্টি বেআইনি থাকাকালীন তিনি তার সভ্য পদ পান।

দেশে ফেরার পর, চল্লিশের একেবারে গোড়ার পর্ব থেকেই তিনি অবিভক্ত বাংলাদেশের গাঁয়ে-গঞ্জে অবিরাম ঘুরে বেড়াতে থাকেন। এই সময় তিনি সংগ্রহ করেন বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগীতির বিপুল সম্ভার। কৃষক আন্দোলনের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে গণসঙ্গীত বাঁধা, সুর দেওয়া ও গাওয়ার কাজ শুরু করেন। কলকাতায় এসে তিনি ডেরা বাঁধেন বেলেঘাটার চটকল-মজুরদের বস্তিতে। তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় কলে-কারখানায়, মাঠে-ময়দানে গাইতে গাইতে বিনয় রায় একজন সংগ্রামী গণশিল্পীতে রূপান্তরিত হন। সারা ভারত গণনাট্য সংঘের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন এই সংস্থার এক প্রধান চালক ও সংগঠক। চল্লিশের গোটা দশক জুড়ে বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানেরা গণনাট্যের মঞ্চ থেকে দেশময় গণমুখী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রসারে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করেছিলেন। মন্বন্তরের ভূখা বাংলার জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের অর্থ-সংগ্রহের কাজে দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন বিনয় রায়। এই সময় বোম্বাই-এর আন্ধেরি অঞ্চলে সংগঠিত হয় গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় ব্যালে ট্রুপ। কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশির আহ্বানে সারা দেশ থেকে বহু বিশিষ্ট

নৃত্যশিল্পী, অভিনেতা, সুরকার, গায়ক ও যন্ত্রী এই ট্রুপে যোগ দেন। সংস্থার সম্পাদকের কাজ নিয়ে বিনয় রায়কে চলে আসতে হয় আন্ধেরিতে। তাঁর নেতৃত্বে এই কেন্দ্রীয় সংস্থা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় দীর্ঘ চার বছর ধরে সারা দেশে অসংখ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে। এই অনুষ্ঠানগুলির মান এত উন্নত ছিল যে উদয়শঙ্করের মতো বরেণ্য নৃত্যশিল্পী বলেছিলেন, বয়সের প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তিনি নিজেই সংস্থার উদ্যোগগুলিতে সরাসরি অংশ নিতেন। এখানেই বিনয় রায় দলে পেয়ে যান রবিশংকর, শান্তি বর্ধন, শচীনশংকর, পৃথ্বীরাজ কাপুর, বলরাজ সাহনি প্রমুখ খ্যাতিমান শিল্পীদের।

১৯৪৭-এ আন্ধেরির দপ্তর গুটিয়ে ফেলা হয়। বিনয় রায় চলে আসেন কলকাতা গণনাট্য সংঘের দায়িত্ব নিয়ে। এই পর্বে তাঁর পরিচালনায় 'শহীদের ডাক' নামে ছায়ানৃত্যটি জনসাধারণের কাছ থেকে বিপুল অভিনন্দন অর্জন করে। ১৯৪৮-এর ২১ জুন ৪৬, ধর্মতলা স্ট্রিটে ফ্রেণ্ডস অফ সোভিয়েত ইউনিয়নের দপ্তরে জয়া রায়ের সঙ্গে বিনয় রায়ের বিবাহ হয়। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও অতিথি ছিলেন গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পীকুল ও প্রগতি সঙ্ঘের কর্মীরা।

১৯৪৯। পার্টি বেআইনি। সম্পূর্ণ আত্মগোপনরত অবস্থায় বিনয় রায় সস্ত্রীক যে কী ভাবে একদিন মস্কো পৌঁছে গেলেন, সে-রহস্য আজও আমাদের অজানা। পার্টির নির্দেশ অবশ্য সে-রকমই ছিল ; কিন্তু দেশের চূড়ান্ত প্রতিকূল পরিবেশে তা পালন করা অসাধ্য সাধনই বলতে হবে।

সমস্ত ব্যাপারটা খুব গোপন রাখা হয়েছিল। সাধারণ পার্টি-কর্মীরা তো বটেই, অধিকাংশ নেতাও জানতেন না বিনয় রায়ের হদিশ।

ঘুরতে ঘুরতে জয়া রায়-বিনয় রায় ১৯৫০-এর ৯ এপ্রিল মস্কোয় পা দিলেন। সেখানকার বেতার কেন্দ্র থেকে এক সন্ধ্যায় দেশবাসীর কাছে ভেসে এল বিনয় রায়ের অতি-প্রিয়, অতি-পরিচিত গলা।

বস্তুত তাঁকে সেখানে এক অল রাউণ্ডারের ভূমিকা নিতে হয়েছিল। তাঁর প্রাথমিক কাজ ছিল বেতারে বাংলা কর্মসূচি ঘোষণা করা। কিন্তু উর্দু ভাষার কাজও তাঁকে টানা তিন বছর চালাতে হয়েছিল। বন্ধুরা বেতারে প্রচারের জন্য যে-সব বাংলা কথিকা অনুবাদ করতেন, সেগুলো তাঁকে সংশোধন ও সম্পাদনা করতে হত। ভারতীয় খবর, নিবন্ধ, সংগীত, সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, কথিকা—এ-সব কিছুর তিনিই ছিলেন একমাত্র উপদেষ্টা। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন, গানও পরিবেশন করতেন মাঝে মাঝে। বি বি সি থেকে তাঁকে তো

দুনিয়ার অন্যতম প্রধান ঘোষক আখ্যা দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়েছিল। কিছুকাল পর তাঁর স্ত্রী জয়াও নারী, শিশু, ধর্ম, কলকারখানা ও শ্রমিক ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত কথিতা পাঠ করতে ও শ্রোতাদের চিঠির উত্তর দিতে থাকেন মস্কো বেতারে।

এ-ছাড়া ছোটদের বইও অনুবাদ করতে শুরু করেন বিনয় রায়। মস্কোয় যখন 'সোনি মহিওয়াল' বা অন্যান্য ভারতীয় নাটক অভিনীত হয়, তখন প্রচুর খাটাখাটনি করতে দেখা গেছে তাঁকে। নতুন উদ্যমে আবার গান লিখতে ও গাইতে শুরু করেন তিনি। রশিদা বাইবুতভ, জারা দালুখানোভার মতো বিশ্ব-বিশ্রুত সোভিয়েত গায়িকাদের সঙ্গে একযোগে বহু গান লক্ষ লক্ষ শ্রোতার সামনে পরিবেশনও করেছেন।

এরই পাশাপাশি প্রবল নিষ্ঠায় মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট অফ ফিলজফিতে ছ-বছর একনাগাড়ে পড়াশোনা করেন তিনি। এই বছরগুলিতে তাঁকে পঁয়তাল্লিশটি বিষয়ে পাঠ নিতে হয়েছিল এবং সবই রুশ ভাষায়। ১৯৫৯-এর নভেম্বর মাসে বিনয়-জয়া দেশে ফিরে আসেন।

কয়েকবছর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে রুশ ভাষার অধ্যাপনা করার পর ১৯৬৫-তে সদ্য গঠিত ইনস্টিট্যুট অফ রাশিয়ান স্টাডিজ্-এ রীডার হিসেবে তিনি যোগ দেন। পরবর্তীকালে, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন এবং রুশ ভাষার বিভাগীয় প্রধান হিসেবে মৃত্যু পর্যন্ত কাজ করে যান।

রুশ ভাষা শিক্ষকদের জন্য আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে যোগ দিতে ১৯৭৯-র জুনের শেষ দিকে আবার মস্কোয় যান বিনয় রায়। এবং, তেসরা জুলাই সেখান থেকে পি টি আই বহন করে আনে এক সর্বনাশা খবর— 'জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিয়ান ভাষা-কেন্দ্রের প্রধান অধ্যাপক বি. কে. রায় আজ ভোরে এক পথ-দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।'

জীবনের এই অতি-সংক্ষিপ্ত, কেজো রূপরেখা দিয়ে বিনয় রায় ও তাঁর অবদানকে মাপতে যাওয়া মূর্খতা। চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, শ্রমিক-কৃষকের অভ্যুত্থানে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিরোধে দেশের সাধারণ মানুষের যে বিক্ষোভ-বিদ্রোহ ও সংগ্রাম উত্তাল হয়ে উঠেছিল, সেই ভরা আবেগের এক মহান প্রতিনিধি ছিলেন গায়ক, গীতিকার, সুরকার, সংগঠক ও কমিউনিস্ট বিনয় রায়। আন্দোলন তাঁকে জন্ম দিয়েছিল, তিনি

আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিনয় রায়কে জানা মানে আমাদের একটা গোটা কালপর্বের সাংস্কৃতিক-রাজনীতিক ইতিহাসকে জানা।

এই বিষয়টি মাথায় রেখেই নয়া দিল্লির পিপলস পাবলিশিং হাউস নামে প্রগতিশীল প্রকাশক সংস্থা বিনয় রায়ের সম্মানে একটি রচনা সংকলন সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। ইংরাজিতে প্রকাশিত সংকলটির নাম 'বিনয় রায়—এ ট্রিব্যুট'। বিনয় রায়ের যোগ্যা সহধর্মিনী জয়া রায় একান্ত পরিশ্রম করে সংকলনটির জন্য অনেকগুলি রচনা সংগ্রহ করেছেন দেশ-বিদেশ থেকে। তা ছাড়া বিনয় রায়ের ওপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধও লিখেছেন তিনি—যার মধ্যে একই সঙ্গে তথ্যনিষ্ঠা ও দুর্লভ উপলব্ধির সুসম রসায়ন ঘটেছে। ব্যক্তিগত অনুভব ও নৈর্ব্যক্তিক চেতনার এমন সমন্বয় খুব বেশি দেখা যায় না। এই মর্মস্পর্শী আলেখ্যটি বারবার পাঠ করতে ইচ্ছে হয়।

সংকলটি থেকে পাঠকদের সেরা প্রাপ্তি অবশ্য খোদ বিনয় রায়েরই চারটি আলোচনা। গণ সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে উদয়শংকর, জনযুদ্ধের গান, গান ও নাচে দেশপ্রেমের আবেগময় প্রকাশ ও আধুনিক পোলিশ থিয়েটার—এই চারটি বিষয়ের পর্যালোচনা করেছেন বিনয় রায়। তাঁর লেখার ভঙ্গি ঋজুতায় স্বচ্ছ, অতিরেকহীন আশাবাদে উজ্জ্বল ও তথ্যসমৃদ্ধ।

সংকলনটির বেশ কিছু লেখা বাংলা থেকে অনূদিত। হিন্দি থেকে ও রুশ থেকেও—সম্ভবত। বাকি লেখাগুলি সরাসরি ইংরাজিতেই।

১৯৪৩ সালের ৭ জুন পি. সি. যোশি-সম্পাদিত 'পিপলস ওয়ার'-এর পাতা থেকে একটি অনবদ্য রিপোর্টোজ সংকলনটিতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে—'বিনয় রায় লীড্‌স্ মাস আপসার্জ'। বিনয় রায়ের ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় এই মূল্যবান দলিলটি ধারণ করেছে।

জয়া রায়ের রচনাটি ছাড়া যে লেখাটি আমাদের মর্মকে সরাসরি বিদ্ধ করে, সেটি বিনয় রায়েরই আমৃত্যু-সাথী, গণ-সংস্কৃতি আন্দোলনের আর এক প্রধান ব্যক্তিত্ব এবং রবীন্দ্রনাথের পর সম্ভবত শ্রেষ্ঠ গীতিকার ও সুরস্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর একটি কাব্যময় প্রবন্ধ। গণনাট্য সঙ্ঘের জোয়ারের দিনগুলি তো বটেই, দিল্লিতে দুই প্রবাসী বন্ধুর শেষ বছরগুলির আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে আলোড়িত জীবন-চর্চার এই আখ্যানটি আমাদের আপ্লুত করে রাখে। প্রায় এই একই মেজাজের একটি ছোট্ট লেখা আছে দেবব্রত বিশ্বাসের। পড়তে ভালো লাগে বিনয় রায়ের প্রতি অনুজ শিল্পী সলিল চৌধুরী ও ভূপতি নন্দীর অকপট লেখা দুটি। সে-কালের বিশিষ্ট গায়িকা প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়,

অভিনেত্রী শোভা সেন ও নিবেদিতা দাসের স্মৃতিচারণা এক লহমায় আমাদের সেই গনগনে দিনগুলির মাঝখানে টেনে নিয়ে যায়।

সবচেয়ে তথ্যবহুল লেখাটি অবশ্য সুধী প্রধানের। তবে এই রচনায় বিভিন্ন আন্দোলনের পর্যায়গুলিতে বিনয় রায়ের সাংগঠনিক ভূমিকা নিয়েই বস্তুত আলোচনা করা হয়েছে। যাকে বলা যায় 'সেন্টিমেন্টাল জার্নি', তার একটি চমৎকার উদাহরণ হীরেন মুখোপাধ্যায়ের 'বিনয় রায়'। গৌতম চট্টোপাধ্যায় যখন ছাত্র-আন্দোলনের নেতৃত্বে, তখন বিনয় রায়কে তিনি কী ভাবে দেখেছেন, তার এক অনুপ্রাণিত বর্ণনা রয়েছে তাঁর আবেগমথিত রচনায়। অল্প কথায় বিনয় রায়কে জীবন্ত করে তুলেছেন চিন্মোহন সেহানবীশ। তবে, এই সংকলনের সবচেয়ে মননদীপ্ত ও গভীরতায় সমৃদ্ধ প্রবন্ধটির রচয়িতা গোপাল হালদার। 'ন্যাশনাল ওরিয়েন্টেশন অব বেঙলি কালচার'-এর তাৎপর্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বিনয় রায়কে একটি প্রতীকী চেহারায় তুলে ধরেছেন।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিনয়—এ ট্রিব্যুট' এই আলোচনাটি লিখেছেন শম্ভু মিত্র, সুধী প্রধান, রেবা রায়চৌধুরী, সজল রায়চৌধুরী ও প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথাবার্তার ভিত্তিতে। ইংরেজি অনুবাদেও বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথের রচনার মেজাজ কমবেশি ধরা পড়েছে। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাটিতে বিনয় রায়কে উপলক্ষ করে গত পাঁচ দশকের বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অভিমান, জয়-পরাজয় ও আত্মিক বিশ্লেষণের এক বিশদ ও বিতর্কিত রূপ আমাদের ভাবিয়ে তোলে। কোনো আপ্তবাক্য আবৃত্তি ও সরলীকরণের মধ্যে না গিয়ে লেখক এখানে এমন কিছু কঠিন সত্য উচ্চারণ করেছেন, যেগুলিকে আজ আর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

বাংলার বাইরে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন বা আছেন, তাঁদের কয়েকজনের লেখা সংকলনটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এঁদের মধ্যে আছেন কে. পি. এস. মেনন, ভীষ্ম সাহনি, সরলা শর্মা, গোবিন্দ বিদ্যার্থী, নরেন্দ্র শর্মা, রজনীকুমার, জগদীশ লাল, ধনবন্ত ওঝা, এম. পি. পাণ্ডে ও আর. এম. বাকাইয়া। সরলা শর্মা ও ভীষ্ম সাহনির লেখা থেকে সর্বভারতীয় স্তরে গণ-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ার ব্যাপারে বিনয় রায়ের ভূমিকা সম্পর্কে বেশ কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যায়।

তিনজন রুশী লেখক-লেখিকা বিনয় রায়ের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন

করেছেন। মস্কোয় বিনয় রায়ের কাজকর্মের আলোচনায় লেখাগুলি সমৃদ্ধ। মস্কো বেতারের ভারতীয় সাংস্কৃতিক কর্মসূচির পরিচালক লেভ নিকোলায়েভিচ নেক্রাসভ বেতারকর্মী হিসেবে বিনয় রায়ের শ্রম, নিষ্ঠা ও উদ্যোগের বিশদ পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। এই লেখায় সব ছাপিয়ে মানুষ বিনয় রায়ের ছবিটি অনবদ্য ভাবে ফুটে উঠেছে।

রুশি গায়িকা তামারা খানুমকে ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে প্রথম অবহিত করেছিলেন বিনয় রায়। জয়া রায়ের কাছে লেখা একটি চিঠিতে এ জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন তামারা। ছোট্ট অথচ ভারী মর্মস্পর্শী চিঠি।

বহুমুখী কর্মকাণ্ডে বিনয় রায়ের প্রগাঢ় উৎসাহের চমৎকার পরিচয় মেলে মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটির এশীয়-আফ্রিকেয় বিভাগের ডোসেন্ট এন. এম. সাজানোভা-র লেখাটিতে।

বিনয় রায়, তাঁর পরিবেশ ও তাঁকে কেন্দ্র করে যে গণমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলন এক দশক ধরে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যার কম্পন গিয়ে পৌঁছেছিল আন্তর্জাতিকেও, সে-সম্পর্কে নতুন ভাবে আমাদের বিক্ষিপ্ত ও বিস্মৃত ভাবনাগুলিকে গুছিয়ে তোলবার কাজে এই সংকলনটির পরিকল্পনা রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ। প্রকাশক সংস্থা পিপলস পাবলিশিং হাউস ও জয়া রায়কে আমাদের সবার তরফ থেকে আবার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দায়হীন ইতিহাসচর্চা

শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়

চিকিৎসা শাস্ত্র যুগে যুগে—ড. অশোককুমার বাগচী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আঠারো টাকা

বাংলা ভাষার প্রকাশনার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ বিগত কয়েক বছরে নিজেদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রমুখের সান্তর প্রয়াসে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা গভীর জটিল তত্ত্ব আলোচনার যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যে বাংলাভাষার উত্তরাধিকার, সাম্প্রতিক সেই ধারাটি ক্ষীয়মাণ। এই সেদিন পর্যন্ত বাংলায় গুরুগম্ভীর বিষয়ের সরস প্রাঞ্জল আলোচনা আমাদের নজর কেড়েছে। সম্প্রতি, কয়েকটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে, তন্নিষ্ঠ শাস্ত্র আলোচনা বাংলায় দুর্লক্ষ্য। এই পরিবেশে, সরকারি আনুকূল্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ জ্ঞানবিজ্ঞানের বহুধাবিস্তৃত শাখার বই বাংলায় প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রথম দিকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের টেক্সট বই রচনা ও অন্যভাষায় রচিত বিশিষ্ট ও প্রধান কয়েকটি বই-এর ভাষান্তরের বৃত্তেই পর্ষদ নিজেদের কর্মসূচিকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম বহির্ভূত পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রেও পর্ষদ উদ্যোগী হন। যার ফলে আমরা পরিভাষা সংক্রান্ত বই, নানা অভিধান এবং সাধারণ পাঠকদের জন্য আরও অনেক বই আমাদের মাতৃভাষার নাগালের মধ্যে পেয়ে যাই। আলোচ্য গ্রন্থটি এই কর্মসূচির অন্তর্গত।

সাধারণ পাঠকদের উদ্দেশ্যে রচিত চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাস বিষয়ক বই 'চিকিৎসা শাস্ত্র যুগে যুগে' মুখবন্ধে লেখক আমাদের আশ্বস্ত করেন, ইচ্ছাকৃতভাবেই পুস্তকটির আকার সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, কেননা কৌতূহলী পাঠকবর্গের মনে ভীতি উদ্রেককারী বৃহদাকৃতি পুস্তক প্রণয়নে আমার একান্ত অনীহা। লেখক অশোককুমার বাগচী নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের বিভাগীয় প্রধান; এ ছাড়াও দেশীবিদেশী নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত। তাঁর নামের পাশে অসংখ্য ডিগ্রির বহর দেখে আমাদের রোমাঞ্চ হয়, আবার উদ্ধৃত আশ্বাসবাক্যটির প্রশ্রয়ে অনেক প্রাপ্তির আশা নিয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত বইটি পাঠে উদ্যোগী হই।

ভূমিকাতেই আমাদের হোঁচট খেতে হয়। কেননা, লেখক জানান আজ

থেকে কোটি কোটি বছর আগেই নাকি বানররূপী প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। আমরা জানি, বানর-মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম পিথেকানথ্রপুস। সেই কয়েক লক্ষ বছর আগেকার কথা। এ ছাড়াও মনুষ্যেতর প্রাণী হোমিনয়েড থেকে হোমিনিডি গোত্রের মনুষ্য-প্রায় প্রাণীর উদ্ভব, আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুমান অনুযায়ী, হয়েছিল মিয়োসিন যুগের আদিপর্বে, অর্থাৎ আনুমানিক আড়াই কোটি বছর আগে। মুখবন্ধ ভূমিকা, পরিশিষ্ট ও তথ্যের সূত্র ছাড়া বইটির বিষয় পরিচিতিতে সাঁয়ত্রিশটি অন্তর্ভাগ আছে। প্রাচীন ভারতীয়, চৈনিক, শ্যামদেশীয়, মিশরীয়, আরবী, য়ুনানী চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে শুরু করে উনিশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞানের অবদান, বিশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র, আধুনিক শল্য চিকিৎসা ইত্যাদি নানা বিষয়ের অবতারণা আছে।

বইটি পাঠান্তে আমাদের মনে এরূপ সন্দেহ জাগে, অসংখ্য ডিগ্রির অলঙ্কারে ভূষিত পণ্ডিত আমাদের মতো সাধারণ মানুষজনের প্রতি নিছক করুণাবশত মাতৃভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন, অন্যতর কোনো দায়বদ্ধতার তাগিদে নয়। ফলত এই পুস্তক প্রণয়নে চিন্তাসমৃদ্ধ কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনার ছাপ নেই। নানা বিষয়ের আলোচনা আছে বিক্ষিপ্তভাবে, কিন্তু কোন চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব কী, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতটুকু সে সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। আমরা ইতস্তত অনেক তথ্যের সাক্ষাৎ পাই, যদিচ, এগুলি বিশ্লেষণের কোনো দায় লেখক নেন নি, এমন অনেক চমকপ্রদ তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে, যার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে স্বতই প্রশ্ন ওঠে। কোন চিকিৎসক জাতিস্মর ছিলেন (লেখক জাতিস্মরে বিশ্বাসী ?), শৈশবে সমগ্র কোরান আবৃত্তি করতে পারতেন—এ রকমের উক্তি অজস্র। নানা ভাষায় রচিত হরেক বই-এর মূল নাম দেখে লেখকের ভাষাজ্ঞানের বহরে আমরা চমৎকৃত হলেও, এগুলির অন্যতর তাৎপর্য আমাদের কাছে অব্যাখ্যাত রয়ে যায়। এমন কি বইগুলিতে কোনো নূতন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আছে কিনা সে বিষয়েও লেখক কিছুই লেখেন না।

ইতিহাস নিছক তথ্যের সমাহার নয়ই, বিজ্ঞানের ইতিহাসও নয়। ইতিহাসবোধ তথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতিরেকে ভূরি ভূরি তথ্য সংগ্রহের বাতিক সম্পর্কে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক উক্তিটি আমাদের বিচারে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নীডহ্যাম, গর্ডন চাইল্ড এক ধরনের আদর্শ স্থাপন করেছেন। সবাইকে সেই আদল মেনেই লিখতে

হবে এমন দাবি করছি না। সামাজিক-আর্থনীতিক পটভূমিতে বিজ্ঞানের বিকাশ, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আদৌ কোনো আলোচনা নেই—আলোচ্য বইটি সম্পর্কে এ ধরনের কোনো অভিযোগও তুলছি না। সমরেন্দ্র নাথ সেন-কৃত বিজ্ঞানের ইতিহাস-এও এইসব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নেই, তবুও অন্যতর বিশ্লেষণে বইটি সমৃদ্ধ। বর্তমান গ্রন্থটিতে, লেখকের অনবধানতাবশত এমন কয়েকটি ভ্রান্তি আছে যা সহজেই পরিহার করা চলত। ভারতের প্রাচীনতম গুহাচিত্রটি তাম্রযুগের মানুষের আঁকা (পৃঃ ৫), এমন উদ্ভট তথ্য কী ভাবে সন্নিবিষ্ট হল জানি না। সমস্ত 'পরমাণু সমঘর' থেকে গামা রশ্মি নির্গত হয় (পৃঃ ১৬)। রেডিও আইসোটোপকে 'পরমাণু সমঘর' লিখলেন কোন্ যুক্তিতে? রেডিও অর্থে তেজস্ক্রিয়, আর পরমাণু তো অ্যাটমের প্রচলিত ও স্বীকৃত প্রতিশব্দ। সরল ও যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্য বোঝাতে গিয়ে লেখক সরল ও যৌগিক লেন্সের কথা লিখেছেন একাধিকবার (পৃঃ ৫২)। সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র তো একটি যে কোনো বিবর্ধক কাচ বা একটি উত্তল লেন্স মাত্র। লেখক লেন্স আবিষ্কারের কৃতিত্বটাও গালিলেওকে পাইয়ে দিলেন কোন্ ঐতিহাসিক সূত্রের সৌজন্যে (পৃঃ ৫১)? বাংলায় সর্বজনস্বীকৃত বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাব আছে বলেই কি এ্যানেস্থেসিয়ার প্রতিশব্দ হিসাবে 'স্পর্শলোপ' মানতে হবে (পৃঃ ৩১)? এই প্রসঙ্গে পর্ষদ প্রকাশিত ও দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রণীত পদার্থবিদ্যার পরিভাষা সংক্রান্ত বইটির উল্লেখ করতে পারি। যথার্থ মূল্যবান গ্রন্থ। পর্ষদ কর্তৃপক্ষ অন্যান্য বিষয়েও এইরূপ পরিভাষা গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিলে বাঙালির কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

বইটিতে নানা চিকিৎসা পদ্ধতির কথা উল্লিখিত হয়েছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে একটি কথাও নেই। নিছক ব্যক্তিগত ভালো-লাগা-না-লাগার ঊর্ধ্বে উঠেই ইতিহাস রচনায় ব্রতী হওয়া যায়। হোমিওপ্যাথি বাদ দিলে 'চিকিৎসাশাস্ত্র যুগে যুগে'-র অঙ্গহানি হয়। বইটিতে এমন আবেগেরও প্রকাশ ঘটেছে যা সঙ্কীর্ণতাবাদদুষ্ট। যেমন,'আজ পৃথিবীতে আধুনিক বিজ্ঞানের এমন কোনও শাখা নেই যা হিন্দু পণ্ডিতগণের অগোচরে ছিল' (পৃঃ ৪), অথবা 'চিত্রটিতে দেখা যায় তাম্রযুগের কতিপয় শিকারী একটি বন্যমহিষের হৃদযন্ত্রের দিকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপরত। সুতরাং স্বতই প্রমাণিত হয় যে তারা হৃদযন্ত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন' (পৃঃ ৫-৬)।

যে চিত্রটি দেখে লেখকের এই ত্বরিৎ-সিদ্ধান্ত সেটি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত (চিত্র-৮)। শরীরের মধ্যভাগের দিকে তাক্-করা অস্ত্র দেখে তৎকালীন

ভারতীয়দের হৃদযন্ত্রের অবস্থান সংক্রান্ত জ্ঞানের সঠিক হদিশ পেয়ে যান লেখক। হিঁদুয়ানি-আচ্ছন্ন দৃষ্টির দৌলতে রামায়ণের পুষ্পক রথে আজকের এরোপ্লেন-এর নিশ্চিত প্রমাণ এর আগেও আমরা পেয়েছি। 'সব বেদেই আছে'—মার্কাদাবিদারদের সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় মেঘনাদ সাহা-র কঠোর ব্যঙ্গোক্তিটি এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসাবিষয়ক আলোচনায় পরিবেশ বিজ্ঞানের দু-চার কথা অত্যন্ত জরুরি। পরিবেশ ও তার দূষণ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে লেখক কিছুই লেখেন নি। এই সম্পর্কিত সাম্প্রতিক ভাবনাচিন্তা, চিকিৎসার ফলে উদ্ভূত জটিলতা, যেমন ওষুধ এবং বিকিরণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও লেখক কিছুই জানান না। দীর্ঘ আলোচনা নয়। সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ে অবহিত করার দায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের ঐতিহাসিকরা আজ আর এড়াতে পারেন না। বইটিতে আর্টপ্লেটে ছাপা বেশ কয়েকটি ছবি আছে। মুদ্রণের কাজ সুন্দর, কিন্তু কোনো বক্তব্যের সূত্র ধরে আসে-নি ছবিগুলি, বরং কোনো কোনো ছবি থেকে লেখক এমন সব হঠকারী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যা ফনিকেন-সুলভ ভ্রান্তির তুল্য।

ব্যক্তি, নন্দন ও সমাজ

সমীর ঘোষ

শিল্পী, শিল্প ও সমাজ শোভন সোম অনুষ্টুপ প্রকাশনী ১৯৮২ কুড়ি টাকা

বাংলা ভাষায় শিল্প বিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য স্বল্পতার মতে, আমরা সার্বিক ঐক্যে অনায়াসেই পৌঁছে যেতে পারি। যদিও তৎপর অনুসন্ধানে শিল্প সম্পর্কিত গ্রন্থ কিংবা পত্র-পত্রিকার ঐতিহ্য কিংবা প্রকাশনার ইতিহাস শতবর্ষের সীমা ছেড়ে গেছে অনেক দিনই। তথাপি সংখ্যাতত্ত্বে এবং গুণমানের বিচারে তা খুবই হতাশাজনক। চিত্র-ভাস্কর্যের সৃজনধারায় যে ঐতিহ্য শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছে বহু দূরে, পাশাপাশি কিন্তু এতদ্ বিষয়ে আলোচনা খুব বেশি ব্যাপ্তি পায় নি। নানা কারণের মধ্যে অন্তত জনচেতনায় বা জীবনবোধে এই মাধ্যমের প্রতিক্রিয়া তেমনভাবে প্রভাব ফেলতে পারে নি। কিংবা সঠিক প্রক্রিয়ায় আমরা শিল্পবিষয়ের বিশ্লেষণী যথার্থতা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পারি নি। পারি নি ছবির প্রতি অনুশীলনজাত দৃষ্টিপাতের অনিবার্যতা প্রমাণ করতে।

চিত্র-ভাস্কর্যের দৃষ্টিগ্রাহ্যতার বিকল্প, ভাষার তাত্ত্বিক আলোচনায় কখনই সম্ভব নয়। চিত্র-ভাস্কর্য অনুভবের সম্পূর্ণতা একমাত্র দর্শনেই সম্ভব। এমন কি মুদ্রণ সৌকর্যের চূড়ান্ত সীমাতেও প্রকৃত রসাস্বাদন ব্যাহত হতে বাধ্য। সতর্ক অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে তো বটেই। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রাথমিক শিল্পজ্ঞান সঞ্চয় এবং রসিকজনের ভাবনার ক্রমপরিণতি ও জিজ্ঞাসু মননকে নিয়ত-প্রক্রিয়ায় পরিশীলিত করার প্রয়োজনে শিল্প ও শিল্পীবিষয়ক যুক্তিবাদী অনুসন্ধানী রচনা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার, এই আলোচনা সংকীর্ণতা মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তা শিল্প ও শিল্পীর সার্বিক স্বার্থেই।

'শিল্পী, শিল্প ও সমাজ'—শোভন সোমের শিল্প-বিষয়ক গ্রন্থের শিরোনাম। নামেই কিঞ্চিৎ পরিচয়ের ইঙ্গিত মেলে। শুধুমাত্র শিল্পী বা শিল্পতত্ত্ব নয়, সমাজ এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত বিষয়ে সম্পৃক্ত। ভাবনার সাজুয্যে অবশ্যই যুক্তিগ্রাহ্য। সমাজ বিন্যাসের ধারায় এবং সম্পর্কিত অনুষঙ্গের কারণে শিল্পী কখনই সমাজ-বিযুক্ত নন। পারস্পরিক সম্পর্কের কারণেই তা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং শিল্পীর আলোচনায় অর্থাৎ ব্যক্তিক চরিত্র বৈশিষ্ট্যের পারম্পর্য বিন্যাসে বা তাৎপর্য

উদঘাটনে সমাজ সম্পর্ক অবশ্যই অগ্রগণ্য। গ্রন্থকারের সচেতন প্রয়াস এক্ষেত্রে অবশ্যই বিশিষ্ট।

শিল্পের নান্দনিক ভূমিকার পাশাপাশি স্বজনকর্তার ব্যক্তিক সত্তার সামাজিক দায়, এই বিপরীত বাহুদ্বয়কে মেলানো কিংবা ব্যবধানের সমান্তরাল রেখা টানার প্রচেষ্টা শুধু চিত্র-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেই নয়, সব শিল্প মাধ্যমের ক্ষেত্রেই ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। স্বজনের প্রেক্ষাপটে সমাজ বা সমাজের মুখ্য-নিয়ন্ত্রক মানুষের উপস্থিতি বিষয়ে তেমন বিরোধ বোধ করি তীব্র নয়। সমস্যা মুখ্যত নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মাতার সামাজিক দায়ভাগের সীমা নিয়ে। কোনো ক্ষেত্রে দায়ের সম্পূর্ণটাই বর্তায় শিল্পের ওপরে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে দায়কে সার্বিক অস্বীকারের ঘটনাও ঘটে থাকে। এই অস্বীকৃতি অনেক ক্ষেত্রেই নৈরাজ্যের প্রশ্রয়ে অধিক মাত্রায় ক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে, যা শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়ায় বিপর্যস্ত করে। আবার বিপরীতে দায়বদ্ধতার সীমার অপরিণামদর্শী ব্যবহারে শিল্পের আত্মিক অনুভূতিকে ব্যাহত করে, যান্ত্রিক ব্যবহারে তা কৃত্রিম হয়ে পড়ে। তবে শিল্পসৃষ্টিতে স্বজনকর্তার সামাজিক দায়বোধকে মেলাবার পরিমাণসূচক নির্দিষ্ট না হওয়ার জন্য ব্যক্তিবোধের ভিন্নতায় নানান চরিত্রগত ধারায় প্রকাশ পায়। আর এই বিভিন্নতাই বিতর্কের অবকাশকে ক্রম প্রলম্বিত করেই চলেছে।

'শিল্পী শিল্প ও সমাজ'—গ্রন্থের প্রাক্ কথনে প্রকাশকের কয়েকটি মন্তব্য, এই গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনায় অত্যন্ত জরুরি। প্রথমেই তিনি এমন একটি মন্তব্য করেছেন যা আমাদের কিঞ্চিৎ দ্বিধায় ফেলে দেয়। 'প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি বিশেষ অবহেলিত দিক হল চিত্র ভাস্কর্য প্রভৃতি। চল্লিশে ফ্যাসিস্ত আক্রমণের মুখে তৎকালীন আন্দোলনের নেতারা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অবহিত হবার প্রয়াস পেয়েছিলেন।' কিন্তু এ মন্তব্যের মধ্যে নাটকীয়তার আভাস থাকলেও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা চলে পরবর্তী মন্তব্য। তবে শিল্পকে মৌখিকভাবে সামাজিক তাৎপর্যে দেখা হলেও কার্যত পোস্টার আঁকার মর্যাদা দেওয়া ছাড়া শিল্পীদের নিয়ে তাঁরা আর কিছু করেছিলেন কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে।'—কিসের সন্দেহ? কেন এই সন্দেহ? আমাদের তৎকালীন এবং বহমান রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত নেতৃবৃন্দ এবং বিশ্বাসী কর্মীদের কেউই সমাজ-বিযুক্ত নন। ফলত শিল্পের ব্যাপ্ত প্রসার না ঘটার জন্য সমাজের সকল ক্ষেত্রেই যে ঘাটতি রয়ে গেছে, রাজনীতির মানুষজনেরাও সেই ঘাটতির প্রভাবে আক্রান্ত। বিরল ব্যতিক্রমে

একজন অবশ্যই স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হয়েছেন বা আছেন। তাঁদের ক্ষেত্রে অন্যতর দায় অবশ্যই বর্তায়। সে দায় হল, সংস্কৃতির চেতন স্বরূপ প্রকাশ। পাশাপাশি শিল্পীর ব্যক্তিক সচেতনতা, শিক্ষা এবং সামাজিক দায়বোধ তাঁর সৃজন-সক্ষমতার মেলবন্ধনে চূড়ান্ত হয়ে ওঠার পক্ষে বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। যেমন এদেশে নন্দলাল বসুর হরিপুরা কংগ্রেসের মণ্ডপসজ্জার পোস্টারগুলি। আক্ষরিক শব্দ-সমন্বয়ের যান্ত্রিক প্রচারপত্র নয়, বরং উদ্গত উদ্ভাসের দ্যুতি-যুক্ত সমাজ-জীবনের টুকরো টুকরো দৃশ্যকল্প। সেই কারণেই এই পোস্টারগুলি কালের সীমা বা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের দায় মেটাবার পরেও শিল্প হিসেবে অনায়াস স্থায়িত্ব পেয়েছে। যেমন জয়নুল আবেদিন চিত্তপ্রসাদ সোমনাথ হোরের ছবির সামাজিক রূপবিন্যাস, সত্যভাষণের অনিবার্যতা সাবলীল ছন্দে মিশে গেছে শিল্পের নন্দন-সীমায়। সময় পেরিয়ে তা আশ্রয় পেয়েছে সময়োত্তীর্ণ নান্দনিক স্থায়িত্বে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, শিল্পের মাধ্যম বা আঙ্গিক প্রকরণ, ভাবনার প্রকাশকে অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করে। গদ্য রচনার ক্ষেত্রেও এই প্রকরণ-প্রয়াস বিষয়কে নানা ব্যঞ্জনা জোগায়। সেক্ষেত্রে সামাজিক দায় এবং শিল্পমাধ্যমের স্ব-নির্ভরতা অনেক সময়ই নানা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। অবশ্য এই দ্বন্দ্বের অধিক অংশই সংকীর্ণতার শিকার। অনুভূতিহীন যান্ত্রিক বক্তব্য স্থাপন কিংবা পূর্বনির্দিষ্ট স্থির সিদ্ধান্তে অনড় হওয়া যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণে বাধা স্বরূপ। বহু বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রেই যথাযথ শিল্পবোধ এবং দৃষ্টি ও ভাবনার স্বচ্ছতার অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। যথাযথ শিক্ষার অভাবে শিল্পমাধ্যমের বিচার-বিশ্লেষণে এঁরা প্রায়শই বিভ্রান্তির জালে নিজেকে ও অন্যান্যদেরও জড়িয়ে ফেলেন। বিগত সময়ের দীর্ঘ অবসর সত্ত্বেও আমরা এখনও পর্যন্ত বিকল্প কোনো সংস্কৃতি কিংবা লক্ষ্যপথ নির্দেশ করতে পারি নি। না পারার কারণের মধ্যে এই যুক্তিহীন সংকীর্ণতাকেই অনেকাংশে দায়ী করা চলে। এ আত্মসমালোচনা আজ আর আমরা কেউই এড়িয়ে যেতে পারব না।

প্রকাশক মন্তব্য করেছেন, 'শিল্পালোচনার ক্ষেত্রে ধনবাদী নিরিখ ছাড়া অন্য নিরিখে দেখার চেষ্টাও বিশেষ হয় নি।'—এই মন্তব্য অনেকাংশেই অপ্রিয় সত্য। কিন্তু মন্তব্যের প্রসঙ্গ ছুঁয়েই তিনি বলেছেন শিল্পালোচনার যে নতুন ধারার প্রকাশ ঘটেছে, তার মধ্যে ফ্রন্টিয়ার অন্যতম। কিন্তু ভাবলে অবাক লাগে ফ্রন্টিয়ারের একদা সমালোচক আজ বাণিজ্যিক কাগজে 'ধনবাদী নিরিখের' অন্যতম কলা-আলোচক। বিপরীতে কালকের কলাকৈবল্যবাদী, চকিতে

স্পষ্টবাক্ বিপ্লবী হয়ে যান। এই কি যথার্থ অন্য ধারার শিল্প-সমালোচনার পূর্বাভাস? কিংবা নিছক আত্মপ্রচারের মহিমা কীর্তনের কারণে পদস্থ ভিত্তি-ভূমির অন্বেষণ? আসলে আমাদের শিল্প সৃজনে যেটুকু ব্যক্তির স্বরূপ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব তা পাওয়া যায়। কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে অধিকাংশই অসত্য ভাষণে আরোপিত। সংস্কার ও সংকীর্ণতামুক্ত যুক্তিবাদী বিশ্লেষণী ধারার সমালোচক খুবই সীমিত। বিশেষত শিল্প-বিষয়ে যথার্থ শিক্ষিত, উপযুক্ত সমালোচকের অভাবে, বোধহীন সমালোচনায় দর্শক ও শিল্পী উভয়ই বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন। এদেশীয় ঐতিহ্যে একমাত্র বিরল ব্যতিক্রম শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। মৌলিক সৃজনে, শিল্পতত্ত্বজ্ঞানে, নিরবচ্ছিন্ন প্রজ্ঞায় তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর অনুপস্থিতির অপূর্ণতা খুবই অনুভূত হয়।

শিল্পী শিল্প ও সমাজ—শোভন সোমের শিল্প-বিষয়ক এই গ্রন্থে সাতটি পৃথক অধ্যায়ে সাতজন ভারতীয় প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পীর সার্বিক মূল্যায়নের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। প্রয়াস অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। সাতজন শিল্পীর মধ্যে আছেন যথাক্রমে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং রামকিঙ্কর। শেষোক্ত দুই শিল্পীর অন্তর্ভুক্তি গ্রন্থের গুরুত্বে সম্পূর্ণতা প্রদান করেছে। ভারতীয় তথা বাংলা চিত্রধারায় অবনীন্দ্রনাথের অগ্রবর্তী ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনে বিনোদবিহারী-রামকিঙ্কর—এই দুই কৃতবিদ্যের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। প্রথাসিদ্ধের সঙ্গে আধুনিকীকরণ, ঐতিহ্যের সঙ্গে উত্তরাধিকারের যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়েছে রামকিঙ্কর-বিনোদবিহারী তার যোগ্য সম্পাদক।

'লেখকের কথায়'—শোভনবাবু নিজেই নিজেকে বিজ্ঞাপিত করেছেন প্রতিভার স্বীকৃত প্রশংসাপত্রে। 'প্রচলিত শিল্পালোচনার ধারা যে আমি অনুসরণ করি না তা এই গ্রন্থের পাঠক অবশ্যই বুঝতে পারবেন।'—পাঠক কি বুঝবেন তার দায় আপাতত পাঠকের। বরং পাঠকের নিবিড় পাঠের পূর্ব মুহূর্তে কিছু প্রাসঙ্গিক কথনে আসা যাক। শোভনবাবু তাঁর রচনার গুণ-বিশিষ্টতার পক্ষে অতুল বসু এবং সুধী প্রধানের চিঠির উল্লেখ করেছেন, যা সর্বাংশে শোভন নয়। লেখকের প্রতি অতুল বসুর 'ভরসা' লেখকের নিজের প্রতি আস্থাহীনতাই প্রকারান্তরে স্মরণ করায়।

শিল্পী শিল্প ও সমাজ—এই গ্রন্থপাঠের অভিজ্ঞতা বর্ণনে যথোপযুক্ত নৈর্ব্যক্তিক মন্তব্য সব সময় সম্ভব হয় না। তার জন্য অবশ্যই লেখকের দায় অনেকাংশেই

বর্তায়। সম্পূর্ণ গ্রন্থপাঠে এ কথা স্পষ্ট হয় যে গ্রন্থকার ব্যক্তি বিশ্বাসে শুধু নন, উদ্দেশ্যমূলক ইঙ্গিতেই সমাজ-মনস্কতার বিচ্যুতিকে শিল্পীর অক্ষমতার সঙ্গে জড়িয়ে আলোচনার ঈপ্সিত ক্ষেত্রকে বিতর্কিত করতে চেয়েছেন। গ্রন্থপাঠের আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে সাম্প্রতিক কালে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যা শোভনবাবুর গ্রন্থেরই বিষয়গত ঐক্যের ধারাবাহী। যেমন দিনকর কৌশিকের BLOSSOMS OF LIGHT, সুব্রানিয়মের MOVING FOCUS এবং বাংলায় প্রকাশিত 'চিত্রকথা'। পূর্বোক্ত বই দুটি শোভনবাবুর গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই প্রকাশিত। গ্রন্থ ত্রয়ীর নাম করলাম আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বের অবকাশ অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ে। শোভন সোমের শিল্প-বিষয়ক গ্রন্থে সাতটি পৃথক অধ্যায়ে সাতজন ভারতীয় প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পীর পরিচয় বিধৃত করা হয়েছে। প্রথম আলোচনা 'অবনীন্দ্রনাথ: ব্যক্তি শিল্প ও সময়' শিরোনামে বিন্যস্ত। আলোচনার নান্দীমুখে অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতির নেপথ্যে, পরম্পরা-উত্তরাধিকারের উৎস সন্ধানে শোভনবাবু তৎপর হয়েছেন। কিন্তু সময় সন্ধানে যে নিবিড় অন্বেষা প্রয়োজন, তা বোধ করি অনেকাংশেই কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে। সময়ের--সার্বিক বিশ্লেষণমুখী প্রতিভাস অনেক ক্ষেত্রেই অসংলগ্নতায় হারিয়ে যায়। বিকীর্ণ চটুল মন্তব্যের টুকরো কাঁচে ঝলকানি আছে, কিন্তু তা বাঞ্ছিত প্রাপ্তি জোগায় না। যেমন, 'কোম্পানীর চিত্র ক্যামেরাহীন যুগে বিশেষ শ্রেণীর চাহিদাই মিটিয়েছিল এবং এতে কোন নান্দনিক বোধ দেখা যায় নি, শিল্পীর নিজস্ব ভাবনাচিন্তাও প্রতিফলিত হয় নি।· এক পয়সা থেকে এক আনা দামে বিক্রি হলেও বিদেশীমুদ্রিত চিত্রের দৌরাত্ম্যে কালীঘাটের পটচিত্র টেকে নি।'···কালীঘাট পটচিত্রের অবলুপ্তির কারণ বিশ্লেষণে শুধু যে কোম্পানির ছবির ভূমিকাই আছে তা নয়। সামাজিক অন্যবিধ কারণও এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। সে যুগে অর্থাৎ কোম্পানির চিত্ররীতি, পাশাপাশি দেশীয় পটচিত্রের দ্বৈত উপস্থিতি নানাভাবেই ভারতীয় চিত্রধারাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছিল। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের সমসময়েও এই দুই ধারার উপস্থিতি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। সুতরাং ঐতিহাসিক অস্তিত্বকে অস্বীকার না করে বরং মূল্যায়ন আরো বেশি তথ্যনিষ্ঠ এবং বিশ্লেষণী-প্রজ্ঞায় অন্বিত হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ মন্তব্যের সরলীকরণে তথ্য বিকৃত হবার সম্ভাবনা থাকে।

শোভনবাবুর 'প্রচলিত শিল্পালোচনার' বিপরীত ধারার আলোচনার

বিশিষ্টতার আভাস যে কোনো পাঠক খুব সহজেই পেয়ে যান দু' একটি বিষয়-পাঠের মধ্যেই। আলোচনার বিভিন্ন স্তরকে বিন্যাসের নিয়মানুগ নিয়ন্ত্রণে বেঁধে ফেলায় লেখক প্রয়াসী হয়েছেন। প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত তথ্য জোগানে এবং পূর্বনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে সব পরিকল্পনাই অবিন্যস্ত হয়ে ভেঙে পড়ে রচনার মধ্যবর্তী অক্ষরভূমিতে। রচনার ক্ষেত্র বিশেষে যে দ্যুতি আছে তা চকিত সিদ্ধান্তে আহত হয়। অবশ্য ব্যক্তিবোধের বা বিশ্বাসের তারতম্যে বিশ্লেষণ বিভিন্নমুখী হতেই পারে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের সামাজিক বা পারিবারিক অবস্থানকে যে ভাবনার সাহায্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং তারই প্রেক্ষণে শিল্প সৃজন মূল্যায়নের চেষ্টা চলেছে তাতে অবনীন্দ্রনাথের সার্বিক সক্ষমতার প্রকাশকে যথাযথ গুরুত্বে প্রকাশ করার মানসিকতা লেখকের ছিল না। অবনীন্দ্রনাথের-মূল্যায়নে শেষ পর্যন্ত তিনি এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, শিল্পী তাঁর দীর্ঘ জীবন-ধারায় সৃজনচর্চার বহুধাব্যাপ্তির মধ্যে জীবনের বা সংসময়ের প্রত্যক্ষতাকে তুলে আনতে সক্ষম হন নি। এই ব্যর্থতার প্রমাণ-সাপেক্ষে লেখক পক্ষদুষ্ট উদ্ধৃতি ব্যবহারে মন্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য ও শাশ্বত করতে চেয়েছেন। কিন্তু শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে তিনি নতুন কোনো তথ্যসূত্রের সন্ধান দিতে পারেন নি। অথচ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অবনীন্দ্র-চিত্র বিশ্লেষণ, তৎকালীন পরিবেশনিয়ন্ত্রিত আবহের ঘাত-প্রতিঘাতের সূক্ষ্ম তাৎপর্য উদ্ঘাটনে যথার্থই মূল্যবান হয়ে ওঠে। রক্ত-মাংসের ব্যক্তিস্বরূপ পূর্ণতা পায়, আলোচনার নিরপেক্ষ-বিচার তৎপরতায়। গদগদ ভক্তি ভাবের নির্দেশিত পথে আনুগত্যের আতিশয্যে যেমন শিল্প-মূল্যায়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি যুক্তিহীন অভিযোগে ছিদ্রানুসন্ধানে সর্ববিধ সক্ষমতাকে নস্যাৎ করার প্রবণতাও ক্ষতিবিশেষ। বিনোদবিহারীর শিল্প-আলোচনায় পেয়ে যাই এই দুয়ের মধ্যবর্তী যুক্তিবাদী বিশ্লেষণে স্বাভাবিক ত্রুটির ফাঁকে ফাঁকে শিল্পীর সক্ষমতার ব্যাপ্ত পরিচয়ের চিহ্ন। সন্ধানী মননপ্রসূ দৃষ্টিভঙ্গিতে হাজির করে ব্যক্তির অনুদ্ঘাটিত বিশিষ্ট ক্ষমতা, যা আমাদের যথার্থই ভাবনার পরিসরকে ক্রমবিস্তৃতি জোগায়।

সম্প্রতি অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কবি-প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষের একটি রচনা অবনীন্দ্র-মূল্যায়নে নতুন ভাবনার যথেষ্ট রসদ জুগিয়েছে। বিশেষত শোভন-বাবুর অবনীন্দ্র-মূল্যায়নে যে মানসিকতার ছায়াপাত ঘটেছে এবং এই ভাবনার ছায়ায় ভবিষ্যৎ পাঠকদের বিভ্রান্তি এবং সংকীর্ণ ধারণার অবকাশ বিরোচনে

এই তথ্যটি অবশ্যই উল্লেখ্য '...আমাদের এই খুদ্দুর যাত্রা,—এর সবটাই নিশ্চয় নিছক সময়-কাটানোর ছল নয়।...' ...'তা যদি না হতো, তাহলে রাবণের যুদ্ধহুংকারের পাশেই জার্মান সেনানায়কের ছবি বসাবার ভাবনাটা নিশ্চয়ই আসত না মনে।' আবার দেখা যায়, ...'রাম রাবণের সমস্ত যুদ্ধ আয়োজনের পাশে পাশে যখন কাগজ থেকে বা বই থেকে পশ্চিম দেশের সেই ছবিগুলি সাজাতে থাকেন এই শিল্পী, আসে আফ্রিকার ছবি, তখন "খুদি রামলীলা" নিছক রামলীলাই থাকে না আর, আমাদের সময়েরও কিছু তির্যক প্রতিবিম্ব ঘটতে থাকে সেখানে' (পাগলামির কারুশিল্প/শঙ্খ ঘোষ)। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের এই সমাজ-মনস্কতায় সচেতন রাজনৈতিক অনুজ্ঞা না থাকলেও মানবিক ক্রিয়ায় তা সচল। যেমন শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের কার্টুনের চরিত্রে কিংবা রামকিঙ্করের চিত্র-ভাস্কর্যে নৈরাজ্যের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা জীবনের যে উল্লাস পাই—তা সচেতন রাজনীতির আনুগত্যে নিয়ন্ত্রিত ছিল-না, ছিল আন্তরিক মানবিক বোধের উত্থান। অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও শ্রেণীচরিত্র উন্মোচনের যে যুক্তি লেখক সাজিয়েছেন, তা কিন্তু তৎকালীন কিংবা বর্তমানের অনেকের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হতে পারে। সুতরাং ব্যক্তিস্বরূপ বৈপরীত্যে সতত দোদুল্যমান বলেই মূল্যায়নে তাঁকে খারিজ করার প্রচেষ্টা গর্হিত। পিকাসোর জীবনযাপনে ও বহুল কর্মধারায় যে আপাত-দ্বন্দ্ব ছিল, তা আশ্চর্য ভাবে স্পষ্ট। অথচ পিকাসো তাঁর সার্বিক পরিচয়েই উজ্জ্বল।

'শিল্পী শিল্প ও সমাজ'-এর বাকি ছটি রচনার মধ্যে 'নন্দলাল বসু : অধ্যাত্মবাদ ও লোকায়তের দ্বন্দ্ব' রচনাটি সার্বিক সম্পূর্ণতায় বিশিষ্ট। নন্দলালের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাঁর চিত্র-পরম্পরা, শিল্পী-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তৎকালীন সময় ও সামাজিক অবস্থান এবং ভূমিকাকে যথাযোগ্য করে তোলার চেষ্টা রয়েছে। যদিও চিত্র সম্পর্কিত আলোচনা অপেক্ষা মাঝেমধ্যেই তথ্য-বাহুল্য রচনার বহতাকে ব্যাহত করে। তা ছাড়া এই গ্রন্থের প্রায় তথ্যই আপাত আলগাভাবে সংবাদ সরবরাহ করে। তথ্য প্রায় কখনোই বিষয়ের গুরুত্বকে দৃঢ় যুক্তির ভূমিতে সংস্থাপিত করতে পারে না।

যামিনী রায়ের ছবি : রীতি ও তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনাটি বিতর্কমূলক। লেখক এখানে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যা একান্তই অযৌক্তিক। '...মধ্য ত্রিশ বয়সে তিনি আকস্মিক ভাবে তাঁর ছবি আঁকার রীতি পরিবর্তন করে এক অনিশ্চিতের ঝুঁকি নিয়েছিলেন।...' যামিনী রায়ের চিত্রচর্চার রীতি পরিবর্তন কখনোই আকস্মিক নয়। চাহিদার স্বতোপ্রকাশ ঘটেছিল অন্তর্গত আলোড়নের

ছিন্নভিন্ন মন্থন থেকেই। লেখক উদ্ধৃতিযোগে প্রশ্ন তুলেছেন, '...এই দেশের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দোলাচলময় সময়ের ছবিতে সমকাল ও সমাজ আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত, এবং সেটাই বেদনাদায়ক। জয়নাল আবেদিন ও রামকিঙ্করের ছবিতে আমরা বাংলার দুর্ভিক্ষের স্পর্শ পেয়েছি। যামিনী রায় তাঁর আনন্দ চাটুজ্যের গলির নিভৃতেই থেকে গিয়েছিলেন।' জয়নুল-রামকিঙ্করের সঙ্গে যামিনী রায়ের এই তুলনা লেখকের ভাবনার সংকীর্ণতা ও যুক্তিবোধের অভাবকেই প্রকট করে। যামিনী রায় শুধু আমাদের জন্যে মণ্ডনধর্মী নকশার উত্তরাধিকার রেখে গেলেন? তার বেশি আর কিছুই নয়? বেঙ্গল স্কুলের আধ্যাত্মিক এবং আখ্যাননির্ভর যে ছবি তা প্রথম যামিনী রায়ের হাতেই নতুন ভাবের দ্যোতনায় মুক্তি পায়। ছবিতে রঙ, রেখা ও স্পেসের গুরুত্বকে তিনিই প্রথম যথাযথ মুক্তির পথে আনতে পেরেছিলেন। যামিনী রায়ের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, তিনি সমকাল ও সমাজভাবনারহিত শিল্পী। তাঁর নিসর্গে মানুষের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। তবে মানুষ থাকা বা না থাকার মধ্যে দিয়ে শিল্পীর সমাজ-মনস্কতার ছায়াপাত খুব বেশি নির্ধারণ করা সঙ্গত নয়। ভ্যানগগের ছবির দিগন্তপ্রসারী ধূ ধূ শুধু হলুদের বন্যা। দিক্‌চক্রবালে অস্পষ্টতার মধ্যে একটি উড়ন্ত পাখির আভাস। এই নির্বিকল্প নিঃশব্দ নিঃসীম একাকিত্ববোধ আমাদের অসহায়তাকে, আরো বেশি মূর্ত করে তোলে। আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি রেণুতে সংঘাতের আসন্ন ঝড়ের সংকেত জোগায়। নিঃসঙ্গতা বা নৈঃশব্দ্যের এই যে প্রাণময়তা, তা অনভিজ্ঞের পক্ষে বোঝা দায়।

বাকি রচনাগুলিতে অর্থাৎ 'গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর: রীতি, সময় ও ব্যক্তিত্ব'; 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: চিত্রবৃত্তি ও চিত্রকৃতি'; 'বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়: প্রকৃতি প্রেম ও মানবপ্রেম'; এবং 'রামকিঙ্কর: ভাস্কর্য ও শিল্প'—এই শিরোনামের বাকি রচনাগুলিতেও কমবেশি একই প্রথায় গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন। গগনেন্দ্রনাথ ও রামকিঙ্করের সার্থকতাকে শোভনবাবু নানা যুক্তির জাল মেলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে তাঁরা সমাজসচেতন, ফলতঃ সার্থক। ছবিতে যেহেতু সমাজজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে, সেই যুক্তিকেই লেখক হাতিয়ার করেছেন অক্লেশে। তবে বিশ্লেষণে এমন কোনো বিশিষ্ট তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না, যাতে পূর্বাপর বিভিন্ন শিল্পী ও সমালোচকগণের আলোচনার ধারা থেকে একেবারেই স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হবার যোগ্য। ভাবনার সংকীর্ণতা অবশ্য সিদ্ধান্তের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রায় রচনাকেই পৌঁছে দিয়েছে। আগেও বলেছি, আবারও বলছি গগন ঠাকুর কিংবা রামকিঙ্করের ছবির চেতনা অবশ্যই অভিনন্দন-

যোগ্য। কিন্তু তাঁদের এই সমাজচেতনা একান্তই ব্যক্তিত্ব-নির্ভর। এই সমাজ-মনস্কতার প্রকৃত উৎস অন্তর্গত উপলব্ধিসঞ্জাত। কোনো সচেতনবোধ বা বিশ্বাস-তাড়িত নয়। সামগ্রিক মানবিক বোধেই যুক্ত। সুতরাং এক্ষেত্রে এই জাতীয় সৃজন-শৈলীর গুরুত্বকে তৎকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক আবহ এবং পাশাপাশি সৃজনকর্তার সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের সামগ্রিক বিশ্লেষণের পথেই করা উচিত। ব্যক্তিক আলোচকের ব্যক্তিগত বিশ্বাসবোধের মাপ-কাঠিতে শিল্পীর সার্বিক বিশ্লেষণকে নিয়ন্ত্রিত করলে, মূল্যায়নে সমূহ ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চার আলোচনায় আলোচক এই সামাজিক ভাবনা বা প্রকাশকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে গেছেন। 'কোন সামাজিক সমস্যা বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর চিত্রে কাজ করে নি,…'—কেন করে নি সে-বিষয়ে লেখক নিরুত্তর। অবশ্য উত্তর না দিয়ে ভালোই করেছেন। অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হত। রবীন্দ্র চিত্রকলার বিশিষ্টতা অপেক্ষা ভারতীয় চিত্র-ভাবনের নানা অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাকেই লেখক যত্নে তুলে ধরেছেন। অবশ্য কবির ছবি আঁকার সঙ্গে এ কর্মতৎপরতাকে এক করে না দেখাই বোধ হয় সঙ্গত। কারণ কবির আজন্ম শিল্পবোধের সঞ্চয় থেকেই পরবর্তী সময়ে জন্ম নিয়েছিল শিল্পের মুক্তির উপায় অনুসন্ধান। কবি যদি ছবি নাও আঁকতেন তথাপি তিনি এই সংস্কৃতির নব ধারার উন্মোচনে স্বভাবতই প্রাণের জোগান দিয়ে যেতেন। সূক্ষ্মধারণা ও শিল্পবোধের যে পরিণতি কবি আয়ত্ত করেছিলেন তাতে, কর্মী-কবির পক্ষে শিল্প-সাহিত্য-সংগীতের প্রাণহীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব ছিল না। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে কিন্তু দায়বোধ তাঁর ক্ষেত্রে বর্তায় নি। ছবি আঁকা, প্রাণের গভীরে অনন্ত উৎসের নিবিড় আহ্বানে উৎসারিত হয়েছিল। এই উৎসারকেই তিনি প্রাথমিক দ্বিধায় কিন্তু আনন্দের প্রাণোচ্ছল, রহস্যের মাধুরীতে গ্রহণ করেছিলেন।

শিল্পী শিল্প ও সমাজ—সময় ও কালের গণ্ডিতে শিল্পের ও শিল্পীর আলোচনার যে প্রচেষ্টা যা বিনোদবিহারীর কলমেই প্রথম সার্থক হয়ে উঠেছিল—এই গ্রন্থটি তারই পথবাহী। আলোচনায় যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ থাকলেও কিংবা সামগ্রিক সফলতার প্রাপ্তি না ঘটলেও, নানা তথ্যাদির সংযোগে রচিত এ গ্রন্থ অন্তত বিতর্কের বা আলোচনার পথ প্রশস্ত করেছে। এখন প্রয়োজন সুস্থির চিন্তার ভারসাম্যে যুক্তিগ্রাহ্য মূল্যায়ন। ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতার পুনর্মূল্যায়নে যুক্তিবাদী বিশ্লেষণে সত্য তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ

আলোচনা প্রয়োজন। সংকীর্ণতামুক্ত আলোচনাই একমাত্র পারে এই জড় ভাবনার জট খুলতে। শিল্প শিল্পী ও সমাজের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থেই মোহমুক্ত রচনার প্রয়োজন। শিল্পী শিল্প ও সমাজের প্রকাশ অবশ্যই অভিনন্দন-যোগ্য। পাশাপাশি ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে প্রকাশ ভাবনার পরিশীলনকেও যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া দরকার। নচেৎ তথ্য-বিকৃত প্রকাশনার অযথা জঞ্জালে জীবনের সার্বিক কল্যাণকেই হয়তো একদিন আক্রান্ত করে তুলবে।

পঞ্চাশ বছরের চলচ্চিত্রচিন্তা

তপনকুমার ঘোষ

Sight and Sound A Fiftieth Anniversary Selection, ভূমিকা ও সম্পাদনা ডেভিড উইলসন। ফেবার অ্যাণ্ড ফেবার, ১৯৮২, ১৯০ টাকা

১৯৮২-তে আত্মপ্রকাশের অর্ধ-শতাব্দী সময় সম্পূর্ণ হওয়ার ঐতিহাসিক মুহূর্তটি চিহ্নিত করে নেওয়া ও আরও গূঢ় কোনো আত্ম-বিশ্লেষণের গরজেই যেন 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড' পত্রিকার এই অসামান্য সংকলন। অসামান্য, শুধু এই কারণেই নয় যে ১৯৩২-এ এক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড' কিভাবে পল রোথা ও গ্রীয়ারসনের ডকুমেণ্টারী ভাবনার আবেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে এসে 'নিও-রিয়ালিজম' ও তার পরবর্তী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে অন্বিত করে নিয়েছিল—শুধু তারই এক পারম্পর্যময় ইতিহাস ধরা আছে এই সংকলনে। সেই বিচারে বরং পারম্পর্য সব সময় ফুটে ওঠে না সেভাবে, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা অজ্ঞাত কোনো কারণে বাদ পড়ে যাওয়ার দরুন। যেমন, ১৯৫৬-তে 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড' পত্রিকাতেই প্রকাশিত লিণ্ডসে-অ্যাণ্ডারসনের 'Stand up! Stand up!'—এই বিতর্কিত লেখাটি এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। ফলে পেনিলপ হাউস্টন-এর 'দ্য ক্রিটিকাল কোয়েশ্চেন' প্রবন্ধটির (এই সংকলনে সেটি আছে) সঠিক পরিপ্রেক্ষিত পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না একজন সচেতন পাঠকের কাছে—যিনি অন্যত্র সঙ্গত কারণেই হয়ত দাবি করতে পারেন ঠিক কী কারণে গ্যাব্রিয়েল পিয়ারসন ও এরিক রোড-এর মতো লেখকেরা 'নিও-রিয়ালিজম'-এর মধ্যে উনিশ শতকীয় ধারাবাহিক কাহিনী বিন্যাসের প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন। অথবা, সেই পাঠকের জিজ্ঞাসা এই কারণেও অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে পারে যে 'হিউম্যানিস্ট' ধারায় বিশ্বাসী একজন শিল্পীর 'প্লট' সম্পর্কিত ধারণা ঠিক কতটাই পৃথক, যার ভিত্তিতে পিয়ার্সন এবং রোড নিউ ওয়েভ আন্দোলনকে প্রায় পুরোপুরি বিপ্রতীপ এক কোণ থেকে বিচার করেন? লেখকদ্বয় প্রসঙ্গত যখন আন্তোনিওনির 'দ্য অ্যাডভেঞ্চারার' ছবির প্রসঙ্গ তোলেন, তখন প্রশ্ন উঠতে পারে 'বাইসাইকেল থীভস্' ছবির সারাদিনের ক্রমিক অন্বেষণের সঙ্গে আন্তোনিওনির ছবির কেন্দ্রীয় অন্বেষণের কতটা তফাত, এবং অন্ততঃ, কাহিনী-

বিন্যাসের শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের বিচারে 'দ্য ওয়ার্ল্ড অব অপু' ছবিটিই বা কিভাবে এই একই বিশ্লেষণের মুখোমুখি চলে আসে। শুধুই হিউম্যানিস্ট ধারায় চিহ্নিত বলে? 'দ্য ওয়ার্ল্ড অব অপু' ছবিতে কাহিনীর যে বিস্তার এবং ধারাবাহিক উন্মোচন, সেই একই পদ্ধতি কী 'বাইসাইকেল থীভস্' অথবা 'দ্য অ্যাডভেঞ্চারার' ছবিতেও লভ্য? এই বিশ্লেষণ কিন্তু সঠিক মাত্রা ও তাৎপর্যে আজও পরিষ্কার নয় আমাদের কাছে, অন্ততঃ এই লেখকের কাছে, কারণ অনেকটা দ্বিধাহীনভাবেই 'দ্য ওয়ার্ল্ড অব অপু' ছবিকে হয়ত বিশ্লেষণের তাগিদে আমরা চলচ্চিত্রের পূর্বলব্ধ একটি আন্দোলনের সঙ্গে সহজেই অন্বিত করে নিয়েছি। তাই অভ্যেসের টানে 'বাইসাইকেল থীভস্'-এর সঙ্গে এই ছবির সম্পর্ক ও পরিবর্তনের চেহারা সঠিক ধরা পড়ে না আমাদের অনুভবে, যেমন, অন্য অর্থে, 'নিও রিয়ালিজম'-এর সঙ্গে 'নিউ ওয়েভ'-এর প্রায় কোনোই সম্পর্ক খুঁজে পাই না আমরা। অথচ ধীরে ধীরে নড়ে ওঠা সেই তরঙ্গের অন্তিম আবর্তনের মধ্যে নিশ্চয়ই এক পরিব্যাপ্ত নেপথ্যপ্রস্তুতির হদিশ ছিল, অন্ধকার অসমান তলদেশ পরিচিত ভূগোল অতিক্রম করে যাবার টানে মাঝে মাঝেই স্ফীত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল অবশ্যই, অনেকবার। সম্মিলিত সেই টানের কেন্দ্রে, 'ওয়েভ'-এর ভেতরে এবং বাইরে কতটা ধরা পড়ছিল তার অতীত এবং বর্তমান—ছবি ধরে ধরে সেই বিচারে প্রবৃত্ত হলে হয়ত একটা অ-সমান জটিল চেহারা বেরিয়ে পড়তে পারে, সমালোচনার বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে তাকে হয়ত সব সময় ঠিক মেলানো যাবে না।

পিয়ারসন এবং রোড-এর লেখাটি জ্যাকস্ সিকলার-এর 'নিউ ওয়েভ ও ফরাসী চলচ্চিত্র' প্রবন্ধটিকে মনে করে লেখা। ১৯৬১ সালেই 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড'-এর গ্রীষ্ম সংখ্যায় সিকলার-এর লেখাটি মুদ্রিত হয়েছিল। সেই রচনাটি বর্তমান সংকলনে অনুপস্থিত থাকার দরুন পাঠকের অতৃপ্তি অবশ্যই জমে উঠতে পারে, পারম্পর্যের ধারণা ঠিক ততটা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে না সেভাবে। লিণ্ডসে অ্যাণ্ডারসনের সেই প্রবন্ধটির কথাই মনে আসতে পারে আমাদের, যেখানে তিনি চলচ্চিত্র সমালোচনায় 'কমিটমেণ্টের' পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। অ্যাণ্ডারসন-এর নিজের 'কমিটমেণ্ট' বামপন্থী ভাবনায় প্রভাবিত—যদিও ঠিক রাজনৈতিক অর্থে নয়, বরং প্রসারিত অর্থে, এক উদারনৈতিক মানবতাবাদী ধারণার মধ্যেই স্থিত হতে চান তিনি। হাউস্টন-এর 'দ্য ক্রিটিকাল কোয়েশ্চেন' লেখাটি, আমরা আগেই বলেছি, অ্যাণ্ডারসনের মূল প্রবন্ধ কেন্দ্র করেই। হাউস্টন তাঁর লেখার শুরুতেই ইংরেজি সমালোচনার মূল

বৈশিষ্ট্যকে 'অভিজ্ঞতানির্ভর' ও 'পরীক্ষামূলক' বলে চিহ্নিত করেছেন, যা নিছক তত্ত্বঘেঁষা নয়, এবং সেই কারণেই সহজ কোনো পার্থক্য নিরূপণও অভীষ্ট নয় তাঁর। এর পরই হাউস্টন শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রে একজন সমালোচকের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিকে সামনে নিয়ে আসেন প্রাথমিক ভাবনা ও প্রতিক্রিয়ার সেইসব উত্থাপন যা একটি শিল্পকর্মের আস্বাদনকে তাৎপর্যময় করে তুলতে পারে সমালোচকের প্রথম কাজ একজন শিল্পী কী করতে চেয়েছেন সেই বিষয়ে অবহিত থাকা; এই অনুমান ও বিশ্লেষণকে অনুভবময় করে তুলতে গেলে হৃদয় ও মেধার যুগপৎ, সামঞ্জস্যময় চালনা প্রয়োজন। এর পর দ্বিতীয় অনিবার্য প্রশ্নটির মুখোমুখি হতে হয় সমালোচককে—কতখানি ছুঁতে পেরেছেন শিল্পী তাঁর অন্বিষ্টকে, কতটা বিশ্বাসযোগ্য ও প্রকাশময় হয়ে উঠেছে তাঁর সেই ভাবনা। এর পর হাউস্টন সেই তৃতীয় বিপজ্জনক প্রশ্নটি তুলেছেন—কতটাই প্রাসঙ্গিক এবং প্রকাশযোগ্য শিল্পীর সেই উদ্দেশ্য এবং ভাবনা; অথবা আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, কেন তিনি সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটি বেছে নিয়েছেন তাঁর শিল্পকর্মের বিষয় হিসেবে আর এই সূত্রেই লিণ্ডসে অ্যাণ্ডারসনের 'Stand up! Stand up' প্রবন্ধটির প্রসঙ্গ এসেছে, যেখানে তিনি এই তৃতীয় প্রশ্নটিকেই বিশেষ জরুরি বলে মনে করেছিলেন; কারণ, শিল্পীর কমিটমেণ্টের একটা মোটামুটি চেহারা এই তৃতীয় প্রশ্নের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব। অ্যাণ্ডারসনের লেখাটির আবার এক পরিপ্রেক্ষিত আছে। পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই চলচ্চিত্র সমালোচনা ক্রমশঃ আক্রান্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠছিল এই কমিটমেণ্টের প্রশ্নে। জন্মলগ্ন থেকেই 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড' পত্রিকা মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের মধ্যে বিনোদন ও শিল্পের ক্রমাগত সংঘাত সম্পর্কে সচেতন ছিল। বিপুল এক উৎকণ্ঠা নিয়ে তার জন্মলগ্নের প্রথম প্রহরগুলি ধীরে ধীরে অতিবাহিত হচ্ছিল এই সংঘাতের আগামী সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে, যখন হলিউড-সিনেমা তার মোহ লাবণ্যের কটাক্ষে হঠাৎ হয়ত আবিল করে তুলছিল সমালোচকের দৃষ্টিকে, দর্শকের আচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়া পোষমানা পাখির মতো বিনোদনের উন্মুক্ত খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। এই সংকলনের সম্পাদক ডেভিড উইলসন তাঁর ভূমিকায় এহেন পটভূমিতে 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড' পত্রিকার বিশেষ স্থানটি নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। চলচ্চিত্র-সমালোচনার শিল্পগত তাৎপর্য অন্বেষণ করতে চেয়েছেন তাঁরা, চলচ্চিত্র ও শিল্পের আপাত-বিরোধী অবস্থানকে অনিবার্য কোনো এক উপলব্ধির সংযমে কেন্দ্রিত করে নিতে চেয়েছেন, শৃঙ্খলা ও বিন্যাসের সম্মিলিত কোনো বিন্দুতে, যখন চলচ্চিত্র

যথার্থই শিল্প হয়ে ওঠে। তাই গোড়া থেকেই হলিউড সিনেমার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থেকেছেন 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ডের' সমালোচকেরা, যদিও পুরোপুরি অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না তাঁদের পক্ষে, অন্তত জন্মলগ্নের মুহূর্তে। এই সংকলনেরই দ্বিতীয় প্রবন্ধে, যেটি ১৯৩৬-এ লেখা হয়েছিল, এলিস্টার কুক একেবারে গোড়ায় এই সচেতন মনোভাবের আভাস রেখে দেন ঃ—

> It only tantalises you with the reminder that there is outside a real world (pace Hitler, Mussolini, the Naval Conference and the Defence Programme) where sanity may come from a glimpse of crocuses, where the box-office formula for gaiety may be no more than a seat in Hyde Park and cost a million dollars less than any Hollywood knows.

হলিউডের বিপজ্জনক প্রভাব সম্পর্কে এই সচেতনতা 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড' পত্রিকার একেবারে গোড়ার দিকের লেখাতেও লক্ষ্য করা গিয়েছিল, এবং এও তো সত্য যে, চল্লিশের দশকের একেবারে শেষের দিকের আগে পর্যন্তও জন ফোর্ড, ফ্রাঙ্ক কাপরা অথবা হাওয়ার্ড হক্স—এই নামগুলি 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড' পত্রিকার পাতায় তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় নি। বরং ১৯৪৭-এ 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড'-এর পাতাতেই আইজেনস্টাইন হলিউড-চিত্রনির্মাতাদের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ শাণিত করেছিলেন। 'Purveyors of Spiritual Poison' বলেছিলেন আইজেনস্টাইন, সেই অটল আত্মবিশ্বাসে ও নির্ভুল আত্মবিশ্লেষণে যার মধ্যে একজন সচেতন শিল্পীর কমিটমেণ্টের শিল্পরঞ্জিত চেহারাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সবার আগে। এর পর ১৯৫৪ থেকেই শিল্পীর দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। ঐ বছরেই ফরাসী সমালোচনার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিণ্ডসে অ্যাণ্ডারসন সুস্পষ্ট ভাষায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন ঃ 'The adulation of directors like Howard Hawks, Preminger, Hitchcock, even Robert Wise, seriously vitiates much of the writing in Gahiers.' পরের বছরই কাজানের 'অন দ্য ওয়াটারফ্রণ্ট' ছবিটির শেষ সিকোয়েন্স-ক তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন অ্যাণ্ডারসন : 'demagogic dishonesty of argument'—এই ছিল তাঁর অভিমত। এর পরের বছর ১৯৫৬-তে মুক্ত সিনেমা আন্দোলনের প্রকজন পুরোধা হিসেবে অ্যাণ্ডারসন 'Stand up, Stand up' প্রবন্ধটি লেখেন। তাৎক্ষণিক প্রেরণা

হিসেবে কাজ করেছিল দুটি আপাত-বিচ্ছিন্ন ঘটনা। 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড'-এর সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে লেখা জন রাসেল টেলর-এর একটি চিঠি, যাতে তিনি চলচ্চিত্র-সমালোচনায় তথাকথিত কমিটমেণ্ট অনিবার্য কিনা, এ নিয়ে কিছু অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি হল 'অবজারভার' পত্রিকা-গোষ্ঠী কর্তৃক আয়োজিত চলচ্চিত্রের একটি প্রদর্শনী। অন্য দিকে, ঠিক কাকতালীয় নয়, বরং ঐতিহাসিক যোগাযোগের অলক্ষ্য এক অনিবার্যতার কথাই আমাদের মনে আসতে পারে, যখন Osborne-এর 'Look Back in Anger' ও অ্যাণ্ডারসনের লেখা ঐ প্রবন্ধের সময়কাল নৈকট্যের টানে কাছাকাছি চলে আসে, বক্তব্য ও প্রবণতার মধ্যে গূঢ় কোনো এক সাজুয্যের নিয়মেই। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল আবহাওয়া হয়ত বা উদ্বেল হয়ে উঠেছিল সেই সময়, যার স্পন্দন চলচ্চিত্র-সমালোচনার মধ্যেও অনুভব করা গিয়েছিল। কোনো কিছুই বিচ্ছিন্নভাবে পূর্বলব্ধ ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না আর। একটি ঘটনার মধ্যে এসে মিলে যাচ্ছিল আরও কয়েকটি আগামী ঘটনার সঙ্কেত—ইশারা ও উদ্ভাবনের সেই অন্বেষণে সমালোচনা নিজেকেই খণ্ডন করছিল প্রতি মুহূর্তে।

বিস্ময়ের কথা, অ্যাণ্ডারসনের প্রবন্ধটি এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত না হলেও জন রাসেল টেলরের লেখা সেই চিঠি কিন্তু এই সংকলনেই আছে, ১১৬ পৃষ্ঠায়। চিঠির শুরুতেই টেলর এই বলে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড' পত্রিকার লেখকেরা সাম্প্রতিক ছবিগুলি সম্পর্কে এক ধরনের উচ্চ সমালোচনামূলক মনোভাব প্রকাশ করে থাকেন, যা অনেক সময় যথার্থ কারণেই অসহিষ্ণু ও হতাশাব্যঞ্জক মনে হলেও সন্দেহের উর্ধ্বে নয় সব সময়। অ্যাণ্ডারসন এবং লাসালি-র কথা উল্লেখ করেছেন টেলর। ছবির বিষয়বস্তুর ওপর অনাবশ্যক ঝোঁক দেওয়ার প্রবণতা অস্বস্তিকর মনে হয়েছে তাঁর কাছে। টেলরের বিচারে, কমিটমেণ্টে বিশ্বাসী সমালোচকদের কাছে গ্রহণীয় নয় এমন কোনো বিষয়ও শুধু আঙ্গিক কুশলতার গুণে মহৎ শিল্প হয়ে উঠতে পারে। এই ধারণার ওপর ভর করেই টেলর আচমকা একটি মন্তব্য করে ফেলেন যা তাঁরই কোনো কোনো প্রয়োজনীয় সতর্ক বাণীকেও অকারণে সন্দেহের যোগ্য করে তোলে আমাদের কাছে। টেলরের মন্তব্য: 'In this way, if we are fair, we must admit that an honest glorification of the good sides of war can be just as valid as a statement of complete disgust with the whole thing' হতেই পারে, হবেও হয়ত, বিশেষ করে

রণাঙ্গনের উদ্বেল আনন্দঘন কোনো মুহূর্তে, আক্রমণকারী যখন দখল করে নেয় অপ্রস্তুত প্রতিপক্ষের এলাকা—হয়ত সেইটেই যুদ্ধের মঙ্গলময় দিক, হয়ত এই রকমই কোনো শুভ কামনায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন হিটলার, যখন চুক্তি ভঙ্গ করে অপ্রস্তুত রাশিয়াকে তিনি আক্রমণ করেছিলেন, অথবা দুর্জয় আত্মবিশ্বাসে আত্মরক্ষার এক নজিরবিহীন লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছিল রাশিয়াকে। এটা অস্বীকার করা মূঢ়তাই হবে যে টেলরের বক্তব্যে এই দুই ধরনের লড়াইয়েরই 'honest glorification'-এর ইঙ্গিত আছে, বিশেষ করে ১৯৫৬-তে যখন এই চিঠি তিনি লিখছিলেন 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড'-এর সম্পাদককে, তার আগেই এই লড়াই তখন 'ইতিহাস' হয়ে গেছে। আর 'fair' হতেও কারোরই কোনো বাধা থাকার কথা নয়। তবে টেলর নিশ্চয়ই জানেন যে সমস্ত 'fairness'-এরই গোড়ার কথাটা হল অনাবিল বুদ্ধি-প্রযুক্ত বিশ্লেষণ এবং তার উপযুক্ত মানসিক প্রস্তুতি। নইলে 'fairness'-এর চর্চা নিতান্ত পরিহাস মনে হতে পারে, এবং পাণ্টা আক্রমণে অনাবশ্যক বিব্রত করতে পারে আমাদের। তখন সেই চর্চা আমাদের লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মুশকিল হল, কমিটমেণ্টে বিশ্বাসী অ্যাণ্ডারসন ঐ 'honest glorification'-এর দুটি শব্দের কোনোটিকেই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করতে চাইবেন না। কাজানের ছবি সম্পর্কে 'dishonesty of argument' কথাটা তিনি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু এই বিতর্কের মধ্যে শিল্পের ফর্ম ও কন্‌টেণ্টের আরো গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের কিছু প্রয়োজনীয় আভাস আছে। টেলরের বক্তব্যে কিছু বেশি উত্তাপ থাকার দরুন তাঁর যুক্তি সব সময় ঠিক অব্যর্থ ও গ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারে নি। চলচ্চিত্রের বিষয়নির্ভর আলোচনাকে তিনি 'newsreel outlook' বলে পরিহাস করতে চেয়েছেন, এবং কমিটমেণ্টের দাবিকে তিনি নিছক 'স্নবারি' আখ্যা দিয়েই তাঁর নিজের দায়িত্ব শেষ করেছেন। টেলর যদি এই কমিটমেণ্টের চেহারা, প্রকৃতি ও তার সম্ভাব্য সীমানার ওপর যুক্তিসম্মত আলোকপাত করতেন, তা হলে এই বিতর্কের একটা শিল্পসম্মত চেহারা ভেসে উঠতে পারত আমাদের সামনে। অ্যাণ্ডারসনের মূল লেখা এই সংকলনে থাকলেও হয়ত বিতর্কের পূর্ণ একটা আদল পেয়ে যেতাম আমরা।

সেই অতৃপ্তি খানিকটা অবশ্য মিটে যায় হাউস্টন-এর লেখাটি পড়লে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে গেভিন ল্যামবার্ট-এর পরে পেনিলপ হাউস্টন-ই 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড' পত্রিকার বর্তমান সম্পাদিকা। হাউস্টন-এর দুটি লেখা এই সংকলনে আছে। তার মধ্যে 'দ্য ক্রিটিকাল কোয়েশ্চেন' লেখাটি চলচ্চিত্র-

সমালোচনায় ফর্ম এবং কন্টেন্টের বিতর্ককে অনেকটা পরিষ্কার করে তোলে আমাদের কাছে। সেই সূত্রেই 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড' পত্রিকার সমালোচকদের উপর ফরাসী সমালোচকদের প্রভাব সম্পর্কেও একটা ধারণা করে নেওয়া যায়। হাউস্টন চলচ্চিত্র-সমালোচনায় কমিটমেন্টের প্রশ্নটিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন, যদিও শিল্পগত কারণেই তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সময় যে অনড় একমুখীনতা কাজ করে, সেই সম্পর্কেও তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। হাউস্টন তাঁর নিজের মনোভাব এই ভাষায় ব্যক্ত করেন আমাদের কাছে :

> The critic does not have to agree with a case to know whether it is being well or badly stated; he does not have to find the Bernanos-Bresson ethos, with its masochistic self-questioning, a sympathetic one (he may even find it repellent) to appreciate that 'Journal d'un Cure' is a masterpiece of resolute conviction. *He can admire without agreeing and agree without admiring.* And although this ought to be self-evidênt, apparently it has not been.

সমালোচনা-পদ্ধতি এবং সেইসঙ্গে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার একটি প্রয়োজনীয় 'ডিসিপ্লিন'-এর ওপর হাউস্টন প্রশংসনীয় আলোকপাত করেছেন। বিষয়নির্ভর আলোচনায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা হাউস্টন-এর প্রবন্ধটি সম্পর্কেই ঠিক এই জাতীয় মনোভাব গ্রহণ করতে পারেন। যদিও হাউস্টন-এর নিজের মতেই, এই 'ডিসিপ্লিন' এখনও আমাদের অনায়ত্ত থেকে গেছে। মনে পড়ছে, 'পরিচয়' পত্রিকার আড্ডায় অতি সম্প্রতি এই নিয়েই কিছু খেদ প্রকাশ করেছিলেন দুজন অগ্রজ সহকর্মী। তাঁদের সেই ধারণা যে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক ছিল না তারই নির্ভুল প্রমাণ হাউস্টন-এর সাহসী উচ্চারণে।

বিষয়নির্ভর আলোচনা এই সংকলনেই আছে, যেমন টনি রিচার্ডসন-এর 'দ্য সেভেন সামুরাই' নিয়ে লেখাটি। দনস্কয়-এর 'গোর্কি ট্রিলজি', রিচার্ডসন-এর মতে, সহজাত সরলতার প্রসাদগুণে 'সেভেন সামুরাই'-এর তুলনায় বেশি প্রাণবন্ত। যদিও কুরোশোয়ার ছবির প্রয়োগকুশলতার তারিফ করেছেন রিচার্ডসন, তবু '...the film doesn't quite succeed. All the elements are there except the depth and the generosity of life.' এই অভিমত নতুন করে উত্তেজিত করতে পারে আমাদের। চিত্রনাট্যের মধ্যেও

কিছু দুর্বলতা লক্ষ্য করেছেন টনি রিচার্ডসন, যদিও প্রসঙ্গটি তিনি কেবল উত্থাপন করেছেন মাত্র। বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি তাঁর অনুভবকে আরো স্পষ্ট এবং গ্রাহ্য করে তুলতে পারতেন আমাদের কাছে।

হিচকক তাঁর নিজের চলচ্চিত্র-নির্মাণ পদ্ধতির কিছু অন্তরঙ্গ হদিশ দেবার চেষ্টা করেছেন পাঠককে, যদিও এই লেখাটি তাঁর 'ফুটনোটস টু দ্য ফিল্ম' বইটির জন্যই বিশেষভাবে রচিত হয়েছিল। বর্তমান সংকলনে হিচককের সেই মূল রচনার সংক্ষিপ্ত ও নির্বাচিত অংশবিশেষ গৃহীত হয়েছে। হিচকক জানিয়েছেন কেন 'ব্ল্যাকমেল' ছবির সমাপ্তিকে তিনি তাঁর প্রাথমিক ভাবনার সূত্রে সাজাতে পারেন নি। জেলে বন্দী মেয়েটিকে তার ভাগ্যের হাতে অনিশ্চিত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে হিচকক শেষ করতে চেয়েছিলেন তাঁর ছবি। কিন্তু পারেন নি। হিচককের মন্তব্য: 'And that shows you how the films suffer from their own power of appealing to millions. They could often be subtler than they are, but their own popularity won't let them.' এ শুধু কমার্শিয়াল ভাবনায় আচ্ছন্ন কোনো উচ্চারণ নয়—শিল্পমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের বিশেষ এক জাতের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে হিচককের ব্যক্তিগত অনুভব ও স্বীকারোক্তি।

সর্বোপরি, এই স্বাদু ও উচ্চমানের সংকলনে আইজেনস্টাইনের 'Charlie the Kid' এই অসামান্য লেখাটি সংযোজিত হয়েছে। 'A Long Time on the Little Road' নামে সত্যজিৎ রায়ের সেই পরিচিত লেখাটির অন্তর্ভুক্তিও কারো কারো কাছে আনন্দের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এ ছাড়াও আরো একাধিক মূল্যবান আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড'-এর এই সময়োচিত সংকলন।

ডেভিড উইলসন-এর সম্পাদকীয় ভূমিকা সুলিখিত সন্দেহ নেই। কিন্তু যে লেখাগুলি এই সংকলনে গৃহীত হয় নি, তার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত পূরণের যে চেষ্টা তিনি করেছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর মনে হয়েছে। কিন্তু সেই পারম্পর্য সঠিক ধরা না গেলেও সংকলনে অন্তর্ভুক্ত মূল রচনাগুলির ভাবনা ও বিশ্লেষণ আরো নতুনতর কোনো ভাবনার সন্ধান দিতে পারে আমাদের। বিশেষ করে, সমালোচনার পদ্ধতি ও তার উপযুক্ত প্রয়োগের বিচারে এই সংকলন জরুরি হয়ে উঠতে পারে, হয়ত বা সেইসঙ্গে প্রচলিত সমালোচনা-ধারার কিছু পুনর্বিন্যাসের কথাও ভাবতে পারি আমরা।

চলচ্চিত্রকে সামনে রেখে, তার মতো করেই, চলচ্চিত্র-সমালোচনা আমাদের

সম্মিলিত শিল্পচর্চার বিষয় হয়ে উঠতে পারে, যখন আমাদের ব্যক্তিগত অনুভব নৈর্ব্যক্তিক কোনো ভাষা খুঁজে নিতে পারে, বহির্বিষয়ের ভাবনার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেবার অঙ্গীকারে, যখন 'কমিটমেণ্ট' যথার্থ অর্থেই শিল্প হয়ে ওঠে। দৃশ্যকে অবলম্বন করেই তখন উপলব্ধির অন্তরস্থ কোনো কেন্দ্রে ঢুকে পড়তে পারি আমরা, রিলকে যাকে বলেছেন 'দৃশ্য থেকে অদৃশ্যে রূপান্তরণ'।

'সাইট এণ্ড সাউণ্ড'-এর বর্তমান সংকলন একজন সচেতন পাঠককে, কিছুটা সীমাবদ্ধ অর্থেই, সেই চর্চার দিকে ঠেলে দিতে পারে।

ত্যাগ, বীরত্ব আর ভ্রান্তির কাহিনী

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

এ হিস্ট্রি অফ দ্য কমিউনিস্ট মুভমেণ্ট ইন ইরাণ। তুলসীরাম। গ্রাফিকস পাবলিকেশন ডিভিশন, ভূপাল। চল্লিশ টাকা

আকাশ পাতাল তোলপাড় করা সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে বন্দুক হাতে পাহাড় জঙ্গল শহর গ্রামের গেরিলা থেকে মসজিদের বৃদ্ধ মোল্লা পর্যন্ত সমাজের প্রায় সব স্তরেরই যে সংগ্রামের সংগঠক সক্রিয়, আক্ষরিক অর্থেই সমগ্র জনগণ যার শরিক, তাও কেমন করে পথ হারিয়ে পুরনো প্রায় চেনা অন্ধকারের দিকে চলে যায়, চলে যেতে পারে, তা শুধু হতবাক বিস্ময়ে দেখার বিষয় নয়, গভীর করে বোঝারও ব্যাপার। বিশ্ব জুড়ে সব শিবিরেই, বোঝার কাজ চলছে, বেদনায় বা উল্লাসে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, তার ক্রীড়নকের বিরুদ্ধে এই শতাব্দীর এক শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম, সাম্প্রতিক কালের স্মৃতিতে সম্ভবত ভিয়েতনামের পরেই, গড়ে ওঠে ইরাণে। তারই তরঙ্গশীর্ষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন নতজানু, তার ক্রীড়নক পহলবী ডাইন্যাস্টির শেষ শাহ যখন দেশত্যাগী, পলাতক, প্রাথমিক টানাপোড়েনের পর রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আয়াতোল্লা খোমেইনি। ইরাণের এই বিপ্লব আজ পথ ঘুরে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে মানুষের মুক্তি সেখান থেকে আবার স্বপ্নে ফিরে গেছে। ইরাণে এবং বিশ্বরাজনীতিতে খোমেইনি নেতৃত্বের মৌলিক অবদান 'মুসলিম ফাণ্ডামেণ্টালিজম', যা হয়তো চিন্তার জগতে কিছু নতুন ব্যাপার নয়, আরো পাঁচটা ধর্মভিত্তিক ভাবনাতেও এমন ফাণ্ডামেণ্টালিজম দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মভিত্তিক আন্দোলন ও রাষ্ট্রের সংখ্যাও তো এ পৃথিবীতে খুব কম নয়। কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং দিকনির্দেশে মূল মন্ত্রের কাজ করছে ফাণ্ডামেণ্টালিজম, দেশে দেশে রাষ্ট্রকে মানুষের মুক্তির আন্দোলনকে এমন কি জীবনযাপনের প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করছে, পরিচালিত করছে পথভ্রষ্ট করছে, এমন পরিস্থিতি নতুনই। এটা খোমেইনির অবদান।

ভিয়েতনাম মুক্ত হওয়ার অল্প কদিন পরেই ডালেসের সেই আতঙ্ক 'ডোমিনোজ উইল ফল,' প্রায় সত্য করে ১৯৭৯-র ফেব্রুয়ারিতে শাহ এবং সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ছিঁড়ে মুক্ত হল ইরাণ। কোনো মুক্তি ফ্রণ্ট এই বিপ্লবে

নেতৃত্ব দেয়নি, যদিও কার্যক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে এক ধরনের বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল সব শক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে। আনুষ্ঠানিক কোনো ফ্রন্ট—ফ্রন্টঅর্থে, গড়ে ওঠেনি আদৌ, যদিও তুদে পার্টি, ইরাণের কমিউনিস্ট পার্টি, অনেক আগে থেকেই চেষ্টা করছিল একটা দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট গড়ে তুলতে, মরতে মরতে এবং মারতে মারতেও তাঁরা চিন্তিত ছিলেন বিপ্লব সার্থক হওয়ার পর কী ঘটবে—সার্থকতা সম্পর্কে তাঁদের কোনো দ্বিধা ছিল না। মোসাদেগের সমর্থক দল যাঁদের ধরা হত ইরাণের জাতীয় বুর্জোয়ার প্রধান ও আলোক-প্রাপ্ত প্রতিনিধি হিশাবে, যদি তুদে পার্টির ডাকে সাড়া দিতেন, দুইয়ে মিলে হয়তো অন্যদেরও টেনে আনতে পারতেন এবং হয়তো ইরাণের ইতিহাস আজ অন্যরকম হত। কিন্তু সেদিন তা হবার ছিল না।

খোমেইনিযুগ শুরু হয়েছিল প্রায় সকলের সমর্থন নিয়ে। বাজারগান বা বানি সদরের মতো সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোশ করার পক্ষপাতী থেকে, চিরকাল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রধান সৈনিক ও নায়ক তুদে পার্টি পর্যন্ত সকলের। তারপর ঝাড়াই বাছাই শুরু হল। শাহবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আবেগ ও আন্দোলন তখন এমনই প্রবল যে ইতিহাসই ঠেলে সরিয়ে দিল বাজারগান-বানি সদরদের। যে তুখোড় পাইলট শাহ ও তার পরিবারকে নিশ্চিত লিনচিং থেকে বাঁচিয়ে গোপনে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল ইরাণ থেকে, সেই পাইলটই বানি সদর এবং মুজাহিদিন-এ-খালকের নেতা মামুদ রাজাভিকেও পৌঁছে দিয়েছিল প্যারিসে। তারপর তো নানা শ্রেণী আর স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকট হতে থাকল। যতই প্রকট হল ততই কঠোর থেকে কঠোরতর খোমেইনি তাঁর মুসলিম ফাণ্ডামেণ্টালিজমের পতাকাকে শক্ত করে ধরে সামাজিক মুক্তির যাবতীয় আন্দোলন এবং শ্রেণী সংগ্রামকে পিষ্ট করে শাসনের রথ চালাতে থাকলেন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী খোমেইনি নেতৃত্বকে শেষ অবধি যাঁরা সমর্থন করে চলছিলেন সেই তুদে পার্টিও আজ বেআইনি, তার বহু নেতা ও কর্মী হয় নিহত বা নির্বাসিত, বাকিরা ফিরে গেছেন আত্মগোপনের পথে ও জীবনে। নতুন ধরনের লড়াই শুরু করতে হয়েছে তাঁদের, আবার একেবারে গোড়া থেকে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে খোমেইনি-র আপোশহীন মনোভাব ও সক্রিয়তার বিচারে তুদে পার্টি ইরাণকে ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করার ও গড়ে তোলার প্রস্তাবও সমর্থন করেছিল। ১৯৭৯ সালের ১ এপ্রিল এ বিষয়ে গণভোটের প্রাক্কালে পার্টি এক নীতিসংক্রান্ত ঘোষণায় বলে 'সাম্রাজ্যবাদের

বিরুদ্ধে ঐক্য প্রতিষ্ঠাই তুদে পার্টির নীতি। আমাদের কাছে এই গণভোটের অর্থ গণভোটের মাধ্যমে শাহ-জমানার কবর রচনা। জনগণের সঙ্গে আমরা একাত্মতা চাই বলেই সর্বান্তঃকরণে এই গণভোট আমরা সমর্থন করি।'

আর যাই থাক, খোমেইনির শাহ-বিরোধিতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় কোনো ভেজাল ছিল না। এই গণভোটের পর ইসলামিক আদালতের হাত শক্তিশালী হয় এবং শাহ জমানার কুখ্যাত অপরাধীরা শাহ প্রাসাদের খুনীর দল এবং ত্রাস সৃষ্টিকারী গোয়েন্দা সংস্থা সাভাক-এর সদস্যরা আরো নিশ্চিত-ভাবে, আরো কঠোর শাস্তি পেতে থাকে। সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইরাণের অবস্থানও দৃঢ়তর হতে থাকে। কাজেই একদিক থেকে তুদে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি ঠিকই ছিল। কিন্তু দিক তো মাত্র একটাই নয়।

দুই

তুদে পার্টির জন্ম চল্লিশের দশকের গোড়ায় হলেও তার আসল বয়স ভিয়েতনামের পার্টি, এমন কি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়েও বেশি। ১৯২০ সালের জুন মাসের ২২ তারিখে ইরাণের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম, তুদে পার্টি তারই উত্তরসাধক। কমিউনিস্ট মতাদর্শ তারও আগে পৌঁছে গেছে ইরাণে, সেই মতাদর্শের প্রভাবে আন্দোলন ও সংগঠনও গড়ে উঠেছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে তার ক্রীড়নক গজর ডাইন্যাস্টির অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ইতিহাস আরো পুরনো। প্রধানত মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তের কিছু অংশ এবং মোল্লাদের একটা অংশের নেতৃত্বে ও উদ্যোগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা গত শতাব্দীতে। আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ গড়ে উঠছে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষের প্রতিরোধ গড়ে উঠছে প্রায় সেই সময়, (১৯০৫ থেকে ১৯১১) এই আন্দোলনের ধারায় এক প্রবল গতি আসে আইনের সরকার ও গণতন্ত্রের দাবিতে। সংবিধান ও মজলিশ (নির্বাচিত পার্লামেন্ট) পাওয়ার এই আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারী গজর ডাইন্যাস্টির পতন ঘটায়। ততদিনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়েছে, রুশ বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে।

নানা ধারায় ছড়িয়ে পড়েছিল এই আন্দোলন। নির্মম অত্যাচার ও পীড়নের মুখে দাঁড়িয়ে শুধু নিয়মতান্ত্রিক পথে একে বেঁধে রাখা যায় নি। অস্ত্র হাতেও লড়াই শুরু করেছে কোনো কোনো গোষ্ঠী। পাহাড়-জঙ্গল ও গ্রামে গেরিলা লড়াইয়ের কাহিনী ইরাণে বেশ পুরনোই।

এই আন্দোলনের বামপন্থী এবং প্রগতিশীল অংশের কাছে মার্কসবাদের বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল তার আগেই। নানা পত্রপত্রিকায় সমাজতন্ত্রের কথা, সাম্যবাদের কথা লেখা হচ্ছিল গত শতাব্দীর শেষভাগেই। মার্কস তখনও বেঁচে, ১৮৮০ সালে 'ইরাণ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, 'প্যারি কমিউনের নবম বার্ষিকী উপলক্ষে'। ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত 'আখতার' (নক্ষত্র) পত্রিকা থেকে লেখাটি পুনর্মুদ্রণ করে 'ইরাণ'। কারা কমিউনিস্ট, তারা কী চায়, তাদের মতাদর্শই বা কী, কেমন সমাজের জন্যে তারা লড়াই করে, এই সব ছিল এই প্রবন্ধের বিষয়। একেবারে গোড়ায় সমাজবাদের ধারণা ইরাণে প্রচারের ব্যাপারে যেসব বুদ্ধিজীবী বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম জামালুদ্দিন আমাদাবাদী (আফগানি)। এই প্রসঙ্গে হেম্মৎ (উচ্চকাঙ্ক্ষা), ফারহাঙ্গ (সংস্কৃতি), হাবুল মাতিল প্রভৃতি পত্রপত্রিকার ভূমিকা অসামান্য।

'হিস্ট্রি অফ কমিউনিস্ট মুভমেণ্ট ইন ইরাণ' গ্রন্থের প্রণেতা, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক শ্রীতুলসী রাম আমাদের, কলকাতার মানুষদের জন্যে একটা বিশেষ খবর দিয়েছেন। 'হাবুল মাতিনে'র সম্পাদক সৈয়দ জালালুদ্দিন, ১৮৯৩ সালে যখন রাজরোষে পড়েন, তাঁর প্রাণ ও কাগজ দুই যখন বিপন্ন, তিনি আজারবাইজানের তাবরিজ থেকে কোনমতে পালিয়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং এখান থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর কাগজ। গত শতাব্দীর শেষে এখান থেকে কাগজ প্রকাশ করতে এবং ইরাণে পাঠাতে তাঁকে কী করতে হয়েছে আর কী করতে হয় নি তা বোঝা খুব কঠিন নয়।

ইরাণের স্বৈর শাসনের প্রত্যক্ষ সহায় ছিল রাশিয়ার জার। রুশ সেনাবাহিনীর একটা অংশ পাকাপাকিভাবেই থাকত ইরাণে। জনসাধারণের সমস্ত আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার কাজে তারা ছিল বিশেষ পারদর্শী। অন্যদিকে সেখানে মার্কসবাদী চিন্তা ও সাম্যবাদী আন্দোলনের সূচনা ও বৃদ্ধিতে রুশ বলশেভিকদের ভূমিকাও প্রত্যক্ষ। তাঁদের সুযোগও ছিল। যুগ যুগ ধরে রাশিয়ার নানা জায়গায়, বিশেষ-করে বাকুর তেলের খনিতে কাজ করতে যেতেন হাজার হাজার ইরাণি। শুধু ১৯১১ সালেই যান ১,৯০,০০০ এবং ফিরে আসেন ১,৬০০০০ মানুষ। এটা সরকারি হিসাব। বেসরকারি হিসাবে সংখ্যাটা তিন লক্ষের ওপর। বিপ্লবের আগে নিজের দেশের শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে করতে এঁদের একটা অংশকেও দীক্ষিত করেন রুশ বলশেভিকরা। ইরাণের আন্দোলনের র‍্যাডিক্যাল অংশের সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ ঘটে।

'হেম্মৎ' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় বাকু থেকেই এবং 'হেম্মৎ' দলের প্রতিষ্ঠাও এই পরিমণ্ডলেই। অকটোবর বিপ্লবের আগেই প্লেখানভ, লেনিন, ট্রটস্কি, স্তালিন, ক্রুপস্কায়া প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় এবং তাঁদের বুদ্ধি পরামর্শ পেতে থাকেন তাঁরা। অন্যদিকে ১৯০০ সালে ডিসেম্বর থেকে 'ইসক্রা' প্রকাশিত হতে থাকলে ইরাণের বিপ্লবীরা তাবরিজ হয়ে বাকুতে পৌঁছে দিতেন লেনিনের কাগজ। অকটোবর বিপ্লবেও সরাসরি অংশ নেন ইরাণি শ্রমিকশ্রেণীর একটা অংশ ও তাঁদের নেতারা। ইরাণের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক হায়দর খান থাফু ওগলি লাল ফৌজের সঙ্গে বন্দুক হাতে লড়াই করেন বিপ্লবকে রক্ষা করতে। বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালের জুলাইয়ে বৃটিশ ফৌজ যখন বাকুর তৈলখনি দখল করতে যায় ইরাণের দুই র‍্যাডিক্যাল দল 'হেম্মৎ' ও 'আদালত' (ন্যায়বিচার) যুক্তভাবে তাদের প্রতিরোধে দাঁড়ায়।

শতাব্দীর গোড়াতেই ইরাণে গড়ে উঠছিল সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন। ১৯০৫ সালেই গড়ে ওঠে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন। উদ্যোগী ছিল ইরাণের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে বারবার নানা শিল্পে-ব্যবসায়ে ধর্মঘট সংগঠিত হতে থাকে। কোথাও কোথাও শ্রমিকদের জয়ও হয়। তাঁদের কাজের সময় ১৪ ঘণ্টা থেকে কমে ১০ ঘণ্টায় দাঁড়ায়। তবে প্রায় বরাবরই সংগঠক-নেতাদের আত্মগোপন করে কাজ করতে হয়, ধরা পড়লে তাঁদের কপালে জেল, ফাঁসি এবং ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়ানো ছিল অনিবার্য।

এইভাবেই ইরাণে তত্ত্বে ও সংগ্রামে পটভূমি রচিত হচ্ছিল কমিউনিস্ট আন্দোলন ও পার্টি গড়ে ওঠার।

অকটোবর বিপ্লবের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবেই পড়ে ইরাণে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে এক গোপন চুক্তি হয়েছিল, যুদ্ধের পর দুই দেশ ভাগাভাগি করে নেবে ইরাণ। লেনিন ইরাণকে বলতেন শতকরা নব্বই ভাগ উপনিবেশ, তাকে পুরোপুরি কলোনি করার এই গোপন চুক্তি প্রকাশ করে দেন তিনি। বিপ্লবী সরকার শান্তির সনদ ঘোষণা করে এবং ইরাণ থেকে সমস্ত সৈন্য সরিয়ে নেয়। এর বিপুল প্রভাব পড়ে ইরাণের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। কিন্তু ইরাণের সরকার অনেকদিন স্বীকৃতি দেয় নি সোভিয়েতকে এবং দেওয়ার পরেও, সেখানে সোভিয়েতের প্রথম রাষ্ট্রদূত খুন হয়ে যান সরকারের গোপন ঘাতকদের হাতে।

এই পটভূমিতে ১৯২০ সালের ২২ জুন প্রতিষ্ঠিত হয় ইরাণের কমিউনিস্ট পার্টি।

তিন

ইরাণের পার্টি যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন সেই বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সোভিয়েত গড়ার নায়কদের। তাঁদের প্রত্যক্ষ সাহায্যও পায় ইরাণ। ১৯১২ সালেই প্রাগে আর-এস-ডি-এল-পি'র ষষ্ঠ কংগ্রেসে ইরাণ সম্পর্কে বিশেষ প্রস্তাব নেওয়া হয়। ঐ সময়েই 'আস্থ্ ওগলির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয় লেনিনের। ইরাণের পার্টি গড়ার ব্যাপারেও সোভিয়েত পার্টি ও কমিণ্টার্নের সাহায্য ছিল অকৃপণ। তবু, দুর্ভাগ্য, গড়ে ওঠার সময় থেকেই ইরাণের পার্টিতে সাংগঠনিক রাজনৈতিক দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। অসম্ভব প্রতিকুল পরিস্থিতি, শ্রেণী-শত্রুদের তীব্র নির্মম আক্রমণ, কমিউনিস্টদের শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের ও সাম্রাজ্যবাদীদের—রুশ, ব্রিটিশ ও মার্কিন—ধারাবাহিক কর্মকৌশল হিমালয় প্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্টির সামনে। তবু অসীম ত্যাগ ও অবিশ্বাস্য বীরত্বের পরিচয় দিয়ে জনসাধারণের এক বিরাট অংশের, বিশেষ করে শ্রমিকদের এবং বুদ্ধিজীবীদের একাংশের, আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জনে পার্টি সফল হয়। ভেতরের দুর্বলতাগুলি, কখনো সংকীর্ণতাবাদ, কখনো উদারতাবাদ, কখনো বা সাংগঠনিক দ্বন্দ্ব এবং মাঝে মাঝেই পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রের গুপ্তচরদের অনুপ্রবেশ যদি এড়ানো যেত তবে হয়তো ইরাণের জনসাধারণকে এত দীর্ঘদিন এত দুর্দশার মধ্যে কাটাতে হত না। বলা বাহুল্য, প্রাচ্যের আর পাঁচটা দেশের মতোই ইরাণের পার্টিতেও মতপার্থক্যের প্রধান বিষয় ছিল জাতীয় বুর্জোয়ার চরিত্র ও ভূমিকা বিশ্লেষণ এবং তাদের প্রতি পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি।

'আদালত পার্টি' গঠিত হয়েছিল বাকুতে ১৯১৬ সালে। ১৯২০ সালের ২২ জুন ইরাণের এন্‌জেলি-তে প্রথম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসেই গড়ে ওঠে আদালত কমিউনিস্ট পার্টি। মাস কয়েক পরে 'আদালত' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। এই কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের অধিকাংশ ছিলেন আদালত পার্টির অন্তর্ভুক্ত। প্রতিনিধিদের শতকরা ৫০ জন আসেন ইরাণ থেকে, বাকিরা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে। কংগ্রেসে পার্টির সংবিধান এবং পাঁচদফা কর্মসূচি গৃহীত হয়, ১৫ জনের কেন্দ্রীয় কমিটিও গঠিত হয়। কিন্তু সম্পাদক নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। কংগ্রেসে নানিশভেলি, আবুকভ প্রমুখ সোভিয়েত পার্টির

প্রতিনিধিরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানোর মতো চরমপন্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে পরামর্শ দেন। কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন বিষয়ে লেনিনের তত্ত্বের আলোকে তাঁরা বলেন, ইরাণের কমিউনিস্টদের প্রধান কাজ সাম্রাজ্যবাদ ও শাহ-র বিরুদ্ধে ব্যাপক ফ্রন্ট গড়ে তোলা। বিশেষ করে গিলানের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে কমিউন্সটদের ঐক্য গড়ার ওপর তাঁরা জোর দেন। কুচেখ খানের নেতৃত্বে আরো দুটি বিপ্লবী গোষ্ঠির সহায়তায় গিলানে তখন সোভিয়েতরাজ গঠিত হয়েছে। রুশ সেনাবাহিনী ইরাণ (গিলান) ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ১৯২১ সালের শেষে এই সোভিয়েতকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু পার্টি কংগ্রেস দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেও, সোভিয়েত পার্টির পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়েও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এগোবার শপথ নেয়। 'বামপন্থা' আরো স্পষ্ট করার জন্যই যেন, ঘোষণা করা হয়, 'বিপ্লবী সংগ্রামে যারা ভীত তাঁদের অচল করে দিতে হবে।' এই কংগ্রেসের প্রতিনিধি তালিকায় আস্থ ওগলির নাম ছিল না, অথচ বিপ্লবী পশ্চাৎপটহীন কেউ কেউ ছিলেন পূর্ণ প্রতিনিধি।

১৯২০ সালের ১-৭ সেপ্টেম্বর বাকু শহরে কংগ্রেস অফ দ্য পিপল অফ দ্য ইস্ট অনুষ্ঠিত হয়। এখান থেকে এক প্রতিনিধিদল যান লেনিনের কাছে। এই দলে ইরাণের নেতা মির্জা মহম্মদ অখণ্ডজাদে-ও ছিলেন। তিনি ইরাণের পার্টির সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কথা লেনিনকে জানান। বাকুতে ফিরে অখণ্ডজাদে দেখেন স্তালিন তাঁর আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। কমিণ্টার্নের পরামর্শে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দুই তৃতীয়াংশ সদস্যকে অপসারিত করে হায়দারখান আস্থ ওগলির গোষ্ঠী থেকে ন জনকে নেওয়া হয়। নতুন কমিটি অতিবামপন্থীদের পার্টি থেকেও বিতাড়িত করে। আস্থ ওগলি-র রিপোর্ট ও প্রস্তাবাদি গৃহীত হয় এবং তিনি পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন। পার্টির নতুন লাইন হয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ফ্রন্ট গঠন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মোল্লা ও আয়াতোল্লাদের সম্পর্কে, যাঁদের একটা বড় অংশ ইরাণের জাতীয় আন্দোলনে একেবারে গোড়া থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন, পার্টি বলে, এঁদের সংখ্যালঘু অংশ ধনী ও উচ্চ শ্রেণীর প্রতিনিধি—তাঁদের ভূমিকা প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু সমাজের দরিদ্র, নিচুতলার অংশ থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক সংস্কার ও সাংবিধানিক আন্দোলনের সমর্থক।

ততদিনে কুচেক খান ও তাঁর সহযোগী এসানুল্লাহ খান প্রমুখের অনেক

পরিবর্তন ঘটে গেছে, তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। কমিউনিস্টরা গিলানে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করতে গেলে কুচেক বাধা দেন। তথাপি তাঁদের সঙ্গে ফ্রন্ট গড়ার উদ্দেশ্যে আলোচনা করার জন্যে পার্টি এক প্রতিনিধিদল পাঠায়। আস্থ ওগলি নিজে সেই দলে ছিলেন। বিপদ মাথায় নিয়ে গোপনে তাঁরা কুচেকের এলাকায় যান। কুচেকের দলবল আলোচনা করার বদলে তাঁদের আক্রমণ করে। অন্যরা সরে যেতে পারলেও আহত আস্থ ওগলি জঙ্গলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পথ হারিয়ে ফেলেন। কুচেকের সমর্থকরা তাঁকে হত্যা করে। এরপর কুচেকের আদেশে সমগ্র গিলানে কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞ ঘটে যায়।

কিছুদিন পরেই রেজা শাহ-র বাহিনী কুচেকের দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পালাতে গিয়ে, তাদের মধ্যে একজন জার্মান এজেন্টও ছিল, তালেশ পর্বতে বরফে জমে কুচেক খানের মৃত্যু হয়।

এইভাবে পার্টির যাত্রাই শুরু হয় দুটি কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়ে। কমিণ্টার্নের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ১৯২২ সালের জানুয়ারিতে দুটি কমিটিকে মেলানো এবং ২০ জনের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গড়া সম্ভব হয়। ঐক্যবদ্ধভাবে পার্টি কাজ করতে শুরু করেই যথেষ্ট সফল হয়। ট্রেড ইউনিয়নে, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, এমন কি মহিলা ফ্রণ্টেও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। কিন্তু অবিলম্বেই পার্টিতে আবার মতবিরোধ দেখা দেয় রেজা শাহ-র চরিত্র বিশ্লেষণ নিয়ে। এক কু-দে-তা-র মাধ্যমে রেজা ক্ষমতায় আসে। পার্টির একাংশ তাকে গণতন্ত্রী মনে করেন, অন্য অংশ তার সব কিছুর বিরোধিতা করতে চান। এমন কি তাঁর রেল লাইন বসানোর কাজকেও 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে অভিহিত করেন। আবার কমিণ্টার্নের হস্তক্ষেপ, ১৯২৪ সালে দ্বিতীয় কংগ্রেস এবং চরমপন্থীদের অপসারণ ও বিতাড়ন। এর মধ্যেই পার্টি নেতৃত্বে সরকারি গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ ও পার্টির ক্ষতি ঘটে গেছে। গুপ্তচরদের কারসাজিতে প্রায় গোটা কেন্দ্রীয় কমিটিই ধরা পড়ে যায়। তখন রেজা শাহ-র অত্যাচারে সমগ্র ইরাণ কাঁপছে। পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয় এবং মজলিস-ও সেই ঘোষণা আইনে পরিণত করে। পার্টি যেন বন্ধুহীন।

এই ধারাই চলতে থাকে দীর্ঘদিন। অত্যাচার, নিপীড়ন, আর মাঝে-মাঝেই হঠকারিতা বা শোধনবাদী উদারতা, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং প্রায় সর্বদাই গুপ্তচরদের সক্রিয়তা পার্টিকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয়। এমনও হয়েছে, অখণ্ডজাদে ও সুলতানজাদে-র মতো নেতাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও-

অভিযোগের তদন্ত করতে কমিণ্টার্ণকে কমিশন বসাতে হয়েছে কুসিনেনের নেতৃত্বে। তদন্তের রায়ে স্বয়ং পার্টি সম্পাদক হোসেন শারেগিও ভর্ৎসিত হয়েছেন, অন্যান্য নেতারাও বাদ পড়েন নি, কেউ কেউ অপসারিত এবং বিতাড়িতও হয়েছেন।

রেজা শাহ-র বর্বর শাসনে কমিউনিস্টদের শুধু শহিদই হতে হয়েছে একের পর এক। পার্টির কাজ তবু থেমে থাকে নি। মৃতপ্রায় বিপ্লবী আন্দোলনকে এই পর্যায়ে অকসিজেন যোগানোর কাজ করেন এক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ডঃ ত্যাগি আরানি ও তাঁর অনুগামীরা। বার্লিন থেকে পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট কর কিছুদিন ফৌজে কাজ করার পর তিনি তেহারান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। তাঁর পত্রিকা 'দোনিয়া' জ্ঞানের আলো ও মার্কসবাদী তত্ত্ব প্রসারে এক অসামান্য ভূমিকা নেয়। ১৯৩৫ সালে পার্টি তাঁর কাগজকেই পার্টির মুখপত্র হিসাবে গ্রহণ করে। 'দোনিয়া'কে কেন্দ্র করে যে গোষ্ঠী গড়ে ওঠে তাকে বলা হত 'গ্রুপ অফ ফিফটি থ্রি।' বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের মধ্যে এর প্রবল প্রভাব পড়ে ও একের পর এক আন্দোলনের ঢেউ গড়ে ওঠে। শ্রমিকরাও সংগঠিত হতে থাকেন। বিশেষ করে তেল ও রেল শিল্পে। একাধিক ধর্মঘটও ঘটে যায় নির্মম ত্রাসের পরিবেশ সত্ত্বেও। রেজা শাহ ভেবেছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। নতুন আতঙ্কে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডঃ আরানি ও তাঁর গোষ্ঠীর ওপর। বহু লোক গ্রেপ্তার হন, তাঁদের বিচারের জন্যে বিশেষ আদালত তৈরি হয়। ডঃ আরানি সেই আদালতে যে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন তাঁর সঙ্গে শুধু রাইখস্ট্যাগ অগ্নিকাণ্ডের পর ডিমিট্রভের বক্তৃতার তুলনা হয়। তিনি শুধু আত্মপক্ষই সমর্থন করেন না, মার্কসবাদের তত্ত্ব ও শোষিত শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামকেও তুলে ধরেন এবং কঠোর আক্রমণ করেন রেজা শাহ ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থাকে। সমস্ত বন্দীর শাস্তি হয় দীর্ঘ কারামেয়াদ। ডঃ আরানিকে কিছুতেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় না, এমন তীব্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সমগ্র ইরাণে। কিন্তু জেলখানায় তাঁর সেলে কঠিন রোগের বীজাণু ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সেই ১৯৪০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি শহিদ হন। তাঁর মৃত্যু ইরাণের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে অপরিসীম ক্ষতি।

চার

ইরাণের কমিউনিস্ট আন্দোলনে একমাত্র ব্যক্তিক্রমের সময়, সম্ভবত,

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধকাল। রেজা শাহ-র জার্মানিপ্রীতিতে উদ্বিগ্ন ব্রিটেন তাঁকে সরিয়ে নিয়ে আসে তাঁর পুত্র প্রিন্স কুটেন মহম্মদ শাহকে। নতুন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নতুন সরকার গড়া হয়। রেজা পালায় দক্ষিণ আফ্রিকায়। সোভিয়েত ও ব্রিটিশ ফৌজ ঘাঁটি গড়ে ইরাণে।

সোভিয়েত-ব্রিটিশ-ইরান চুক্তি অনুযায়ী সমস্ত রাজবন্দী মুক্ত হন—সংখ্যায় প্রায় তিরিশ হাজার। 'গ্রুপ অফ ফিফটি থ্রি'-ও মুক্তি পায়। তাঁরা তখন বাহান্ন জন। ১৯৪১ সালের ২ অকটোবর তাঁরাই প্রতিষ্ঠা করেন তুদে (জনগণের) পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টির ন্যায্য উত্তরসূরী। যে কমিউনিস্টরা আত্মগোপনে ও নির্বাসনে বিদেশে ছিলেন তাঁরাও এসে যোগ দেন। পার্টি 'ফ্যাসিবিরোধী ফ্রন্ট' গঠন করে কাজ করতে থাকে। সমাজের নানা স্তরের বহু মানুষকে একত্রিত করে এবং তাঁদের অনেকেই পার্টিতে যোগ দেন। ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ের সঙ্গেই পার্টি স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে, শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের দাবিদাওয়া এবং স্বাধীন ইরাণ ও গণতন্ত্রের পক্ষেও লড়াই চালিয়ে যায়। অসম্ভব দ্রুত পার্টির শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে। ১৯৪৩ সালের মজলিস নির্বাচনে পার্টি ৩০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১০টি আসন দখল করে। ইসপাহান কেন্দ্রে পার্টির প্রার্থী মোট ৩৩ হাজার ভোটের মধ্যে ৩০ হাজার পায়।

প্রতিক্রিয়াশীলরা ভীত হয়ে ব্রিটিশের সহায়তায় আক্রমণ শুরু করে পার্টির ওপর। সেই পুরোনো পদ্ধতি—হত্যা, অগ্নিসংযোগ, গণসংগঠন ভেঙে দেওয়া এবং গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ। টেকনিক্যাল পার্টি তখনও বেআইনি, ১৯৩১ সালের মজলিসের আইন রদ হয় নি। এবং ১৯৪৪ সালে তুদে পার্টির প্রথম কংগ্রেস একদিকে অতি উদারপন্থার দায়ে স্নুরত-এর সম্পাদককে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে অন্যদিকে খলিল মালেকির নেতৃত্বে হঠকারী এক গোষ্ঠী পার্টি নেতৃত্ব প্রায় দখল করে নিতে উদ্যত হয়।

দু বছরের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে যায় পরপর। ১৯৪৫ সালের ১২ ডিসেম্বর আজারবাইজান প্রদেশে এবং ৪৬-এর জ্যানুয়ারিতে কুর্দস্তানে অটোনমাস সরকার গড়ে ওঠে এবং ইরাণ রাষ্ট্রের মধ্যেই তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। ইরাণে তখন এক জটিল রাজনৈতিক সংকট চলছে, পাঁচ বছরের মধ্যে আট জন প্রধানমন্ত্রী এসেছেন, গেছেন। ১৯৪৬-এর আগস্টে এক জাতীয় সরকার গঠিত হয়, তুদে পার্টির তিনজন মন্ত্রী হন সে সরকারে। কিন্তু অবিলম্বেই তাঁদের পদত্যাগ করতে হয়। লাল ফৌজ ১৯৪৬ সালের মে মাসে ইরাণ ছেড়ে চলে যেতে একদিকে যেমন বিশ্বময় প্রতিক্রিয়াশীলদের অপপ্রচারকে স্তব্ধ করে

প্রমাণ হল আজারবাইজান ও কুর্দিস্তানকে বিচ্ছিন্নবাদী করার বা গ্রাস করার কোনো পরিকল্পনা সোভিয়েতের ছিল না, অন্যদিকে ইরাণের ফৌজ ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পেল। ৪৬-এর ডিসেম্বরে দুই প্রদেশেই নির্বাচিত, জনপ্রিয় সরকারকে গুঁড়িয়ে, প্রগতিশীল আন্দোলনকে রক্তে ভাসিয়ে দেওয়া হল।

পার্টি ততদিনে আবার হঠকারিতার পথে। ১৯৪৭ সালের নির্বাচন বয়কট করার ডাক দিল পার্টি, প্রধানত মালেকি গোষ্ঠীর চাপে। তারপর আবার সেই পুরাতন কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। কারাগার, ফাঁসি, গুলি। পার্টি আবার কার্যত বেআইনি। অথচ পার্টির গণভিত্তি তখন বেশ শক্ত। গ্রামাঞ্চলে পার্টির দুর্বলতা দূর হয় নি বটে, কিন্তু সমাজের নানা স্তরে, এমন কি সেনাবাহিনীতেও পার্টি সংগঠিত। এই পর্যায়ে পার্টির দশজন বিশিষ্ট নেতাকে, তার মধ্যে ন জন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, প্রকাশ্য দিবালোকে জেল থেকে মুক্ত করে আনে সামরিক বাহিনীর মধ্যে পার্টির একটি শাখা।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় মোসাদেগ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আবার পার্টি প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ পায়। ইতিমধ্যে মালেকি পার্টি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। সে ও তার দলবল পাল্টা পার্টি গঠন করলেও পার্টি তার শক্তির শতকরা আটানব্বই ভাগ রক্ষা করতে পেরেছে। আলেকির পার্টি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

মোসাদেগ ছিলেন ইরাণের জাতীয় বুর্জোয়ার আধুনিক নেতা। তিনি বৃটিশ মালিকানাধীন তেলের শিল্প জাতীয়করণে উদ্যোগী হলেই তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়। পার্টি তাঁকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। সামরিক বাহিনীর একাংশের সাহায্যে মোসাদেগকে শাহ ক্ষমতাচ্যুত করতে, এমন কি হত্যা করতেও চেষ্টা করে। পার্টি পূর্বাহ্নে খবর পেয়ে তাঁকে সাহায্য করায় তাঁর প্রাণ ও ক্ষমতা রক্ষিত হয়। তিনি সামরিক বাহিনীর অপরাধী অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন এবং শাহ-র নিজস্ব ও পারিবারিক সম্পত্তি জাতীয়করণের দিকে এগোন। শাহ দেশ থেকে পালান।

সি-আই-এ ১৯৫৩ সালের ১৯ আগস্ট এক কু সংগঠিত করে। এর জন্য তারা এক কোটি ডলার খরচ করে। শাহ-র প্রাক্তন স্ত্রী সুরাইয়া লিখেছেন, পরিমাণটি এক কোটি নয়, ষাট লক্ষ। বিশাল এক মিছিল সংগঠিত হয়। পার্টি মোসাদেগকে সতর্ক করে উদয় কিন্তু তিনি তাঁদের কথায় কান দেন না। সেনা বাহিনীর ওপর নির্ভর করে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। সমাজবিরোধীদের দ্বারা সংগঠিত এই মিছিলে যখন সেনাবাহিনীর এক বিরাট অংশ যোগ দেয়,

তখনও পার্টির সম্পাদক নুরেদ্দিন কিয়ানৌরি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে বলেন। রেডিওতে জনগণের উদ্দেশ্যে আবেদন জানাতে পরামর্শ দেন, যাতে অন্তত তাঁর দলের লোকেরা এগিয়ে আসে। নুরেদ্দিন তাঁকে জানান, তুদে পার্টি তৈরি আছে। মোসাদেগ তাঁকে বলেন সমস্যা জটিলতর না করতে এবং তাঁর পরামর্শ না শুনলে তুদে পার্টির বিরুদ্ধেও তাঁকে ব্যবস্থা নিতে হবে। অল্প সময় পরে, মোসাদেগ, তখন বিচ্ছিন্ন ও শত্রুপরিবৃত, তিনি নুরেদ্দিনকে বলেন, সবাই আমার প্রতি বিশ্বাষাতকতা করেছে, আপনারা যা পারেন করুন। কিন্তু পরিস্থিতি তখন শত্রুর হাতের মুঠোয়। আরো নির্মমভাবে নিপুনভাবে কাজ করতে ব্রিটেনের জায়গা নিতে এগিয়ে এসেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কমিউনিউস্টদের আরো একবার আত্মগোপন আর মৃত্যুবরণের পালার শুরু।

১৯৫৩ থেকে ১৯৭৯, ছাব্বিশ বছর ধরে এই পালাই চলেছে। কারাগার, অত্যাচার, মৃত্যু। পার্টির ভেতরেও ভ্রান্তি, দ্বন্দ্ব, গুপ্তচরের কারসাজি দূর হয় নি। কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও পার্টি বেঁচে থেকেছে, গোপনে, কখনো দুর্বল, কখনো কিছু শক্তিশালী, কিন্তু থেকেছে, আছে। খোমেইনির রাজত্বেও আছে। একদিন খোমেইনি থাকবেন না কিন্তু পার্টি থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে। ইরাণের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস এই সিদ্ধান্তই নিশ্চিত করে।

পাঁচ

শ্রীযুক্ত রাম তার গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। নানা দেশ ও ভাষা থেকে তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছে এইসব তথ্য। যে দেশে আজও শোষক শ্রেণীর আধিপত্য, প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি, মাঝে মাঝে অল্পকিছুদিনের জন্যে ছাড়া যে-পার্টি প্রকাশ্যে বা আধা-প্রকাশ্যেও কাজ করতে পারে নি, যে-পার্টির অসামান্য ত্যাগী ও বীর কর্মী ও নেতাদের এক বিপুল অংশ স্বাভাবিক মৃত্যুর সুযোগও পান নি গত চৌষট্টি বছরে, তাঁদের সংগ্রামের ইতিহাসের মালমশলা সংগ্রহ করা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-প্রতিজ্ঞা ও ভেতর-বাইরের বাধা ও উৎসাহের সন্ধান এবং বিশ্লেষণ করা খুবই কঠিন কাজ। এবং এ ইতিহাস এমন এক সংগ্রামের যা আজও চলছে।

এইসব বিবেচনায় মানতেই হবে শ্রীযুক্ত তুলসী রাম খুবই ভালো কাজ করেছেন। কিন্তু হয়তো এই সব কারণেই তাঁর গ্রন্থে নানা ত্রুটি রয়ে গেছে।

পরিশিষ্ট

সংযোজন : মার্কস সংখ্যা

'পরিচয়'-এর মার্কস সংখ্যায় আমরা মার্কসের একটি 'কালানুক্রমিক রচনাপঞ্জি' প্রকাশ করেছিলাম। তাতে আমাদের অনবধানতায় উল্লেখ করা হয় নি যে রচনাপঞ্জিটি ডেভিড ম্যাকলেনান-এর 'কার্ল মার্কস—হিজ লাইফ এ্যাণ্ড থট' (ম্যাকমিলান, ১৯৭৩) বইটির পরিশিষ্টের হুবহু অনুবাদ।

আমাদের এই অনবধানতার একটি কারণ ছিল।

মার্কস-সংখ্যা ছাপার কাজ শুরু হওয়ার সময়ই আমরা এই রচনাপঞ্জিটি তৈরি রাখি। কিন্তু পরে সিদ্ধার্থ রায় তাঁর 'মার্কসের নতুন লেখা' শীর্ষক নিবন্ধটির সঙ্গে 'মার্কস-এঙ্গেলস রচনা-সংগ্রহ'-এর এ-পর্যন্ত প্রকাশিত খণ্ডগুলি ঘেঁটে, মার্কস-এঙ্গেলসের যে-রচনাগুলি এই সংগ্রহে প্রথম অনূদিত ও প্রকাশিত হল তার, প্রায় ৫০ পৃষ্ঠার একটি তালিকা তৈরি করে দেন। মোট ৭৮৬টি রচনা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

এই তালিকা থেকে আমরা তাঁর ব্যক্তিগত দলিল ইত্যাদি বাদ দেই যেমন, মার্কসের বার্থ-সার্টিফিকেট, বিয়ের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তিপত্র ইত্যাদি, এবং একেবারে শেষে মার্কসের চিঠিপত্রের খণ্ডে এ-যাবৎ অপ্রকাশিত চিঠির প্রাপকের নাম।

কিন্তু, তৎসত্ত্বেও 'পরিচয়' যে-প্রেসে ছাপা হয়, সেই প্রেস এতগুলো ইংরেজি হরফ জোগাতে পারে না। এ থেকেই 'পরিচয়'-এর পাঠকরা অনুমান করতে পারবেন. কোন প্রতিকূলতার ভিতর 'পরিচয়' বের করতে হয়। ফলে এই রচনাপঞ্জিটি আমাদের বাদ দিতে হয়। শেষ মুহূর্তের তাড়াহুড়োতে ম্যাকলেনানের বই থেকে অনুবাদ-করা রচনাপঞ্জিটিই ছাপা হয়ে যায়—যথাযথ স্বীকৃতি ছাড়াই।

মার্কস-সংখ্যা প্রকাশের পরে বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিক অশোক সেন আমাদের জানিয়েছেন—সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত 'কার্ল মার্কস—এ বায়োগ্রাফি' বইটিতে মার্কসের শেষ জীবনের একটি রচনার উল্লেখ ও দীর্ঘ উদ্ধৃতি আছে। এই রচনাটি ম্যাকলেনানের তালিকায় উল্লিখিত নেই।

এই সংখ্যায় আমরা সিদ্ধার্থ রায়-সংকলিত সেই রচনাপঞ্জিটি প্রকাশ করলাম।

সম্পাদক

'মার্কসের নতুন লেখা'

রচনাপঞ্জি

সংকলক : সিদ্ধার্থ রায়

১৯৭৫ সাল থেকে মস্কোর প্রগ্রেস পাবলিশার্স—লণ্ডনের লরেন্স উইশার্ট ও নিউইয়র্কের ইন্টারন্যাশন্যাল পাবলিশার্সের সহযোগিতায়—মার্কস-এঙ্গেলস-এর সমগ্র রচনাবলি প্রকাশ করে আসছেন। প্রস্তাবিত ৫০ খণ্ডের মধ্যে এখনো পর্যন্ত ১৯ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

এই ১৯ খণ্ড থেকে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে—মার্কস-এঙ্গেলসের যে-সব লেখা এই প্রথম ইংরেজিতে প্রকাশিত ও অনূদিত হল। প্রধানত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই যাঁরা মার্কসচর্চা করেন তাঁদের কাছে এ-সবই মার্কসের 'নতুন লেখা'। এ-থেকে এই আন্দাজ কিছুটা মিলবে—মার্কস এখনো কতটাই অনুদ্‌ঘাটিত।

'যুগ্ম' বলতে বোঝাবে—মার্কস-এঙ্গেলস দুজনারই লেখা। শেষের তারিখটি বেশির ভাগই রচনাকাল।

প্রথম খণ্ড ১৮৩৫-৪৩

১। Draft on new preface ১৮৪১-এর শেষে ও ৪২-এর শুরুতে
২। Debates on freedom of the press এপ্রিল, ১৯৪২
৩। Yet another word on Bruno Bauer ১৮৪২-এর সেপ্টেম্বরের প্রথমে
৪। Communism and the Augsburg 'Allgemeine Zeitung', সম্পাদকীয়, ২২ অক্টোবর, ১৮৪২
৫। Debates on the law on thefts of wood অক্টোবর ১৮৪২
৬। In connection with article 'Failures of Liberal Opposition' ৮ নভেম্বর ১৮৪২
৭। Communal reform ৭-১২ নভেম্বর ১৮৪২
৮। Koluische Zeitung vs. Rheinische Zeitung ১৬ নভেম্বর ১৮৪২
৯। Cabinet order on the Daily Press নভেম্বরের মাঝামাঝি ১৮৪২
১০। Renard's Letter ১৭ নভেম্বর ১৮৪২

১১। The industrialists of Hanover and protective tariffs নভেম্বর ১৮৪২
১২। Attitude of Herwegh নভেম্বর ১৮৪২
১৩। Polemical tactics নভেম্বর ১৮৪২
১৪। On the commission of the Estates in Prussia ১০, ১৯ ও ৩০ ডিসেম্বর ১৮৪২
১৫। Ban on the 'Leipziger Allegmeine Zeitung' ৩১ ডিসেম্বর ১৮৪২ থেকে ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৫ জানুয়ারি ১৮৪২
১৬। Announcement by the editors ২ জানুয়ারি ১৮৪৩
১৭। Justification of the correspondence from the Mozel ১ ও ২০ জানুয়ারি ১৮৪৩
১৮। Polemical articles ৩ ও ১২ জানুয়ারি ১৮৪৩
১৯। Marginal Notes ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৩
২০। Local election of Deputies to Provincial Assembly মার্চ ১৮৪৩
২১। The Rhein und Mozel-Zeitung as Grand Inquisitor ১১ মার্চ ১৮৪৩
২২। Stylistic exercises ১৩ মার্চ ১৮৪৩
২৩। Announcement ১৮ মার্চ ১৮৪৩

চিঠিপত্র এপ্রিল ১৮৪১ থেকে মার্চ ১৮৪৩

২৪। To Carl Friedrich Bachmann ৬ এপ্রিল ১৮৪১
২৫। To Oscer Ludwig Bernhard Wolff ৭ এপ্রিল ১৮৪১
২৬। To Arnold Ruge ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪১
২৭। To Arnold Ruge ৫ মার্চ ১৮৪২
২৮। To Arnold Ruge ২০ মার্চ ১৮৪২
২৯। To Arnold Ruge ২৭ এপ্রিল ১৮৪২
৩০। To Arnold Ruge ৯ জুলাই ১৮৪২
৩১। To Dagobert Oppenheim ২৫ আগস্ট ১৮৪২
৩২। To Arnold Ruge ২৫ জানুয়ারি ১৮৪৩
৩৩। Notebooks on Epieurian Philosophy ১৮৩৯

৩৪। Plan on Hegel's philosophy of Nature ১৮৩৯

কম বয়সের সাহিত্য চেষ্টা

৩৫। From the albums of poems dedicated to Jenny Von Westphalen

From the 'Book of Love' (Part I)

Concludind Sonnets To Jenny ১৮৩৬-এর অক্টোবরের শেষ দিক

৩৬। From 'Book of Songs' নভেম্বর ১৮৩৬

To Jenny

To Jenny

৩৭। From the 'Book of Love' (Part II)

My World অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৮৩৬

Feelings অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৮৩৬

Transformation নভেম্বর ১৮৩৬—ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭

৩৮। A book verse dedicated by Marx to his Father ১২ এপ্রিল ১৮৩৭

তৃতীয় খণ্ড ১৮৪৩-৪৪

৩৯। The Kreuznach Notebooks of 1843 জুলাই-আগস্ট ১৮৩

৪০। Draft programme of the 'Deutsch-FranzosischeJahrbucher' আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৪৩

৪১। Letter to the editor of the 'Democratic Pacifique' ১০ ডিসেম্বর ১৮৪৩

৪২। Letter to the editor of 'Allgemeine Zeitung' ১৪ এপ্রিল ১৮৪৪

৪৩। Illustrations of the latest exercise in cabinet style ১৫ আগস্ট ১৮৪৪

৪৪। To Ludwig Feuerbach ৩ অক্টোবর ১৮৪৩

৪৫। To Julius Frobll ২১ নভেম্বর ১৮৪৩

৪৬। From the 'Memories de R. Levasseur (De La Sarthe) অংশবিশেষ, ১৮৪৩-৪৪

৪৭। Summary of F. Engels' article ১৮৪৪

চতুর্থ খণ্ড ১৮৪৪-৪৫

৪৮। Draft of an article on Friedrich list's book মার্চ ১৮৪৫
৪৯। Peuchet : on Suicide ১৮৪৫-এর শেষার্ধ
৫০। Hegel's construction নভেম্বর ১৮৪৪
৫১। Draft plan for a work on the modern state নভেম্বর ১৮৪৪
৫২। Plan of the 'Library...' ৭-১৭ মার্চ ১৮৪৫
৫৩। From the Notebooks এপ্রিল ১৮৪৫

ষষ্ঠ খণ্ড ১৮৪৫-৪৮

৫৪। Statement ২৬ জানুয়ারি ১৮৪৬
৫৫। Circular against Kriege ২০ এপ্রিল—১১মে, ১৮৪৬
৫৬। Brussels Communist correspondence committee to G. A. Koltgen ১৫ জুন, ১৮৪৬
৫৭। Declaration against Karl Grun ৩ এপ্রিল, ১৮৪৭
৫৮। The Commumism of the 'Rheinscher Beobachter, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭
৫৯। The Protectionists, the free traders and the working class সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭
৬০। Moralising criticism and critical morality অক্টোবর, ১৮৪৭
৬১। On Poland ২৯ নভেম্বর, ১৮৪৭
৬২। Remarks on the article by M. Adolphe Bartels ১৭ ডিসেম্বর, ১৮৪৭
৬৩। Lamartine and Communism ২৪ ডিসেম্বর, ১৮৪৭
৬৪। Wages ডিসেম্বরের শেষে, ১৮৪৭
৬৫। Situation in France ১৬ জুন, ১৮৪৮
৬৬। The 'Debat Social' of Feb 6 on the Democratic Association ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৮
৬৭। On the Polish question ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৮

৬৮। To the editor of 'La Reforme' ৬ মার্চ, ১৮৪৮

৬৯। Prosecution of foreigners in Brussels ১০ মার্চ, ১৮৪৮

৭০। Minutes of Paris community meet ৮ মার্চ, ১৮৪৮

৭১। Minutes of the Paris circle ৯ মার্চ, ১৮৪৮

সপ্তম খণ্ড ১৮৪৮ (নিউ রেইনিশ জেইটুং-এ লেখা প্রবন্ধ)

৭২। To the committee of the German Democratic Society in Paris ১ এপ্রিল, ১৮৪৮

৭৩। Questions of life and death ৩ জুন, ১৮৪৮, যুগ্ম

৭৪। The reaction ৫ জুন, ১৮৪৮, যুগ্ম

৭৫। 'Comitede surete generale' in Berlin ৫ জুন, ১৮৪৮ যুগ্ম

৭৬। The question of address ৭ জুন, ১৮৪৮, যুগ্ম

৭৭। The shield of Dynasty ৯ জুন, ১৮৪৮, যুগ্ম

৭৮। An admission of incompetence ১১ জুন, ১৮৪৮, যুগ্ম

৭৯। The position of the Parties in Cologne ১৬ জুন, ১৮৪৮, যুগ্ম

৮০। Valdenaire's arrest-Sebaldt ১৮ জুন, ১৮৪৮, যুগ্ম

৮১। The Stupp amendment ২০ জুন, ১৮৪৮

৮২। Downfall of the Camphausen govt. ২১ জুন, ১৮৪৮, যুগ্ম

৮৩। The Hanseman govt. ২৩ জুন, ১৮৪৮, যুগ্ম

৮৪। The 'New Berliner Zeitung' on the Chartist ২৩ জুন ১৮৪৮ যুগ্ম

৮৫। Threat to the 'Gervius Zeitung' ২৪ জুন, ১৮৪৮ যুগ্ম

৮৬। News from Paris ২৪ জুন, ১৮৪৮, যুগ্ম

৮৭। Reichensperger ২৫ জুন, ১৮৪৮, যুগ্ম

৮৮। News from Paris ২৫ জুন, ১৮৪৮, যুগ্ম

৮৯। News from Paris ২৬ জুন, ১৮৪৮

৯০। The 'Northern Star' ২৬ জুন, ১৮৪৯, যুগ্ম

৯১। Marrast and Theirs ২ জুলাই, ১৮৪৮ যুগ্ম

৯২। Arrests ৩ জুলাই, ১৮৪৮, যুগ্ম

৯৩। Arrests ৪ জুলাই, ১৮৪৮, যুগ্ম

৯৪। Legal proceeding against the 'Neue Rheinische Zeitung' ৬ জুলাই, ১৮৪৮

৯৫। The government of action ৭ জুলাই, ১৮৪৭

৯৬। The ministerial crisis ৮ জুলাই, ১৮৪৮

৯৭। Legal proceedings against the 'Neue Rheinische Zeitung' ১০ জুলাই, ১৮৪৮

৯৮। German foreign policy ১১ জুলাই, ১৮৪৮ যুগ্ম

৯৯। Herr Frostman on the state credit ১৩ জুলাই, ১৮৪৮, যুগ্ম

১০০। The ciric militia Bill ২০-২৩ জুলাই, ১৮৪৮, যুগ্ম

১০১। The 'Concordia' of Turin ২৩ জুলাই, ১৮৪৮, যুগ্ম

১০২। Bill on the compulsory loan and its motivation ২৫-২৯ জুলাই, ১৮৪৮, যুগ্ম

১০৩। Bill proposing the abolition of feudal obligations ২৯ জুলাই, ১৮৪৮

১০৪। Miscellaneous ২ আগস্ট, ১৮৪৮

১০৫। Bakunin ২ আগস্ট, ১৮৪৮

১০৬। Hansemann govt. and the old-Prussian criminal bill ৩ আগস্ট, ১৮৪৮, যুগ্ম

১০৭। The 'Kolnische Zeitung' on the compulsory loan ৩ আগস্ট, ১৮৪৮, যুগ্ম

১০৮। Proudhon's speech against Theirs ৩ আগস্ট, ১৮৪৮, যুগ্ম

১০৯। Dr. Gottschalk ৪ আগস্ট ১৮৪৮, যুগ্ম

১১০। The 'model state' of Belgium ৬ আগস্ট, ১৮৪৮

১১১। German citizenship and Prussian police ১১ আগস্ট. ১৮৪৮

১১২। The altempt to expel Schapper ১৮ আগস্ট, ১৮৪৮, যুগ্ম

১১৩। Geiger and Schapper ২২ আগস্ট, যুগ্ম

১১৪। Conflict between Marx and Prussian consorship ২২ আগস্ট, ১৮৪৮

১১৫। The crisis and the counter revolution ১১, ১২, ১৩, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮

১১৬। The government of the counter revolution ২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮, যুগ্ম

১১৭। Cologne com for public safety ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮ যুগ্ম

১১৮। Public prosecutor Hecker questions people ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮, যুগ্ম

১১৯। Counter-revolution in Cologne ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮, যুগ্ম

১২০। An attemps to arrest Moli ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮, যুগ্ম

১২১। State of siege in Cologne ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮ যুগ্ম

১২২। Editorial statement on reappearance of the 'Neue Rheinische Zeitung' ১১ অক্টোবর, ১৮৪৮

১২৩। Revolution in Vienna ১১ অক্টোবর, ১৮৪৮

১২৪। The latesr news from 'model state' ৮ ১১ অক্টোবর, ১৮৪৮, যুগ্ম

১২৫। The Pfuel government ১৩ অক্টোবর, ১৮৪৮

১২৬। Their's Speech ১৩ অক্টোবর ১৮৪৮

১২৭। The 'Frankfurter Oberpostamts Zeitung' and the Viennese Revolution ১৮ অক্টোবর, ১৮৪৮

১২৮। Reply of the king of Prussia ১৮ অক্টোবর, ১৮৪৮

১২৯। Reply of Frederick William IV ১৮ অক্টোবর, ১৮৪৮

১৩০। The 'Reforme' on the June insurrection ২০ অক্টোবর, ১৮৪৮

১৩১। The 'model constitutional state' ২১ অক্টোবর, ১৮৪৮

১৩২। Public prosecutor 'Hecker' ২৮ অক্টোবর, ১৮৪৮

১৩৩। The Viennese revolution and the 'Kolnische Zeitung' ৩ নভেম্বর, ১৮৪৮

১৩৪। On Bourgeoisie and Dr. Nickel ৪ নভেম্বর, ১৮৪৮

১৩৫। News from Vienna ৫ নভেম্বর, ১৮৪৮

অষ্টম খণ্ড ১৮৪৮–৪৯ (নিউ রেইনিশ জেইটুং এ লেখা প্রবন্ধ)

১৩৬। Decision of the Berlin National Assembly ১১ নভেম্বর ১৮৪৮

১৩৭। Cavaignac and the June Revolution ১৩ নভেম্বর, ১৮৪৮

১৩৮। Statement ১৬ নভেম্বর, ১৮৪৮

১৩৯। Confessions of a noble soul ১৬ নভেম্বর, ১৮৪৮
১৪০। The 'Kolnische Zeitung' ১৬ নভেম্বর, ১৮৪৮
১৪১। A decree of Eichmann's ১৮ নভেম্বর, ১৮৪৮
১৪২। Tax refusal and the countryside ১৮ নভেম্বর, ১৮৪৮
১৪৩। The city council ২০ নভেম্বর, ১৮৪৮
১৪৪। Appeal ২০ নভেম্বর, ১৮৪৮
১৪৫। On the proclamation of the Brandenburg Manteuffel ministry about tax refusal ২১ নভেম্বর, ১৮৪৮
১৪৬। Chief public proecutor and 'Neue' ২১ নভেম্বর, ১৮৪৮
১৪৭। Public prosecutors office in Berlin and Cologne ২১ নভেম্বর, ১৮৪৮
১৪৮। State of siege everywhere ২২ নভেম্বর. ১৮৪৮
১৪৯। Position of the Left in the National Assmbly ২২ নভেম্বর, ১৭৪৮
১৫০। Minteuffel and the central authority ২৪ নভেম্বর, ১৮৪৮ যুগ্ম
১৫১। Drigalski-legislator citizen and communist ২৪ নভেম্বর, ১৮৪৮
১৫২। Three state trials ২৪ নভেম্বর, ১৮৪৮
১৫৩। Report of the Francfurt Com ২৭ নভেম্বর, ১৮৪৮, যুগ্ম
১৫৪। News ২৮ নভেম্বর, ১৮৪৮, যুগ্ম
১৫৫। Letters opened ২৮ নভেম্বর, ১৮৪৮
১৫৬। Organ of Manteuffel and Johann ২৯ নভেম্বর ১৮৪৮, যুগ্ম
১৫৭। German professional baseness ২৯ নভেম্বর ১৮৪৮ যুগ্ম
১৫৮। Herr Rauner is still alive ৬ ডিসেম্বর, ১৮৪৮
১৫৯। Second stage of the counter-revolution ৬ ডিসেম্বর. ১৮৪৮
১৬০। A new ally in the counter-revolution ১১ ডিসেম্বর, ১৮৪৮, যুগ্ম
১৬১। The calumnies of the 'Neve···' ১৩ ডিসেম্বর, ১৮৪৮
১৬২। Dismissal of Drigalski ১৭ ডিসেম্বর, ১৮৪৮

১৬৩। Trial of Gottschalk and his comrades ২১-২২ ডিসেম্বর, ১৮৪৮

১৬৪। The Prussian counter-revolution and the Prussian judiciary ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৪৮

১৬৫। Refutation ২৬ ডিসেম্বর ১৮৪৮, যুগ্ম

১৬৬। The new 'Holy Rllance ৩০ ডিসেম্বর ১৮৪৮, যুগ্ম

১৬৭। A new year greeting ৮ জানুয়ারি, ১৮৪৯

১৬৮। The Berlin 'National Zeitung' to the primary dectons ২৫-২৯ জানুয়ারি, ১৮৪৯

১৬৯। The -ituation in Paris ১৮ জানুয়ারি, ১৮৪৮ যুগ্ম

১৭০। The 'Kolnische zeitung' on the Clectors ৩০ জন্থায়ারি, ১৮৪৯

১৭১। Camphausen ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯

১৭২। The first trial of the 'Neue…' ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯, মার্ক্সের বক্তৃতা

১৭৩। The tax refusal trial ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯

১৭৪। Political trial ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯

১৭৫। Lassalle ১০ ফেব্রুয়ারি, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯

১৭৬। Divjson of labour in the 'Kolnische Zeitung' ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯

১৭৭। Prussian financial administration ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯

১৭৮। Stein ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯

১৭৯। Three stars versus triangle ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯

১৮০। Proclamation of a Republic of Rome ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯, যুগ্ম

১৮১। Further contribution on the old Prussian fin adm. ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯

১৮২। A Denunciation ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯

১৮৩। Speech from the throne ২৮ ফেব্রুয়ারি ১ মার্চ, ১৮৪৯ যুগ্ম

১৮৪। Lassalle ৩ মার্চ, ১৮৪৯

১৮৫। Proceedings against Lassalle ৩ মার্চ, ১৮৪৯

১৮৬। State of trade ৬ মার্চ, ১৮৪৯, যুগ্ম

নবম খণ্ড ৬ মার্চ-১৯ মে, ১৮৪৯ (নিউ রেইনিশ জেইটুং-এ লেখা প্রবন্ধ)

দশম খণ্ড ১৮৪৯-৫১

or the struggle between big and small capital' by J. G. Eccarius অক্টোবর, ১৮৫০, যুগ্ম

২৩৪। Review ১ নভেম্বর, ১৮৫০, যুগ্ম

২৩৫। Draft statement by Heinrich Bauer ১৮৫০-এর শেষে, যুগ্ম

২৩৬। Statement ২৭ জানুয়ারি, ১৮৫১, যুগ্ম

২৩৭। Introduction to the leaflet ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫১, যুগ্ম

একাদশ খণ্ড ১৮৫১-৫৩

২৩৮। Statement and accompanying letter to the editorial board of the Augsburg 'Allgemeine Zeitung' ৪ অক্টোবর, ১৮৫১

২৩৯। General Klapka মে-র প্রথমে, ১৮৫২

দ্বাদশ খণ্ড ১৮৫৩-৫৪

২৪০। Hirsch's confessions ৯ এপ্রিল, ৮৫৩

২৪১। David Urquhart ২৯ নভেম্বর, ১৮৫৩

২৪২। The knight of the noble consciousness ২১-২৮ মভেম্বর, ৯৮৫৩

২৪৩। Apropos Carey সেপ্টেম্বর, ১৮৫

ত্রয়োদশ খণ্ড ১৮৫৪-৫৫

২৪৪। In Retrospect ২৯ ডিসেম্বর, ১৮৫৪—১ জানুয়ারি, ১৮৫৫.

২৪৫। The Press and the military system ৩ জানুয়ারি, ১৮৫৫

২৪৬। The crisis in trade and industry ৮-২২ জানুয়ারি, ১৮৫৫

২৪৭। The four points ৯-১৫ জানুয়ারি, ১৮৫৫

২৪৮। Sunday Observance and the Publicans—Clanricarde ১৯ জানুয়ারি, ১৮৫৫

২৪৯। The aims of negotiations ২৩ জানুয়ারি, ১৮৫৫

২৫০। The opening of Parliament ২৪ জানুয়ারি, ১৮৫৫

২৫১। Comments of the cabinet crisis ২৬ জানুয়ারি, ১৮৫৫

২৫২। Parliamentary news ২৭ জানুয়ারি, ১৮৫৫

২৫৩। From Parliament ২৯ জানুয়ারি, ১৮৫৫

২৫৪। On the ministerial crisis ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৫

২৫৫। The defeated govt. ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৫

২৫৬। Two crisis ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৫

২৫৭। A central Junta ৫-২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫

২৫৮। Unpublished extract from a series of Articles 'Revolutionary Spain' ১৪-২১ নভেম্বর, ১৮৫৫

চতুর্দশ খণ্ড ১৮৫৫-৫৬

২৫৯। Palmerstone—The Army ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৫ যুগ্ম

২৬০। From Parliament. [Glastone at the dispatch-box] ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৫

২৬১। Lord Palmerstone ১২-১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৫

২৬২। Herbert's re-election ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৫

২৬৩। Parliament ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৫

২৬৪। Coalition between Tories and Radicals ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৫

২৬৫। Parliamentary and military affairs ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৫, যুগ্ম

২৬৬। On the new ministerial crisis ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৫

২৬৭। (Joseph) Hume ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৫

২৬৮। Layard ২ মার্চ, ১৮৫৫

২৬৯। The buying of commissions—News from Australia ৩ মার্চ, ১৮৫৫

২৭০। The English Press on the Late Tsar ৩-৬ মার্চ, ১৮৫৫

২৭১। On the history of French alliance ৬ মার্চ, ১৮৫৫

২৭২। The committee of Inquiry ৭ মার্চ, ১৮৫৫

২৭৩। The Brussels 'Memoire' ৭ মার্চ, ১৮৫৫

২৭৪। Criticism of the French conduct of the war ১৭ মার্চ, ১৮৫৫, যুগ্ম

২৭৫। Agitation against Prussia—A Day of fasting ১৯ মার্চ, ১৮৫৫

২৭৬। Report from the English Press ২০ মার্চ, ১৮৫৫

২৭৭। From Parliament ২১ মার্চ, ১৮৫৫

২৭৮। Some observations on the history of the French alliance ২৪ মার্চ, ১৮৫৫

২৭৯। Napoleon and Barbes—The newspaper stamp ২৭ মার্চ, ১৮৫৫

২৮০। The committee of Inquiry ২৮ মার্চ, ১৮৫৫

২৮১। A scandal in the French Legislature ৩ এপ্রিল, ১৮৫৫

২৮২। On the history of political agitation ৭ মার্চ, ১৮৫৫

২৮৩। Pianori.—Dissatisfaction with Austria ৯ মে, ১৯৫৫

২৮৪। 'The Morning Post' versus Prussia ১৪ মে, ১৮৫৫

২৮৫। A sitting of the House of Lord ১৫ মে, ১৮৫৫

২৮৬। The Agitation outside Parliament ১৬ মে, ১৮৫৫

২৮৭। Question of Finance ১৯ মে, ১৮৫৫

২৮৮। A critique of the Crimean affair ২৩ মে, ১৮৫৫

২৮৯। Prologue at Lord Palmerstone' ২৪ মে, ১৮৫৫ যুগ্ম

২৯০। Parliamentary reform ২৬ মে, ১৮৫৫

২৯১। Disraeli's motion ২৮ মে, ১৮৫৫

২৯২। From Parliament ২৯ মে, ১৮৫৫

২৯৩। A critique of Palmerstone's latest speech জুন, ১৮৫৫

২৯৪। Parliamentary ৬ জুন, ১৮৫৫

২৯৫। The Great Parliamentary debate ৯ জুন, ১৮৫৫

২৯৬। Napier's letters ১৪-১৫ জুন ১৮৫৫

২৯৭। The debate on Layard's motion ১৬ জুন, ১৮৫৫

২৯৮। Prince Albert's toast ১৮ জুন, ১৮৫৫

২৯৯। The local war ২০ জুন, ১৮৫৫, যুগ্ম

৩০০। Announcement concerning the taking of Sevastopol ২২ জুন, ১৮৫৫

৩০১। The mishap of June 18 ২৩ জুন, ১৮৫৫

৩০২। Miscellaneous reports ২৬ জুন, ১৮৫৫

৩০৩। Miscellaneous reports ৩০ জুন, ১৮৫৫

৩০৪। Clashes between the police and tha people ৬ জুলাই, ১৯৫৫, যুগ্ম

৩৩০। Big meeting in support of political refugee ১৩ নভেম্বর ১৮৫৫

ষোড়শ খণ্ড আগস্ট ১৮৫৮-ফেব্রুয়ারি ১৮৬০

৩৩১। Spree and Mincio ২৩ জুন, ১৮৫৯
৩৩২। Erfurtery in the year 1859 ৯ জুলাই ১৮৫৯
৩৩৩। On Ernest Jones ১৫ জুলাই, ১৮৫৯
৩৩৪। Invasion ২৮ জুলাই, ১৮৫৯
৩৩৫। Quid pro quo জুলাই-এর শেষ-অগাস্টের মাঝামাঝি, ১৮৫৯
৩৩৬। Symptoms of the revival of France's internal life ৯ নভেম্বর, ১৮৫৯
৩৩৭। On the division of Labour শরৎ, ১৮৫৯

সপ্তদশ খণ্ড ১৮৫৯-৬০

৩৩৮। Letter to the editor of the 'Allgemeine Zeitung' ২৭ অক্টোবর, ১৮৫৯
৩৩৯। Statement to the editors of 'Die Refrom', the 'Volks-Zeitung' and the 'Allegmeine Zeitung' ৭ নভেম্বর, ১৮৫৯
৩৪০। Declaration ১৫ নভেম্বর, ১৮৫৯
৩৪১। To the editors of the 'Volks-Zeitung' ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬০
৩৪২। To the editors of the Augsbrug 'Allgemeine' ২১, ফেব্রুয়ারি, ১৮৬০
৩৪৩। To the editors of 'Die Refrom' ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬০
৩৪৪। Declaration ২৪ নভেম্বর, ১৮৬০
৩৪৫। Herr Vogt ফেব্রুয়ারি-নভেম্বর, ১৮৬০
৩৪৬। Extracts from Inre Szabo's work 'The state policy of modern Europe' জুন, ১৮৬০

অষ্টাদশ খণ্ড ১৮৫৭-৬২

৩৪৭। Excerpts from the article 'Blum' published in 'Meyer's Conversation-Lexicon' অগাস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭, এই প্রথম প্রকাশিত

৩৪৮। Excerpts made for the article 'Bourrienne' সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭, প্রথম প্রকাশিত

৩৪৯। Rough draft of the article 'Brune' ডিসেম্বর, ১৮৫৭, প্রথম প্রকাশিত

৩৫০। Excerpts from the article 'Bulow' published in 'Meyer's Conversations-Lexicon' ১-১৮ মার্চ, ১৮৫৮

৩৮, ৩৯, ৪০ খণ্ডগুলোতে চিঠিপত্র আছে। প্রায় সবই এই প্রথম অনূদিত হল।

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৭

দাম: ছয় টাকা